বাংলার ছোটগল্প



বাংলার ছোটগল্প

বাংলার ছোটগল্প

প্রথম খণ্ড

সম্পাদনা

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

৯এ নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৯

BANGLAR CHHOTO GALPA
Collection of Bengali Short Stories
1st Volume
Edited by
Dr Bijit Ghosh

Price Rs 100/-

প্রচ্ছদ : সুনীল শীল

ISBN 81-7332-373-1

দাম : ১০০ টাকা

পুনশ্চ, ১১৪ এন ডাঃ এস সি ব্যানার্জী রোড, কলকাতা - ৭০০০১০ থেকে সন্দীপ নায়ক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস ১১৪ এন ডাঃ এস. সি ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

'আজি প্রণমি তোমারে ..'

শ্রদ্ধেয় স্যার (ড অলোক রায়)-কে

প্রাসঙ্গিক কয়েকটি কথা ঃ প্রথম খণ্ড

বাংলা ভাষার মানুষ যাঁব কাছে চিবঋণী হয়ে আছেন, সেই মহামান্য ড উইলিযম কেবীব লেখা গল্প দিযেই 'বাংলাব ছোটগল্প' গ্রন্থেব প্রথম খণ্ড শুক কবলাম। তার কাবণ, পূর্বে লেখা দীর্ঘ ভূমিকায় সবিস্তাবে উল্লেখ কবেছি আমি।

সবকিছুবই সূচনাবও আগে একটা সূচনা থাকে। ববীন্দ্রনাথ যে-ব্যাপাবটাকে বলতেন, 'প্রদীপ জ্বালানোব আগে সলতে পাকানো।'

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্পেব প্রদীপটি জ্বলাব আগেও তাব সলতে পাকানোব কাজ কবে গেছেন অনেকেই। বিশেষ কবে, রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী ভূদেব মুখোপাধ্যায, বঙ্কিম সহোদব পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায, বিপিনচন্দ্র পাল, জলধব সেন এবং অতি অবশ্যই স্বর্ণকুমাবী দেবী প্রমুখেবা ছোটগল্প লেখাব চেষ্টা কবে গেছেন। সে-সব চেষ্টা ছোটগল্পেব যথাযথ শিল্পরূপ না পেলেও, গল্প হিসেবে এঁদেব সৃষ্টি অবশ্যই স্মবণযোগ্য।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, স্বযং ববীন্দ্রনাথেব লেখা প্রথম গল্পটি (**ভিখাবিণী** —১২৮৪) তো নযই, তাব পব লেখা তিনটি গল্পও (**ঘাটেব কথা**—১৮৮৪, **বাজপথেব কথা**—১৮৮৪, **মুকুট**—১৮৮৫) ছোটগল্পেব যথার্থ সার্থকতায পৌঁছতে পাবেনি। আবাব, সেই ববীন্দ্রনাথেবই লেখা পঞ্চম গল্পটি কেবল তাঁবই প্রথম সার্থক ছোটগল্প নয, বাংলা ছোটগল্পেব ইতিহাসেব ধাবাতেও সেটিই (**'দেনাপাওনা'—১৮৯১**) প্রথম সার্থক ছোটগল্প। সে-কাবণেই, ববীন্দ্রনাথেব আবো অজস্র অনবদ্য গল্প ('স্ত্রীব পত্র', 'পোস্টমাস্টার', 'যজ্ঞেশ্ববেব যজ্ঞ', 'হৈমন্তী', 'তোতাকাহিনী', 'অতিথি', 'সম্পত্তি সমর্পণ', 'শাস্তি' ইত্যাদি) থাকা সত্ত্বেও আমি 'দেনাপাওনা'-কেই এখানে গ্রহণ কবলাম, ইতিহাসগত কাবণেই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব 'বাধারাণী', ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যাযেব, 'বীববালা', অমৃতলাল বসুব 'মাতৃভক্তি', বর্তমান খণ্ডে নির্বাচিত 'সন্ন্যাসিনী' গল্পটি ছাড়াও স্বর্ণকুমাবী দেবীব আবো চাবটি উল্লেখযোগ্য গল্পেব কথা মনে পডছে। যেমন, 'শবৎকুমাব', 'আমাব জীবন', 'পেনে প্রীতি', 'লজ্জাবতী'। জলধব সেনেব 'গৃহিণীযোগ' ছাডাও কেদাবনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'মধুবেণ', 'নিতাই লাহিডী'; প্রমথ চৌধুরীব 'বাম ও শ্যাম'; দীনেন্দ্রকুমাব বাযেব 'গল্প লেখার বিড়ম্বনা', 'দেবতার ভব', 'বিধবা', 'চাকুবে ভাই', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুবের 'চৈতন্যচুটকি', 'ফার্স্ট টু লাস্ট', প্রভাতকুমাব মুখোপাধ্যাযেব 'কাশিবাসিনী', 'বলবান জামাতা', 'আদরিণী', 'দেবী', সবলাবালা সবকাবেব (দাসী) 'বেলে চুরি', 'নিশি', 'ঘড়িচুবি', চাবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'ঘেন্না', 'কবুল জবাব', 'মবণ-আলিঙ্গনে', 'চুড়িওয়ালা', ইন্দিবা দেবীর 'পুবস্কার', শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'একাদশী বৈরাগী', 'অভাগীর স্বর্গ', 'সতী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গল্পগুলি কখনই ভোলাব নয়।

'রুচি সংসদ' ছাড়াও মনে পড়ছে পবশুরামেব অনন্যসাধাবণ সৃষ্টি 'বিরিঞ্চিবাবা', 'কর্দম মেখলা', 'রামরাজ্য', 'শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্ববী লিমিটেড' প্রভৃতি গল্পেব কথা।

আলোচ্য খণ্ডে মোট ৩৯টি গল্প নেওয়া হয়েছে। শুরু করেছি উইলিয়ম কেরীকে দিয়ে। ইতি টেনেছি অন্যধাবার বিশিষ্ট গল্পকাব পরশুরামে (রাজশেখর বসু) এসে। লেখকদের জন্মসনের পরিপ্রেক্ষিতে এই খণ্ডের সময়সীমা ১৭৬১ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত।

ইতিপূর্বে আমাব সম্পাদিত **'নকশাল আন্দোলনের গল্প'** ও **'সত্যজিৎ-প্রতিভা'** গ্রন্থ দু'টি পাঠকদের কাছে সবিশেষ সমাদর লাভ করায় আমি তাঁদেব কাছে কৃতজ্ঞ। এবাবেও আশা করবো, এই ১০ খণ্ডের ৪০০টি গল্পের বৃহৎ সংকলনটি পাঠকদের ভালো লাগবে। আর তাহলেই সম্পাদকের দীর্ঘ সাত বছরের পরিশ্রম সার্থকতা পাবে।

এই বিশাল কাজেব জন্য বিপুল ব্যয়ভাব বহনেব ঝুঁকি নিয়ে 'পুনশ্চ' প্রকাশনা অতি-অবশ্যই গল্প-প্রিয় পাঠকদেব কাছে বিশেষভাবে অভিনন্দিত হবেন।

(ড বিজিত ঘোষ)

সূচীপত্র

ভূমিকা

গল্প আমাদের বড় আদরের জিনিস। গর্বের ধন। সে কী আজকের কথা! মানবজন্ম থেকেই গল্পেরও জন্ম। মানুষ কথা বলতে পাবার সঙ্গে সঙ্গেই শিখেছে গল্প বলতে পারাও। গল্প শব্দটি এসেছে 'জল্প' বা 'জল্পন' বা 'জল্পনা' থেকে। আর জল্পনা হল মানুষের কথাবার্তা। এর মধ্যে আমরা সহজেই মানুষের কল্পনা-প্রবণ মনের সন্ধান করতে পারি। আসলে মানুষ তার অভিজ্ঞতার কাহিনী বলতে গিয়ে তাকে কল্পনার নানা রঙে রাঙিযে মনোহারী করে তুলতো। গল্প বলার প্রবণতা মানুষের আদিম বৃত্তিগুলির মধ্যে একটি। মানুষের ইতিহাসের মতোই সুপ্রাচীন গল্প বলার ইতিহাস। যাযাবর মানুষের মনে একদিন প্রথম দেখা দিয়েছিল কথার অঙ্কুর। সেই কথাকে তারা প্রথম রূপ দিয়েছিল ভাষার মধ্যে। মানুষের গল্প বলার/ শোনার আকাঙ্ক্ষা সেই আদিম কালের।

গল্পের উৎসের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় পুরাকাহিনী। রূপকথা। আর, উপকথার কথা। হোমারকে বলা হয় প্রতীচ্য গল্প-সাহিত্যের পথ-নির্দেশক। এছাড়া তো আছেই আমাদের ভারতীয় সাহিত্যের গল্প। সে-সব গল্প ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে 'ঋগ্বেদে'। 'জাতকে'। 'রামায়ণে'। 'মহাভারতে'। 'পঞ্চতন্ত্রে'। আর গল্প আছে আরব্য-পারস্য উপন্যাসে।

কালিদাসের 'রঘুবংশম্'-কে তো একটা গল্প-ভাণ্ডারই বলা চলে। এছাড়া 'হিতোপদেশ', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'কথাসরিৎসাগর', 'বৃহৎ-কথামঞ্জরী', 'দশকুমার চরিত', 'হর্ষচরিত', 'কাদম্বরী', 'বাসবদত্তা' প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে।

ভারতের 'কথাসরিৎসাগর' সমগ্র পৃথিবীকেই ব্যাপ্ত করেছিল। গল্পের আদিভূমি ভারতবর্ষ থেকেই গল্পের ধারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমশঃ তা এক বিশ্ব-কথাসরিৎসাগরে পরিণত হয়।

'গোপীচাঁদের গীত', 'মনসার ভাসান', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'শীতলা মঙ্গল', 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'ময়মনসিংহ গীতিকা' প্রভৃতি পাঁচালী বা গাথাগুলিকেও বাংলা সাহিত্যের আদি-গল্প রূপে ধরা যেতে পরে।

মানুষের নন্দন সাধনায় গল্প রচনা ও গল্পের বাসনা দিনে দিনে একাগ্র হয়েছে। আজও গল্প-সাহিত্যের জনপ্রিয়তা সবচেয়ে বেশি ও ব্যাপক। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ এখনও গল্পের জাদুতে মুগ্ধ।

সেই কতকাল আগে কোন্ মহাজন কথাকে বৃহৎ করে লিখেছিলেন 'বৃহৎ-কথা'। আর কথা-সরিতের সাগর পাড়ি দিয়েছিলেন যিনি বা যাঁরা, তাঁরা তো আজ ইতিহাস। এগুলোই আমাদের বাংলা গল্পের প্রাচীনতম ঐতিহ্য। জন্তু-জানোয়ার-পক্ষীকেও যাঁরা নায়ক বা কথকের মর্যাদা দিয়ে গল্প শুনিয়ে গেছেন, সেই সাহসী আদি গল্পকারগণ আমাদের প্রণম্যজন। বহুকাল আগে 'পঞ্চতন্ত্র' আর 'হিতোপদেশ'-এও তো কম মহান গল্প শোনানো হয় নি। তারও পর কত-শত শতক পার হয়ে গেল চর্যা আর পদ্যের প্রবহমানতায়। সেই বয়ে চলা স্রোতোধারায় ক্রমশঃ একের পর এক এসে গেল গদ্য। গদ্য-সাহিত্য। আদি-গল্প। গল্প। ছোটগল্প।

(২)

বাংলা গদ্যের সূচনা ও ক্রমবিকাশে সর্বপ্রথম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিশিষ্ট অবদানের কথা বলতেই হয়। তবে ইতিহাসের প্রেক্ষিতে এও উল্লেখ্য, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮০০) দু'শ বছর আগেও বাঙালি সমাজে গদ্যরীতির প্রচলন ছিল।

ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, আবেদন-পত্র, মামলা-মোকদ্দমা বিষয়ক লেখাপত্র ও অন্যান্য দু'চারটি ছোটখাটো বাংলা গদ্যের নমুনা পাওয়া গেছে। যদিও সে-সব ছিল নিতান্তই কাজকর্মের ভাষা। বলাবাহুল্য, সেই কেজো গদ্যভাষা আদৌ শিল্পের ভাষা নয়। তা গদ্য মাত্র। গদ্য-সাহিত্যও কখনই নয়।

দোম আন্তোনিও (আন্তোনিয়ো) দো রোজারিয়ো (রোজারিও) রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থটি ১৭২৬-এর পূর্বেই রচিত বলে অনুমিত হয়। ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন 'ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ' শিরোনাম দিয়ে এটি প্রকাশ করেন। এটি নিছক একটি ধর্ম-পুস্তিকা।

১৭৩৫-এ রচিত হয় পর্তুগীজ পাদ্রী মানোএল (মানোয়েল)-দা-আস্‌সুম্পসাঁও-এর 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। এটিও প্রশ্নোত্তর ঢঙে লেখা একটি ধর্ম-পুস্তিকা মাত্র।

এভাবে ক্রমশঃ বাংলা গদ্য, পুঁথি থেকে মুদ্রণের যুগে আসতে থাকে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশে এই কলেজের অবদান বিস্ময়কর।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত-মুনশীরাই প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন। ইংলন্ড থেকে নবাগত কিশোর ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও ইতিহাস শেখাবার জন্যই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে এই কলেজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলির নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজটি স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে কেরী সাহেব এই কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বাংলা গদ্য-গ্রন্থের মুদ্রণ ও ক্রমবিকাশে এই বিদেশী মানুষটির অবদান প্রতিক্ষণ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য।

১৭৬১-র ১৭ই আগস্ট নরদামটন-শায়ারের পলাস-পিউরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন কেরী। ধার্মিক পিতার ধার্মিক পুত্র। ধর্মপ্রচারের জন্য সপরিবারে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুন। ১৭৯৩-এর ১১ই নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছে ধর্মপ্রাণ ডাক্তার জন টমাসের বাংলার শিক্ষক রামরাম বসুকে কেরী তাঁর মুনশী নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকেই মাসিক কুড়ি টাকা বেতনের বিনিময়ে কেরীকে বাংলা শেখাবার জন্য নিয়োজিত হন রামরাম বসু।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি কেরী, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রমুখ শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পর সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের ভার পান উইলিয়ম কেরী। সেই ভার গ্রহণের পর তিনি বিভাগীয় সুপরিচালনার অভিপ্রায়ে কয়েকজন পণ্ডিত-মুনশীর নিয়োগ সুপারিশ করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু। রামরাম এই কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপকরূপে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাজ করেছিলেন। কেরী যাঁদের কাছে বাংলা ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) রচিত 'কথোপকথন' (১৮০১) এবং 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) গ্রন্থ দুটির শেষোক্ত গ্রন্থটির মধ্যে ('ইতিহাসমালা') বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গল্পরসের সন্ধান পাই। 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র' বা 'ইতিহাসমালা'-র গল্পগুলির উৎস লোককথা হতেও পারে। তবু এই আখ্যান বা গল্পগুলির মধ্যে কেরীর উর্বর কল্পনা, মৌলিক ভাবনা ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটেছে নিশ্চয়ই। 'ইতিহাসমালা'-য় কেরীর গল্পগুলি পড়লেই এ-কথার সত্যতা মিলবে। গল্পগুলি বেশ সুখপাঠ্য। কখনো-কখনো চমৎকার কৌতুকরস পরিবেশনে সবিশেষ দক্ষতা বা মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন কেরী। তাঁর রচনাভঙ্গিমাও চিত্তাকর্ষক। সরস গল্প-আখ্যান পাঠককে আনন্দ দেয়।

বাংলা গদ্যরীতির সাধুপ্রকরণটি যে ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠছিল, তা ১৮১২-তে কেরীর রচিত 'ইতিহাসমালা' থেকেই বেশ টের পাওয়া যায়। এখানে কিছু কিছু গল্পে চমৎকার সরস

রঙ্গ-কৌতুকের উদার প্রকাশ ঘটেছে। এজন্য কেরী, সেই-কালের পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে এ-কালেও নিশ্চয়ই সকলের উচ্চপ্রশংসাই পাবেন। তাই তাঁর লেখা গল্প বা আখ্যান দিয়েই শুরু করলাম এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড।

এই সংকলনের প্রথম লেখক উইলিয়ম কেরীর জন্ম ১৭৬১-তে। শেষ করেছি যে গল্পকারের গল্প দিয়ে তাঁর জন্মসন ১৯৬৮। অর্থাৎ উইলিয়ম কেরী থেকে শুরু করে বিশ শতকের দ্বিতীয় অর্দ্ধও অতিক্রম করেছি আমরা।

কেরীর নির্দেশেই তাঁর পূর্বে অবশ্য দুটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)। 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) এবং 'লিপিমালা' (১৮০২)। এ-কথা সত্য, 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' বাংলা অক্ষরে ছাপা বাঙালির রচিত প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গদ্যগ্রন্থ। কিন্তু নীরস, তথ্যসর্বস্ব এই রচনায় গল্প-রসের কোনো অবকাশই ছিল না। তাছাড়া প্রথম মুদ্রিত গদ্য-গ্রন্থের রচনাকার হলেও গদ্য সৃষ্টির কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য নয়।

সে কৃতিত্বের প্রধান দাবীদার সে-যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)। ইনি লেখেন 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮), 'রাজাবলি' (১৮০৮) ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮১৩-তে রচিত, ১৮৩৩-এ মুদ্রিত)।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর কলমে ছিল বিশেষ প্রতিভার স্পর্শ। তাঁরই চেষ্টায় বাংলা গদ্য, গদ্য-সাহিত্য হয়ে উঠেছে প্রথম। মৃত্যুঞ্জয়ই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। বিদ্যাসাগরের পূর্বে তিনিই একমাত্র ভাষা-সচেতন শিল্পী। তাঁর রচিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান উৎকৃষ্ট গল্প হয়ে উঠেছে। ভাষার মাধুর্যে, হাস্যরস সৃষ্টিতে, ব্যঙ্গ-কৌতুকের ছটায়, সর্বোপরি গল্প-রস পরিবেশনের কৃতিত্বে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'-র একাধিক আখ্যান বা গল্প সে-যুগের পক্ষে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যেই প্রথম ভাষার প্রসন্নতা, স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, সর্বোপরি গল্প-রস পাওয়া যায়।

রামমোহন রায়ের (১৭৭৪-১৮৩৩) রচনায় গল্প-রস ব্যাপারটা কল্পনাতেও আসে না। আসলে তিনি যুক্তির অস্ত্র ধারণ করে নানাবিধ সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য রচনার সময় তাঁর ছিল না। তাঁর ভাষায় তার্কিকতাই প্রধান। পরমত খণ্ডন ও নিজমত প্রতিষ্ঠার একমাত্র অভিপ্রায়ে তাঁর গদ্য হয়েছে শাণিত অস্ত্র। সাময়িক প্রয়োজনের জন্য লেখালিখি হওয়ায় সেখানে রম্য-সাহিত্য রস সৃষ্টির কোনো অবকাশই ছিল না। রামমোহন রায় ছিলেন প্রধানত যোদ্ধা। শিল্পী নন। তবে এ-কথা স্বীকার করতেই হয়, তাঁর গদ্যেই বাঙালির প্রথম মানসমুক্তি ঘটেছে। এটা ঐতিহাসিক সত্য।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭-১৮৪৮) লেখালিখির প্রধান ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সমাজের হিতসাধন। তবু তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্য রচনার মানসে আখ্যানধর্মী নকসা লেখেন। সেই রচনাগুলিতেও আমরা যথেষ্ট গল্পরসের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলি হয়ে উঠেছে এক-একটি সামাজিক গল্প।

যেমন অসংখ্য ছোট ছোট আখ্যানধর্মী সামাজিক গল্পের ফুল দিয়ে একটি অখণ্ড মালা গেঁথেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ।

বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সকল কর্মেই প্রত্যক্ষ প্রেরণা জুগিয়েছে তাঁর গভীর সমাজ-সচেতনতা-বোধ। তাঁর গ্রন্থাবলী রচনার ক্ষেত্রেও এটা সমভাবে সত্য। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর 'আখ্যানমঞ্জরী'-তেও এই সমাজ-সচেতনতার ছাপ সুস্পষ্ট।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (১৮২৭-১৮৯৪) রচনাতেও আমরা পেয়েছি কাহিনীধর্মী গল্প-রস।

(৩)

তবে বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব নিতান্ত আধুনিক কালের ঘটনা। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধান করলে অতিপ্রাচীন কাল থেকেই গল্প পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সচেতনভাবে 'ছোটগল্প' নামক একটি বিশিষ্ট রূপ-সৃষ্টি শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীতেই। তাই ছোটগল্প একেবারেই আধুনিক যুগের সন্তান। প্রাগাধুনিক যুগে আধুনিক ছোটগল্পের পূর্বপুরুষ

সন্ধান নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। আসলে প্রশ্নমুখর আত্মানুসন্ধানী ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন না হলে ছোটগল্পের জন্ম হতে পারে না। তাই, ছোটগল্পের জন্ম একেবারে আধুনিক যুগে। শিল্পবিপ্লবের পর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

ছোটগল্পেব জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীর এক ক্রম-অগ্রসরমান জীবনধারায়। ছোটগল্পের ইতিহাসগত সূচনা হল উত্তব আমেরিকায়, ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'রিপভ্যান উইঙ্কল', এডগার অ্যালান পো-র 'ম্যানুসক্রিপ্ট বাউন্ড ইন এ বটল', আব নাথানিয়েল হথর্ন-এর 'সিলেশ্চিয়েস ওমনিবাস'-এ। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হ'ল, ছোটগল্পের জন্ম পুরোনো পৃথিবীতে (ইউরোপে) হযনি। হয়েছে নতুন পৃথিবীতে (আমেরিকায)।

একসময় জীবনের পুরোনো মূল্যবোধগুলি পারিপার্শ্বিকের চাপে ধ্বসে পড়ে। প্রকাশব্যাকুল ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে রক্ষণশীল সমাজচেতনার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ব্যক্তি প্রচলিত রীতি ও সংস্কাবকে দেবতাজ্ঞানে আর ভক্তি কবতে চায় না। এমন সময়েই বুঝি ব্যক্তির হৃদয থেকে ধ্বনিত হয় আত্মজিজ্ঞাসা। 'নূতন উষাব স্বর্ণদ্বাব খুলিতে বিলম্ব কত আর?'

ছোটগল্পেব জন্ম এই লগ্নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-আমেরিকায় দেখা দিযেছিল এই সংঘর্ষ। মুক্তি-ব্যাকুলতা। আত্মপ্রতিষ্ঠাব আকাঙ্ক্ষা। সমাজ-সচেতনতা। এই সময়ে ফ্রান্সে, উত্তর আমেবিকায, বাশিয়ায়, ভারতে দেখা দিলেন ছোটগল্পের প্রথম পাঁচ প্রবর্তক। গী দ্য মোপাসাঁ। এডগার অ্যালান পো। নাথানিযেল হথর্ন। নিকোলাই গোগোল। এবং ববীন্দ্রনাথ।

ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ কঠিন। আজ পর্যন্ত ছোটগল্পের কোনো সর্বজনস্বীকৃত সংজ্ঞা আবিষ্কৃত হয়নি। এ-থেকেই প্রমাণ হয, ছোটগল্প কত বিচিত্র-বকমেব হতে পাবে।

সব গল্পই ছোটগল্প নয। এমনকি আকাবে ছোট হলেও সে গল্প অনেক সময ছোটগল্প নাও হতে পাবে। ছোটগল্পেব চরিত্র-সংখ্যা কম। ঘটনাও কম। পবিশেষে কোনো একটি প্রধান ঘটনা বা চবিত্র বা ভাব প্রাধান্য লাভ করে এখানে।

ছোটগল্প জীবনের ফলবান খণ্ড মুহূর্তেব রূপায়ণ। সেই সঙ্গে একটি তীক্ষ্ণ জীবন-জিজ্ঞাসাও বটে। ছোটগল্পেব গঠন-কৌশল বিষয়ে সবচেযে জরুবি হল, একাগ্র-কল্পনা-সংহতি। উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতির একমুখিতা। ছোটগল্প প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুবীর অভিমত, 'ছোটগল্প বলবাবও একটা আর্ট আছে, এবং আমার বিশ্বাস এ আর্ট নভেল লেখার আর্টেব চাইতেও কঠিন। আর্টে কনটেন্টেব মূল্যের চাইতে ফর্ম-এব মূল্য ঢের বেশি।'

আর নাবাযণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে, '. . আধুনিক ছোটগল্প হল যন্ত্রণাব ফসল। মহৎ বিশ্বাস থেকে — অন্তত। মোটামুটি একটা নিশ্চিন্ত ভিত্তি থেকে উপন্যাস সৃষ্টি হয়, কিন্তু শূন্যতার আঘাতে তার উপকরণগুলো টুকরো টুকবো হয়ে ভেঙে পড়ে . । ছোটগল্প হল লেখকেব ব্যক্তিত্বেবই এক একটি অভিব্যক্তি। নিজেব সমাজ-পবিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযাযী ছোটগল্পেব লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তাবাই তাঁব রচনায ধবা দেবে। ছোটগল্প, লেখকের ব্যক্তিত্বেবই বিচিত্র-বঞ্জিত বিকাশ।'

ছোটগল্প শিল্পীব অনুভূতিপ্রসূত এমন এক বাধাবন্ধনযুক্ত গদ্য কাহিনী, যার সুনির্দিষ্ট ও একমুখিন বক্তব্য কোনো ঘটনা, পরিবেশ বা মানসিকতাকে আশ্রয করে দ্বন্দ্ব ও ব্যঞ্জনাব মধ্য দিযে পূর্ণতা লাভ করে।

ছোটগল্প এমনই এক গদ্যকাহিনী, যা স্বল্প পবিসবে গল্পটির চিত্তাকর্ষক পবিস্থিতিকে বা চরম পবিণতিতে গল্পকাব শৈল্পিক কুশলতায় উচ্চতব কোটিতে পৌঁছে দেয়। ঘটনা, চবিত্র, অনুভূতি, সাংকেতিকতা যাই ছোটগল্পের বিষয়ীভূত হোক না কেন, তা গল্পকারের পরিমিতিবোধ, আকস্মিক সূচনা, পবিশেষে রসেব নিবিড মোচড বা চমৎকাবিত্বেব গুণে সার্থক হয়ে ওঠে।

ইংবেজ গল্পলেখক রবার্ট লুই স্টিভেনসন প্লট-প্রধান, চবিত্র-প্রধান ও ইম্প্রেশন-মুখ্য এই তিন শ্রেণীব ছোটগল্পের কথা বলেছেন। দুনিয়াব সকল ছোটগল্পকেই এই তিন শ্রেণীব অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আজকাল লক্ষ্য করা যায়, ইম্প্রেশন-মুখ্য গল্পেরই সমাদব বেশি। এডগার এ্যালান পো-ও এই শ্রেণীব শ্রেষ্ঠতা স্বীকাব কবেছেন।

অবশ্য আমার মতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞার সাহায্যে কোনো জীবিত, বহমান, গতিদৃপ্ত শিল্পকে বেঁধে দেওয়া অসম্ভব। প্রতিদিন জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন ছোটগল্পের। নব নব তার অভিব্যক্তি। কত নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা তার। কালের সঙ্গে অনিবার্যভাবেই তা রূপান্তরিত হচ্ছে। প্রতিটি সচেতন মৌলিক স্রষ্টাই চান পূর্বসূরীদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে। কেউ কেউ পারেনও তা। আর যুগের প্রয়োজনে ভাবের বিবর্তন তো ঘটছেই। রূপেরও পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে শিল্পীর সজ্ঞান প্রয়াসে। তাই আজকের সংজ্ঞা কাল অচল।

আধুনিক বাংলা ছোটগল্প একান্তই উনিশ শতকের দান। এই শতাব্দীর ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২), নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০) রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সমসাময়িক কালে গল্প লিখেছেন। তবে যথার্থ অর্থে আধুনিক ছোটগল্প বলতে যা বুঝি তা বাংলা সাহিত্যে সর্বপ্রথম এনেছেন রবীন্দ্রনাথই।

বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের কিছুটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে শ্রী পূঃ রচিত 'মধুমতী' গল্পে। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ মাসে (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) গল্পটি প্রকাশিত (১৮৭৩/১২৮০) হয়। ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর শ্রী পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায। বলা বাহুল্য 'মধুমতী' যথার্থ অর্থে ছোটগল্প হয়ে ওঠেনি। 'বঙ্গদর্শন'-এ রচনাটিকে 'উপন্যাস' নামে পরিচিত করা হয়েছে। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমের বিভিন্ন কাহিনীর প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়ে। বিন্যাস ও ভাষাভঙ্গির ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য।

অবশ্য কারো কারো মতে বাংলা সাহিত্যে প্রথম ছোটগল্পের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে **সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের** (১৮৩৪-১৮৮৯) 'ভ্রমর' পত্রিকায় (১২৮১/১৮৭৪) প্রকাশিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী' নামের গল্প দু'টিতে। কিন্তু এ দুটিও ঠিক ছোটগল্প নয়। 'নভেল' শ্রেণীর রচনা। এর মধ্যে অবশ্য 'দামিনী' গল্পটিতে ছোটগল্পের কিছুটা সম্ভাবনা ছিল। তবুও এগুলিকে ঠিক ছোটগল্প না বলে, ছোটগল্পের পূর্বাভাষ বললেই যথার্থ বলা হয়।

রবীন্দ্রনাথের অনেক আগে থেকেই বাংলা সাহিত্যে গল্প রচনার প্রয়াস বা প্রচেষ্টা দেখা যায়। তবে যথার্থ অর্থে রবীন্দ্রনাথই বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পী। তিনিই প্রথম 'ছোটগল্প' কথাটি ব্যবহার করেন। 'ছোটগল্প' নাম দিয়েই রবীন্দ্রনাথ প্রথম প্রকাশ করেন তাঁর গল্প-সংগ্রহ। ১৮৯৪ সালে। এটিই বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সংকলন।

রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম সার্থক ছোটগল্প **'দেনাপাওনা'** (১৮৯১)। বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম সার্থক ছোটগল্পও এটি। অবশ্য এটিই তাঁর লেখা প্রথম ছোটগল্প নয়। এরও আগে রবীন্দ্রনাথ আরো চারটি ছোটগল্প রচনার চেষ্টা করেছিলেন। ১২৮৪-তে 'ভারতী' পত্রিকায় (শ্রাবণ/ভাদ্র) **'ভিখারিনী'** গল্পটি রচনার মাধ্যমে বাংলা ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ। তবে এই গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ কখনই তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করেননি। গল্প হিসেবে এটি খুবই কাঁচা হাতের লেখা। অবশ্য তাঁর বয়সও তখন মাত্র ষোলো। এটি ছোটগল্প তো নয়ই, একটি সুগঠিত গল্পও নয়। এরপর ১৮৮৪-তে রবীন্দ্রনাথ 'নবজীবন' পত্রিকায় (কার্ত্তিক/ অগ্রহায়ণ ১২৯১) **'ঘাটের কথা'** ও **'রাজপথের কথা'** নামে দুটি ছোটগল্প লেখেন। পরের বছরই ১৮৮৫-তে **'মুকুট'** (১২৯২) নামের আর একটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম চারটি রচনার মধ্যে একটিও ছোটগল্পের যথাযথ শিল্পরূপ পায়নি।

এর প্রায় দীর্ঘ ছ-বছর পর (১৮৯১) বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সার্থক শিল্পীর শিল্প-সাধনার সফলতম প্রকাশ দেখা যায় 'হিতবাদী' (১৮৯১) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মোট ছটি ('দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি') গল্প রচনার মধ্য দিয়ে। এখান থেকেই বাংলা ছোটগল্পের ভগীরথ রবীন্দ্রনাথের যাত্রা শুরু।

(৪)

সাহিত্য ব্যাপারটি দেশ, কাল, সমাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। ফলে, বহু বিচিত্র সামাজিক পরিস্থিতি, রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ, সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষ, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-লাভ, স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষের নানাবিধ সমস্যা ও সংকট অনেক গল্পেরই জন্মের মূল কারণ।

ভারতবর্ষের শতাব্দী-ব্যাপী আর্থ-সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয়, রাজনৈতিক (এবং অন্য নানাবিধ) পটভূমি বহু গল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

'সাহিত্য সমাজের দর্পণ' কথাটি বহু ব্যবহারে শুনতে ক্লিশে ঠেকলেও, আক্ষরিক অর্থে এর অন্তর্নিহিত সুগভীর সত্যতাকে কোনোমতেই অস্বীকার করা চলে না। সাহিত্য সৃষ্টির মূলে আছে দেশ-কাল-সমাজের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া নানা ধরনেব ঘটনার অভিঘাত। একে গল্প সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণাও বলা যেতে পারে।

দেশে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতি, সেইসূত্রে তখনকার আর্থনীতিক-সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন, প্রচলিত মূল্যবোধের ভাঙন বহু গল্প রচনার মূল প্রেরণা হিসেবে লেখকদের মনের ভেতরে ভেতরে কাজ করে গেছে।

সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর অর্থাৎ এক কথায় এক-একটি ছোটগল্পের উদ্ভবের মূলে তলে তলে বিশেষ দেশ-কাল-সমাজ-এর অনিবার্য প্রভাব পড়েছে। সেই বিশিষ্ট পটভূমিই অনেক গল্প-সৃষ্টির অনিবার্য প্রেরণা। কেননা, ছোটগল্প বিশেষভাবে দেশ-কালের অধীন। ইতিহাসের ছোট-বড়ো তরঙ্গ ছোটগল্পকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বাংলা ছোটগল্প বিভিন্ন দিকে যাত্রা শুরু করেছে।

চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভয়াবহতার ছবি অসংখ্য বাংলা ছোটগল্পের বিষয় হয়েছে। এতো ভয়ংকর উত্তাল সময় ভারতবাসীর জীবনে এর আগে কখনো আসেনি। স্বভাবতই সমাজের সমস্ত দিকের সেই প্রচণ্ড আলোড়ন গল্পকারদের সে সময়ে স্থির থাকতে দেয়নি।

এই দশকেই **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দুর্ভিক্ষ, ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, খণ্ডিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তি, উদ্বাস্তু-স্রোত** একের পর এক সব আছড়ে পড়তে থাকে। সে যেন এক মহাপ্রলয়ের সময়। **মন্বন্তর, যুদ্ধ, দাঙ্গা, গণবিক্ষোভ, রক্তাক্ত স্বাধীনতা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু-ঝড়**—চল্লিশের বিপর্যয়কারী এইসব ঘটনা স্বভাবতঃই প্রাধান্য পেয়েছে ছোটগল্পে। চল্লিশের দশক আমাদের জাতীয় জীবনে এক চরম সংকটকাল। তেল নেই। কাপড় নেই। ভাত নেই। মানুষের সৃষ্ট মন্বন্তরে গ্রামে-গঞ্জে, শহরের পথে-পথে প্রতিদিন মরছে হাজার হাজার মানুষ। ঘুষ, কালোবাজারীতে তখন দেশ ভরে গেছে। মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়েছে। নারী হয়েছে পণ্য। নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সব খোলা বাজার থেকে উধাও। যেটুকু পাওয়া যায়, তাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই কম। আর তারও মূল্য আকাশছোঁয়া। সেদিনের বিপর্যস্ত বাঙালি জীবনের এইসব নির্মম প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় এই সময়ের লেখকদের গল্পে। ১৯৩৯-এর ১লা সেপ্টেম্বর যে যুদ্ধ শুরু হয়, তার সমাপ্তি ঘটে ১৯৪৫-এর আগস্টে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৬১টি দেশের ৭০ কোটি মানুষ জড়িয়ে পড়েছিল। আর এই মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ১১ কোটি সৈন্য। মারা গিয়েছিল প্রায় ৫২ কোটি মানুষ।

১৯৩৯-এর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা শুরু হয়। সামাজিক বাতাবরণ অশান্ত, বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সেই বিপর্যস্ত সময়ে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনে ভয়াবহ ভূমিকম্পের মতো নেমে আসে যুদ্ধ। যুদ্ধের ভয়ংকর অভিঘাতে মানুষের ভদ্রতার আবরণ যায় খসে। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার আপ্রাণ সংগ্রামে পারস্পরিক মানসম্ভ্রম, মায়া-মমতা-ভালোবাসা, আনুগত্য-দায়িত্ব-কর্তব্য, নীতি-ধর্ম-সংস্কার যুদ্ধের ঝড়ে সব ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। সমাজের প্রচলিত বিধিনিয়ম সব যায় ভেঙে। নৈতিক মূল্যবোধের বিনাশে সমাজজীবনে দেখা দেয় অধোগতি। কেউ নিজে বেঁচে থাকার জন্য যুদ্ধের বাজারে আপন গ্রামের নারীদের নিয়ে আসে শহরে বিক্রী করতে (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়: **'তীর্থযাত্রা'**)। কেউ গ্রামের সমাজপতির লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচতে, বিশেষত নিজের পেটের খিদে মেটাতে চলে আসে শহরে শরীর-ব্যবসায়ে (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'আজ কাল পরশুর গল্প'**)।

আসলে যুদ্ধ, **মন্বন্তর আর স্বাধীনতার লড়াই** সেদিন বাংলার লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে আমূল বদলে দিয়েছিল। প্রথম শ্রেণীর গল্পকারদের অধিকাংশ সৃষ্টিই শিল্পসফল হওয়া সত্ত্বেও,

সেদিন তাদের গল্পে শিল্পগুণ কতখানি থাকছে সে দিকে খেয়াল করারই অবসব, অবকাশ, বিশেষ করে মানসিকতাই ছিল না। সাহিত্যে তখন বারুদের গন্ধ। চতুর্দিকে হাহাকার আব ক্রন্দনধ্বনি। তারই মধ্যে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের, প্রতিরোধের আগুন।

যুদ্ধেব সেই জ্বলন্ত বিষয বাস্তব হয়ে উঠে এসেছে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের '**কেরোসিন** , মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের '**প্যানিক**', '**নমুনা**', '**যাকে ঘুষ দিতে হয়**', '**তারপর**', '**গোপাল শাসমল**', '**মঙ্গলা**', '**বাগ্দী পাড়া দিয়ে**'; নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের '**ডিম**', '**খড়্গ**', '**নক্রচরিত**', '**তীর্থযাত্রা**', '**দরজা**'; মনোজ বসুর '**রাজবন্দী**', '**গান্ধীটুপি**', নবেন্দ্রনাথ মিত্রেব '**চোবাবালি**', '**রসাভাস**', সন্তোষকুমাব ঘোষেব '**কানাকড়ি**', তাবাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েব '**আখেবী**', সুশীল জানাব '**সওয়াল**' প্রভৃতি গল্পে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী অবস্থায ভারতেব কলকারখানাব সমস্ত যন্ত্রপাতির অবস্থা তখন স্বভাবতঃই খুব খাবাপ। কেননা যুদ্ধ চলাকালে এইসব কাবখানা তথা যন্ত্রপাতির ব্যবহাব হযেছে অত্যধিক। সে সময়ে কোনোবকম মেবামতিও করা যায় নি। আবার নতুন নতুন যন্ত্রপাতিও আমদানি করা হয়নি। ফলে ভোগ্যপণ্যেব উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। স্বভাবতঃই খাদ্য ও বস্ত্রেব উৎপাদনও যথেষ্ট হয নি।

আবাব **যুদ্ধেব** ফাটকা বাজারে পাশাপাশি কিছু লোকেব হাতে প্রচুব অর্থ সঞ্চিত হয়েছে। তাদেব কাছে বেড়ে গেছে ভোগ্যপণ্যের চাহিদা। ফলে জিনিসপত্রের দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া। শুরু হযেছে **কালোবাজারি**।

যুদ্ধেব আকালে দেখা দিয়েছে ভয়ংকব **কেবোসিন সঙ্কট**। সে-সময়েব সংবাদপত্র থেকে এ বিষযক কিছু সংবাদ এখানে উল্লেখ কবতে পাবি। '**জনযুদ্ধ**' পত্রিকায ১৭ই ফেব্রুযারি (১৯৪৩)-ব সংবাদে জানানো হচ্ছে ঃ '. কেবোসিন তেলেব অভাব এমন প্রবল হইয়া উঠিযাছে, প্রায শতকবা ৯০ জনেব ঘবে সন্ধ্যাব পব আলো জ্বলে না, অথচ স্বার্থপবাযণ লোকেব সহযোগিতায় মহাজনেবা গোপনে বেশি দামে এদিকে ওদিকে তেল চালান দিতেছে। কমিউনিষ্ট কর্মীদেব চেষ্টায বিভিন্ন শ্রেণীব জনসাধারণেব সম্মিলিত চেষ্টায় ৪৮ টিন তেল ধরা পড়িল। '

কেবোসিন সঙ্কটেব তীব্রতায সে সময়ে ৩৮ হাজাব গ্রামে আলো নিভে যায়। ২৪ পবগণাব বসিবহাটে স্কুলেব ছাত্রবা কেবোসিনের দাবিতে আদালতের সামনে মিছিল করে এলে পুলিশ তাদেব উপব গুলি চালায। এই ঘটনায় শহবেব ভদ্রলোকদেব প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। বসিবহাটে এবং নদীযাব নানা স্থানে বিক্ষোভে মানুষ ফেটে পড়ে। সে সময়ে সেই বিক্ষোভ দমনে সৈন্যবাহিনী নামানো হয়।

কেরোসিনেব অভাবে গ্রামেব সমস্ত ঘব তখন গভীব অন্ধকাবে ঘেবা। সেই সব ভয়ঙ্কব বাতেব নিকষকালো আঁধাবে মাযের পাশ থেকে নবজাত সন্তানকে তুলে নিয়ে গেছে শেয়ালে।

কেরোসিনের পাশাপাশি শুরু হয়েছে ভয়ংকব **বস্ত্র সংকট**। যুদ্ধ-মন্বন্তবেব দিনগুলিতে খাদ্যেব পাশাপাশি দেখা দিল ভযংকব **বস্ত্র সংকট**। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার এক প্রতিবেদনে এব কারণ হিসেবে বলা হয়, মিল মালিকেবা সস্তা দামেব কাপড় উৎপাদনে উৎসাহী ছিল না আদৌ। কেননা, এক্ষেত্রে তাদের লাভের সুযোগ অনেক কম। তাই সস্তা দামের কাপড় উৎপাদন কমিয়ে দিতে শুরু করে তাবা। শুরু হয সাধারণ মানুষের মধ্যে বস্ত্রের একান্ত অভাব। বস্ত্র-সংকটেব পিছনে সরকারি প্রশাসনের উদাসীনতা ও দুর্নীতিও অনেকাংশে দায়ী ছিল। কালোবাজারীরা সবকাবি কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে কৃত্রিম বস্ত্র-সংকট সৃষ্টি করে। এর প্রতিবাদে বাংলায় ১৯৪৪-এর ১০ই মার্চ '**বস্ত্র সংকট দিন**' রূপে পালন কবা হয। কাপড়ের অভাবে মা-বোনেবা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে ঘরে লুকিয়ে থেকে রাতের আঁধাবে চুপি চুপি ঘর-গেরস্থালির কাজ সেরেছে। এসব ভয়াবহ ঘটনার অনবদ্য জীবন্ত ছবি দেখি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের '**দুঃশাসন**', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের '**দুঃশাসনীয়**' প্রভৃতি গল্পে।

কালোবাজারে রাতেব আঁধারে চাল উধাও। খবরে প্রকাশ ঃ '.. বাজার হইতে চাল একেবাবে উধাও। গোপনে চেষ্টা করিয়া খুব চড়া দরে হয়তো কিছু চাল ব্যবসাদারের কাছ হইতে মেলে।

কিন্তু কার এমন ক্ষমতা আছে যে ব্যবসাদারেব মুনাফা লোভকে তৃপ্ত করিয়া চোরাবাজারের সঙ্গে পাল্লা দিবে? . মুনাফালোভীরা.. স্পষ্টই বোঝে যে চালের অভাবের বাজারে মুনাফা করিতে কোনো অসুবিধাই নাই। কয়েকদিন আটকাইয়া রাখ, লোকে ক্ষুধার জ্বালায় যে দরে পাইবে সেই দরেই চাল কিনিতে বাধ্য হইবে।

মুনাফালোভীরা এত সাহস পাইল কোথায়? কেন পাইবে না? তারা দেখিযাছে দর-নিযন্ত্রণ কাগজ-কলমেই থাকিয়া যায়। সরকারি বিভাগের কড়াকড়ি নাই।'

('জনযুদ্ধ' পত্রিকা, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৩)

সাধারণ মানুষ চালেব নিতান্ত অভাবে মাটি খেয়ে বমি করে মবছে। আবার সে গ্রামেরই কারো ঘরে অফুরন্ত চাল মজুত (নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : 'নক্রচরিত'; '**তীর্থযাত্রা**')। একই বিষয় নিয়ে লিখেছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় '**সাড়ে সাত সেব চাল**', '**ছিনিয়ে খায়নি কেন**' ইত্যাদি গল্প।

মানিক এই দুঃসহ দিনগুলির কেবল সাক্ষী থেকে শুধুমাত্র গল্পই লেখেন নি। এই নিরন্ন, অসহায মানুষগুলোর বেদনার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছেন। চাল ও কাপড়ের দুর্ভিক্ষেব দিনগুলিতে মানিক যে-সব গল্প লিখেছেন সেগুলি সমকালের এক-একটা দলিল।

লজ্জা নিবাবণের অক্ষমতায় নারীর আত্মঘাতী হওয়ার কাহিনী মানিকের পাশাপাশি লিখেছেন নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ('**ইজ্জৎ**'), অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত ('**বস্ত্র**') প্রমুখ। এগুলি নিছক গল্প নয়, সমকালেব ইতিহাস। সে-সময়ে আইনসভাব বক্তৃতাগুলোব দিকে তাকালেই দেখা যায় লজ্জা নিবাবণে অসমর্থ হয়ে কত নারী আত্মঘাতী হয়েছে।

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের ('ইংরেজ ভারত ছাড়ো') অভিঘাতও অনিবার্যভাবে উঠে এসেছে সমাজ-সচেতন, রাজনীতি-সচেতন ছোটগল্পকাবদের কলমে। এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের '**শেষ কথা**', '**শবরী**', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যাযের '**ইতিহাস**', সুবোধ ঘোষের '**কালাগুরু**', '**শিবালয়**' প্রভৃতি গল্প।

১৯৪৩-এ শুরু হয় মন্বন্তর। কৃষকদের জীবনে নেমে আসে এক ভয়ংকর অভিশাপ। খাদ্যাভাবে মৃত্যু হয় অসংখ্য কৃষকের। ধনী জোতদার হতে থাকে আরো ধনী। দবিদ্র কৃষককে শোষণ করে। মাল মজুত করে। ফলে কৃষকদের মধ্যেও দেখা দিতে থাকে গণ-অসন্তোষ। জোতদার ও ব্যবসাদারদের প্রতি। তার চমৎকার ছবি দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যাযের '**মেজাজ**' গল্পে।

মন্বন্তরে উজাড় হতে থাকে একেব পর এক গ্রাম। শহরের পথে-পথে ছড়িয়ে থাকে অসংখ্য শব। রাজপথেব বুভুক্ষুদের অধিকাংশই ক্ষেতমজুর। এই ভয়ংকর মন্বন্তরে সরকাবের তবফ থেকে সুরাবর্দি '**জনসাধারণকে যত কম সম্ভব ভাত খাইতে এবং ভাতের পরিবর্তে অন্য কিছু খাওয়ার অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন।**' বলা হয়: 'চালের পরিবর্তে বাজরা ও জোয়ার দুইটি আদর্শ খাদ্যশস্য। এই দুইটিও বেশ পুষ্টিকর। বস্তুত, উহারা চালেব চেযেও অধিকতর পুষ্টিকব, অথচ চালের চেয়েও সস্তা এবং বাজারে অনায়াসেই পাওয়া যায়। অতঃপর কীভাবে এই দুই শস্য থেকে চাপাটি, খই ও ছাতু তৈয়ার করা যায় তাহার প্রণালী শেখানো হয।'

১৯৪৪-এ দুর্ভিক্ষ ব্যাপক আকার ধারণ করে। শুরু হয় ব্ল্যাকআউট। কালোবাজারী। সমকালের ইতিহাস থেকে জানা যায়, মেদিনীপুরে প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে বিস্তীর্ণ এলাকা ডুবে যায়। সেটা ১৯৪২ এর অক্টোবর। শুধু তমলুক মহকুমাতেই ফসল নষ্ট হয়েছিল শতকরা ৫০ ভাগ। মৃত গোরু-মোষের সংখ্যা ৭০ হাজারেরও বেশি। আর মৃত মানুষের সংখ্যা চাব হাজার অতিক্রম করেছিল। দক্ষিণবঙ্গে ও মেদিনীপুরে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও ধানের মড়কে এই পরিণতি।

দুর্ভিক্ষ তখন বাংলার মানুষদের নিত্যসঙ্গী। অনশনে মৃত্যু ঘটছে আকছার। খবরে প্রকাশ, বর্ধমান শহরের আদালত চত্বরে প্রায় ১৫০ জন বুভুক্ষু শিশু ও নরনারী মহকুমা শাসকের অফিসের সামনে সমবেত হয়ে ভিক্ষাপ্রার্থনা করে। ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় চাল পাওয়া মাত্র তারা সেই কাঁচা চালই মুঠো মুঠো করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে।

কলিঙ্গ -এন শবদেহের মিছিল। বুভুক্ষু মানুষের অসহায় আর্তনাদ আর দুর্মর ক্রন্দনধ্বনি আকাশে-বাতাসে সর্বত্র। ক্ষুধা। কঙ্কাল। কালোবাজারি। পিশাচ-মহাজন। রেশনের লাইন। লঙ্গরখানার ভীড়। সে এক বীভৎস চিত্র। দুর্ভিক্ষে, অনাহারেই কেবল মৃত্যু নয়। দুর্ভিক্ষের গায়ে-গায়ে এসেছিল মহামারি। কলেরা, ম্যালেরিয়া, বসন্ত, টিবি এবং অন্যান্য ব্যাধিতেও মরতে থাকে অসংখ্য মানুষ।

'তমলুকের নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল থানা ও কাঁথি মহকুমার শতকরা ৮০/৯০ জন অনাহারী। এই অঞ্চলে ম্যালেরিয়া গ্রামকে গ্রাম উজাড় করিয়াছে। ৩টি গ্রামে একদিনে মৃত্যু সংখ্যা ২৩৭। একটি গ্রামের হিসাবে মোট ৩৬৫ জনের মধ্যে ২০২ জন লোক মারা গিয়াছে। .... ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায় অক্টোবরের ১৫ দিনের মধ্যে ২২০ জন অনাহারে এবং ১৫০ জন কলেরায় মারা গিয়াছে। এক সপ্তাহে ৫টি মহকুমায় কলেরায় মারা গিয়াছে ২১২ জন।' (**'জনযুদ্ধ'** পত্রিকা, ২০ অক্টোবর ও ১০ই নভেম্বর, ১৯৪৩)

ঘূর্ণিঝড়, বন্যা এবং ধানের মড়কের ফলে অনেক ভূমিহীন শ্রমিক সে সময়ে বেকার হয়ে পড়ে। দুর্ভিক্ষে খেতে না পেয়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে ভূমিহীন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। মাঝি, মাল্লা, জেলে এবং বিশেষ করে যাদের একমাত্র রুজি-রোজগার ছিল ধান ভেনে পেট চালানো, সবার আগে তাদেরই মৃত্যু হয় না খেয়ে। কলকাতার পথে পথে প্রধানত দেখা গেছে এইসব কঙ্কালের মিছিল ও পড়ে-থাকা শব। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তারা জেনে ও দেখে গেছে মানুষের নিষ্ঠুর উদাসীনতা আর হৃদয়হীনতার নির্মম পাশবিক চিত্র!

সমকালের ইতিহাস থেকে পাচ্ছি, সে সময়ে ৬,৬০০ লঙ্গরখানা খোলা হয়েছিল। সেখানে বিতরণ করা হয় খিচুড়ির নামে লাপসি। খাদ্যমন্ত্রী সুরাবর্দির ভাষায় **'মন্ড'**। তাতে থাকতো আতপ চাল, প্রচুর পরিমাণে কুমড়ো, মিষ্টি আলু, সামান্য পেঁয়াজ, লবণ, অল্প ডাল এবং অন্যান্য জিনিস। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'লঙ্গরখানায় ভিটামিন' গল্পটি।

পূর্ববর্তী বছরগুলির তুলনায় ১৯৪৩-এ বেশি পরিমাণেই ধান উৎপন্ন হয়েছিল। অথচ মন্বন্তরে প্রাণ হারিয়েছিল ১৫ লক্ষের বেশি মানুষ। অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক কে. পি. চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, মৃতের সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ। আর নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ডঃ অমর্ত্য সেনের মতে, দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ৩০ লক্ষের কম নয়। তবে সমকালে দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে ৩৫ থেকে ৫০ লক্ষের মধ্যে, অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে।

স্বভাবতঃই দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের মতো ভয়াবহ বিষয় নিয়ে অসংখ্য জীবন্ত ছোটগল্প লেখা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে। এইসব গল্প সম্পর্কে পরিমল গোস্বামী তাঁর **'মহা মন্বন্তর'** গল্প সংকলনের 'নিবেদন' অংশে লিখেছিলেন: 'বাংলার বুকে একদিন মহাপ্রলয় নেমে এসেছিল সেকথা ইতিহাসে চিরদিন লেখা থাকবে। কি কারণে এই প্রলয় ঘটেছিল তারও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যাবে। কিন্তু সেই বর্ণনায় ভবিষ্যতের লোকের কাছে আজকের এই প্রলয়-চিত্র কখনও জীবন্ত হয়ে উঠবে না, উঠবে এই গল্পগুলির ভিতর দিয়েই।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'পার্থক্য'**, **'চাউল'**, **'ভীড়'**; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'তিনশূন্য'**, **'ইস্কাপন'** **'পৌষ লক্ষ্মী'**, **'বোবা কান্না'**; বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের **'বীরুর প্রশ্ন'**; পরিমল গোস্বামীর **'পরিচয়'**, **'ভাঙন'**, **'কৃষ্ণহরির চাল'**, **'তারিণী মাস্টার'**, **'শেষের হিসাব'**, মনোজ বসুর **'মন্বন্তর'**, **'দ্বীপের মানুষ'**, **'বন্যা'**, সরোজকুমার রায়চৌধুরীর **'ক্ষুধা'**, **'ক্ষুধার দেশের যাত্রী'**, **'আগুন'**, **'ছন্নছাড়া'**; অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের **'কালনাগ'**. **'হাড়'**, **'কেরোসিন'**, **'বাঁশবাজি'**, **'চিতা'**, **'কাক'**, **'বস্ত্র'**; প্রবোধকুমার সান্যালের **'অঙ্গার'**; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'নমুনা'**, **'নেড়ী'** **'দুঃশাসনীয়'**, **'আজ কাল পরশুর গল্প'**, **'গোপাল শাসমল'**, **'তারপর'**, **'প্রাণ'**, **'অমানুষিক'**, **'প্রাণের গুদাম'**, **'সাড়ে সাত সের চাল'**, **'রাঘব মালাকার'**, **'ছিনিয়ে খায় নি কেন'**, **'গাযেন'**, **'কালোবাজারে প্রেমের দর'**, **'কে বাঁচায় কে বাঁচে'**; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'কালোজল'**, **'নক্রচরিত'**, **'কবর'**, **'নিশাচর'**, **'ডিনার'**, **'ভাঙাচশমা'**, **'হাড়'**, **'পুষ্করা'**, **'দুঃশাসন'**; শচীন সেনগুপ্তের **'রাজধানীর রাস্তায়'**; নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'রসাভাষ'**, **'রূপান্তর'**, **'পুনশ্চ'**,

'মদনভস্ম', 'আবরণ', নবেন্দুভূষণ ঘোষের **'বাঁকা তলোয়ার', 'বস্ত্রং দেহি', 'ছিন্নমস্তা', 'ত্রিশঙ্কু', 'এই সীমান্তে', 'কল্কি'**, সোমনাথ লাহিড়ীর **'১৯৪৩'**; সুশীল জানার **'সাঙাত', 'খুনী', 'কুকুর'**, অবন্তী সান্যালের **'দুঃশাসন'**; গজেন্দ্রকুমার মিত্রের **'ম্যায় ভুখা হুঁ', 'মহাকালের নিঃশ্বাস'**; ননী ভৌমিকের **'হটাবাহার', 'ধানকানা', 'একটি দিন ১৯৪৪', 'কাফের', 'খুনীর ছেলে'**, সুকান্ত ভট্টাচার্যের **'ক্ষুধা', 'দুর্বোধ্য'** প্রভৃতি গল্পগুলির কথা। বিভিন্ন পর্বে বা সময়ে লেখা হলেও বার বার পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রতিচ্ছবি এইসব গল্পের মধ্যে আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই।

১৯৪৬-এ শুরু হয়ে গেল সর্বগ্রাসী ভয়ংকব ভ্রাতৃঘাতী **দাঙ্গা**। কলকাতার এই ভযাবহ দাঙ্গা তথা **'গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং'**-এর নায়ক হাসান শাহিদ সুরাবর্দি।

১৯৪৬-এর ১৬ই আগষ্ট দিনটা ছিল ভয়াল। ভয়ংকর। ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লিগ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়। ১৭ই আগষ্ট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায, সকাল থেকেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকাব নানা স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়। দাঙ্গাব আশঙ্কায জনমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য কবে লীগ মন্ত্রিসভা ১৬ই আগষ্ট তাবিখে ছুটি ঘোষণা করে। তাতে ফল হয় সম্পূর্ণ বিপবীত। সকাল থেকে বেপরোয়া ভাবে দোকানপাটে হামলা চালিয়ে লুঠ করা হয। ছুবির ঘায়ে মাবা যায় অসংখ্য মানুষ। বিভিন্ন স্থানে আগুন লাগানো হয। ট্রাম, বাস সবকিছু বন্ধ থাকে। আহত অবস্থায শুধুমাত্র মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০০ লোককে ভর্তি করা হয। তার মধ্যে ৬৪ জনেরই মৃত্যু ঘটে। পোস্ট আপিসে আগুন লাগানো হয়। খববের কাগজের আপিসগুলিও অক্ষত থাকে না দাঙ্গাবাজদেব হামলায।

এই দাঙ্গার সূত্রপাত ক্যাবিনেট মিশনেব ব্যর্থতায। মুসলিম লিগ ঘোষণা কবে, দেশেব মুসলমানদের সামনে নিয়মতান্ত্রিক পথে পাকিস্তান আদাযের পথ আর খোলা রইল না। সুতরাং তাদের মতে, পথ তখন একটাই। আর তা হল, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। তা না হলে, মুসলিম লিগের আশঙ্কা, ভারতে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করবে উচ্চবর্ণেব হিন্দুবাজ। মুসলিম লিগেব মতে, ভারতীয় রাজনীতিতে ন্যায় ও সুবিচারের কোনো ঠাঁই নেই। আর সে কারণেই তাবা দেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয় ১৬ই আগষ্ট।

মুসলিম লিগ সরকার সে সময় বাংলার গদিতে আসীন। প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি। ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় বেপরোয়া লুঠতরাজ ও খুন-জখমেব মাঝে পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের। ১৬ তারিখ রাত ৯টায় সরকার কার্ফিউ জারি করে। কিন্তু পবের দিনই, ১৭ই আগষ্ট কলকাতার পার্ক স্ট্রিট ও পার্ক সার্কাস অঞ্চলে দাঙ্গা বেধে যায। সেখানে ১৪৪ ধাবা জারি করা হয়। দুপুরে রাস্তায় নামানো হয় সৈন্যবাহিনীকে। তবু তাব মধ্যেও খুনোখুনি, লুটপাট, দোকান-ঘর-বাড়িতে আগুন লাগানো চলতেই থাকে। পুলিশ, মিলিটাবি, সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় **দাঙ্গা** প্রতিরোধ করতে।

সমকালের পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যাচ্ছে, চারদিন ধরে গোটা শহর দুই সম্প্রদায়েব গুণ্ডাবাহিনীর দখলে চলে যায়। দেশে কোনোরকম আইন, শাসন কিচ্ছু নেই। ফলে লুটেরা, খুনিরা প্রকাশ্য রাজপথে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সে সময়, অর্থাৎ যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই চোরাবাজারে সমস্তরকম অস্ত্র-শস্ত্র অনায়াসে পাওয়া যেত। দাঙ্গাবাজদের হাত থেকে দোকান-পাট, গৃহস্থের ঘর-বাড়ি, ছাত্র-ছাত্রীর হোস্টেল কিছুই রক্ষা পায়নি।

সে-সময়ের প্রতিটি কাগজেই, এই ভয়াবহ দাঙ্গার জন্য অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয় মুসলিম লিগ ও বাংলার লিগ সরকারকে। কাগজে, একটা পরিসংখ্যানে প্রকাশ কবা হয়, কলকাতার দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ৫,০১৮। আহতেব সংখ্যা ১৩,৩২০। এই সংখ্যা এর থেকে বেশি ছাড়া কম নয়।

'শুধু কলকাতা বা 'গ্রেট ক্যালক্যাটা কিলিং' বা কলকাতার কুখ্যাত ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা আরো নানাদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এই দাঙ্গার সূত্র ধরেই ১০ই অক্টোবরে নোয়াখালি এবং কুমিল্লায় শুরু হয় ভয়াবহ হাঙ্গামা। তার আগে কলকাতাব দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় ছোটখাটো

দাঙ্গা ঘটে যায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, বরিশাল ও পাবনায়। নোয়াখালিতে দাঙ্গা মারাত্মক আকাব ধারণ করে। টানা ১৫ দিন ধরে সেখানে চলে লুঠতরাজ। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, অসংখ্য ধর্মস্থান ধ্বংস করা, নারীধর্ষণ এবং ধর্মান্তরিত করা — এসব চলতেই থাকে। ৫০ হাজাবেব বেশি নর-নারী এই দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সে-সময়ের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় এ-প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে ঃ 'সমগ্র নোয়াখালি জেলায় ও ত্রিপুরা জেলাব স্থানে স্থানে যে বর্বরতা ও অত্যাচাব আরম্ভ হইয়াছে তাহার তুলনা ইতিহাসে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। হাজার হাজার লোককে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়, যাহারা তাহাতে বাধা দেয়, তাহাদের গৃহে আগুন লাগাইয়া দিয়া সবংশে নিধন করা হইয়াছে।... দুর্বৃত্তবা হিন্দু মহিলাদিগকে বলপূর্বক বিবাহ করিয়া লইয়া গিয়া নিজ নিজ গৃহে আটক করিয়াছে। এখনও এইরূপ বহু নারী বোবখার মধ্যে আবৃত থাকিয়া পশু জীবন যাপন কবিতেছে।'

নোয়াখালির পর আগুন জ্বলে ওঠে দাউ দাউ করে বিহারে। সেটা ১৯৪৬-এর ২৫শে অক্টোবর। এক আগুন থেকে আরেক আগুন ক্রমাগত জ্বলতেই থাকে। বিহারের দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা কমপক্ষে ৭ হাজার। পাঞ্জাবে ৫০ হাজার সীমান্তরক্ষী মোতায়েন করেও বিপর্যয় ঠেকানো সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাবে শেষপর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬ লক্ষ। সেখানকার এক লক্ষ তরুণীকে অপহরণ করা হয়েছিল। দেশছাড়া হয়েছিল ১ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ। খবরে প্রকাশ, ভারত বিভাগের দিনগুলিতে দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ।

বাঙালি লেখকদের কাছে এই ভযংকর সময়টা ছিল অত্যন্ত জরুরি ও মর্মবিদারক। ফলে দাঙ্গার বিরুদ্ধে, কুৎসিত হিংস্রতার বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অ-সাধাবণ সব ছোটগল্প লেখা হয়েছে এ-সময়ে। তাছাড়া সীমান্তবর্তী বাজ্যগুলিতে যে জাতিদ্বন্দ্ব ক্রমশঃ তীব্র আকাব ধাবণ কবছিল, স্বভাবতই সমাজকে প্রভাবিত করছিল তা। সমাজেব সে-ছবিও স্থান পেযেছে অসংখ্য ছোটগল্পে।

ভযাবহ দাঙ্গার পটভূমিকায় সমরেশ বসু লিখলেন অনবদ্য গল্প 'আদাব'। পটভূমি দাঙ্গার ঢাকা। একটি ছোট্ট গল্প জীবনের কতখানি গভীর কথা সহজে তুলে আনতে পাবে তা এ-গল্পটি না পডলে বোঝা যাবে না। '৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গাকে নিয়ে রমেশচন্দ্র সেন লিখলেন অনন্যসাধাবণ গল্প 'সাদা ঘোড়া'।

ধর্মান্ধতা মানব-জীবনে দু-ভাবে নেমে আসে। একটা দেবতার প্রতি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কাব। আর একটি জাত-পাত ভিত্তিক সম্পূর্ণ উগ্র ভাবনা। যা থেকে দেখা দেয ভয়াবহ সাম্প্রদাযিক দাঙ্গা। এই দাঙ্গাব জ্বলন্ত ছবি দেখেছি নারাযণ গঙ্গোপাধ্যায ('উস্তাদ মেহের আলি খাঁ', 'আবাদ', 'একটি শত্রুর কাহিনী', 'বীতংস', 'ইজ্জত'), নবেন্দ্রনাথ মিত্র ('জৈব'), সোমেন চন্দ ('দাঙ্গা'), তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায় ('কলিকাতার দাঙ্গা ও আমি'), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায ('বিশ্বাস', সত্যাগ্রহী'), পবিমল গোস্বামী ('হত্যা'), মনোজ বসু ('হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা', 'একটি দাঙ্গার কাহিনী'), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ('খতিয়ান', 'ভালবাসা', 'ছেলেমানুষি', 'ব্রীজ', 'বাগ্দীপাড়া দিযে', 'স্থানে ও স্তানে'), অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ('স্বাক্ষর'), রমাপদ চৌধুবী ('অঙ্গপালি'), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ('কাফের'), আবুল বাশার ('নিশি কাজল') প্রমুখের গল্পে। দেবতা বা ধর্ম বা ধর্মগুরুর প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী গল্প লিখেছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ('নয়ন চাঁদের ব্যবসা'), চিত্তরঞ্জন ঘোষ ('আরতির শিখা'), মিহির সেন ('সিদ্ধবাক'), নবেন্দু ঘোষ ('শ্যাম রায়ের মৃত্যু'), সাধন চট্টোপাধ্যায় ('পাতক', 'ঢোলসমুদ্র') প্রমুখ।

ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখা, এই পর্যায়ে আরো যে সমস্ত গল্পকারকে আমরা পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে আছেন ঃ রবীন্দ্রনাথ ('মুসলমানী গল্প'), বনফুল ('দাঙ্গার সময়', 'সবিলা'), সতীনাথ ভাদুড়ী ('গণনায়ক'), সলিল চৌধুরী ('ড্রেসিং টেবিল'), প্রেমেন্দ্র মিত্র ('সাগরসঙ্গম'), ঋত্বিক ঘটক ('ভূস্বর্গ অঞ্চল'), মহাশ্বেতা দেবী ('সাঁঝসকালের 'মা', 'মানত'), সুদর্শন সেনশর্মা ('গঞ্জের ধর্মাধর্ম', 'বরযাত্রিণীরা'), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ('শাজাহান

ও তাব নিজস্ব বাহিনী', 'ধর্মাধর্ম'), সনৎ বসু ('লক্ষ্মীর অমৃতকথা'), চিত্ত ঘোষাল ('ভবনাথের কালীপূজা', 'সুলেমানের হেফাজত'), কিন্নর রায় (আলি আসগর জয়ন্তী অথবা ধর্মনিবপেক্ষতার গল্প', 'ধর্মসংকট', 'বোকাবুড়ো' 'ভাবতবর্ষ-১৯৯০', 'জনগণমন', 'তারার আলোর নিচে', 'লঘিষ্ঠ, সাধারণ'), শৈবাল মিত্র ('ধর্মের কল', 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রিপোর্ট', 'তীর্থযাত্রিণী') অভিজিৎ সেন ('দেবাংশী', 'ব্রাহ্মণ্য'), অমর মিত্র ('দৈব কেরামতি'), অসীম রায় ('লখিয়ার বাপ'), স্বপ্নময় চক্রবর্তী ('পুরোহিত-দর্শন', 'দীন-ইলাহী', 'শনি', 'মেয়েমানুষ অথবা কলাগাছ') অসিত কর্মকার ('খরা'), বীরেন শাসমল ('বর্ণ বিদ্বেষ', 'বর্ণপবিচয়'), দীপঙ্কর দাস ('দাঙ্গার দিকে'), মানব চক্রবর্তী ('বালা বাহমনি'), মনোজ দাস ('দুই শত্রু'), নীহারুল ইসলাম ('দাঙ্গা'), সুখেন্দ্র ভট্টাচার্য ('প্রস্তরখণ্ড', 'লক্ষ্মীব কথা'), ভগীরথ মিশ্র ('গিরগিটি'), মণি মুখোপাধ্যায় ('মায়ার আড়াল পেবিয়ে'), গুণময় মান্না ('ভূতমন্দির'), রামকুমার মুখোপাধ্যায ('নিত্যগোপালের প্রত্যাবর্তন'), আনসারউদ্দিন ('মান্‌তি ষাঁড়') প্রমুখ।

১৯৪৬-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৭-এব এপ্রিল পর্যন্ত সময়সীমাব মধ্যে বাংলার ১৯টি জেলায ৬০ লক্ষ ভাগচাষি তাদের উৎপাদিত ফসলেব তিন ভাগেব দু-ভাগ আদায়ের জন্য জমিদার ও জোতদাবেব বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সংগঠিত করে, বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসে তা 'তেভাগা আন্দোলন' নামেই সুপরিচিত। ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরের শেষে এই মরসুমেই 'তেভাগা চাই' দাবি কৃষকসভা উত্থাপন করে। উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গের ১৯টি জেলায় এই আন্দোলন ব্যাপক গণ-সংগ্রামের রূপ নেয়। দিনাজপুর, রঙপুব ও জলপাইগুড়ি জেলায় এই আন্দোলন গণবিদ্রোহে পরিণত হয। আদিবাসী, রাজবংশী, মুসলিম ভাগচাষি, দরিদ্র কৃষক ও খেতমজুব সক্রিযভাবে এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ কবে। তাদের পরিবাবেব মহিলাগণও প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়। পুলিশেব ও জোতদারেব গুলিতে বহু ভাগচাষি শহিদেব মৃত্যুববণ করে। অসংখ্য ভাগচাষি আহত হয। কযেক হাজাব ভাগচাষিকে গ্রেপ্তার করা হয়। নাবী-নির্যাতনও সমানে চলতে থাকে। এই আন্দোলন দমনে মুসলিম লিগ সরকার পুলিশকে নির্দেশ দেয় জোতদারদের সাহায্য করতে।

পাঁজিযাতে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভা তেভাগাব ডাক দেয। সেটা ছিল ১৯৪০ এব জুন। গ্রামে গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকগণ 'তেভাগা চাই' এবং 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' শ্লোগান দিতে থাকে। ক্রমে আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। পূর্বে আধিয়ারকে ফসলেব অর্ধাংশ জোতদারের বাড়িতে দিযে আসতে হত। এছাড়া বীজ, ধান ও উৎপাদনের জন্য অন্যান্য খরচ আধিযারকেই বহন করতে হত। এবই প্রতিবাদে শুরু হয় তেভাগা সংগ্রাম। আধিযাব বা বর্গাদাবেব পক্ষ থেকে তাবা ফসলেব দুই তৃতীযাংশ এবং জমির স্থাযী প্রজাস্বত্বের অধিকার দাবি করে।

১৯৪৬-এব নভেম্বরে জোরদারভাবে শুরু হযে গেল তেভাগা আন্দোলন। দীর্ঘকাল ধরে কৃষকদের উদযাস্ত পরিশ্রমের যাবতীয ফসল জমিদাব-জোতদারের ঘরে তুলে এনে কৃষকদের প্রতি যে চবম অর্থনৈতিক শোষণ চলে আসছিল, তাবই বিরুদ্ধে কৃষকগণ একজোট হয়ে **তেভাগা আন্দোলনে** নামে।

১৯৪৬-এর জুলাইতে তেলেঙ্গানায় ১৫ হাজার বর্গমাইল জুড়ে বিপন্ন কৃষকগণ সেদিন গেরিলা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তিন হাজার গ্রামে ৩০ লক্ষ মানুষ জড়িয়ে পড়ে জমিদার, জোতদাব আর মহাজনের বিরুদ্ধে এই **তেভাগা আন্দোলনে। ক্রমশ তেভাগা আন্দোলন** ছড়িয়ে পড়তে থাকে বাংলার এখানে-ওখানে।

মাত্র এক মাস আগেই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল। অথচ আশ্চর্য ও আনন্দের কথা, এক মাসেব মধ্যেই ময়মনসিংহ, রংপুব, মালদা, জলপাইগুড়ি, মেদিনীপুরে হিন্দু ও মুসলমান একযোগে আন্দোলনে নামে। তাদেব দাবি, ভাগচাষিকে দিতে হবে উৎপন্ন ফসলের তিন ভাগের দুই ভাগ। আর এবার থেকে ফসল উঠবে চাষিব উঠোনে। জোতদাবেব মরাইয়ে নয়। বাংলাব চাষি দুর্ভিক্ষে সেদিন যেমন বেপরোয়া তেমনি ভয়ংকর প্রতিবাদী।

১৯৪৭-এর নভেম্বরে নতুন পাকা ধান তোলার সময় দিনাজপুর, রংপুর, জলপাইগুড়ি, যশোহর, মালদহ, খুলনা, ময়মনসিংহ ও মেদিনীপুরে আন্দোলন মারাত্মক আকার ধারণ করে। আধিয়ারেরা জোতদারের খেলানের পরিবর্তে নিজেদের খেলানে ধান তুলে জমা করে। ফলে জোতদারের অর্থের জোরে শাসকশ্রেণী তাদের স্বপক্ষে এই আন্দোলন দমনে নেমে পড়েন।

গ্রামে গ্রামে গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। কৃষকবধূদের ওপর বলপ্রয়োগ ও আরো নানাবিধ অত্যাচার চলতে থাকে। কিন্তু নির্যাতিত গ্রামবাসী ও গরিব কৃষকেরা শাসকগোষ্ঠীর দমননীতিকে উপেক্ষা করে সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন চালাতেই থাকে। ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার আধিয়ারদের দাবি মানতে বাধ্য হয়। এই আন্দোলনের পরিচালনায় ছিল দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি। আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও তীব্রতা লক্ষ করে মুসলিম লিগ সরকার ১৯৪৭ সালের ২২শে জানুয়ারি 'বর্গাদার বিল' প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

এই তেভাগা আন্দোলনকে বিষয় করে স্বভাবতঃই বাংলার লেখকদের হাতে এক-একটা জ্বলন্ত দলিলের মতো গল্প তৈরি হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য '৪০-এর দশকে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কম্যুনিষ্ট লেখকশিল্পীগণ যূথবদ্ধভাবে সামাজিক দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। 'প্রগতি লেখক সংঘ' নামে এই বামপন্থী লেখকদের উদ্যোগকে অবশ্যই স্বাগত জানাতে হয়।

তেভাগা আন্দোলন গ্রাম বাংলায় ভয়ংকর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সেই সময়কার এক বিশ্বস্ত দলিল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'হারাণের নাতজামাই'**। এছাড়াও মানিকের **'পেরাণটা'**, **'দীঘি'**, **'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'**, **'মেজাজ'** —এই বিষয়ের উপর লেখা উল্লেখযোগ্য গল্পসমূহ। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'বন্দুক'**, সমরেশ বসুর **'প্রতিরোধ'**, সুশীল জানার **'সখা'**, ননী ভৌমিকের **'বাদা'**, **'সলিমের 'মা'**, **'অর্ডার'** তেভাগা আন্দোলনকে বিষয় করে লেখা অসামান্য সব গল্প।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৭, মাত্র এই ৯ বছরের মধ্যেই বাংলার সমাজে ও রাষ্ট্রে একের পর এক নেমে এসেছে বিপর্যয়। সেই সমাজ-বাস্তবতার ছবি দেখি একাধিক ছোটগল্পে।

১৯৪৭-এ দেশভাগ হয়ে গেল। দেশভাগের দুর্মর স্মৃতি বেদনাবহ হয়ে মাঝে-মধ্যেই ফুটে উঠেছে বাংলা ছোটগল্পে। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষজন, যাদের কলোনির বস্তিতে বাস করতে হচ্ছে, তাদের আপশোসই সব থেকে বেশি।

'৪৭-এর খণ্ডিত স্বাধীনতা তথা দেশভাগের যন্ত্রণার ছবি দেখি অসীম রায়ের **'ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র'**, মিহির আচার্যের **'হিংস্রতা বর্জন করুন'** প্রভৃতি গল্পগুলিতে।

দেশভাগের পরেই এলো **খণ্ডিত ও রক্তাক্ত স্বাধীনতা**। আর সেই দুঃখবহ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শুরু হয়ে গেল প্রবল **উদ্বাস্তু-স্রোত**।

ক্যাম্পে-ক্যাম্পে তখনই অন্তত ৩৫ লক্ষ উদ্বাস্তু বা শরণার্থী এসে হাজির। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর ভয়ংকর ভয়াবহ সমস্যা মাথায় নিয়ে, দেশভাগ হয়ে, ভারত খণ্ডিত স্বাধীনতা লাভ করল। বিভক্ত ভারতই ইংরেজের শেষ উপহার। কলকাতায় তখন শরণার্থীরা বন্যার জলের মতো হু-হু করে ছুটে আসছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বর্মাসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পলাতকের দল ছুটে আসছে কলকাতায়। এক বুক হাহাকার আর আর্তনাদসহ ধেয়ে আসছে গ্রামবাংলার অন্নহীন মানুষের ভুখা-মিছিল। ১৯৪২-এ জাপান অধিকৃত বর্মা মুলুক থেকে দলে দলে কলকাতায় এসে ঢুকছে অগণিত-অসংখ্য উদ্বাস্তু। এই উদ্বাস্তু সমস্যাকে বিষয় করেও বাংলায় একাধিক ছোটগল্প লেখা হয়েছে। যেমন, মনোজ বসুর **'ঘড়ি চুরি'**, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের **'সুবালা'**, **'উপায়'**, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের **'লাঠিয়াল'**, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের **'হেডমাস্টার'**, সন্তোষকুমার ঘোষের **'দ্বিজ'**, সমরেশ বসুর **'পশারিণী'**, **'নিমাইয়ের দেশত্যাগ'** প্রভৃতি।

১৯৬৬-র খাদ্য আন্দোলনেও চতুর্দিকে বিদ্রোহ, বিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। খাদ্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে বসিরহাটের স্বরূপনগরে পুলিশের গুলিতে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র নুরুল ইসলামের মৃত্যু হয়। একই কারণে পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় হাবড়ার কালু মণ্ডল ও কৃষ্ণনগরের ১৭ বছরের আনন্দ হাইতের। এ-সবের উত্তাপও লক্ষ্য করা গেছে একাধিক ছোটগল্পে।

ষাটের দশকের শেষের দিকে শুরু হয়ে যায় নকশাল আন্দোলন। নকশাল আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯৬৭-তে। ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে। যুক্তফ্রন্ট জয়লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় তখন পশ্চিম-বঙ্গেব মুখ্যমন্ত্রী হন। এই ১৯৬৭-তেই নকশালবাড়িতে নকশালদের আন্দোলন শুরু হয়। নকশাল-পন্থীরা '৬৯ পর্যন্ত বামপন্থীদের সঙ্গে থাকলেও তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে মতভেদ প্রকট আকার ধাবণ কবে। বিভিন্ন বিষয়ে, উভয়েব মধ্যে তুমুল তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকে। তখন ডেপুটি চীফ মিনিস্টার হন জ্যোতি বসু। ১৯৬৭-এর সাধারণ নির্বাচনের পরে সি. পি আই (এম) যুক্তফ্রন্টের সরকারে যোগ দিলে চরমপন্থীদেব চূড়ান্ত আশাভঙ্গ হয়। ফলে নকশালপন্থীবা যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে আসে '৬৯-এ।

আসলে সংশোধনবাদী নির্বাচনসর্বস্ব রাজনীতি ছেড়ে বিপ্লবের রাস্তা ধরার জন্য নকশালপন্থী নবীন ও প্রবীণ সদস্যগণের তখন বিপুল উৎসাহ। উদ্দীপনা। ঠিক এই সময়েই দার্জিলিং জেলায় স্থানীয় নেতা চারু মজুমদার প্রায় প্রকাশ্যে সশস্ত্র সংগ্রামের তত্ত্ব প্রচাব করতে শুরু কবেন।

১৯৬৭-র মে মাসে শিলিগুড়ি মহকুমার নকশালবাড়ি গ্রামে যুক্তফ্রন্ট সরকার বেনামি জমি উদ্ধার ও খাস জমি বণ্টনের নীতি রূপাযণের চেষ্টায় পুলিশ প্রশাসনকে পাঠায়। পুলিশের সঙ্গে প্রচণ্ড সংঘর্ষ বাধে আদিবাসী কৃষক, পুরুষ ও মেয়েদের। এই আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্বে ছিলেন চারু মজুমদার। কানু সান্যাল। জঙ্গল সাঁওতাল প্রমুখ। এই সময় থেকে সি পি আই. (এম)-এর মধ্যে অন্তর্বিরোধ চবম পর্যায়ে চলে যায়।

চিনেব তৎকালীন নেতাবা তখন নকশালবাড়িব নেতৃত্বকে **'খাঁটি বিপ্লবী'** আব সি পি আই (এম)-কে **'নয়া সংশোধনবাদী'** বলে প্রচার চালাতে থাকে। দিনে দিনে এই দুই অংশেব মধ্যে শত্রুতা, সংঘর্ষ, খুনোখুনি বেড়েই চলে। অবশেষে তাদেব পথ আলাদা হয।

১৯৬৯-এব ১লা মে কলকাতায় মনুমেন্টেব তলায় এক বিশাল জনসভায় নতুন পার্টি সি পি. আই. (মার্কিস্ট-লেনিনিস্ট)-এব প্রতিষ্ঠা হল। দু-ভাগ হযে গেল সি. পি. আই। সি পি আই এবং সি. পি আই (এম-এল)।

পশ্চিমবাংলায় এক অস্থির সঙ্কটময অবস্থা চলে পুবো '৬০ ও '৭০-এব দশক ধবে। ১৯৬২-তে ঘটে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ। '৬৫-তে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। '৬৬-তে খাদ্য-আন্দোলন। '৬৭-তে যুক্তফ্রন্ট সবকারেব অভ্যুদয়। '৬৮-এব ফেব্রুযাবিতে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে দিয়ে বাষ্ট্রপতি শাসন। '৬৯-এর মধ্যবর্তী নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টেব ফিরে আসা। সবকারে যোগ দেওয়ায় '৬৯-এই চরমপন্থীদের বেবিযে আসা। বেরিযে এসে নকশাল আন্দোলন শুরু কবা। এই সময়ে হিংস্রতাব বাজনীতিব আক্রমণে গোটা পশ্চিমবাংলাব বিধ্বস্ত অবস্থা। নকশালবাড়িব আন্দোলনও তখন চবম পর্যায়ে।

সত্তব দশককে মুক্তিব দশকে পবিণত কবাব আহ্বান জানিযেছিল নকশালপন্থীবা। তাদেব এই আন্দোলনেব প্রধান নেতা ছিলেন চারু মজুমদার। নকশালপন্থীদের মূল লক্ষ্য ছিল সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে কৃষিবিপ্লব ঘটানো। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হওযায কৃষি-বিপ্লবেব মধ্য দিয়েই ভারতীয জনগণেব মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব বলে তাবা মনে কবেছিল।

কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই নয়; বিহার, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহাবাষ্ট্র, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যেও এই আন্দোলন ছড়িযে পড়ে। নকশালপন্থীরা বিহারের ভোজপুব জেলায় ও অন্ধ্রের শ্রীকালুকালামে যথেষ্ট সফলতাও অর্জন করেছিল।

১৯৬৭-তে শিলিগুড়ি মহকুমায় নকশালবাড়ি এলাকার সশস্ত্র কৃষকগণ ধনী জোতদার ও চা-বাগানেব মালিকদের উদ্বৃত্ত জমি দখল করার জন্য লড়াই শুরু কবে। প্রাথমিক সাফল্যেব পব সেখানে একটি 'মুক্তাঞ্চল' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই সংগ্রামে নেতৃত্ব দেয় সি. পি এমেব বামপন্থী অংশ। এই অংশই তাদের সহকর্মীদের সাহায্যে অন্যান্য অঞ্চলেও কৃষি-বিপ্লবের উদ্দীপনা ছড়াতে থাকে।

সাধারণভাবে নকশালপন্থীরা সংগ্রামের ৪টি কাঠামোব উল্লেখ করেছিল। তারা মনে করতো, ভারতেব জনগণের প্রধান শত্রু — (১) মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, (২) সোভিয়েত শোধনবাদ, (৩) জমিদার শ্রেণী এবং (৪) আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়া শ্রেণী। নকশালবাদীদের মতে এই চাব শ্রেণীর শত্রুকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উচ্ছেদ কবতে পারলেই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফল্য

অনিবার্য। সেজন্য তারা বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীকে বিপ্লবী ঘাঁটি হিসেবে প্রস্তুত করে। তাদেব নীতি, দীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিযে মুক্তাঞ্চল সৃষ্টি কবতে কবতে গ্রাম দিয়ে শহরগুলোকে ঘিরে ফেলতে হবে। তারপব সেগুলো দখল কবে চূড়ান্ত বিজয অর্জন সম্ভব হবে। এদেব মতে, সশস্ত্র সংগ্রামই বিপ্লবেব একমাত্র পথ। কাজেই তাবা সংসদীয় নির্বাচন বয়কট কবাব আহ্বান জানায়। দেশেব সক্রিয অন্যান্য বাজনৈতিক দলগুলি সম্পর্কে এদেব অভিমত, তাবা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা সোভিয়েট শোধনবাদ অথবা দেশীয় প্রতিক্রিযাশীলদেব সহযোগী। কাজেই এরা সকলেই বিপ্লবেব শত্রু। আব এই বিপ্লবেব শত্রু তথা শ্রেণীশত্রুকে খতম কবাই ছিল নকশালপন্থীদের মূল লাইন।

দেশেব হাজাব-হাজাব তরুণ চলে আসে এই বিপ্লবেব কাজে। এদেব কাছে নেতারা নির্দেশ পাঠায, পুলিশ খতম কবে অস্ত্র সংগ্রহ করতে। বাষ্ট্রশক্তিও নকশালদেব মুক্তাঞ্চল নিশ্চিহ্ন করে দেওযাব জোবদাব অভিযানে নামে। উভয পক্ষের মধ্যে শুরু হয ভযাবহ সংঘর্ষ। কলকাতার বাস্তায বাস্তায বাড়িব দেওযালে তখন শুধুই মাওযেব ছবি।

এই একই সময়ে ভাবতেব বিভিন্ন রাজ্যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দুর্নীতি আব কালোবাজাবীব বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হযে ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে নকশাল নেতৃবর্গ মনে করেন, জমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই সর্বাত্মক উদ্দীপনাব মধ্যেই কৃষি-বিপ্লব সাফল্য লাভ কববে।

নকশালবাদীদেব ডাকে বিপ্লবের নামে হাজাব হাজাব তরুণ তখন ঝাঁপিযে পড়ে আত্মদানে। অগণিত যুবক, কিশোর প্রাণ হাবায। যে সমাজ ও বাষ্ট্র, সমাজবদ্ধ মানুষেব পবিপূর্ণ দাযিত্ব গ্রহণ না কবে পবিবর্তে অবাঞ্ছিত মনে কবে উপেক্ষা কবে, তাব প্রতি এদের অপবিমেয ক্রোধ ও ঘৃণা। এই ঘৃণা নিযেই তাবা আক্রমণ কবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে। পরিবর্তে বাষ্ট্রযন্ত্রও সুপবিকল্পিত ভাবে গণহত্যা শুরু করে। নকশাল আন্দোলনকে স্তব্ধ কবাব জন্য পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিযে পড়ে বিদ্রোহী যুবকদেব উপব। কলকাতায় এই সংঘর্ষ ভযাবহ আকার ধাবণ করে।

সংঘর্ষ, হিংসা, প্রতিহিংসা আব দমননীতির তাণ্ডবে চতুর্দিকে তখন এক ভযংকব অবস্থা। পুলিশী দমননীতিব মাঝেও বিপ্লবীদেব শ্রেণীশত্রু খতম করাব অভিযান চলতেই থাকে। হাজাব হাজাব যুবক নিরুদ্দেশ হয। গ্রেপ্তার হয অসংখ্য তরুণ। বিভিন্ন জেলখানায় পিটিযে মেবে ফেলা হয অনেককেই। গুলিবিদ্ধ হযেও অসংখ্য বিপ্লবী-কর্মীব জীবনাবসান ঘটে। মৃত্যু ঘটে চারু মজুমদাবেবও।

নকশালপন্থীদেব কর্মসূচিব মধ্যে আব একটি ছিল মূর্তি ভাঙাব পবিকল্পনা। বিভিন্ন মনীষীদেব মূর্তি ভেঙে ফেলা হবে। তাদেব মতে, মুষ্টিমেয় এই সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের স্তুতির ঐতিহ্য থেকে জনসাধাবণ দৃষ্টি ফেবাক মজনু শাহ, তিতুমীব, সিধু-কানুব মতো সংগ্রামী বীরদেব দিকে।

১৯৭২-এর মধ্যবর্তী সময়ে এসে দমননীতির বীভৎসতায় নকশাল আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু নকশালপন্থীবা সত্তব দশককে মুক্তির দশকে পবিণত করতে পাবলো না।

আসলে চারু মজুমদাবেব নেতৃত্বে যে সি পি. আই (এম এল) গঠিত হযেছিল, কাবো কাবো মতে, সেটি ছিল মূলত একটা সন্ত্রাসবাদী দল। গান্ধীজিব অহিংস ধর্মেব দেশে শুধু সন্ত্রাস সৃষ্টি কবে সমাজবিপ্লব কি সম্ভব? সম্ভবত এ-কথা পরবর্তীকালে নকশালপন্থীবাও ভেবেছিলেন। একটা সৎ ও গভীর আন্তবিক ভাবনা নিয়েই নেমেছিল নকশালপন্থীবা। নেমেছিল একটা সুন্দর স্বপ্ন নিযেও। কিন্তু সেই স্বপ্নকে সত্য করার জন্য নিঃস্বার্থ বলিদানের কিছু দুঃসাহসিক স্মৃতি আর বিপুল বিপথগামী ক্ষয়ক্ষতি ছাড়া তাবা আব কি-ই বা রেখে যেতে পাবলো?

রাষ্ট্রযন্ত্র ভযংকর দমননীতিব মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনকে একেবারে নিশ্চিহ্ন কবে দেওয়ার চেষ্টা চালাতেই থাকে। পুলিশ-প্রশাসনের ভযাবহ, নির্মম অত্যাচাব চলে '৬০-এর শেষ থেকে '৭২-এব প্রথম দিক পর্যন্ত। খববে প্রকাশ, নকশাল আন্দোলনে পাঁচ হাজারেরও বেশি তরুণ-তরুণীব মৃত্যু হয়। মুক্তির দশকেব স্বপ্ন নিয়ে সত্তবেব দশককে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল একদল চবমপন্থী। কিন্তু সেই নকশালপন্থীরা ব্যক্তিহত্যা আব সন্ত্রাসের চোরাবালিতে ক্রমশই

তলিয়ে যেতে শুরু করে। সেদিন বাংলার একটি প্রজন্মের অসহিষ্ণু তারুণ্যকে আত্মহননের পথেই কি ঠেলে দেয়নি, নকশাল আন্দোলন তথা নকশাল আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ?

এই নকশাল আন্দোলনের ওপর নেমে আসা ভয়ংকর দমননীতি এবং সেই দমননীতির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ নির্ভীকতা ও অসম দুঃসাহসিকতার সঙ্গে নকশালদের রুখে দাঁড়ানো আর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের জ্বলন্ত ছবি উঠে এসেছে অসংখ্য বাংলা ছোটগল্পে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ঃ অসীম রায়ের **'অনি'**, **'শ্রেণীসংগ্রাম'**, সমরেশ বসুর **'শহিদের মা'**, **'বিবেক'**, মহাশ্বেতা দেবীর **'দ্রৌপদী'**, **'অপারেশন? বসাই টুডু'**, মিহির আচার্যের **'লোহার খুব'**, মিহির সেনের **'আলোয় শুধু'**, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের **'অংশু সম্পর্কে ২টো—১টা কথা যা আমি জানি'**, প্রলয় সেনের **'তপু চলে যাচ্ছে'**, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের **' পলাতক ও অনুসরণকারী'**, সুরজিৎ দাশগুপ্তের **'পরিচয়হারা'**, তপোবিজয় ঘোষের **'কপাটে কবাঘাত'**, দিব্যেন্দু পালিতের **'মানুষের মুখ'**, **'কলকাতা ১৯৬৭'**, মণি মুখোপাধ্যায়ের **'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'**, শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের **'তরাইয়ের মা'**, শৈবাল মিত্রের **'শবসাধনা'**, নিহিব ভট্টাচার্যের **'বাল্মীকির মা'**, একলব্য ঘোষের **'হাবা'**, স্বর্ণ মিত্রের **'প্রসব'**, তিমিরবরণ সিংহের **'সূর্যসেনা'**, অমর মিত্রের **'ডাইন'**, কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের **'প্রতিক্রিয়া'**, কিন্নর রায়ের **'চক্রব্যূহ'**, জয়ন্ত জোয়ারদারের **'উত্তরাধিকার'**, মীনাক্ষি সেনের **'মামিমা'**, জয়া মিত্রের **'স্বজন বিজন'**, ব্রজেন মজুমদারের **'মুখোমুখি ওরা'**, **'খোদহাটির ডাক'**, অমলেন্দু চক্রবর্তীর **'নচিকেতা জানিতে চাহিলেন'**, প্রিতম মুখোপাধ্যায়ের **'সম্পূর্ণ রঙীন'**, কার্তিক লাহিড়ীর **'মানুষ মবলে এখন তদন্ত হয় না'**, চিত্ত ঘোষালের **'যেখানেই হোক'**, স্বপন চক্রবর্তীর **'রতনলাল'**, অজিত মুখোপাধ্যায়ের **'একশো ষাট জন'**, **'কলকাতা . ১৯৭০'**, **'নতুন মানুষ'**, **'পিতা স্বর্গ'**, **'গামছা বোমা'**, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর **'রামযতনের বাগান'**, সুখেন্দ্র ভট্টাচার্যের **'একটি ক্রোধের জন্ম'**, **'চোখের মণির চেয়েও দামী'**, শংকর বসুর **'কিংবদন্তীর শহর'**, **'কপিলের মুলুকযাত্রা'**, সিদ্ধার্থ ঘোষের **'জনক'**, **'বার্তা'**, শঙ্কর সেনগুপ্তের **'বোকাবুড়োর ছেলেরা'**, **'শপথ'**, **'অন্যমুখ'**, দেবেশ রায়ের **'ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালেবিলে'**, **'কয়েদখানা'** প্রভৃতি গল্প।

১৯৭১-এ পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হয়। '৭১-এই বাংলাদেশের পক্ষ নিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে বিজয়ী ইন্দিরা গান্ধী তখন ভয়ংকর স্বৈরাচারী। '৭১-এ কংগ্রেস মধ্যবর্তী নির্বাচনে পুনরায় জয়লাভ করে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। পশ্চিমবঙ্গে শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ অবস্থা ('৭২-'৭৭)। ঘোর অরাজকতা। ইন্দিরা গান্ধী '৭৫-এ সমগ্র দেশে 'জরুরী অবস্থা' জারি করেন। ইন্দিরা গান্ধী-সঞ্জয় গান্ধী-সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়েদের হাতে পশ্চিমবঙ্গের তখন বীভৎস, ভয়াবহ অবস্থা।

১৯৭০ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় পরিপূর্ণ সন্ত্রাসের রাজত্ব চলে। রাষ্ট্র ও জাতির জীবনে তুমুল রাজনৈতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সত্তরের দশকে হিংস্রতার রাজনীতির আক্রমণ ঘটে বারবার। প্রতিক্রিয়াশীলদের সন্ত্রাস সৃষ্টি, '৭২-এর 'ভৈরবতন্ত্র', 'জরুরী অবস্থা'-র তাণ্ডব—সবকিছুই লেখক-শিল্পীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

সমগ্র দেশ তখন ক্ষুধা, ঘৃণা, প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বুলেট-বেয়নেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে পথে-প্রান্তরে, অরণ্যে-বন্দীশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছে। তখন সেই আতঙ্ক-পাণ্ডুর সন্ত্রাসের অবস্থায় রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন অনুযায়ী সমাজসচেতন লেখকগণ সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেছেন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের গল্প লিখতে।

সে সময়ে শুধু রাজনৈতিক কর্মীরাই নন, সাধারণ মানুষ, লেখক-শিল্পী-অভিনেতারাও আক্রান্ত হয়েছেন। কারো কিছুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না। এই স্বাধীনতা হরণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী গল্প আমাদের উপহার দেন তপোবিজয় ঘোষ (**'একটি মাস্তানী গল্পের ভূমিকা'**), মণি মুখোপাধ্যায় (**'গণতন্ত্র ও গোপাল কাহার'**) প্রমুখ।

স্বৈরাচারী ইন্দিরার পতন হল। ১৯৭৭-এ বিধানসভা নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়ী হয়ে বামফ্রন্ট পশ্চিমবাংলায় সরকার গঠন করে। আঁধার কেটে আলোর দেখা মেলে। জনগণ স্বপ্ন

দেখে। অনেক অনেক প্রত্যাশা তাদের। কিন্তু কেন্দ্র-রাজনীতির স্বার্থকলুষ নানা চক্রান্তে বার বার সরকার বদলে, বার বার মধ্যবর্তী নির্বাচনে দেশে গভীর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও অশান্তি দেখা দিতে থাকে।

সমকালীন গল্পকারদেব হাতে উঠে আসে সেই দুঃসময়ের ছবি। আশির দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত, অর্থাৎ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও বলতে হচ্ছে, এমন সঙ্কটময় অবস্থা স্বাধীন ভাবতেব ইতিহাসে আগে কখনও আসেনি। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি, কালো টাকার প্রসার, আন্তর্জাতিক লেনদেনে প্রচণ্ড ঘাটতি, টাকার বহির্মূল্যে অস্থিরতা, বিদেশ থেকে প্রচুর ঋণের ব্যবস্থা—ইত্যাদি সমস্যা প্রধান হয়ে দেখা দিচ্ছে।

'৮০ থেকে বর্তমানেব একবিংশ শতাব্দীতে এখন শুধুই হতাশা আব অন্ধকারেব ছবি। বিপুল পবিমাণ জনসংখ্যার চাপ। বেকার সমস্যা। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি। বাসস্থানেব অভাব। শিক্ষাব অবনতি। পবিবেশ দূষণ। সর্বস্তবে নিজেব আখেব গোছানো কলুষিত বাজনীতি। সাধাবণ মানুষেবও সমস্ত বমা অনুভূতি, শুভ মূল্যবোধ সবকিছু ত্যাগ করে শুধুই অর্থের পিছনে উন্মাদেব মতো ছোটা। চোর ও সমাজবিবোধীতে ভরে যাওয়া বাজনীতিবিদ। যাবা কিনা দেশেব চালক। একাধিক বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নেতাব নামে চুরি, ঘুষ, দুর্নীতি ও আবো নানাবিধ কেলেঙ্কাবিব মামলা চলছে আদালতে। কর্মসংস্থানেব অভাব। শিল্প-কলকারখানা একের পব এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভযংকব অর্থনৈতিক দুববস্থা সমগ্র দেশব্যাপী। চতুর্দিকে সমস্ত কিছুর মধ্যে বন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়া দুর্নীতি। আপিস-আদালত, চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই চলছে চবম মূল্যবোধহীনতা। নৈবাজ্য। সবকাবি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজেব পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে চূড়ান্ত ফাঁকি। শুধু যাওয়া-আসা।

পুবো আশিব দশক ধবেই পাঞ্জাবে জঙ্গি খালিস্তানি আন্দোলন অব্যাহত থেকেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সংঘাতে প্রায প্রতিদিন বড় বকমেব নবহত্যার খবব পাওয়া গেছে। সর্বত্র অনিযম। দেশ নয়, জনগণ নয, স্রেফ কেন্দ্রীয সবকারে যাওযার জন্য, সেখানকার গদি পাওয়াব জন্য পাবস্পবিক কামড়াকামড়ি। কাদা ছোড়াছুড়ি। বাজনীতিব নামাবলী গায়ে দেওয়া চতুর্দিকে সব লোভী শ্বাপদেব চলাফেবা। তাদেব তদনুরূপ দেশ চালানো। বাব বাব বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিব অভ্যুত্থান। পাঞ্জাবে। আসামে। দার্জিলিং-এ। কাশ্মীবে। দেশের মধ্যে সাম্প্রদাযিক সংঘর্ষ। বাবরি মসজিদ। দেশ-প্রতিবেশী দেশে সংঘাত। কার্গিল। আব দুর্নীতি এবং দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সমস্ত বকম মূল্যবোধ বিসর্জন দেওয়া আমরাও। সবার উপবে আছে বাজনীতিব দুর্বৃত্তায়ন ও দূর্বৃত্তের সামাজিকীকরণ। যা এখনকার একটা চালু বিষয। এই সবকিছুই বিষয় হয়ে উঠে আসছে সাম্প্রতিককালের ছোটগল্পকারদেব গল্পে। পূর্বেও লেখা হযেছে এসব নিয়ে। তবে এখন লেখা হচ্ছে তার থেকে ঢের বেশি।

স্রষ্টার মনে গল্পসৃষ্টির অনিবার্য-প্রেবণা হিসেবে নিঃসন্দেহে কাজ করে যায় তাঁর সমকাল। তাঁর চোখে দেখা দেশ-কাল-সমাজেব ছবি। সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি—এ কালের সর্ববিধ ক্ষেত্রে আগ্রাসী দুর্নীতি, সামগ্রিক মূল্যবোধহীনতা, রাজনীতির দেউলিযাপনা, প্রেম-ভালোবাসা-আন্তরিকতাহীন মানবতাবর্জিত আত্মস্বার্থসর্বস্ব যান্ত্রিক জীবন—এ-সব বিষযই এখনকাব এক-একটি ছোটগল্পের প্রধান উপজীব্য।

(৫)

সাহিত্যে মাঝেমধ্যে নতুন আন্দোলন আসে। **'কল্লোল'** (১৯২৩) পত্রিকাকে অবলম্বন কবে শুরু হয়েছিল তরুণ কথাকাবদেব আন্দোলন। ১৯৬০-এর এপ্রিলে গড়ে উঠেছিল শ্রুতি আন্দোলন। এর দু'বছর পরই শুরু হযেছিল **'হাংবি জেনারেশন'** আন্দোলন। ১৯৬২-র এপ্রিলে প্রথম প্রকাশিত **'হাংরি জেনাবেশন'** পত্রিকাটিকে নির্ভর করে গড়ে ওঠে **'শাস্ত্রবিরোধী সাহিত্য আন্দোলন'**। যাদেব মূল বক্তব্য ছিল, সমস্ত মূল্যবোধের বিনাশ। **'এই দশক'** নামে আর একটি আন্দোলনও চলেছিল কিছুদিন। তাঁরা আগ্রহী ছিলেন শাস্ত্রবিবোধী রচনায। গল্প থেকে কাহিনী ও প্লট বিসর্জন দিয়ে তাঁরা পুবনো প্রথা ভাঙতে চেয়েছিলেন। শাস্ত্রবিরোধীরা এই গল্পহীন গল্পের

কথা বলতে শুরু করেন সেই ষাটের দশক থেকেই। একসময় শুরু হযেছিল **'নিম সাহিত্য আন্দোলন'**। তবে বিশেষ করে উল্লেখ্য, বিমল করের **'নতুন রীতির গল্প আন্দোলন'**। তিনিই প্রথম পূর্বের গল্প-আন্দোলনগুলির কৃত্রিমতা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করেন।

তবে পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাস লক্ষ করলে দেখা যায়, কোনো সাহিত্য-আন্দোলনই বেশিদিন টেঁকে না। হঠাৎ আবির্ভূত এই সব আন্দোলনের প্রবক্তারাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে হারিয়ে যান অন্ধকারে। বরং অনেকসময দেখা যায় সেই আন্দোলন থেকে অপেক্ষাকৃত অপরিচিত কেউ কেউ উঠে আসেন। সেই শক্তিমানের আবির্ভাব, ওই আন্দোলনকে উপলক্ষ করে হলেও, মূলতঃ তিনি উঠে আসেন নিজস্ব প্রতিভার জোরেই। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, **'কল্লোল'** আন্দোলনের সুফল ভোগ করে, ঐ গোষ্ঠীর প্রায় সকলকে পিছনে ফেলে প্রতিভার দীপ্তি নিযে এগিযে এসেছিলেন তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে এতো রীতি-নীতির পরীক্ষা, আন্দোলন-টান্দোলন হলেও শেষ পর্যন্ত গল্প থেকে গল্পকে কখনো বাদ দেননি বড়মাপের লেখকেরা।

সাম্প্রতিক কালের ছোটগল্প (কিছু ব্যতিক্রম বাদে) আগের মত আর পাঠককে আকর্ষণ করছে না। এটা একটা অত্যন্ত বাস্তব সত্য ঘটনা। পাঠকগণ ক্রমশঃই ফিরে যাচ্ছেন পুরনো দিনের ধ্রুপদী লেখকদের গল্প পাঠে। কিন্তু কেন? আসলে পাঠক বরাবরই চান একটা গল্প। কিন্তু এখনকার অনেক গল্পকারই নিটোল গল্পকে ভেঙে-চুরে না-গল্প করে তোলার পরীক্ষায় রত। বর্তমানের সেইসব আঙ্গিকসর্বস্ব গল্পকারগণ স্বভাবতই গল্প-খোর পাঠকের আজন্ম গল্প-পাঠের স্পৃহাকে ঠিক জাগিয়ে তুলতে পারছেন না। এভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের সূত্র ধরে অকারণে গল্পকে দুর্বোধ্য করে তুললে, গল্পের পাঠক কমতে তো বাধ্য।

ছোটগল্পের ভাষা বা সংলাপ রচনা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। সেকাল থেকে একালে রচিত অসংখ্য গল্পের ভাষার বিবর্তন এক্ষেত্রে লক্ষ করার মতো। কালের নিযমে গল্পের ভাষা বদলায়। ভাষা বদলায় সমযের ব্যবধানেও। আবার গল্পের বিষয়, পরিবেশ, শ্রেণী এবং চরিত্রানুযায়ীও ভাষার অনিবার্য রূপান্তর ঘটে। একই লেখকের ভিন্ন ভিন্ন সমযে রচিত গল্পের ভাষার পরিবর্তনও লক্ষণীয়। বিষযের ভিন্নতার কারণেও ভাষার সূক্ষ্ম পরিবর্তন সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু এমন গঠনমূলক ভাষা-সচেতনতার পরিবর্তে শুধুমাত্র স্টান্ট দিয়ে, ভাষার মারপ্যাঁচ কষে, আধুনিকতার নামে কিছু গিমিক, সিনট্যাক্সের ভাঙচুর, অনিবার্য শব্দসমূহকে বাদ দিয়ে অকারণে-জটিল শব্দ-শব্দ খেলাকে কেউ কেউ ভাবছেন আধুনিকতা।

গল্পের চরিত্রের মুখের সংলাপ ব্যবহারেও অনেক সমযই নিষ্ঠার অভাব চোখে পড়ে। অনেক গল্পে ব্যবহৃত ভাষা বা উপভাষা দেখা যায় আদৌ সেই অঞ্চলেরই নয়। আবার কারো কারো লেখায় মাত্রাতিরিক্ত আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের প্রবণতা গল্পের গতি ও রস উভযকেই নষ্ট করছে। এমনিতেই সাহিত্যের সেই সর্বগ্রাসী আকর্ষণ ক্ষমতা এখন অনেক কমেছে। বর্তমানের বিশেষ আর্থ-সামাজিক কাঠামোয়, আমূল বদলে যাওয়া সমাজ-চরিত্রে স্বভাবতঃই মানুষের উপর সাহিত্যের সেই অমোঘ প্রভাব আদৌ নেই। আগে ঘরের মহিলাগণ দ্বিপ্রাহরিক অবসরে গল্প, উপন্যাস পড়তেন। এখন গোটা দুপুরটায় ঘরে থাকা মহিলাদের জন্য বিশেষভাবে বন্দোবস্ত করা আছে টি ভি -র সব মেগা সিরিয়াল। আর একটু অর্থ থাকলে হাজারো সুখের (বিনোদন) অপ্রতিরোধ্য হাতছানি তো এখন আছেই। প্রায় সকলেই সুখ কিনতে ছুটছে সেই অর্থের পিছনে। এমতাবস্থায় সাহিত্য তথা ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ কোথায়?

ছোটগল্পের সমালোচকগণকেও দেখি অনেক ক্ষেত্রে পক্ষপাতদুষ্ট। অথবা ব্যাপক এবং সাম্প্রতিক পড়াশুনোর সঙ্গে কেউ-কেউ আদৌ যুক্ত নন। তাছাড়া পত্র-পত্রিকা, প্রকাশক, সরকারি, বেসরকারি পুরস্কার ইত্যাদির ক্ষেত্রে বাংলা ছোটগল্প আজও যথেষ্টই অবহেলিত। এই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিশিষ্ট গল্পকার প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষের কথা : 'ছোটগল্পকে আমাদের সাহিত্যের মণি বলে যদি মানি, তবে আজ এত যে পুরস্কারের ধুম, কী রাষ্ট্রীয় আকাদেমিতে, কী রাজ্যস্তরের বিবিধ স্বীকৃতিতে, এবং অর্থমূল্যে বা উচ্চারণে কত না

সংস্থার কত না সম্মান, কত না অর্পণ, সেখানে কবিতা আছে, প্রবন্ধ আছে, কিন্তু গল্প কই? পত্র-পত্রিকাতেও ছোটগল্প খুব গরীব জ্ঞাতির মতো একটু কৃপণ কৃপা পায়। সে কি অনাত্মীয়? অন্তত ছোটগল্পের যিনি আদি স্রষ্টা, সেই রবীন্দ্রনাথের নামে যে সরকারি পুরস্কার, আজ পর্যন্ত নিছক কোনো ছোটগল্প বা ছোটগল্প লেখককে তা দেওয়া হয়েছে কি? অন্যান্য ভাষার কথা জানি না, আকাদেমি বাংলার ব্যাপারে একবার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল। হয়তো লেখক পরশুরামের মতো শালপ্রাংশু লেখক বলেই। প্রবন্ধ-নিবন্ধ, উপন্যাস, বড়গল্প, এমন কি সুকুমারী কবিতার প্রতি কিছুমাত্র কটাক্ষ করছি না। খালি নির্মল জিজ্ঞাসা, অন্যান্য প্রকরণ যদি আনন্দে নন্দিত হয়, তবে গল্প কেন ধনীর দুয়ারে ভিখারিনী মেয়ে হয়ে থাকবে? অথচ ওই মেয়েটিকে নিয়েই না আমাদের অহংকারের পত্‌পত্‌ পতাকা ওড়ে? এই খানেই ভণ্ডামি, সেইটেই এই সুযোগে খোলাখুলি লিখে দিতে চাইছি।'

একই কথা ভিন্ন ভাষায় বলেছিলেন রমাপদ চৌধুরীও : 'একটি শাখাতেই আমরা পৃথিবীর যে কোন উন্নত সাহিত্যের সমকক্ষ। যে কোন একটি প্রধান ভাষার গল্পকে নিয়ে এসে বাংলা গল্পের পাশে দাঁড় করালেই সেটা বোঝা যাবে। কবিতায় সমকক্ষ নই, উপন্যাসে নই। সেখানে হতে পারলে খুশি হবো, কিন্তু যে মুকুট বাংলা সাহিত্যের আছে সেটা ধুলোয় লুটোবে কেন?

সাহিত্যের পুরস্কারগুলোর কোন দাম নেই আজকাল—কি রবীন্দ্র পুরস্কার, কি অ্যাকাডেমি পুরস্কার, কিভাবে এবং কেন দেওয়া হয়, তা তো আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এই পুরস্কারের প্রভাব তো আছেই। ভেবে দেখুন, আজ অবধি সত্যিকারের ছোটগল্পের বইকে একবারও পুরস্কার দেওয়া হয় নি। পরশুরাম? আমরা যে ধরনের ছোটগল্পের কথা বলছি, তাঁর লেখা সেই গণ্ডির বাইরে।'

আবার পাশাপাশি বর্তমানের পাঠকদের অভিযোগ অন্যরকম। তাদের মতে, ভালো লেখা আগের মত এখন আর তেমন লেখা হচ্ছে না। সেটা সম্ভবতঃ এখনকার গল্পকারদের অভিজ্ঞতা, পরিশ্রম ও নিষ্ঠার অভাবেই। সেজন্যই হয়তো তা পাঠককে তেমন স্পর্শ করতে পারছে না। তাছাড়া এখনকার ছোটগল্পে বিষয়গত একঘেয়েমিও পাঠকের পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে উঠেছে।

আসলে বর্তমান সময়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মানসিকতার পাঠকদের কাছে লেখকের পৌঁছানোর একটা সেতু গল্পের বিষয়। সেই বিষয় ব্যাপারটাই গল্পকারদের কাছে একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এখন। কেননা আমাদের ছোটগল্পের রাজ্যটিকে বিচিত্র বিষয়ের মাধ্যমে বেশ কিছু রাজা-মহারাজা পূর্বেই সমৃদ্ধতম করে গেছেন। সেই প্রেক্ষিতে বিষয়- ভাবনাটা এখনকার অনেক গল্পকারের কাছেই একটা সমস্যা।

সর্বোপরি এখনকার সর্ববিষয়ে 'এ্যাডভান্স' পাঠককেও বিষয় দিয়ে অভিভূত করা বেশ কঠিন কাজ। দুর্নীতি দেখে দেখে তার চোখ পচে গেছে। রাজনীতির আত্ম-স্বার্থসর্বস্বতায় পাঠক বীতশ্রদ্ধ। খুন, ধর্ষণ, সমকামিতা, অবৈধ সম্পর্ক, মোটের উপর যাবতীয় মূল্যবোধহীনতা দেখে, পাঠক আর কিছুতেই বিস্মিত হয় না। অবশ্য শক্তিমান গল্পকার তাঁর উপস্থাপনার বিশিষ্টতায় যে-কোনো বিষয়কেই হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে নিশ্চয়ই পারেন। কিন্তু বর্তমানে তেমন প্রতিভাবান গল্পকারের সংখ্যা নিতান্তই কম। এ-কথা ভেবেই কি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, যথার্থই বুদ্ধিজীবী প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেছিলেন, — সাহিত্যে রাজতন্ত্রের যুগ শেষ, এবার গণতন্ত্রের যুগ শুরু। গল্প-সাহিত্যেও এখন বড়-বড় রাজা-মহারাজাদের পরিবর্তে ভরে গেছে অসংখ্য মাঝারি মাপের প্রজাবৃন্দে। এখনকার যান্ত্রিক সময়ে, অনুভূতির চর্চাহীন পাঠককে (কিছু ব্যতিক্রমী সহৃদয় পাঠক নিশ্চয়ই আছেন।) গল্প-শিল্পের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করতে পারা বেশ কঠিন ব্যাপার। আবার তা না পারলে অন্য নানাবিধ সহজ বিনোদনের যে কোনো একদিকে তিনি চলে যাবেন। অথচ একসময় বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে কনিষ্ঠ এই শাখাটিই ক্রমে ক্রমে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। বিষয় ও রূপের বৈচিত্র্যময়তাই একদিন পাঠকদের কাছে ছোটগল্পকে দ্রুত জনপ্রিয়ও করে তুলেছিল। কিন্তু ইদানিং সে ছবিটা পাল্টাতে শুরু করেছে।

এখন একাধিক লেখকের লেখাকে দুই-মলাটের মধ্যে ধরে সংকলনগ্রন্থ বার করার খুব চল হয়েছে। সেই সংকলনগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পক্ষপাতদুষ্ট। এই সব সংকলনে গল্প স্থান পাওয়ার মানদণ্ড অনেক সময়েই গল্পের শ্রেষ্ঠত্বে হচ্ছে না; হচ্ছে পারস্পরিক চেনাজানার সূত্র ধরে।

আগের দিনে কোনো গল্পকার ডাকযোগে লেখা পাঠালেও স্রেফ লেখার মান বিচার করেই তা ছাপা হয়ে যেত। শুধু তাইই নয়, তারপর পত্রিকাব সং সম্পাদকগণ প্রত্যন্ত গ্রাম থেকেও সেইসব প্রতিশ্রুতিবান গল্পকারদের খুঁজে বার করে অনুপ্রাণিত করতেন, সাহিত্যেব প্রতি দায়বদ্ধতা ও ভালোবাসা থেকেই।

সেদিন আর নেই। তাই আগের মত খোঁজাখুঁজির পবিশ্রম না করে চেনাজানার মধ্যে থেকেই কাজ চালিয়ে নেন এখনকার অধিকাংশ সম্পাদকই।

তবু অন্যান্য শাখার তুলনায় ছোটগল্পেব অবস্থা কিছুটাও ভালো। প্রবন্ধ সাহিত্যের পাঠক বরাবরই কম। একালে তো আবো কম। অত ভাবনা-চিন্তা, মাথা ঘামাবার সময় ও ইচ্ছে মানুষের এখন একেবারেই নেই। কবিতার সূক্ষ্ম অনুভূতি-অনুভব-উপলব্ধি ধরবাব জন্য নিরন্তব কাব্যপাঠে অনুশীলিত সহৃদয় মনের মানুষের দরকার। তেমন মানুষের সংখ্যা এখনকার কম্পিউটার যুগের ব্যস্ততায় হাতে গোনা। নাটক পাঠ্য হলেও মূলত দৃশ্যকাব্য। সময় বাব করে হলে গিয়ে তা দেখা, কম মানুষই এখন পারেন বা করেন। আর উপন্যাস পাঠেব মস্ত অবকাশ বা অবসর এখন আর কটা মানুষের আছে? এই একান্ত সময়াভাবের ব্যস্ততাব কাবণেই সারারাত্রব্যাপী জনপ্রিয় যাত্রাপালা এখন তিন ঘণ্টায় সমাপ্ত হয। পঞ্চাঙ্ক নাটকের স্থান গ্রহণ করেছে এখন জনপ্রিয় একাঙ্ক। মহাকাব্যের ধারা শেষ হযে এসেছে গীতিকাব্য। ঠিক এই মানসিকতা থেকেই, আমাব বোধ হয, এ যুগের মানুষেব পক্ষে সাহিত্যেব সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য, উপযোগী শাখা ছোটগল্প। ছোটগল্পেব মধ্যে নিহিত আছে মানুষকে সর্বাপেক্ষা অধিক আকর্ষণের ক্ষমতা। তাই ছোটগল্পের লেখকদের আবও বেশি সং, নিষ্ঠাবান, পবিশ্রমী ও আন্তরিক হতে হবে, এই শিল্প মাধ্যমটিকে পাঠকদেব কাছে আবও আকর্ষণীয কবে তুলতে হবে। পাঠক মানুষের জীবনের গল্প চান। তাকে বাদ দিয়ে নানানতর কায়দা করে, তার নাম অন্তর্বাস্তবতা, স্যুররিয়ালিজম, ম্যাজিক-রিয়ালিজম যে নামই দেওয়া হোক না কেন, পাঠকের কাছে তা স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি করতে পারছে না।

মূলকথা হল গল্প চাই, গল্প। গল্প বলো, গল্প শুনি। সেই আদিকাল থেকেই মানুষ গল্প চায়। যাঁবা টিকে আছেন, তাঁরা সকলেই ওই গল্পের জোরেই বেঁচেআছেন। যদিও কাজটা নিঃসন্দেহে খুবই কঠিন। কেননা অন্য মাধ্যমগুলিতে মনোহরণের কত উপকবণ আছে' গানে কত যন্ত্র আছে। নাচে কত সাজ আছে। বাজনায় কত সুর আছে। আঁকায় কত বং আছে। কিন্তু সে তুলনায় সাহিত্য-ব্যাপাবটি মানুষেব কাছে পৌঁছনোর সব থেকে কঠিনতম মাধ্যম। তাব মনোহবণেব কোনো রং, বাজনা, যন্ত্র, এটা-ওটা কিছুই নেই। কতগুলো শুকনো, নিষ্প্রাণ, মৃত অক্ষর নিয়ে তাব কাববার। সর্বমোট ৫২টা মাত্র অক্ষব নিয়ে কী কঠিন, কষ্টকর সাধনা তাব। পৃথিবীব আদিমতম উপাদান, এই ৫২টা অক্ষর ভিন্ন অন্যান্য মাধ্যমের মতো মনোহরণের আর কোনো উপকরণই গল্পকারের হাতে নেই। এই অক্ষর ক'টিকেই ঘুরিয়ে-ফিবিয়ে, নাড়িয়ে-চাড়িয়ে, এদিক-ওদিক-সেদিক কবে সাজিয়ে, তাকে পৌঁছতে হয মানুষের কাছে। মানুষেব মনের কাছে। এর থেকে কঠিন, জটিল, দুরূহ কাজ আর কী থাকতে পারে?

(৬)

সেকাল থেকে একাল (১৭৬১-১৯৬৮, প্রথম ও শেষ গল্পকাবেব জন্মসন) এই দীর্ঘ ২০৮ বছরেব বিস্তৃত সময়সীমায় অসংখ্য ভালো বাংলা গল্প লেখা হয়েছে। সেই প্রেক্ষিতেই এই দশ খণ্ডের বৃহৎ সংকলনের ক্ষেত্রেও হয়তো এমন হতেই পারে, কোনো পাঠক তাঁব প্রিয় গল্পকাবকে এই সংকলনে না পেয়ে আশাহত হলেন। তেমন ক্ষেত্রে সেই লেখকের সেবা গল্পটি হয়তো আমি খুঁজে পাই নি। মানুষের পঠন-পরিধি এবং অনুসন্ধানেরও তো একটা সীমা থাকে। অথবা, আমার বিবেচনায় সেরা অন্যটি। আবার নিতান্ত অনবধানতাবশতঃ কেউ কেউ হযতো বাদই পড়ে গেছেন।

তা সত্ত্বেও বলবো, দশ খণ্ডের এই গ্রন্থাবলীতে আমার নির্বাচিত অধিকাংশ গল্পই সহৃদয় পাঠকের ভালো লাগবে। এখানে আমি বিখ্যাত লেখকদের স্মরণীয় প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলিই গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিখ্যাত লেখকের অপরিচিত অসাধারণ গল্পও আবিষ্কার করেছি। এই সঙ্গে কম-খ্যাত বা অখ্যাত-জনেরাও যদি স্মরণযোগ্য একটি করে গল্পও লিখে থাকেন, অমানুষিক পরিশ্রম-নিষ্ঠা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে সেই গল্পগুলিকেও আমি সংগ্রহ করে এই দশ খণ্ডের গ্রন্থাবলীতে স্থান দিয়েছি। আবার সম্পূর্ণ অন্য পেশার মানুষ, অন্য ক্ষেত্রে স্বনামখ্যাত, কিন্তু উল্লেখযোগ্য গল্পও রচনা করে ফেলেছেন দু'একটি, সে-সব গল্পও স্থান পেয়েছে এই সংকলনে। এই প্রেক্ষিতে জানাই, বিখ্যাত-জনের পাশাপাশি কেবল কম-খ্যাত, অখ্যাত জনই নন, অধুনা বিস্মৃত, নিতান্তই কম লিখেছেন, গ্রন্থকারও নন, পত্র-পত্রিকায় দু-চারটি গল্প প্রকাশিত হয়ে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে মাত্র, এমন-এমন ক্ষেত্র থেকেও কিছু অনন্যসাধারণ গল্প আমি আবিষ্কার করেছি। এবং সেগুলোকে স্থান দিয়েছি এই সংকলনে। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত আর কোনো গল্প-সংকলনে এ ধরনের প্রচেষ্টা হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

তবু বলবো, এই সংকলনের অধিকাংশ গল্পই অ-সাধারণ হলেও, প্রত্যেকটি গল্পই যে সেইসব লেখকের শ্রেষ্ঠ গল্প, এমন কথা বলা যায় না। আসলে কোনো সংকলন-গ্রন্থই কখনো এমন স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না, যা সবরকম পাঠকের যাবতীয় প্রত্যাশাপূরণে সমর্থ হবে!

এ-ব্যাপারটি নিয়ে বিশিষ্ট লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি বাস্তব তথা আন্তরিক উদাহরণের কথা মনে পড়ে গেল। '. কোনো সংকলনই সব লেখককে খুশি করতে পারে না, এমনকি সম্পাদককেও না। বাড়িতে কোনো উৎসব হলে নিমন্ত্রিতদের লিস্ট বানাতে গিয়ে অনেক সময় এমন হয় যে কোনো মধুর সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের নামটাই মনে পড়ে না, বাদ থেকে যায়। সংকলন করতে গিয়েও সে-রকম হতেই পারে।'

তবু তেমন ক্ষেত্রে সম্পাদকের, পাঠকের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়াই সমীচীন। তা হয়েই আমি পাঠকের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি ঃ এমন ক্ষেত্রে প্রিয় পাঠক, আপনি আপনার সুপরামর্শ ও সুচিন্তিত মতামত পাঠান। আপনার মতামত যথাযথ ও মূল্যবান হলে, তা গ্রহণের মধ্য দিয়েই পরবর্তী সংস্করণে আমার এই সম্পাদনা-কর্মটিকে আরো সুন্দর করে তুলতে পারবো।

৪০০ টি গল্পের সকল রচয়িতার (প্রয়াতদের ক্ষেত্রে তাঁদের আত্মীয়দের) সঙ্গে অনেক চেষ্টা করেও যোগাযোগ স্থাপন করা যায় নি। কেউ-কেউ আবার পরিচিতি চেয়ে পাঠানো পত্রটির জবাবই দেন নি। অবশ্য এঁদের মধ্যে কারো কারো ঠিকানা বদল হওয়ায় আমার চিঠিটা হয়তো তাঁদের হাতে যথাসময়ে পৌঁছায়ই নি। ফলে, তাঁদের জন্ম-সন অজানাই রয়ে গেছে। এর মধ্যে কেবল প্রয়াতই নন, কিছু জীবিত লেখকও আছেন। তাঁদের সকলকেই স্থান দিয়েছি দশম তথা শেষ খণ্ডে।

১০ খণ্ডের এই সংকলনে ৪০০টি গল্পের মধ্যে ৩৫৮টি গল্পের গল্পকারদেরই জন্মসন সহ পরিচিতি উল্লেখ করা গেল। শেষ খণ্ডের (দশম) কেবলমাত্র ৪২ জন গল্পকারের জন্মসন ও পরিচিতি অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা যায় নি। সে-কারণে শুধুমাত্র এই একটি (দশম বা শেষ খণ্ড) খণ্ডের সূচীপত্রের বিন্যাস লেখকদের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ীই (বর্ণানুক্রমিক) উল্লেখ করেছি। বাকি ন'টি (প্রথম থেকে নবম) খণ্ডেরই সূচীপত্র সাজিয়েছি লেখকদের বয়সের ক্রম মেনেই। গ্রন্থশেষে তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও লিপিবদ্ধ করেছি ঐ বয়সানুক্রমিক ভাবেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে (১৮৯১) রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা' রচনার মধ্য দিয়ে বাংলায় প্রথম সার্থক ছোটগল্পের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার বহুকাল পূর্ব থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল বাংলায় গল্প লেখা।

সমস্ত ক্ষেত্রেই শুরুর আগেও একটা সূচনা থাকে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, প্রদীপ জ্বালাবার আগে সলতে পাকানো। সেই আদি সূচনা থেকেই যাত্রা শুরু করেছি আমি। সেকাল থেকে শুরু করে শেষ করেছি একেবারে সাম্প্রতিককালে এসে।

সেকাল থেকে একাল (১৭৬১-১৭৬৮, প্রথম ও শেষ গল্পকারের জন্মসন), এই দীর্ঘ ২০৮ বছরের বিস্তৃত সময়সীমায় অসংখ্য ভালো-ভালো বাংলা গল্প লেখা হয়েছে। অখণ্ড বঙ্গদেশে। পরবর্তীকালে, দুই বঙ্গে (পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ)। বহির্বঙ্গেও (অসম, ত্রিপুরা ইত্যাদি)। সেই অতীতকাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত যে-সব অসামান্য গল্প লেখা হয়েছে তা থেকে ৪০০টি গল্প বাছাই করে রচিত হয়েছে ১০ খণ্ডের বৃহত্তম এই সংকলন। বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত এ-ধরনের কাজ এই প্রথম।

সুবিখ্যাত লেখকদের স্মরণীয় প্রতিনিধিস্থানীয় গল্পগুলি ছাড়াও কম-খ্যাত, অখ্যাত, অধুনা বিস্মৃত, সেকালে সমাদৃত একালে উপেক্ষিত, — এমন লেখকদেরও সেরা গল্পটি আবিষ্কার করে এখানে গ্রহণ করেছি আমি। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় রচিত আর কোনো গল্প-সংকলনে এ-ধরনের প্রচেষ্টা হয় নি।

এই দশ খণ্ডের সংকলন গ্রন্থটিতে নির্বাচিত সে-কালের অনন্যসাধারণ গল্পগুলি যেমন পাঠকদের স্মৃতিতে সম্পদ, তেমনি এ-কালের অসাধারণ গল্পগুলিও পাঠকদের বিশেষ আনন্দ দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। একসঙ্গে ৪০০টি গল্প পাঠের উজ্জ্বল সুখস্মৃতি ১০ খণ্ডের এই সংকলন-গ্রন্থটি।

এই সঙ্গে আছে ৩৫৮ জন লেখকের পরিচিতিসহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তথ্যসমৃদ্ধ একটি দীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকা। সম্ভবতঃ এটিই প্রথম বাংলা গল্প-সংকলন সম্পাদনার ইতিহাসের ধারায়, তথ্যনিষ্ঠ দীর্ঘ ভূমিকা সম্বলিত, সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী (১৭৬১-১৭৬৮) সর্বোচ্চ খণ্ড (১০) যুক্ত, সর্বাধিক সংখ্যক (৪০০) গল্পের সংকলন।

'বাংলার ছোটগল্প'-র দশটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম সাতটি খণ্ডের সময়সীমা ১৭৬১ থেকে ১৯৪৭/৪৮ (গল্পকারদের জন্মসনের প্রেক্ষিতে)। বলা বাহুল্য এই সময়সীমার মধ্যে নির্বাচিত যাবতীয় গল্পই অখণ্ড বাংলার। শেষ তিনটি খণ্ডের সময়সীমা ১৯৪৭/৪৮ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত। কিন্তু এই শেষ তিনটি খণ্ডও কি শুধুই পশ্চিমবঙ্গের গল্পকারদের নিয়ে হতে পারে? তুলনায় স্বভাবতঃই কম হলেও ত্রিপুরা, অসম এবং বর্তমান বাংলাদেশের গল্পকারদের গল্পও এখানে যথাসম্ভব গ্রহণ করার চেষ্টা করেছি আমি। সেই প্রেক্ষিতে বলতে পারি, ১০ খণ্ডের এই সংকলন-গ্রন্থটি কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গেরই নয়, সমগ্র বাংলারই একটি প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প-সংকলন।

বাংলাদেশ, ত্রিপুরা ও আসামের লেখকদের কিছু গল্প নির্বাচন ও সংগ্রহ করে দিয়েছেন ড বিষ্ণু বসু। তাঁকে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা।

এই সংকলনটির ব্যাপারে হুগলি জেলার বেশ কয়েকটি গ্রন্থাগারের ('দি ইয়ং মেনস্ এ্যাসোসিয়েশন, বৈদ্যবাটী', 'মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার', 'শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাণ্ড মিউচ্যুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন', 'মাহেশ পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাণ্ড ফ্রি রিডিং রুম', 'উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী', 'শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী' ইত্যাদি) সাহায্য পেয়েছি আমি। এইসব গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক এবং সংশ্লিষ্ট সকল কর্মী-বন্ধুদের আমার পক্ষ থেকে জানাই সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন।

(ড. বিজিত ঘোষ)

বন্ধুর বিক্রয়, নমাজ-পড়া ব্রাহ্মণ

উইলিয়ম কেরী

এক গ্রামে দুই জুয়াচোর থাকে। তাহারা একদিন পরস্পর বিচার করিয়া এই স্থির করিল যে, "বসিয়া থাকিলে কিছু হইতে পারে না, চল, কোন স্থানে যাইয়া ধনানয়ন করি।" ইহা কহিয়া দুইজন এক দেশে যাইয়া বড় তৃষার্ত হইয়া কহিল যে, "চল, এই গ্রামে বড় এক ধনী আছে, তাহার নিকটে কিছু খাদ্য সামগ্রী চাহিয়া আনি।" তাহাতে একজন কহিল, "আমি আর চলিতে পারি না, তুমি যাও।" ইহা শুনিয়া সে বলিল, "ভাল আমি যখন ডাকিয়া তোমাকে এই কথা কহিব যে, 'তুমি সম্মতিপূর্বক কহিলে ইনি টাকা দেন,' তখন তুমি কহিও যে 'আমার কর্তা উনি, উনি যাহা করেন, আমি তাহাতেই আছি।" ইহাতে ঐ ব্যক্তি স্বীকৃত হইলে পর সে চলিল ও ধনীর বাটিতে যাইয়া কহিল, "হে মহাশয, আমার একজন ক্রীত চাকর ব্রাহ্মণ আছে, তাহাকে আমি বিক্রয় করিব। সে সকল-কর্মোপযুক্ত। যদি মহাশয লন, তবে অল্প মূল্যে পান। ইহার মূল্য অশীতি টাকা হইবে। এখন বিবেচনা করুন।" ইহা শুনিয়া ধনী কহিল, "সে-লোক কোথা আর সে ইহাতে সম্মত আছে কি না?" ইহা শুনিয়া কহিল, "সে-লোক ঐ গাছের তলে বসিয়া আছে।" ধনী কহিল, "অগ্রে তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাউক।" ইহা শুনিয়া ঐ ব্যক্তি কহিল, "আমি এখানে থাকিয়া ডাকিয়া কহি, তোমরা বরং তাহার সম্মতি বুঝিয়া আমাকে টাকা দেও, আমিও তোমাকে বিক্রয়-খত লিখিয়া দি।" ইহা শুনিয়া তাহাকে ডাকিয়া কহিল। যেরূপ পূর্বে কহিয়াছিল সেইরূপ সঙ্কেত জ্ঞান করিয়া সে-ব্যক্তি স্বীকৃত হইয়া কহিল যে, "দেও, আমি সম্মত আছি।" এইরূপে তাহাকে বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া তাহার নিকটে যাইয়া কহিল যে, "তোমাকে আমি বিক্রয় করিয়াছি, এই লোক তোমাকে কিনিল।" সে ইহা শুনিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে তাহাকে ঐ ধনী গৃহে লইয়া কহিল যে, "তুমি আমার বাটীর মধ্যে সাবধান হইয়া থাকিবা আর ঠাকুর-পূজার পুষ্পাদি চয়ন করিবা এবং বাহির-বাটীর লোকদিগের বন্ধনাদি করিবা—এই কর্মে তুমি নিযুক্ত হইলা।" পরে সে ঐ কর্ম প্রত্যহ করে। এইরূপ কিছু দিন গেল। পরে সে মনে মনে বিবেচনা করিল যে, "পরবশ হইয়া আর কত দিন থাকিব? এ কিছু নয় " বলিয়া ঐ ধনীর পুষ্পোদ্যানে তিন সন্ধ্যা যাইয়া চতুর্দিক নিরীক্ষণ করে আর নমাজ করে। এইরূপে প্রত্যহ নমাজ করে। ইতোমধ্যে দৈবাৎ এক ব্যক্তি তাহা দেখিতে পাইয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া ধনীকে কহিল, "হে মহাশয, তুমি যে-চাকর রাখিয়াছ, সে কি লোক?" ধনী কহিল, "সে ব্রাহ্মণ।" এ কহিল "কখনও ও সে ব্রাহ্মণ নয। কোথা কে শুনিয়াছে যে ব্রাহ্মণ নমাজ করে?" ধনী কহিল, "সে কি?" এ কহিল, "আইস, দেখ ঃ সে তোমার পুষ্পোদ্যানে নমাজ করিতেছে।" ধনী গিয়া সেরূপ দেখিয়া বড় ভীত হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, "বাপু তোমার ভয় নাই। তুমি পুষ্পোদ্যানে কি করিতেছিলা?" ইহা শুনিয়া সে কহিল যে, "আমার জাতির কর্তব্য যে কর্ম, আমি তাহাই করিতেছি।" ইহা শুনিয়া ধনী কহিল, "তুমি এ-কথা কাহারেও কহিও না। আমি তোমাকে হাজার টাকা দি, তুমি টাকা লইয়া এখান হইতে যাও।" তাহাতে

সে স্বীকার করিযা টাকা লইয়. সেখান হইতে আপন বাটীতে যাইতে যাইতে ভাবিল যে. "আমাকে যে বেচিযা আসিযাছে, তাহাব স্ত্রীকে আগে বিধবা করি— তবে পরে যাইব।" ইহা বলিযা তাহাব বাটী যাইয়া কহিল. "বাটী কেহ আছ কি না?" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহাব গলাব স্বর শুনিযা বুঝিল যে, "আমার স্বামী বিদেশে গিযাছিলেন. তিনি আইলেন. কেননা তাঁহাব সঙ্গী আইল।" ইহা ভাবিযা বাহিরে আসিযা তাহাব সহিত দেখা করিয়া কহিল. "কৈ, তিনি কোথা?" ইহা শুনিযা সে আপন কপালে ঘা মারিয়া কহিল যে, "তোমাব কপাল পুড়িযাছে ঃ আজি দশ দিন তাঁহাব মৃত্যু হইযাছে।" সে স্ত্রী ইহা শুনিযা মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িযা কান্দিতে লাগিল। পবে সে সান্ত্বনা করিযা তাহাব অঙ্গেব অলঙ্কাব ত্যাগ করাইল এবং পরদিন তাহাব যথাসর্বস্ব বিক্রয করাইযা শ্রাদ্ধ করাইল। পরে ঐ ব্যক্তি বাটী আসিযা সকল শুনিযা তাহাব সহিত মিলন করিল এবং উভযে পরস্পর যথেষ্ট প্রশংসা করিল ইতি।

তৃতীয় স্তবক*

তৃতীয় কুসুম

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার

দণ্ডকারণ্যে ধূর্ত্তশিরোমণিনামে এক শৃগাল বাস করে সেই বনে ব্যাঘ্রদম্পতীও থাকে। নবপ্রসূতা ব্যাঘ্রী ছানাগুলিনকে ছাড়িয়া যাইতে না পারিয়া বাসাতেই থাকে কেবল ব্যাঘ্র আহার আহরণ করিতে যায় বনমধ্যে ইতস্ততো পরিভ্রমণ করত নানা জাতীয় জন্তু হত্যা করিয়া আপনি স্বচ্ছন্দরূপে শোণিত পিয়া মাংস খাইয়া কোমল মাংস আনিয়া দিলে ব্যাঘ্রী অনায়াসে পরমসুখে ভক্ষণ করে। এইরূপে বাঘ বাঘিনী হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। ঐ শিয়াল তাহদের (তাদের) কাদাচিৎক উচ্ছিষ্ট পুচ্ছ খুর চর্ম্ম অস্থিমাত্র চর্ব্বণ করিয়া উঞ্ছবৃত্তিতে অতিকষ্টে কালক্ষেপ করে। একদা ঐ বঞ্চক মাৎসর্য্যদোষে দুষ্টচিত্ত হইয়া চিন্তা করিল আহা কি সুন্দর মাংসখণ্ড এ বেটাবেটি খায় আমি খাইতে পাই না এ কি প্রাণে সহে যদি কোন গোচে এ বাঘিনী মাগীর খাবার মাংস খাইতে পারি তবেই তো মনের সাধ মিটে। শৃগাল এই চিন্তা করিয়া ব্যাঘ্রের বাসার কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ঘাড় অল্প বাঁকা করিয়া ভয়েতে সচকিত নেত্রে ইতস্ততঃ পুনঃ পুনঃ অবলোকন করত একাকিনী বাঘিনীকে মাংসাহার করিতে দেখিতে পাইয়া হন্‌হন্ করিয়া হঠাৎ ব্যাঘ্রীনিকটে আসিয়া পশ্চাৎ পাদদ্বয় চাপিয়া বসিয়া অগ্রিম দক্ষিণ চরণ ভূয়োভূয়ঃ লাড়িয়া অত্যন্ত ক্রোধে আরক্ত চক্ষুর্দ্বয়ে ব্যাঘ্রীর দিগে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া নিষ্ঠুর কঠোর বাক্য কহিতে লাগিল ওলো ছেঁচড়া লক্ষ্মীছাড়া মাগী তোর ভাতার অলক্ষণে ছেঁচড় বেটা কমনে গেল আমার যে এক শত ভার সদ্যঃ স্নিগ্ধ নিরস্থি উপাদেয় আম মাংসপিণ্ড কর্জ্জ ধারে তার কি তা মনে নাই ঋণ কেমন বালাই তাহা বুঝি জানে না যেমন গর্ভ তেমনি ঋণ গ্রহণ সময়ে বড় সুখ মোচনকালে মার্গ চড়২ করে দুঃশীল বালীক বেটাকে প্রায় এক মাস হইলো আমি প্রত্যহ খুজিতেছি দেখাই পাওয়া যায় না আমি যে শৃগাল মহাজন মহাশয় বসিয়া আছি তাহার খোজ খবরই নাই নিশ্চিন্ত হইয়া নাভিতে তেল দিয়া আমার দত্ত মাংসভোজনে মাংকে চিক্কণা করিয়া পিণ্ডীশূর গেহনর্দী বেটা বসিয়া আছে আন মাগী আজি বেবাক সকল মাংস লইব তবেই উঠিব।

শৃগাল সদাগরের আমার কর্জ দে এই শব্দ শুনামাত্রে ব্যাঘ্রী ভয়েতে কাতরা হইয়া অস্তব্যস্তে ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিছাড়ী দুই পায় বসিয়া আগা দুই পায়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া অত্যন্ত বিনয়ে নিবেদন করিল। হে শৃগাল উত্তমর্ণ মহাশয় কর্ত্তা আসুন যে বিহিত হয় তাহা করিবা আমি স্ত্রীলোক কি জানি স্ত্রীজাতি খায়দায় ঘরকর্ণা করে দেনা লেনা পাওনা ও আয়ব্যয় স্থিতি অর্থাৎ আমদানী খরচ জমা এ সকল লেঠা বড়ো ঠক্‌ঠকি সে সকল লট্‌খট্ কি গৃহপঞ্জর কোকিলা চপলা অবলা জাতি করিতে পারে মাসের উপাসী কি পারণা সহিতে পারে না এত দিন যদি গেল আরো কিঞ্চিৎকাল সামাই (চিত্তস্থৈর্য্য) কর তোমার গর্জ্জন তর্জ্জনে আমার ছেলিয়া পিলিয়া গুলিন ডরিয়াছে। এই দেখ ভেল২ করিয়া চাহিয়া আছে

* মূল গ্রন্থের নমুনা স্বরূপ তৃতীয় স্তবকের দুটি অধ্যায় উদ্ধৃত হয়েছে।-- সম্পাদক

তোমার কি শরীরে কিছুই দয়া নাই গা গো এ কি স্ত্রী বালকেব উপব এত কেন। ক্ষমা কর স্থির হও হে রাম মর্ম্মান্তিক কটু কষায়ণ রুক্ষ কতোকগুলাক বলিযা গালি দিলে কি হবে। শিয়াল বাঘিনীর এই বাক্য শুনিয়া ক্রোধে থবথর করিয়া কাঁপিতে২ দাঁত কডমড় করিয়া বাঘিনীব পানে কট্মট্ করিযা চাহিযা কহিল বেদড়া মাগী উনি কিছুই জানেন না কেবল খাবেন এই জানেন আরে মাগী ইহা কি কখন শুনিস নাই ভর্ত্তা যদি রোগী ও প্রবাসী হয তবে ভার্য্যাকে গৃহব্যাপার সকলই কবিতে হয়। ভার্য্যা স্বামিব শবীরার্দ্ধ হয পতিব ধন স্ত্রীব ধন পতির দেয স্ত্রীর দেয় পতিব আদেয় স্ত্রীর আদেয হয়। এই যে ছাওলাককে আমাব২ কহিতেছিস সে ছানাগুলাক কি বাপেব ঘর হইতে আনিছিলি মব মাগী যা২ তোব যদি এক কালে সকল দিবার যোত্র না থাকে তবে যেমন সঙ্গতি কিছু২ কবিযা ক্রমে ২ দে। ঋণব্রণকলঙ্কানাং কালে লোপো ভবিষ্যতি।

বাঘিনী শিয়ালেব এই বচন শুনিযা মরুক যা এক্ষণে কিছু দিলে যদি এ পাপ আপদ্ যায তবে ছেলেরদের এঠো মাংস যা আছে তাহাই কিছু দি এ বালাই দূর হউক ইহা মনে কবিযা এক খান মাংস ফেলিয়া দিল। শৃগাল তাহা অল্প জানিয়া মাতা লাড়িযা কহিল উঁহুঁ এতোতো (এই-পরিমাণ) কিছু হবে না ঢের করিযা দে ইহাতে ব্যাঘ্রী আবাব কিছু দিল। এইরূপে বঞ্চক ব্যাঘ্রীকে বঞ্চনা করিয়া চারি দিগে অবলোকন কবত অতিবেগে দ্রুতগতিতে গমন করিল। তদনন্তর নিশাবসানে ব্যাঘ্র পদভরে ভূকম্পপ্রায কবত বহুতর মাংস লইযা ব্যাঘ্রীকে ভক্ষণ করিতে দিয়া পর্যটনপরিশ্রমে শ্রান্ত হইয়া বিশ্রামার্থ অকাতরে নিদ্রা গেল। ব্যাঘ্রী ইষ্টদর্শন লাভ ভোগজন্য ত্রিবিধ আনন্দে মগ্না হইযা সুপ্তোত্থিত স্বামিকে শৃগাল উত্তমর্ণেব সংবাদ কহিতে ভুলিয়া গেল। এইরূপে প্রতিদিন শৃগাল মাংস লইযা যায ব্যাঘ্রীব পতিকে কহিতে মনে পড়ে না। ইহাতে শৃগাল দিনে২ উত্তম মাংসাহাবে হৃষ্টপুষ্ট হইযা শবীব নিবীক্ষণ কবত (করতে) থাকে। এইরূপে কতিপয দিবস অতীত হইলে পব এক দিন শৃগালেব কথা হঠাৎ বাঘিনীর মনে পড়িলে স্বামিকে সম্বোধন কবিযা কহিল ও গো অমুকেব বাপ শুনতো তোমাব এ কি তুমি না কি একটা শিয়ালের ঠাঁই এক শত ভাব মাংস কর্জ্জ লইযাছো। তুমি শূর স্বযং ঘাতিত পশু মাংসব্যতিবেকে অন্য মাংস খাও না ও মা এ কি ছোট লোকেব স্থানে কর্জ্জ কর। সে ছাব বেটা মাগুবাঁড়িযা গুষ্টিখেগো আমাকে যাহা ইচ্ছা তাহাই বলে কতো বা গালাগালি দেয় নানা প্রকাব অপমান ও ভর্ৎসনা কবে মুক্ কবে চক্ষু ঘুবায দন্ত কড়্মড়ি করে আরতো কত কুবাক্য কয় তাহা কি কহিব আমি মেযে মানুষ আমাব উপব এত জঞ্জাল সে নির্ব্বংশিয়া অল্পায়েব বিকট মুখ দেখিয়া আমার প্রাণ অমনি উডিযা যায আমাব বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পায় এ পোড়াকপালীব মবণ হয় না এত সহিতে হইল মনে হয গলায দড়ি দিযা মবি। ছালিয়াগুলি অক্রবাণ দুগ্ধপোষ্য কেবল এই বাছাবদেব মুখ চাহিয়া পডিযা থাকি।

ব্যাঘ্রীব এই কথা শুনিয়া ব্যাঘ্র কহিল ছি২ এ কি এমন অমঙ্গল কথা কেন সে বেটা অতিতুচ্ছ ক্ষুদ্র তীর্থকাক পবপিণ্ডাশী আত্মম্ভবি তাব কথাও কথা তাতে আবাব তুমি এতো দুঃখ কর ও হো ফুস কথা। আমাব কথা ওদিকে থাকুক (থাক) তুমি যদি এক বাব চক্ষু ঘুরাইয়া ভ্রূকুটী করো তবে কোথা পালাইবে তাহাব পথ পায না লাঙ্গুল পোঁদে গুঁজিযা অমনি কমনে ছুটিযা পলায় তাহার দিশাই পাওযা যায না মরুক গিযা সে আমাব লক্ষ্য নয তার কথা অগ্রাহ্য হেতা সেতা বেড়াইযা বড় বেজাব হইযাছি কাছে আইস হাঁসিযা কথা কও। পতিব এই বাক্যে বাঘিনী স্ত্রীবুদ্ধিপ্রযুক্ত প্রকারান্তব বুঝিযা অল্প মানিনী হইযা কহিল বটে এমন তবে না হবে কেন হবেইতো সে আমাকে এত অপমান কবে তাহা আবাব অগ্রাহ্য হয। যাও মেনে বুঝা গেল ও মা তোমাব মনে এতো ছিলো সে কোটনাব মাগু তোমাব সোযাগিনী হইযাছে হউক আমাকে কেন শিযাল দিযা কাটাও তাকে লইযাই আজি হইতে ঘব কব আমাব কি মা বাপ ভাই বুন কেহ নাই হায ইহাও হইল এ অমৃতে বিষ উপজিল সর্কাল আমার কপালে করে তোমার কি দোষ। হে বিধাতা তোমাব মনে কি এই ছিল এত কালে

সতিনের জ্বালায় জ্বলিতে হইল আমি জন্মিয়া কেন না মরিলাম এ পোড়ামুখীর মুখে আগুন কেন না লাগিল।

এতদ্রূপে নানা প্রকার অনুযোগ আক্ষেপ অনুতাপ দুঃখোক্তি করিতে২ স্বজাতিদোষবশতঃ পর পর অতিশয় রোষাবেশে কাঁদিতে২ কপাল গাল বুক চাপড়াইয়া বরাবরটা করিল ও পতির আগে মাতা কুড়িতে লাগিল। তদনন্তর ব্যাঘ্র হাঁ হাঁ এ কি এ কি এক করিতে আর হইল তোমার যে অপমান হয় সে কি আমার সাধ। হায় তোমার এই বুদ্ধি স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী সুস্থ হও এই কহিয়া ব্যাঘ্রীকে ধরিয়া তুলিয়া কোলে বসাইয়া তাহার মুখ জিহ্বাতে চাটিতে২ কহিল আহা এ কপালপোড়া কথা কোথা হইতে অকস্মাৎ উঠাইয়া মিছা দুঃখে দুঃখিনী কেন বা হইলা আমার মাতা খাইয়া সিন্দুর রেখার স্থানে শোণিত কেন বা বহাইলে উজ্জ্বল কজ্জল লেখাস্থলে নিরন্তর অশ্রু ক্ষরণ কি নিমিত্তেই বা করিলা শঙ্খ শোভাস্থানেতে দংশন কি লাগিয়া করিলা পয়োধরে নখক্ষতজনিত রক্তধারা বহাইলা কেবল আপনা আপনি এ সকল নিরর্থক করিয়া কিবা সুখ পাইলা। আহা মরিমরি তোমার বালাই লইয়া তুমি আমার সুভগা তুমিই আমার সজনী যে চাঁদমুখ মলিন দেখিতে পারি না সে মুখে অজস্র বাস্পবারি (অশ্রুজল) ধারাও দেখিতে হইল। আমি কিবা করিয়া কহিতেছি তোমা বিহীনে আমি আর কাহাকেও স্বপ্নেতেও কখনো জানি না তুমি আমার প্রাণহইতেও অধিক ইত্যাদি নানা প্রকার শান্তবচনে ব্যাঘ্রীর মান অল্পে২ শমতা পাওযাইয়া বাঘ শিথিলমনা বাঘিনীকে গাঢ়ালিঙ্গন চুম্বনাদি করিতেই ব্যাঘ্রী অন্তরেচ্ছা মৌখিক নিষেধে প্রবর্ত্তমানা হওত মরুক মেনে যাও২ তোমার ওই বই আর কি কায জানা গিয়াছে আর খুসুর২ ফুসুর২ করিবার দায় নাই আপনার দুঃখে আপনি মরি পোঁদের জ্বালায় মরি মনসা বর দিযা যাও। যাও না তোমার শৃগালীর কাছে তোমার পথপানে চাহিযা২ সে ভাতারখাগীর চক্ষের জল যে শুখাইল নড়োচড়ো না চুপ করিয়া শোও আমার গাটা ঘুম২ করিতেছে। এই এইরূপে নাকরা করিতে লাগিল।

পরে ব্যাঘ্র মিথুন সুখে বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিল কথা প্রসঙ্গে শার্দূলের শৃগালদত্ত ঋণাপবাদ মনে পড়াতে জাত ক্রোধে সর্ব্বাঙ্গস্ফীত ও ওষ্ঠাধর কামড়িয়া সশব্দ বিকট দংষ্ট্র ভযানক বদন ও অগ্নিপিণ্ডসম চক্ষুর্দ্বয়ের ঘূর্ণন ও লাঙ্গুলাঘাত চট্‌চটারাব ও অত্যন্ত গম্ভীর ঘোরতর শব্দ সমারম্ভ হওযাতে বুঝি ভয়েতে বনস্থলী কম্পান্বিত হইল। ব্যাঘ্র আস্ফালন করিয়া সাহঙ্কার বাক্যে কহিতে লাগিল আমি স্ব বাহুবলেতে বলিষ্ঠ গরিষ্ঠ গো মৃগ মহিষ মানুষাদি মারিযা তাহারদের ঘাড়ের সদ্যঃ শোণিত পীযা পাছার খাসা মাংস তোমার জন্যে দাঁতে কামড়াইয়া লইয়া যে নাড়ীভুঁড়ী চামড়া গুলা থু২ করিযা ফেলিযা দি সেই উচ্ছিষ্ট চাটিযা প্রাণ ধারণ করে যে অসৎ বিজন্মা বেটা তার এত স্পর্দ্ধা। ওর ছোটলোকের বাড় হইলে এমনি হয় যেমন পতঙ্গের আগুনে ঝাঁপ ও পালক উঠিলে পিপীলিকার অর্থাৎ পিপড়ার আকাশের উপর উঠা। তাকে আমাকে দেখাইতে পারিবা। ব্যাঘ্রী কহিল তার আটক কি সে সর্ব্বনেশে গোশাতে হন২ করিয়া আসিযা দাঁত কড়মড় চক্ষু কণ২ যখন করে তখন ভয়েতে খোকা খুকি গুলির চক্ষুহইতে ঝর্ ঝর্ করিযা জল পড়ে ও ছরছর করিযা মুতিয়া ফেলায আমার প্রাণ ধড়ফড় করে গা থরথর গর২ ও জরজর করে যদি দৈবাৎ কদাছিৎ অল্প মাংস দি তবে ফর২ করিয়া ফিরিযা যায আবার আপনিই খরখর করিয়া আইসে। এই সকল নবরঙ্গ ভাব দেখিযা আমি অমনি তটস্থ হইযা থাকি। করি কি আমি মাইযা অবলা তাতে আবার একলা যথেষ্ট করিয়া মাংস দি তুষ্ট হইযা যায এই যে লোভ পাইয়াছে তাহা কি ভূলিতে পারিবে এই এলো প্রায একটুকু থাক রাতি হউক আজি তুমি রাত্রে কোথাও যাইও না নিভৃতে লুক্কাইযা থাক।

ব্যাঘ্রীর এই কথাতে ব্যাঘ্র রাত্রিতে গাছের আড়ে লুকাইযা থাকিল বাঘিনী ছানারদিগ্‌কে লইযা সোয়াগ করিতে লাগিল। শৃগাল মহাজন খাতকের ঘরে কর্জ আদায় করিতে বাসার

কাছাকাছি আসিয়া চতুর্দ্দিগে দৃষ্টি করত ধীরে২ আগমন করিতে লাগিল। ব্যাঘ্রী তাহা দেখিতে পাইয়া ঐ দেখ তোমার সাধু আসিতেছেন এই মন্দ স্বরে কহিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিল। ব্যাঘ্র দেখিতে পাওয়া মাত্রেই ক্রোধে প্রস্ফুরিতাধর কম্পমানকলেবর বিস্ফারিতলোচন হইয়া হাঁরে বেটা তুই আমার উত্তমর্ণ আমি অধমর্ণ ওরে এঁটো খেগো তোর বড় বুক থাক২ এই তোরি ছাতির খরতর নখ বিদারণে তোর ধার শুদি পলাইস না। এতদ্রূপ অহঙ্কারেতে তর্জ্জনাদি করিয়া লাফ দিবামাত্রেই শৃগাল ভীরু হইয়া গুহ্যে পুচ্ছ গুঁজিয়া বাপ২ করিয়া অমনি উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। ব্যাঘ্র পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল। ব্যাঘ্রী শৃগাল-পুত্রকে ভয়ে পলায়িত দেখিয়া হাসিয়া কহিল এখন দৌড়িয়া পলাও কেন এসো না দিব্য মাংস রাখিয়াছি লও না পেট ভরিয়া খাও না আমাকে মুখ ভেঙচাও না চাপিয়া বসো না হাত লাড়িয়া কোঁদল কর না হা মাগু রাঁড়িয়া পোড়া কপালে চুলায় যা তোর মুখে পোড়া গোজলা দি তোর মাতায় বাঁ পায়ে নাথি মারি এখন ছাই খাও এই তোর ঘাড়ের রক্ত খায় মাতা কড়মড় করিয়া চাবায়।

এইরূপে অতিত্রাসে ভয়দ্রুত শৃগাল মহাশয় ভূতল সংলগ্ন বটের লম্বায়মান দুই নামনার ফাক দিয়া গলিয়া গিয়া গর্ত্তের ভিতরে সাঁদাইয়া লুক্কায়িত হইল। পরে বলদর্পদর্পিত সহজ বর্ব্বর এক গুঁইয়া গোঁয়ার ব্যাঘ্র বটবিটপির ঐ বোয়ার মধ্যপদ দিয়া অতিবেগে গলা গলাইয়া নির্গত সমস্ত মস্তকমাত্র হইয়া অর্গলাতে অর্থাৎ হাড় কাঠেতে ঠোকা গলপ্রায় হওয়াতে কণ্ঠাবরোধে বদ্ধনিশ্বাসোচ্ছ্বাস হইয়া গোঁ২ শব্দ করিতে লাগিল। গর্ত্তমধ্যে সকম্প শৃগাল ভীরুক হইয়া গর্ত্তের দ্বারে বুঝি বাঘ আইল এই মনে মানিয়া নীরব হইয়া কথঞ্চিৎ কষ্ট-সৃষ্টে কিঞ্চিৎকাল সঙ্কুচিত হইয়া থাকিয়া ব্যাঘ্র নিঃশব্দ হইয়া স্তব্ধীভূত হইলে ক্রমে২ কিঞ্চিৎ মুখ বাহির করিয়া ফুট২ করিয়া চাহিয়া বাঘকে তাদৃশ দশাগ্রস্ত দেখিয়া সতর্ক হইয়া তর্ক করে যে বাঘ কি মরিয়াছে কিম্বা বাঁচিয়া আছে না মরিয়াই আছে যেহেতুক নিস্পন্দ নিশ্চল নিশ্চেষ্ট দেখিতে পাই। ইত্যবসরে বাঘের গলার ঘড়ঘড়ি শুনিতে পাওয়ামাত্রেই ও বাপ করিয়া গর্ত্তের ভিতরে গিয়া ভয়ে জর্জ্জর হইয়া কাঁপিতে২ অবস্তব্ধ অর্থাৎ জড়সড় হইয়া থাকে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ করিতে লাগিল মৃতপ্রায় ব্যাঘ্র চক্ষু কপালে তুলিয়া মরিয়া গেল। পরেও বিগত ভয়ে ধৈর্য্যাবলম্বনে চঞ্চল চক্ষুতে উভয় পার্শ্ব নিরীক্ষণ করত ও মধ্যে২ স্থগিত হইয়া ঈষৎ বক্রকন্ধর কুটিল দৃষ্টিতে প্রাপ্তপঞ্চত্ব ব্যাঘ্রকে বীক্ষণ করত অল্পে২ পাদ প্রক্ষেপ গতিতে পশ্চাৎ আসিয়া মুহুর্মুহুঃ মৃত ব্যাঘ্রের মাগ আঘ্রাণ করিয়া সংশয় ত্যাগ করিয়া মরণাবধারণে জায়মান আনন্দসন্দোহে আলাঘরের দোলার ন্যায় ঢল২ হইয়া শীঘ্র ব্যাঘ্রীসমীপে শৃগালপুত্র আইল। ও কহিল ওলোলো মাগী কেমন এখন হইল যেমন মতি তেমনি গতি ভাতারের গরবে পা ভুঁয়ে পড়ে না তোর স্বামী বুঝি আমার ঘাড় ভাঙ্গিবে আর দেখসিয়া কার ঘাড় ভাঙ্গা গেল হা বাঁড়ী তোর এত বড় কথা বামন হইয়া চাঁদে হাত। আমি কেমন লোক তা জান না এখন জানিলি ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ যা দেখ গিয়া তোর মহাবলপরাক্রম পতিকে হরিকাঠ দিয়া হরি ভজাইয়া এই মর্দ্দরাম জাজ্জ্বল্যমান বসিয়াছেন। গেহেনর্দ্দী (কাপুরুষ) কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতী দুর্ম্মদ বেটা আমার খায়। মাগিলে আবার মারিতে ধায় যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। যা না দেখ গিয়া তাহাকে পোঁদে ছেঁচড়ি দিয়া ঘুরাড়িয়া লইয়া কান মুচড়িয়া ঘাড় মুড়িয়া হাড়ে ঠুকিয়া রাখিয়াছি। বাবাজী চক্ষু ভড়ঙ্গিয়া দাঁতবিদ্ড়িয়া পড়িয়া আছেন। বাহাদুরি ঘুরাড়িয়া গিয়াছে।

বাঘিনী একথা শুনামাত্রে তটস্থ হইয়া হঠাৎ এক নিশ্বাসে উঠিতে পড়িতে তাড়াতাড়ি আসিয়া পতিকে তথাবিধ দেখিয়া গাত্র চাটিয়া মৃত্যু নিশ্চয় করিয়া শোকসাগরে নিমগ্না হওত ভূতলে গড়াগড়ি দিয়া ধূলিধূসরসর্ব্বাঙ্গী ও অগ্রিম পাদদ্বয়েতে মৃতপতির কণ্ঠ ধরিয়া রোরুদ্যমানা হইয়া করুণ স্বরে উন্মুক্তকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিল। কিয়ৎকালান্তর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত পতিবিরহ দুঃখ বিস্মরণে শিথিলশোক ব্যাঘ্রীকে শৃগাল কহিল। মর মাগি আর বিষাদ করিলে কি হবে যে মরে কি কাঁদিলে ফিরিয়া আইসে তোর পতি অত্যন্ত দুরন্ত

কৃতান্তেব অন্তিকে গিয়া ঋণের অপরিশোধন পাপে অনন্তকাল বাস কবিল তোবও কি সেই পথ হবে। আত্মা সতত বক্ষণীয় আপনি থাকিলে ক্রমে২ কালে সকল সামগ্রীই হয। গ্রীষ্মকালে নির্জ্জল পুষ্করিণী কি পুনর্ব্বাব জলদাগমে পরিপূর্ণ সলিলাপ্লাবিতা হয় না। শবীরনিমিত্ত সম্বন্ধ জীবনাবধি। মরণোত্তব কেবা কার পতি কেবা কাব পত্নী। জীব জীবেতেই বাঁচে তোব যে পতি ছিল সেই কি জীব আর কি জীব নাই এত দিন কি ঐ জীবকে উপজীব্য কবিযা জীবন ধারণ করিযাছিলি। ইদানী অন্য জনোপজীবনে জীবিত কালযাপন কর কেহ কি কাহাব স্বামী বলিয়া চুণেব ফোটা দেওয়া হইয়া আছে। আমবা চতুষ্পদ পশুজাতি বিশেষতঃ আমাবদের (আমাদেব) কাহাব সহিত কি সম্পর্ক লজ্জাই বা কাহাহতে। ধর্ম্মাধর্ম্মেব ভয বা কি বেদ শাস্ত্র চাতুর্বর্ণ্যাধিকারিক আমবা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাবহির্ভূত বাহ্য লোক। আমারদের শৌচাচমনাচাব নাই খাদ্যাখাদ্য বিবেচনা নাই যাহাতে স্বাদুবোধ হয় তাহাই আমারদেব চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয চতুর্বিধ ভক্ষ্য তদন্য অন্ন অভক্ষ্য। পুংসাং ভোগার্থে পরমেশ্বর নির্ম্মিত স্ত্রী জাতি পুরুষমাত্রেব উপভোগ সম্পাদনে কি পাপভাগিনী হয ভাবনা কি ইতঃপব যাহাতে সুখে থাকিবি তাহার চেষ্টা কব নিশ্চেষ্টের কি অভীষ্ট সিদ্ধি হয।

বাঘিনী প্রত্যুক্তি কবিল তুমি যাহা কহিলা সে সমস্ত বাস্তব আমি কি গতানুশোচন করিতেছি তাহা নয় কিন্তু ইহাই ভাবিতেছি অতঃপব যে পতি হবে সে শক্ত সমর্থ হবে কি না দুষ্ট হবে কি শিষ্ট হবে আমার মনোনীত হবে কি না আমাতে তাহাব মন মগ্ন হবে কি না সংপ্রীতি (প্রণয) দম্পতীসাধ্য একতব সাধ্য নয। আমি স্ত্রী সবলা যদি কুটিলেব সঙ্গে সংযোগ হয তবে সে চিরস্থাযী হবে না ধনুকেব শবেব মত। দুই ঋজু হইলেই উত্তম প্রেমপ্রবাহ্ ববাবব সমান চলে কি জানি কেমন হবে। শৃগাল প্রত্যুত্তব কবিল তার ভাবনা কি আমিই আছি তোমাব মনে বুঝি আমি লাগি না মর মাগি গেদারি আমি যেমন তাহাতো প্রত্যক্ষে দেখিলি। আর আমাব অন্নেতে তোরদেব স্ত্রী পুরুষেব শবীব। ভাতাবতো কৃতঘ্নতা কবিয়া অধোগতিতে গেল তুইও কি অধঃপাতে যাবি। তোব ভালোব জন্যে কহি আমার কি। বড়কেই লোকেবা অন্বেষণ কবে মণি কি লোকদিগকে তত্ত্ব কবিয়া থাকে। আমি বসিক শিবোমণি যুবতীজন মনোনীত কামকেলিকলাপ কোবিদ চাতুবী মাধুবী লহবী পাবগ আমার স্ত্রী যে হয় তাহাতে সকল লোকে শিবা করিয়া কহে। শিবা কে তাহা জানিস্ শিবা সর্ব্বমঙ্গলা আমাব পত্নী হইলে তুইও সর্ব্বমঙ্গলা হবি। সংপ্রতি অনাথা হইযাছিস আমাকে পাইলে সনাথা হবি। আমি শিবাপতি শিব আমাকে যদি ভজিবি তবে নিত্য নিরতিশয সুখ পাইবি। ভদ্রাভদ্র ভাগ্যাধীন তোর অদৃষ্টে থাকে তবে হবে আমি দযালু স্বভাবপ্রযুক্ত পবদুঃখ হবণেচ্ছারূপ কৃপাতে কহিলাম। এখনও স্বকীয় কল্যাণ যাহাতে বুঝিস্ তাহা কব। তবে আমার নামগণনাতে আমাকে বঞ্চক নামে বৌদ্ধ বেটা যে গণিয়াছে সে কেবল ডিত্থ ডবিত্থাদি শব্দেব সমান সংজ্ঞামাত্র। আর পণ্ডিতগুলো কিবা বলে তাহা তাহারাই বুঝে। এই এক খেদ সহস্র নামে পবমেশ্বরকে মার্গ করিযা বলিযাছে পরমেশ্বব কি মার্গ। ঈশ্বব যদি মার্গ হন তবে আমার নাম বঞ্চক হইলেই বা ক্ষতি কি।

এ বিষয়ে এক কথা কহি শুন আমি এক দিবস মৃগযা করিতে গিযাছিলাম এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সেই বনে পুষ্পচয়ন কবিতেছিল। এক বনেচব ঐ দ্বিজকে কহিল ওগো মহাশয বিপ্র ক্ষিপ্র কুসুমাবচয় কবিযা অর্থাৎ ফুল তুলিযা আশ্রমে যাও এ অবণ্যে ব্যাঘ্রভীতি বড। বামনা বন্য জনের ঐ বচন শুনিযা আপনাব পণ্ডিতাই খাটাইলেন বিশেষরূপে আঘ্রাণ যে করে সে ব্যাঘ্র শব্দেব বাচ্য হয তার ভয় কি শুঁকিলে কি প্রাণী মরে মনে এই করিয়া নিশ্চিন্ত নির্ভয় নিঃশঙ্ক হইয়া পুষ্পচযনে নির্ভব কবিল বনবাসিব বাক্য শ্রুতমশ্রুত কবিল। ইতোমধ্যে ব্যাঘ্র আসিয়া ঠাকুব মহাশযকে খাইয়া ফেলিল। পণ্ডিতেবদেব এই বুদ্ধি তাহারদেব কথাও কথা সেও আবাব গ্রাহ্য। আঃ কপাল বঞ্চকের ইত্থম্ভুত (এইরূপে) ভয়প্রীতি বাক্যে ব্যাঘ্রী প্রতাবিত।

হইয়া কহিল উঁ কেমন করিয়া ইহা হবে। শৃগাল কহিল মর মাগি কতো নাকরা করিস্ আয় না দেখ কেমন করিয়া হয় ইহা কহিয়া ঐ বঞ্চক ব্যাঘ্রীপতি হইয়া থাকিল।

অতএব কহি হে মহারাজ ঋণ বড় মন্দ যার মিথ্যাপবাদ মাত্রে অতিপ্রবল বাঘের এতাদৃশ দুববস্থাতে পঞ্চত্ব হয় ক্ষুদ্র দুর্ব্বল শৃগাল মিথ্যা উত্তমর্ণতানিমিত্তক তৎপত্নীপতি হয়। বাস্তব ঋণ হইলে না জানি কি হইতো। ঈদৃশ অভদ্র যে কর্জ্জ তৎপরীবাদ আপনকার পবমধার্ম্মিক মহাধনিক পিতাকে কালিদাস দেয এ বড় আশ্চর্য্য। ধূর্ত্তের অসাধ্য কি কপটিবা অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে ধূর্ত্তকর্তৃক এ জগৎ বঞ্চিত আছে হে মহারাজ ধূর্ত্তের আর এক কথা কহি শ্রবণ করুন।

দ্বৈতবনে কোমল ঘাস ভক্ষণে ও সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল জলপানে স্থূল চাক্‌চিক্য শবীর ও উদার স্বভাব সর্ব্বদা সতর্ক এক শশক সুখে বাস করিয়া থাকে। ঐ বনে ধূর্ত্তশিরোমণিনামে এক শৃগাল থাকে ঐ বঞ্চক সেই শশককে দেখিয়া তন্মাংস ভক্ষণ লালসাতে লোলুপ হইয়া অনেক প্রকার চেষ্টা করিয়া আত্মসাৎ করিতে না পাবিযা কপট প্রণয ব্যবহারে স্বাযত্ত করিতে যত্ন করিল। শশক স্বীয় উদারতাপ্রযুক্ত তদীয় মিথ্যা উপচারে বিশ্বস্ত হইয়া তাহাকে আপ্ত কবিযা মনে মানিয়া তদাশ্বাসে বিশ্বাস দিনে২ অধিক করিতে লাগিল। ইহাতে ঐ ধূর্ত্তশিবোমণি শশককে আপনার নিতান্ত বাধ্য বুঝিয়া এক শস্য ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া আপনি ক্ষেত্রবাহ্যে অতিসাবধানে থাকিয়া শশককে কহিল বন্ধু তুমি অকুতোভয় হইয়া চব আমি জাগরূপ হইয়া আছি সঙ্কেত করামাত্রে তুমি ত্বরায় পলাযন করিও।

এইরূপে অভয় দিয়া প্রত্যহ চরায। দৈবাৎ এক দিবস লাঙ্গলিক নামে তৎক্ষেত্রপতি নববর্দ্ধিত ধান্যক্ষেত্রে চরিতে শশককে দেখিতে পাইয়া পাষাণ ফেলাইয়া মারিল। তৎপ্রক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে শশক বিদীর্ণ শীর্ণ ও গতপ্রাণ হইযা পড়ামাত্রে পূর্ণ মনোরথ ও আনন্দিতান্তঃকরণ হইয়া ক্ষেত্রপতি এক দিগহইতে শৃগাল আব দিগহইতে মৃত শশক গ্রহণেচ্ছাতে ধাবমান হইল। লাঙ্গলিক হাঁ২ করিযা আসিযা পড়িযা মৃত শশককে লইয়া গেল। শৃগাল ত্রাসে অরণ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভেকুয়া হইয়া ভেল২ করিয়া চাহিযা থাকিল। পবে চোরের ধন বাটপাড়ে লইল ইহা মনে করিয়া অত্যন্ত জাতক্রোধ হইযা ক্ষেত্রপতিব উপব ঈর্ষা কবিযা দ্রোহ কবিতে তাব খামাবে গিয়া খোলায় আমাড়া ধানের গাদির আড়ে মেইব নিকটে লুকাইয়া থাকিল। ক্ষেত্রপতি খামার হইতে ঘরে গিয়া স্ত্রী পুত্রকে ডাকিযা আনিযা মাংসপাকার্থে নিযুক্ত করিয়া আপনি শস্য রক্ষার্থে মাঠে গেল। কৃষকপত্নী মাংসপরিস্রাবপূর্ব্বক পাকানন্তব অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত কবিযা পতিকে ডাকিতে পুত্রকে পাঠাইল। কর্ষক পুত্রপ্রমুখাৎ তদ্বার্ত্তা শ্রবণ করিযা কহিল এ ভূমিখান নিড়াইতে কিছু শেষ আছে আয় বাপে বেটায় দুই জনায তাড়াতাড়ি নিড়াইয়া ফেলি পাছে খাইতে যাব। ইহা কহিযা পিতাপুত্রে ক্ষেত্র তৃণরহিত কবিতে লাগিল। ইত্যবসরে শৃগাল অমন্দিত শুষ্ক শশ্যস্তূপে স্তোকে২ বহ্নি প্রজ্বলিত কবিয়া দিয়া গৃহের নিকটস্থ বনে লুক্কায়িত হইয়া থাকিল। কৃষকেব গৃহিনী ধান্যস্তূপে দোধূয়মান অগ্নি দেখিয়া দৌড়াদৌড়ী ধাইয়া গিয়া স্বামিকে সম্বাদ করিল। ওরে মিন্‌সা দৌড়িয়া আয ধানের গাদায় আগুন লাগিযা সকল পুড়িযা ছাই হইল। ইত্যবসরে শৃগাল শূন্য ঘবে প্রবেশ করিয়া অন্ন মাংসাদি তাবৎ পবম সুখে ভোজন কবিল।

কৃষক অগ্নিলাগা শুনামাত্রে সত্বর হইয়া খামাবে আসিয়া জলোপসেকে বহ্নি নির্ব্বাণ করিতে কলস আনিতে গৃহে যাইতেছে। ইতোমধ্যে শৃগাল সাড়া পাইয়া গৃহ হইতে নির্গমনার্থ উন্মুখ হইযা গুরুতব ভোজনেতে উদবভারে শীঘ্র বহির্নির্গত হইতে পারিল না। কৃষক দেখিতে পাইযা ত্বরায কপাটে শৃঙ্খলা লাগাইয়া দিল। শিযালের পো কারাগারবদ্ধ প্রায হইয়া থাকিলেন। তদনন্তর লাঙ্গলিক কৃচ্ছ্রে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া অত্যন্ত ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিত হইয়া ভোজ্য দ্রব্যব্যাঘাতে জাত মহাক্রোধে শৈলীক্রমে গৃহাভ্যন্তবে গিযা দৃঢতব রজ্জুতে কণ্ঠদেশ

আঁটিয়া বান্ধিয়া শৃগালকে টানিযা আনিয়া হাতিনাতে পাড়িযা কাতি করিয়া ফেলিয়া শৃগালেব পিছাড়ি দুই পাতে আপন দুই পাদতলেব ভর দিয়া তাব উপবে চাপিযা বসিয়া স্ত্রীকে কহিল ওলা মাগি কতক গুলা ধূলা শীঘ্র আন এ শালাব বেটাকে জব্দ কবি। চাষানী ধূলি আনিযা দিল। কুপিত মূর্খ লাঙ্গলিক পাঁচনিতে ঠাসিযা শৃগালেব মার্গছিদ্রে সকল ধূলা পূরিযা স্ত্রীকে ডাক দিল। হেদেব মাগি আর কতকগুলা ধূলা শীঘ্র আনতো শালাব মার্গে ভাল কবিয়া ধূলা ভরি বেটা বড় দুঃখ দিয়াছে। তৎপত্নী কহিল মা গো শিযালটার পেটে কতো ধূলা যাবে দেখই না কেন মার্গ পূরিযা গিয়াছে। ইহা শুনিয়া অতিবড় মূঢ় চাষা অধোমুখ হইয়া শৃগালের গুহ্যদ্বাব নিবীক্ষণ করিতেছে ইত্যবসবে ধূর্ত্তশিবোমণি বঞ্চক কাশিযা এক মকৃৎকর্ম্ম কবিযা চাষার চক্ষু ধূলিতে সম্পূর্ণ কবিল। চাষা বাপরে২ মলাম্‌বে ওলো মাগি দৌড়লো২ চক্ষু গেল২ এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে কবিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া হস্তদ্বয়ে চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন করিতে২ শৃগাল অমনি ঝটিতি ধড়পড় কবিয়া উঠিয়া চাষাব পাচায় এক কামড় দিয়া এবং চক্ষে ধূলা দিযা চলিয়া গেল। চাষা হাবা হইযা ইস্‌উস্ কবত থাকিল।

তাহার স্ত্রী কপালে করঘাত (কর দ্বারা আঘাত) করিয়া ও মা এ কি হইল শিয়ালের কামড় বড় মন্দ না জানি মোর ভাগ্যে কি আছে অভাগিনী জন্মদুঃখিনী মুই। মোরা চাস্ করিব ফসল পাবো বাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছরশুদ্ধ অন্ন করিযা খাবো ছেলেপিলাগুণি পুষিব। যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয় সে বছব বড় দুঃখে দিন কাটি কেবল উড়িধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুক গুগলি (ছোট শামুক বা গেড়ি) সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি খনকুটা কাটা শুকনা পাতা কঞ্চী তুঁষ ও বিলঘুঁটিয়া কুড়াইয়া জ্বালানি করি। কাপাস তুলি তুলা করি ফুড়ী পিঁজী পাঁইজ কবি চরকাতে সূতা কাটি কাপড় বুনাইয়া পরি। আপনি মাটে ঘাটে বেড়াইয়া ফুলফুলাবিটা যা পাই তাহা হাটে বাজাবে মাতায মোট কবিযা লইয়া গিযা বেচিযা পোণেক দশ গণ্ডা যা পাই। ও মিন্‌সা পাড়াপড়সিদের ঘবে মুনিস্ খাটিয়া দুই চাবি পোণ যাহা পায তাহাতে তাঁতিব বাণী দি ও তেল লুণ করি কাটনা কাটি ভাড়া ভানি ধান কুড়াই ও সিজাই শুকাই ভানি খুদ কুঁড়া ফেন আমানি খাই। শাক ভাত পেট ভবিযা যে দিন খাস সে দিন তো জন্মতিথি। কাপড বিনা কেয়ো পাচা ঠুকবিযা খায তেল বিহনে মাতায খড়ি উড়ে। শীতেব দিনে কাঁথা খানী ছালিযা গুলিকেব গায দি আপনারা দুই প্রাণী বিচালি বিছাইযা পোয়ালেব বিঁড়ায় মাতা দিযা মেলেব মাদুর গায দিয়া শুই। বাসন গহনা কখন চক্ষেও দেখিতে পাই না যদি কখন পাথবায খাইতে পাই ও বাঙ্গা তালের পাতা কাণে পবিতে ও পুঁতিব মালা গলায পবিতে ও বাঙ্গ সীসা পিতলেব বালা তাড মল খাড়ু গায পবিতে পাই তবেতো বাজবাণী হই। এ দুঃখেও দূবন্ত রাজা হাজা শুকা হইলেও আপন বাজস্বেব কড়া গণ্ডা ক্রান্তি বট হয ধুল ছাড়ে না এক আদ দিন আগে পাছে সহে না। যদ্যপিস্যাৎ কখন হয তবে তাব সুদ দাম২ বুঝিয়া লয কড়া কপর্দ্দকও ছাড়ে না। যদি দিবাব যোত্র না হয় তবে সানা মোড়ল পাটোয়ারি ইজারদাব তালুকদাব জমীদারেবা পাইক পেযাদা পাঠাইযা হাল যোয়াল ফাল হালিযা বলদ দামড়া গব বাছুব বক্‌না কাঁথা পাতবা চুপড়ী কুলা ধূচনীপর্য্যন্ত বেচিয়া গোবাডীযা করিযা পিটিযা সর্ব্বস্ব লয। মহাজনেব দশগুণ সুদ দিয়াও মূল আদায় কবিতে পাবি না কতো বা সাধ্য সাধনা করি হাতে ধরি পায় পড়ি হাত জুড়ি দাঁতে কুটা করি। হে ঈশ্বব দুঃখিব উপরেই দুঃখ ওরে পোড়া বিধাতা আমারদেব কপালে এত দুঃখ লেখিস্ তোব কি ভাতেব পাতে আমবাই ছাই দিয়াছি। মাস্ ও ভাত আব২ বেসাতি বাঁধিলাম মনে বড় সাব ছিল মাউগ ভাতাবে ছালিযাগুলিকে সঙ্গে লইয়া সুখে বসিয়া খাবো। সে সকল বাসনা কমনে গেল শেষ পাছার মাসপর্য্যন্ত খুলিযা শিয়ালে খাইল। এ শিয়াল কামড়াব ঘা ভাল নয় কত দিনে বা শুকাইবে কোথা বা ওঝা পাবো। এইরূপে দুঃখোক্তি কবিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। ইতি প্রবোধ চন্দ্রিকায়াং তৃতীয স্তবকে তৃতীয কুসুমং।

ফুলবাবু

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুলবাবু অর্থাৎ বাবু ফুল্ল হইলেন। খলিপা সঙ্গে কখন বাগানে কখন নিজভবনে নানাজাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী বারাঙ্গনা আনয়নপূর্ব্বক আপন | মন | খুসি করিতেছেন। খুসির তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনে অক্ষম হইলাম, এক দিবসের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি; খলিপা কহিলেন, কল্য বাগানে সকল রকম মজা দেখাইব, কিন্তু পাঁচ শত টাকা অদ্য ব্যয় করিতে হইবেক। বাবু কহিলেন, খলিপা অদ্য আমার হস্তে একটি টাকাও নাই, সংপ্রতি টাকার কি হইবেক। খলিপা কহিল, বাবুজী আমি তোমার নিকটে যত দিবস থাকিব তত দিবস টাকার নিমিত্ত মজা ভঙ্গ হইবে না, কেবল তুমি আপন নাম সহি করিয়া দিবা। বাবু আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন, আর কহিলেন শীঘ্র টাকার সুযোগ অর্থাৎ ফিকির করহ, খলিপা কাপ্তেনি আফিসে খবর দিয়া তৎক্ষণাৎ দুই জন দালাল আনিয়া বাবুর নিকটে নিযুক্ত করিলেন, দালালেরা কহিলেক, বাবুজী কত টাকা চাহি আজ্ঞা করুন, বাবু কহিলেন পাঁচ শত টাকা, দালালেরা একে হনুমান, তাহাতে যদি আজ্ঞা পান, তবে তৎক্ষণাৎ নক্ষত্রবেগে মহাজনের বাটীতে হয়েন ধাবমান। মহাজন ব্যাধের প্রায় ফাঁদ পাতিয়া আছেন, কে ফাঁদে পড়ে তাহাই সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করিতেছেন। দালালেরা কহিলেক, মহাশয় অভাগা অজা পাইয়াছি, পাঁচ শত টাকা চাহে। মহাজন কহিলেক, তাহার নাম কি এবং পিতার বা কি নাম, বাটী কোথা। দালালেরা কহিলেন এক্ষণে ওসকল কথায় প্রয়োজন নাই, আপনকার স্থানেও এমন শিকার পান নাই। ইহার নাম জগদ্দুর্লভ বাবু, পিতার নাম রামগঙ্গা নাগ, হরেক রকম সওদাগরি আছে বেলেঘাটায় চুনের গোলা, জক্সনের ঘাটে থল্যার দোকান, খাতাবাটীতে মুটের সবদারি প্রায় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার সম্ভাবনা হইবেক। মহাজন আপন লিষ্টি বাহির করিলেক, তাহার ঐ লিষ্টিতে লেখা আছে যে কোন লোক ধনী অবিবেচী অজাতুল্য এবং সন্তানকে অধিক স্নেহ করে, ঐ লিষ্টির মধ্যে রামগঙ্গা নামও লেখা আছে আর দেখিলেক এ লোক কখন আদালত দেখে নাই এবং উকীল কৌনসলী কি কর্ম্ম করে তাহাও জ্ঞাত নহে, মহাজন আপন লিষ্টিতে এসব অবগত হইয়া মহাতুষ্ট হইল। পরে দালালদিগকে কহিলেক, পাঁচ শত টাকা দিব দুই হাজার টাকার খত সহি করাইতে হইবেক, তোমরা দালালি সেই স্থানে লইবা, যাও বাবুর সহিত রফা কর। বাবু বৈঠকখানায় খলিপাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন অদ্য কি মজা হইবেক, আর এক একবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন টাকা পাওয়া যাইবেক কি না। খলিপা কহে টাকার কারণ উদ্বেগ করিবা না, যাহারা এক কথায় টাকা না দেয় এমন লোকের সহিত ব্যবহার ও আলাপ করি না, বাবুকে এত এত টাকা দেওয়াইয়াছি, এই যত হুমরা চুমরা দেখিতে পাও এক্ষণে কেহ মাকমারি দলের রাজা, কেহ পাখির দলের সর্দ্দার, সকের যাত্রানির্ব্বাহক ইহারা সকলেই আমার কাছে তালিম হইয়াছে, কোন বেটাকে আমি টাকা না দেওয়াইয়াছি, ইহারা কএদ হইয়াছে ইহাদিগের পিতার কাছে গমনাগমন করিয়া খালাস করিয়াছি। তোমাকে একেবারেই কহিয়াছি আমি নিকটে থাকিতে কোন পেঁচ নাই, স্বচ্ছন্দে

মজা কর, কেবল আমার কথাপ্রমাণে চলিবা। এমত [সময়] সমুদয় দালালেরা আসিয়া কহিলেক, বাবুজী টাকা স্থির করিয়াছি, কত স্থানে ভ্রমণ করিলাম তাহা কি কহিব কেহ দিতে চাহে না। তৎপরে এই সুর বাবুর নাম ডিউয়ের দিনে অর্থাৎ খতের মেয়াদ পূর্ণ হইলে টাকা না পাও আমরা দিব। বাবু কহিলেন, তোমারদিগের সহিত সে মহাজনের কি প্রকার আলাপ। দালালেরা কহিলেক, বাবুজী এ কর্ম্মে আমরা নূতন ব্রতী নহে। আপনি জ্ঞাত নহেন আমরা এই কর্ম্ম করিতে করিতে প্রাচীন হইলাম, আমাদিগের বাটী ছিল কোড়াগাছি, তাহা কে না জানে, এই সুরবাবু সকলি জানেন, ইঁহাকে কত টাকা দেওয়াইয়াছি এবং আমরাও ইহার স্থানে কত টাকা পাইয়াছি, যদি ইহার টাকা কিম্বা দুই চারিখান বাটী থাকিত তবে আজি আমারদিগের কি কি ভাবনা ছিল। সে যাহা হউক এক্ষণে আমারদিগের কি দালালি দিবেন। বাবু কহিলেন খলিপাজী যাহা দিতে কহিবেন তাহাই দিব। পরে খলিপা বাবুর সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া কহিলেন, তোমরা দুই জনে ৫০ টাকা পাইবা। দালালেরা এ কথা শুনিয়া কহিলেক, মহাশয় এ কি কথা আপনি পাঁচ শত টাকা লইবেন আমাদিগকে পঞ্চাশটি টাকা দিবেন এমন কথা কখন শুনি নাই, যদি কোন লোক দুই শত টাকা লয় সেও পঞ্চাশ টাকা দেয়। এইরূপ অনেক কথোপকথনের পর এক শত টাকায় রফা হইল। ইহাতে বাবু কিঞ্চিৎ বিরস হইলেন যে পাঁচ শত টাকার কমে এ কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইবেক না, ইহার মধ্যে এক শত টাকা দালালদিগকে দিতে হইবেক ইহাই ভাবিছেন। খলিপা কহিলেক, বাবুজী এক কথা আছে দালালি টাকা খতের উপর চড়াইয়া দাও। বাবু কহিলেক, এ কথা ভাল আমি ইহা স্বীকৃত আছি। ইহা শুনিয়া দালালেরা তৎক্ষণাৎ মহাজনের নিকট গমন করিয়া দুই হাজার এক শত টাকার এক লোট লেখাইয়া আনিল। বাবু সহি করিলেন টাকা খলিপা বুঝিয়া লইলেন। মহাজনের তরফ তিন লোক আসিয়া বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবুজী এই নোটের বেবাক টাকা পাইয়াছেন। বাবু কহিলেন, হাঁ পাইয়াছি। পরে টাকা লইয়া খলিপা মজার নিমিত্তে দ্রব্যাদির আয়োজন করিছেন।

নরক কেমন সুখের স্থান

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যদি বলেন, নরক কেমন সুখেব স্থান, সে বোধ থাকিলে, তুমি কখনই, নবকে যাইতে চাইতে না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই, কিছু দিন পূর্বে, কলিকাতায এক ভদ্র সন্তান বেযাড়া ইযার হইয়াছিলেন। তিনি একবারে উচ্ছন্ন যাইতেছেন ভাবিয়া, তাঁহার গুরুদেব, উপদেশ দিয়া, তাঁহাকে দুরস্ত কবিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। 'তোমার কি নরকে যাইবার ভয় নাই', গুরুদেব এই কথা বলিলে, সেই সুবোধ, সুশীল, বিনয়ী ভদ্রসন্তান কহিযাছিলেন, 'আপনি দেখুন, যত প্রবলপ্রতাপ বাজারাজড়া, সব নরকে যাইবেন, যত ধনে মানে পূর্ণ বড় লোক, সব নবকে যাইবেন, যত দিলদরিয়া, তুখড় ইয়ার, সব নবকে যাইবেন, যত মৃদুভাষিণী, চারুহাসিনী বারবিলাসিনী, সব নরকে যাইবেন, স্বর্গে যাইবার মধ্যে, কেবল আপনাদেব মত টিকি-কাটা বিদ্যাবাগীশের পাল। সুতরাং অতঃপব নরকই গুল্‌জার, এবং, নরকে যাওযাই সর্বাংশে বাঞ্ছনীয়।' আমারও সেই উত্তর।

কিন্তু একটি বিষয়ে, উক্ত ভদ্রসন্তানের মতের সহিত, আমাব মতেব সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি কহিয়াছিলেন, টিকি-কাটা বিদ্যাবাগীশেব পাল স্বর্গে যাইবেন। আমার কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস এই, যদি নরক নামে বাস্তবিক কোনও স্থান থাকে, এবং কাহাবও পক্ষে, সেই নবক পদবাচ্য স্থানে যাইবার ব্যবস্থা থাকে, তাহা হইলে, টিকি-কাটা বিদ্যাবাগীশেব পাল সর্বাগ্রে নরকে যাইবেন, এবং নরকের সকল জাযগা দখল কবিয়া ফেলিবেন, আমবা আর সেখানে স্থান পাইব না।

শ্রীমান্ বিদ্যাবাগীশ খুড় মহাশয়েবা, শাস্ত্রেব দোহাই দিযা, মনগড়া বচন পড়িযা, বলিযা থাকেন, জ্ঞানকৃত পাপের নিষ্কৃতি নাই। বিযযী লোক শাস্ত্রজ্ঞ নহেন, সুতবাং তাঁহাদেব অধিকাংশ পাপ, জ্ঞানকৃত বলিযা, পরিগণিত হইতে পাবে না। কিন্তু বিদ্যাবাগীশ খুড়দেব, শাস্ত্রেও যেমন দখল, পাপেও তেমনি প্রবৃত্তি, সুতবাং, তাঁহাদেব পাপেব সংখ্যাও অধিক, এবং সমস্ত পাপ জ্ঞানকৃত। এমন স্থলে তাঁহারাই নবক একচেটিয়া করিযা ফেলিবেন, সে বিযযে অনুমাত্র সংশয় নাই। তাঁহাবা, আমাদিগকে ভয় দেখাইবাব জন্যে, নানা বঙ্ চড়াইযা, বর্ণনা কবিযা, নরককে এমন ভয়ানক স্থান করিযা তুলেন যে, শুনিলে হৃৎকম্প হয়, এবং একবাবে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু, আপনাদেব বেলায, 'মাকড় মাবিলে ধোকড় হয' বলিযা, অবলীলাক্রমে, সমস্ত পাপকর্মে সম্পূর্ণ লিপ্ত হইযা থাকেন। এ বিযযেব অতি সুন্দব একটি উদাহবণ দর্শিত হইতেছে।

কিছু কাল পূর্বে, এই পবম পবিত্র গৌড়দেশে কৃষ্ণহরি শিবোমণি নামে, এক সুপণ্ডিত অতি প্রসিদ্ধ কথক আবির্ভূত হইযাছিলেন। যাহাবা তাঁহার কথা শুনিতেন, সকলেই মোহিত হইতেন। এক মধ্যবয়স্কা বিধবা নাবী, প্রত্যহ, তাঁহার কথা শুনিতে যাইতেন। কথা শুনিয়া, এত মোহিত হইযাছিলেন, যে তিনি অবাধে, সন্ধ্যাব পব, তাঁহার বাসায গিয়া, তদীয পবিচর্যায

নিযুক্ত থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া, অবশেষে ঐ বিধবা রমনী গুণমণি শিরোমণি মহাশয়েব প্রকৃত সেবাদাসী হইয়া পড়িলেন।

একদিন, শিবোমণি মহাশয, ব্যাসাসনে আসীন হইয়া, স্ত্রীজাতিব ব্যাভিচার বিষয়ে অশেষবিধ দোষ কীর্তন করিয়া, পবিশেষে কহিয়াছিলেন, 'যে নাবী পবপুরুষে উপগতা হয়, নবকে গিয়া, তাহাকে অনন্ত কাল, যৎপরোনাস্তি শাস্তিভোগ কবিতে হয়। নবকে এক লৌহময শাল্মলি বৃক্ষ আছে। তাহাব স্কন্ধদেশ, অতি তীক্ষ্ণাগ্র দীর্ঘ কণ্টকে পবিপূর্ণ। যমদূতেবা, ব্যভিচারিণীকে, সেই ভয়ঙ্কব শাল্মলি বৃক্ষেব নিকটে লইয়া গিযা বলে, তুমি, জীবদ্দশায , প্রাণাধিক প্রিয উপপতিকে, নির্বতিশয, প্রেমভরে, যেরূপ গাঢ আলিঙ্গনদান কবিতে, এক্ষণে, এই শাল্মলি বৃক্ষকে, উপপতি ভাবিযা, সেইরূপ গাঢ় আলিঙ্গন দান কব। সে ভযে অগ্রসব হইতে না পাবিলে, যমদূতেবা, যথাবিহিত প্রহাব ও যথোচিত তিবস্কাব কবিযা, বলপূর্বক, তাহাকে আলিঙ্গন কবায, তাহাব সর্ব শবীব ক্ষত বিক্ষত হইযা যায, অবিশ্রান্ত শোণিতস্রাব হইতে থাকে, সে, যাতনায অস্থিব ও মৃতপ্রায হইযা, অতিকরুণ স্বরে, বিলাপ, পরিতাপ ও অনুতাপ কবিতে থাকে। এই সমস্ত অনুধাবন করিযা, কোনও স্ত্রীলোকেবই, অকিঞ্চিৎকব, ক্ষণিক সুখেব অভিলাষে, পবপুরুষে উপগতা হওযা উচিত নহে ইত্যাদি।

ব্যভিচাবিণীর ভয়ানক শাস্তিভোগ বৃত্তান্ত শ্রবণে, কথকচূডামণি শিরোমণি মহাশয়েব সেবাদাসী ভযে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইযা, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যাহা কবিযাছি, তাহাব আব চারা নাই, অতঃপব, আব আমি, প্রাণান্তেও, পবপুরুষে উপগতা হইব না।' সে দিন, সন্ধ্যাব পর, তিনি, পূর্ববৎ, শিবোমণি মহাশয়ের আবাসে উপস্থিত হইযা, যথাবৎ আব আব পবিচর্যা করিলেন, কিন্তু, অন্যান্য দিবসেব মত, তাঁহাব চবণ সেবাব জন্য, যথাসময়ে, তদীয় শযনগৃহে প্রবেশ করিলেন না।

শিরোমণি মহাশয, কিযৎক্ষণ অপেক্ষা কবিলেন, অবশেষে, বিলম্ব দর্শনে অধৈর্য হইযা, তাঁহাব নামগ্রহণপূর্বক, বারংবাব আহ্বান কবিতে লাগিলেন। সেবাদাসী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট না হইযা, দ্বারদেশে দণ্ডাযমান রহিলেন, এবং গলবস্ত্র ও কৃতাঞ্জলি হইযা, গলদাশ্রু লোচনে, শোকাকুল বচনে কহিলেন, 'প্রভো! কৃপা কবিযা, আমায ক্ষমা করুন। সিমূল গাছেব উপাখ্যান শুনিযা, আমি ভযে মবিযা বহিযাছি, আপনকাব চবণ সেবা কবিতে, আব আমাব, কোনও মতে প্রবৃত্তি ও সাহস হইতেছে না। না জানিযা যাহা কবিযাছি, তাহা হইত কেমন কবিযা নিস্তাব পাইব, সেই ভাবনায অস্থির হইযাছি।'

সেবাদাসীব কথা শুনিযা পণ্ডিতচূডামণি শিবোমণি মহাশয শয্যা হইতে গাত্রোত্থান কবিলেন, এবং দ্বাবদেশে আসিযা, সেবাদাসীব হস্ত ধবিযা, সহাস্য মুখে কহিলেন, 'আবে পাগলি! তুমি এই ভযে আজ শয্যায যাইতেছ না? আমবা, পূর্বাপব, যেরূপ বলিযা আসিতেছি, আজও সেইরূপ বলিযাছি। সিমূল গাছ পূর্বে ঐরূপ ভযঙ্কব ছিল যথার্থ বটে, কিন্তু শবীবেব ঘর্ষণে ঘর্ষণে, লৌহময কণ্টকসকল ক্রমে ক্ষয পাওযাতে, সিমূল গাছ তেল হইযা গিযাছে, এখন আলিঙ্গন কবিলে, সর্ব শবীব শীতল ও পুলকিত হয'। এই বলিযা, অভযপ্রদান ও প্রলোভন প্রদর্শনপূর্বক শয্যায লইযা গিযা, গুণমণি শিবোমণি মহাশয তাহাকে, পূর্ববৎ, চরণ সেবায প্রবৃত্ত কবিলেন।

সফল স্বপ্ন

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

প্রথম অধ্যায়

একদা কোন অশ্বারোহী পুরুষ গান্ধার দেশের নির্জ্জন বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ক্রমে দিনকর গগনমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া খরতর কিরণ-নিকুর বিস্তার দ্বারা ভূতল উত্তপ্ত করিলে, পথিক অধ্বশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অশ্বকে তরুণ তৃণ ভক্ষণার্থ বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন এবং আপনি সমীপবর্ত্তী নির্ঝরতীরে উপবিষ্ট হইয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, স্থানটি ভয়ানক এবং অদ্ভুতরসের আস্পদ হইয়া আছে। নিবিড় বনপত্রে সূর্য্যকিরণ প্রায় সর্ব্বতোভাবেই আচ্ছাদিত, কেবল স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশমান মাত্র। বৃক্ষগণ অতি দীর্ঘ। কাহার কাহার গাত্রে একটিও শাখাপল্লব না থাকাতে বোধ হয় যেন, উহারা উপরিস্থ পর্ণচন্দ্রাতপ ধারণের স্তম্ভ হইয়া আছে। অদূরে বন-হস্তিগণ সুশীতল ছায়াতলে সুষুপ্তি-সুখানুভব করত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনতরুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া আপনাদিগের অপেক্ষাকৃত খর্ব্বতা প্রমাণ করিতেছে। ফলত বিধাতা নিভৃত নির্জ্জন কাননে, অথবা নির্গম গিরিশিখরেই সৃষ্টির পরম রমণীয় শোভা সমস্ত সংস্থাপিত করিয়া থাকেন। সেই মনুষ্য-সম্বন্ধ-বর্জ্জিত, নিঃশব্দ, শান্ত-রসাস্পদ স্থানে নানা অদ্ভুত বস্তুর সন্দর্শন হওয়াতে মন অবশ্যই ভক্তি শ্রদ্ধা ও ঔদার্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া সেই মহৈশ্বর্য্যশালী জগৎকর্ত্তার সন্নিধানে নীত হয়।

অনুমান হয়, পথিক তাদৃশ উদারভাবে নিমগ্ন-চিত্ত হইয়া ধ্যানাবলম্বিতের ন্যায় সম্মুখস্থ নির্ঝরের প্রতি একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে হঠাৎ সমীপবর্ত্তী ক্ষুদ্রশাখী সমুদায় প্রবল বেগে সমালোড়িত, তাবৎ অরণ্য গভীর গর্জ্জনে শব্দায়মান এবং পথিকের অশ্ববর এক প্রকাণ্ড সিংহের পদাঘাতে ভূতলশায়ী হইল। পথিক নিমিষ মধ্যে সিংহের সমীপবর্ত্তী হইয়া নিষ্কোষিত করবাল দ্বারা এক এক আঘাতেই তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয়ের শিরাচ্ছেদন করিলেন। মৃগরাজ ছিন্নপদ হওয়াতে চলৎশক্তিরহিত হইয়া অশ্বকে পরিত্যাগ করিল—কিন্তু অশ্ব তাহার দারুণ পদাঘাতে একান্ত আহত এবং নখর বিদারণে জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল—অতএব ক্ষণমাত্র পরেই প্রাণত্যাগ করিল। সিংহ অতিশয় ভয়ঙ্কররূপে গর্জ্জন করিতেছিল—তাহার চক্ষুর্দ্বয় তেজে উদ্দীপ্ত এবং কেশর উত্থিত হইয়াছিল—কিন্তু সেই ক্রোধ কোন কার্য্যকরী হইল না। পশু সম্মুখের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া, পথিক নির্ভয়ে গমনপূর্ব্বক তাহার মস্তকে খড়্গ প্রহার করিলেন, দ্বিতীয় আঘাতেই পশুরাজ আর্ত্তনাদ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

পথিক বাহনবিনাশে নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্ত হইলেন—কিন্তু কি করেন, অপ্রতিবিধেয় দুঃখে দুঃখী হওয়া অকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ অতীত হইয়াছে, দিবাভাগ থাকিতে থাকিতেই পদব্রজে অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে হইবে, এই বিবেচনা করিয়া বাজিপৃষ্ঠে যাবৎ পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী ছিল, সমুদায় স্বীয় স্কন্ধে আরোপণ করত দ্রুতবেগে গমনোন্মুখ হইলেন। বহুক্ষণ কাননের

কুটিল পথে গমন করিয়া একান্ত ক্লান্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে সম্মুখে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর দৃষ্টিগোচর হইল। অগ্রসর হইয়া দেখেন, প্রান্তরমধ্যভাগে এক নবপ্রসূতা হরিণী স্বীয় শাবক সমভিব্যাহারে তৃণ ভক্ষণ করিতেছে। পথিক সত্বরপদে আসিয়া অনতিবেগবান্ সদ্যোজাত সেই হরিণশিশুকে গ্রহণ করিলেন। ভয়বিহ্বলা হরিণী প্রাণভয়ে পলায়ন করিল। মৃগয়া সফল হওয়াতে পথিক মনে মনে ভাবিলেন, এইক্ষণে উত্তম উপযোগ দ্রব্য পাইলাম, কাননে রাত্রি যাপন করিতে হইলেও হানি নাই। এই ভাবিয়া হৃষ্টচিত্তে মৃগশাবকের পদে রজ্জু বন্ধন করিয়া লইলেন, এবং প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রস্তুত করণের যথাযোগ্য স্থান প্রাপ্ত হইয়া হরিণশিশুকে একটা বৈদ্যুতাগ্নিশুদ্ধ বৃক্ষমূলে স্থাপন করত দুইখানি শুষ্ককাষ্ঠ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিলেন। অনন্তর অসিধারণপূর্ব্বক মৃগশাবকের প্রাণবধে উদ্যত হইয়াছেন, দৈবাৎ অদূরে দণ্ডায়মানা মৃগমাতার প্রতি নেত্রপাত হইল। আহা! পশুজাতির মধ্যেও অপত্যস্নেহ কি প্রবল! হরিণী উন্নতমুখী হইয়া জলধারাকুল লোচনে পথিকের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টি করিয়া রহিয়াছিল। পরে, ক্ষণে স্বীয় শাবকের প্রতি এবং ক্ষণে পথিকের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে এক এক পা করিয়া শাবকের সমীপাগত হইলে, পথিক কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। হরিণী এক লম্ফে শাবকের সন্নিহিত হইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল এবং পার্শ্বে শয়ন করিয়া নানা প্রকারে স্পষ্টরূপে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। পথিক পুনর্ব্বার নিকট গমনের উপক্রম করিলেন। হরিণী অমনি দীর্ঘলম্ফ প্রদান করিল। কিন্তু অকৃত্রিম স্নেহ-বন্ধন প্রযুক্ত পলায়ন করিতে পারিল না—পূর্ব্ববৎ অপত্য বিরহ-বিষাদ প্রদর্শন করিতে লাগিল। পশুযোনিতে ঈদৃক্ মানুষ-সদৃশ বাৎসল্য ভাব অবলোকনে কাহার মনে সত্ত্ব গুণের উদয় না হয়? পথিক কারুণ্যরসের প্রাদুর্ভাবে বিচলিতান্তঃকরণ হইয়া কুরঙ্গের কোমলাঙ্গ হইতে বন্ধন মোচন করত অপার পবিত্র আনন্দানুভব করলেন। মৃগশাবক মুক্ত হইয়া অতি শীঘ্র মাতৃসন্নিহিত হইল এবং সিদ্ধমনোরথা হরিণী তৎক্ষণাৎ আনন্দধ্বনি করিয়া প্রস্থান করিল। কিন্তু শাবক সমভিব্যাহারে অটবী-মধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার সন্তানের জীবনরক্ষিতার প্রতি সজল দৃষ্টিদ্বারা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া গেল।

ধর্ম্মাত্মা পথিক এইরূপ সদাশয়তা প্রকাশ দ্বারা অতীব চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলেন। জীবন অপেক্ষা ইহলোকে অধিকতর প্রেমাস্পদ পদার্থ আর কি আছে? বিশেষতঃ নিকৃষ্ট জীবগণ অপরিণামদর্শী ও ইন্দ্রিয়-প্রীতিপরায়ণ। এই জন্য জিজীবিষাবৃত্তি পশ্বাদির মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবল থাকে। হায়! তাহারা কি নির্ঘৃণ, যাহারা অকারণে কোন প্রাণীর জগদীশ্বর-প্রদত্ত সর্ব্ব সুখনিদান প্রাণাপহরণ করিয়া আপনাদিগের চিত্ত কলুষিত করে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। অনুমান হয়, পবিত্রচিত্ত ধর্ম্মাত্মার অন্তঃকরণে জগদীশ্বর স্বয়ং অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং সৃষ্ট প্রাণিমাত্রের প্রতি তাঁহার হিংসা দ্বেষ ক্রোধাদি ভাব অপনীত হইয়া সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস জন্মে। দেখ, পথিক কুরঙ্গশাবককে মোচন করিয়া অবধি সেই ভয়াবহ গহনবনকে প্রার্থনীয় পুণ্যতীর্থ বোধ করিয়া স্থানান্তরে রাত্রি যাপনের মানস পরিত্যাগ করিলেন এবং পাথেয় তণ্ডুলের কিয়দংশ হইতে যথাকথঞ্চিৎরূপে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধাশান্তি করত অতীব তৃপ্তি লাভ করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইল। সুধাংশুমণ্ডলনিঃসৃত জ্যোৎস্নারাশি মন্দ মন্দ সমীরণে সঞ্চালিত মহীরুহগণ কর্ত্তৃক সহস্র সহস্র খণ্ডে বিকীর্ণ হইয়া নৃত্যকারী বনদেবতাগণের অলৌকিক অঙ্গ প্রভার ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল, এবং শুষ্কপত্র পতনের মর মর শব্দ, নির্ঝরের ঝর ঝর ধ্বনি ও রাত্রিচর পশুগণের গভীর নিনাদ সমুদায় মিলিত হওয়াতে বোধ হইল যেন জগদ্যন্ত্র বাদ্যের মধুর লয়সঙ্গীত হইতেছে এবং উহারই মোহিনীশক্তি প্রভাবে যাবতীয় জীব একেবারে সুপ্ত-শক্তি হইয়াছে।

পথিক বৃক্ষমূলে পর্ণশয্যায় শয়ন করিয়া পথ-পরিশ্রম বশতঃ শীঘ্রই নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিন্তু দিবাভাগে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছিল তদ্দ্বারা চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তিনি নিদ্রাবস্থায় একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি দেখিলেন মৃগাঙ্কমণ্ডল হইতে জ্যোতির্ম্ময় দেবমূর্ত্তি অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। পরে ক্ষণকাল তাঁহার প্রতি সহাস্যাননে এবং সস্নিগ্ধ নয়নে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন—"রে বৎস! তুমি অদ্য অতি সুকৃত করিয়াছ, অতএব যিনি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সমস্ত জীবকে সমভাবে সুখদুঃখভাজন করিয়া সৃষ্টি করিযাছেন, সেই পরাৎপর পরমাত্মা তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ তুমি অচিরে গজনন্ নগরের অধিপতি হইবে, কিন্তু দেখিও, যেন প্রভুত্বমদে মত্ত হইয়া নিজ নৈসর্গিক দয়া দাক্ষিণ্য বিবর্জিত হইও না, অদ্য পশুযোনির প্রতি যাদৃশ সদয়তা প্রকাশ করিয়াছ, যাবজ্জীবন নরলোকের প্রতিও তাদৃশ ব্যবহার করিও।"

এই বলিয়া দেবমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে পথিকের নিদ্রাভঙ্গ হইল। নেত্রোন্মীলন করিয়া দেখেন নিশা অবসান হয় নাই। গগনমণ্ডলে নক্ষত্রমণ্ডল পরিবেষ্টিত অম্লানকিরণ দ্বিজরাজ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তাদৃশ স্বপ্নদর্শনে পথিক এমত চঞ্চল-মনা হইয়াছিলেন যে, আর নিদ্রাবেশে নেত্র নিমীলিত করিতে পারিলেন না। পর্ণশয্যা হইতে উত্থিত হইয়া করতলে কপোলবিন্যাস পূর্ব্বক হিমাংশুর ব্যোমান্ত অবলম্বন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে নভোমণ্ডল ঈষৎশুক্লাম্বর ধারণ করিল, চন্দ্রমামুখ ম্লান হইল, এবং দূরস্থ গিরিশৃঙ্গ সমুদায় হইতে কুজ্ঝটিকারাশি উত্থিত হইযা দিঙমণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিল। ক্রমে পূর্ব্বদিক কিঞ্চিৎ প্রকাশ হইল—পরে সহস্রাংশুর তীক্ষ্ণ রশ্মি সমুদায় কুজ্ঝটিকাজাল বিদীর্ণ করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ করিল—দূরস্থ মহীধরশৃঙ্গসকল প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিরাশিপ্রায় উদ্দীপ্ত হইযা উঠিল—নীহারমণ্ডিত বৃক্ষগণের পত্র-বিটপাদি বালাতপ-সংযোগে বিচিত্র বর্ণ ধরিল—এবং শিশির-সিক্ত শষ্পশয্যা যেন, রাত্রিবিহারী বনদেবীগণের পরিচ্যুত অঙ্গাভরণ বিভূষিত হইযা তাদৃশ চাক্‌চিক্যশালী হইতে লাগিল—তথা প্রশস্ত পত্র মাত্রেই পবিত্র অম্বুভারে অবনত হইযা সহৃদয় ব্যক্তির ন্যায় সদ্গুণাধার বশত নিজ নিজ নম্রতা স্বীকার করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মন্দ মন্দ মারুতহিল্লোলে অথবা রবিরশ্মি-সংযোগে যে যাহার আপনাপন শোভা—কেহ বা পৃথিবীতে অভিষেক করিল, কেহ বা স্বর্গাভিমুখে প্রেরণ করিল—করিয়া, সকলে শান্তিপ্রদ হরিদ্বর্ণ ধারণ করিয়া রহিল।

পান্থ প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর শুষ্ক পত্রাদি সংযোগে অগ্নি জ্বালনপূর্ব্বক পূর্ব্বদিবসের ন্যায় অন্ন পাক করিযা প্রাতরাশ সম্পন্ন করিলেন। পরে পাথেয় দ্রব্যসামগ্রী সমুদায় স্কন্ধে আরোপণ করিয়া ভূতলে জানু পাতনপূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে সংযত-মনোবৃত্তি হইযা স্বীয় ধর্ম্মের শাসনানুযায়ী পুণ্যধাম মক্কার প্রত্যভিমুখে ঈশ্বরারাধনা করিযা পুনর্ব্বার গমনোদ্যত হইলেন।

অপরিজ্ঞাত কাননপথে একাকী যাইতে যাইতে পূর্ব্বরাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নটি বারম্বার স্মৃতি-পথারূঢ় হইতে লাগিল। স্বপ্নটি তাঁহার চিত্তপটে এমন স্পষ্টরূপে চিত্রিত হইয়াছিল যে, এক এক বার বোধ হইল উহা অবশ্যই সত্য হইবে। আবার ভাবিলেন, আমি এই দেশে নামধামবিহীন আগন্তুক ব্যক্তি, আমি এই দেশের একাধিপতি হইব ইহা স্বপ্নেরই বিষয় হইতে পারে, কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে, স্বপ্ন কেবল বাতিকের ক্রীড়া মাত্র, জাগ্রদবস্থায় যে সকল ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়, মনুষ্য তাহা বুদ্ধিবলে দমন করিয়া মনোবৃত্তি সকলকে আপন আপন উচিত কার্য্যে নিযুক্ত করেন, স্বপ্নাবস্থায় বুদ্ধি নিষ্ক্রিয় হয়, সুতরাং মনোমধ্যে বিবিধ অসঙ্গতভাবের আবির্ভাব হইবে আশ্চর্য্য কি? অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিরা কখনও স্বপ্নে বিশ্বাস করেন না-- বিশেষতঃ একরূপ দুরাশা সঞ্চিত করায় মহৎ হানির সম্ভাবনা, কারণ যদিও ইহা কস্মিন্‌কালে সফল হয়, তাহাতেই বা তাৎকালিক সুখের আধিক্য কি? আর যদি

সফল না হয়, তবে যতকাল বাঁচিব ততকাল লোভরূপ দাবাগ্নিদ্বারা অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে, অপরন্তু, সংকীর্ণ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঈদৃশ দুশ্চিন্তা নিমগ্ন হইলে স্খলিতপদ হইয়া অধঃপতিত অথবা অন্যমনস্কতা বশতঃ বিপথগামী হইতে হয়—অতএব হে জগৎপতে! আমার এই প্রার্থনা, কখন যেন অন্তঃকরণে লোভের ভার এমত না হয় যে, তজ্জন্য অবিনশ্বর ধর্ম্ম পদার্থকে এই নশ্বর জীবন অপেক্ষা লঘু বোধ করি।

শুদ্ধাত্মা পথিক এই সকল চিন্তাদ্বারা উদ্রিক্ত দুরাকাঙ্খা নিরাকরণের চেষ্টা করিতে করিতে চলিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পথিক এইরূপ চিন্তা-মগ্ন হইয়া কুটিলকানন-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ একটি স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কতিপয় ব্যক্তি একত্র উপবেশন করিয়া কেহ বা তাম্রকূটধূম পানে কেহ বা অন্যান্য উপযোগে মনোযোগ করিয়া আছে। পর্যটক মনে মনে বিবেচনা করিলেন, ইহারা যদি শত্রুতা করে, তবে কখনই পলাইয়া রক্ষা পাইব না, আর শত্রুতাই করিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি?- -মিত্রতা করিলেও করিতে পারে। অতএব ইহাদিগের সম্মুখে সাহস করিয়া গিয়া পথ জিজ্ঞাসা করি, অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। এইরূপে সাহসে ভর করিয়া তিনি ঐ বনচরদিগের সম্মুখীন হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "ওহে ভাই সকল। আমি পথিকজন—এই স্থানের পথ জানি না, অনুগ্রহ করিয়া কহিয়া দেও।" এই কথা শ্রবণমাত্র একজন শীঘ্র গাত্রোত্থান করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিকট হাস্য করত কহিল, "ওহে পথিক! ভাল বল দেখি, যদি এইখানেই তোমার গতি শেষ করা যায়, তাহাতে হানি কি?" পর্যটক উত্তর করিলে, "তাহাতে অনেক ক্ষতি আছে কিন্তু সে সকল কথা কহিবার অবকাশ নেই- এক্ষণে পথ বলিয়া দেও উত্তম—নচেৎ চলিলাম।" বনেচর কহিল, "তুই আর কোথা যাবি?—জানিস না, আমরা এই কাননরক্ষক, যে যে এখান দিয়া যায় সকলের স্থানেই আমরা শুল্ক আদায় করি—আমাদিগের অনুমতি ভিন্ন কেহই এখান দিয়া যাইতে পারে না।"পথিক কহিলেন, "ভাই, আমি পণ্যজীবী বণিক্ নহি, কোন ব্যবসায় বাণিজ্য করি না।—আমার স্থানে কি শুল্ক পাইবে?" তস্কর তখন আপন প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কহিল, "ওরে মূর্খ! তুই নিঃসহায়, আমরা আটজন, তোর দুই হস্তের কি এত বল হইবে যে, আমাদিগের আটজনের সহিত একাকী যুদ্ধ করিবি?—যদি ভাল চাহিস্ তবে বাক্ছল পরিত্যাগ কর, সমভিব্যাহারে যে ধনসম্পত্তি বা ভক্ষ্যসামগ্রীসম্ভার আছে সমুদায় আমাদিগকে আনিয়া দে, দিয়া স্বচ্ছন্দে চলিয়া যা, নিবারণ করিব না—আমাদিগের এই ব্যবসায়, কেহ কখন আমাদিগের কথার অন্যথা করিতে পারে না।" "তবে তোমরা চৌর্য্যবৃত্তি?" "আমরা চোর হই বা না হই সে কথায় তোর প্রয়োজন কি?" "এই প্রয়োজন যে, তোমার সাতজন মাত্র সহায়, কিন্তু যদি সাতশত হয় তথাপি জীবনসত্ত্বে আমি আজ্ঞাবহ হইব না।" তস্কর পথিকের সাহসের কথা শুনিয়া আপন সহযোগিগণকে কহিল, "এ বেটা বলে কি রে?—এ যে মরিতে বসেও কার্দ্দানি ছাড়ে না। ভাল, দেখা যাউক, দুই এক ঘা ওসারিয়া দিলেই ইহার বুদ্ধি স্বস্থান প্রাপ্ত হইবে" এই বলিয়া পথিকের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিল— "আইস তোমার পিঠ্‌বোচ্‌কাটি নামাইয়া দি, ছি ছি কুজের মত পিঠে থাকাতে কি কদাকার দেখাইতেছে, এবার সোজা হইয়া রূপখানি দেখাও।" পথিক তস্করের উপহাসে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "রে চোর! আমি প্রাণের ভয় করি না, বিশেষতঃ একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন সুখ পাই নাই এবং কখনও পাইব এমত আশাও করিতেছি না যে জীবনভয়ে কাতর হইয়া তোর শরণ প্রার্থনা করিব – মৃত্যু আমার পক্ষে প্রার্থনীয় —অতএব সাবধান হইয়া আমার গতি রোধ কর।" এই বলিয়া পথিক এক বৃহৎ বনতরুকে আশ্রয়

করিয়া নিষ্কোষ কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। চোরেরা ঈদৃশ সাহস এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে চমৎকৃত হইল। পরে একজন দুরাত্মা দূর হইতে সন্ধান করিয়া পথিকের অপসব্য (দক্ষিণ) হস্তে শর নিক্ষেপ করিল। পথিক তৎক্ষণাৎ শরকে উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু শরধারে বাহুর শিরা ছিন্ন হইয়াছিল, অতএব যুদ্ধ করিবেন কি, ভুজোত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না। চোরেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিরস্ত্র করিল, এবং তাহার পৃষ্ঠস্থিত থলিয়া মোচন করিয়া ফেলিল।

লুব্ধেরা পথিকের সমুদায় সম্ভার বাহির করিয়া দেখে তাহাতে এমন কিছু নাই যে, গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হয়। কিন্তু পথিক সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর জন্যই প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন, ইহা ভাবিয়া কেহ পরিহাস করিতে লাগিল এবং কেহ অদ্ভুত ব্যাপার মানিয়া তূষ্ণীম্ভূত হইয়া রহিল। অনন্তর তস্করপতি নিজ অনুচরদিগকে আদেশ করিয়া কহিলেন, "দেখ ইহার সঙ্গে এক কপর্দ্দকও নাই, কিন্তু ইহার শরীর বিলক্ষণ সবল এবং পরিশ্রমক্ষম, এমন দাস পাইলে অনেকে ক্রয় করিবে, অতএব চল উহাকে সঙ্গে করিয়া লই, যে কয়েক দিবস হাতের ঘা-টা আরাম না হয়, আমাদিগের সঙ্গেই থাকুক, পরে কোন গ্রামে লইয়া বিক্রয় করিলেই হইবে।" এইরূপ কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ হইলে চোরেরা পথিকের হস্তযুগল তাঁহার নিজ উষ্ণীষ বস্ত্র দ্বারা বন্ধন করত তাঁহাকে আপনাদিগের মধ্যবর্ত্তী করিয়া লইল।

অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই পথিক তাহাদিগের কর্ত্তৃক কতিপয় কুটীর সম্মুখে নীত হইলেন। ঐ সকল কুটীর তস্করদিগের নির্ম্মিত এবং তাহাদিগের পরিজনের আবাস। চোরেরা সেই স্থানে পথিকের নিমিত্ত একটি নূতন কুটীর প্রস্তুত করিয়া দিল। পান্থ বনেচরদিগের সমভিব্যাহারে তিনি দিবস যাপন করিলেন। তাঁহার বাহুর ক্ষত প্রায় শুষ্ক হইয়াছিল, আর দুই চারি দিবসে সম্পূর্ণ সুস্থ হইবার সম্ভাবনা, এমন সময়ে তস্করেরা একত্র হইয়া তাহাকে সম্মুখীন করিল, এবং তাহাদের অধিপতিদ্বারা কহিতে লাগিল, 'শুন পথিক! আমরা তোমার দেহ শক্তি এবং সাহস দর্শনে পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, আমরা চোর বটি, কিন্তু যথার্থগুণের পুরস্কারে পরাঙ্মুখ নহি, তোমার পাথেয় দেখিয়া নিতান্ত দুরবস্থা বুঝিয়াছি, অতএব আমরা তোমাকে সমভিব্যাহারি করিতে স্বীকার করিলাম, দেখ আমাদিগের কন্যা কলত্রাদি আছে এবং আমরা বনেচর বলিয়া নিতান্ত ক্লেশে কালযাপন করি না—ইচ্ছা হয় ত আমাদিগের সহিত মিলন কর, নচেৎ পূর্ব্বে যে অভিসন্ধি করিয়াছি অবশ্য তাহাই করিব।" পথিক ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, "তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, আমি কোনক্রমেই অসৎবৃত্তি অবলম্বন করিব না—বরং তোমাদিগকে অগ্রে সাবধান করিতেছি যে, আমাকে কোন রহস্যানুসন্ধান জ্ঞাত করিও না, করিলে, প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা জানিবে।" তস্করপতি কহিলেন "আমরা সে ভয় করি না। সাহসী বীরগণ কখন বিশ্বাসহন্তা হতে পারে না, বিশ্বাসঘাতকতা নীচপ্রকৃতি ভীরুগণেরই ধর্ম্ম।" পথিক কহিলেন, "তোমরা সে আশা পরিত্যাগ কর, চোর ও দস্যু প্রভৃতি যে সকল দুরাত্মা মনুষ্যমাত্রেরই অপকারক, তাহাদিগকে ব্যাঘ্রভল্লুকাদির ন্যায় উচ্ছেদ করা সকল ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম— না করিলে, ধার্ম্মিকগণের অনুপকার করা হয়।" চৌরপতি পথিকের ভর্ৎসনা বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "আর তোর সাধুতা প্রকাশ করিতে হইবে না, আমি বুঝিলাম, তুই না ধার্ম্মিক জনের, না সাহসী পুরুষদিগের সংসর্গী হইবার যোগ্য — অতএব তুই যাদৃশ নীচপ্রকৃতি অচিরাৎ তদুপযুক্ত দাসবৃত্তি প্রাপ্ত হইবি।" পথিক উত্তর করিলেন "নিরস্ত্র এবং আহত ব্যক্তিকে অধার্ম্মিক ভীরুজনেরাই অপমান করে তাহাতে মনুষ্যত্ব নাই।" চৌরপতি ঈষৎ লজ্জাযুক্ত হইয়া গাত্রোত্থান করত কহিলেন, "ভাল ভাল, এত বাকবিতণ্ডার প্রয়োজন নাই তুমি আমার অনুচর হইতে অস্বীকার করিলে অতএব চল তোমার শরীর বিক্রয় করিয়া আমাদিগের এতাবৎ পরিশ্রম সফল করি।' এই বলিয়া তস্করেরা পথিককে সমভিব্যাহারে করিয়া চলিল এবং বন উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে একখানি

ক্ষুদ্র গ্রাম প্রাপ্ত হইল। সেই গ্রামের হট্টে একজন দাসক্রেতা পথিককে ক্রয় করিয়া লইল। চোরেরা মূল্য পাইয়া চলিয়া গেল। পথিক মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, আমার স্বপ্ন বিলক্ষণই সফল হইল। আমি কি নির্ব্বোধ যে, এমন দুরাশাকে মনোমধ্যে স্থান দান করিয়াছিলাম। কোথায় রাজ্যেশ্বর হইব, না দাস হইলাম। বিধাতা কপালে আরও কি লিখিয়াছেন, বলা যায় না, কিন্তু যাহা হউক এমত কোন কর্ম্ম করা হইবে না, যাহাতে শেষে অনুতাপ বা অপযশের ভাজন হইতে হয়।

দাস-ক্রেতা পথিকের অঙ্গস্পর্শ করিয়া এবং বীরলক্ষণাক্রান্ত শরীর দেখিয়া তাহাকে অত্যন্ত পরিশ্রমসহিষ্ণু বুঝিয়াছিলেন। অতএব আপন আলয়ে আনিয়া বিশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক ভেষজসেবন করাইয়া তাহার হস্তের ক্ষতদোষ সংশোধন করাইলেন। কিন্তু তিনি লোভপরবশ হইয়া ঐ দাসটির প্রতি যেরূপ অধিক মূল্য নিরূপিত করিলেন, তাহাতে কেহই ক্রয় করিতে চাহিল না। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে দাস-বিক্রেতা মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই দাসটির জন্য অনেক ব্যয়ব্যসন করিলাম, কিন্তু কেহই ইহাকে ক্রয় করিতে চাহে না—কি করি?—অথবা উহার যাদৃশ শ্রী দেখিতে পাই, তাহাতে উহাকে সদ্বংশজাত বলিয়া বোধ হয়, অতএব উহাকেই জিজ্ঞাসা করি যদি আমাকে অর্থদ্বারা তুষ্ট করিতে পারে, তবে দাসত্বন্ধন হইতে মোচন করিয়া দিব। এই ভাবিতে ভাবিতে দাসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন রে! তুই স্বাধীন হইতে চাহিস্ কি না?" "মহাশয়! এ কথা কি জিজ্ঞাস্য? পিপাসাতুর কি জল পান করিতে পরাঙ্মুখ হয়?" "ভাল, তবে তুই আমাকে তুষ্ট করিবি কি না?" "কি প্রকারে তুষ্ট করিব, অনুমতি করুন।" "অর্থদ্বারা।" দাস দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া উত্তর করিল, "স্বাধীনতা প্রাণিমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থদ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি—তাদৃশ অধার্ম্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে।" এই বলিতে বলিতে দাসের চক্ষুর্দ্বয় ক্রোধে লোহিতবর্ণ এবং শরীর কম্পমান হইতে লাগিল। দাস-বণিক্ ভয়ে সঙ্কুচিতচিত্তে এবং ম্লানবদন হইয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন। সেই অবধি তাহার চেষ্টা হইল, যাহাতে দাসকে অন্যহস্তে সমর্পণ করিয়া আপনি নিষ্কৃতি পায়।

কিয়দ্দিনান্তর সৌভাগ্যক্রমে খোরাসান-প্রদেশাধিপতি অতি বদান্য এবং ক্ষমতাবান্ আলেপ্তাগীন্ ঐ দাসকে ক্রয় করিয়া আপন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

দাস কিছুকাল মহীপালের আশ্রয়ে বাস করিতে করিতে প্রভুকে স্বীয় গুণে বদ্ধ করিল। রাজা তাহার ধর্ম্ম-পরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামিবাৎসল্য দেখিয়া পরম তুষ্ট হইয়া তাহাকে সর্ব্বদা আপন সমীপে রাখিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহার পদোন্নতি করিয়া দিলেন। একদিন দুইজনে একত্র বসিয়া আছেন এমন সময় রাজা নিজ দাসের পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলে দাস কহিতে লাগিল।—

"মহারাজ! আমার পূর্ব্ববৃত্তান্ত অতি সংক্ষেপ। আমি দাস হইয়াছি বটে, কিন্তু কখন এমত কোন কর্ম্ম করি নাই যাহাতে বংশের কলঙ্ক হয়। যখন মুসলমানেরা 'কালিফ্ ওথ্মানের' আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করে, তখন পারস্য-ভূপাল 'ইসদগর্দ' তাহাদিগের পরাক্রম-অসহিষ্ণু হইয়া তুর্কস্থানে পলায়ন করেন। আমি সেই রাজার বংশজাত। তাঁহার সন্তানেরা তদ্দেশের আচার-ব্যবহার অবলম্বন করিয়া তুর্কীয় জাতি হইয়া গেলেন। আমিও সেইরূপে তুর্কী হইয়াছি।—আমার পিতা নির্ধন ছিলেন, সুতরাং বাল্যকালাবধি আমাকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায় অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল। তজ্জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম এবং ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু তাহাতে আমার বপু সবল এবং মন উৎসাহশীল ও

পরিশ্রমানুরক্ত হইল। অতএব আমি দরিদ্রাবস্থাকে ক্ষেমঙ্কর বলিয়া মানি।—পিতা নির্ধন ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞানযোগ ছিল। তিনি প্রাচীন ইতিহাসাদি গ্রন্থ অনেক জানিতেন, কিন্তু তত্তাবৎ পাঠ করাইবার অনবকাশ বশতঃ সমুদায় বিদ্যার সার পদার্থ যে ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাই অহরহ শিক্ষা করাইতেন। অতএব তাঁহার অনুগ্রহ বশাৎ আমি বালককালাবধি ইন্দ্রিয়দমন করিতে এবং জগৎপিতার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইতে অভ্যাস করিয়াছিলাম। শৈশবাবধি আমার অন্তকরণে এই ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, আমার দ্বারা পরিবারের ক্লেশমোচন হইবে। সেই আশা অবলম্বন করিয়া ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃকালে পিত্রালয় পরিত্যাগ করি। ইচ্ছা ছিল, কোন রাজসংসারে যোদ্ধৃকর্ম্ম স্বীকার করিব। পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক পরাভূত এবং দাস্যে নিযুক্ত হওয়াতে সেই বর্দ্ধমান আশালতা একেবারে ছিন্নমূলা হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়া অবধি তাহা পুনর্ব্বার অঙ্কুরিত, সম্বর্দ্ধিত এবং ফলিত হইয়াছে।

আলেপ্তাগীন্ এই বৃত্তান্ত শ্রবণে তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দাসত্ব মোচন করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে উন্নত-পদ করিয়া পরিশেষে তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রিত্বে এবং সর্ব্ব-সৈন্যাধ্যক্ষতায় নিযুক্ত করিলেন। দাস তাদৃশ উচ্চপদারূঢ় হইয়া ব্যবহারের কিছুমাত্র অন্যথা করিলেন না। তাঁহার শান্তস্বভাব ও বিচক্ষণতায় সেনাপুঞ্জ বিলক্ষণ ভক্তিমান ও সুশিক্ষাসম্পন্ন হইল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্যপ্রভাবে রাজার সকল শত্রু ক্ষীণবল হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল, এবং রাজ্যও নিরুপদ্রবে পালিত হওয়াতে প্রজাবৃন্দের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই এই অমাত্যের পিতা লৌকিকী লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন, অতএব আত্মজের ঈদৃশ বিভব দেখিতে পান নাই। কিন্তু জননী তৎকাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন, অতএব তিনি পুত্র সন্নিধানে আনীত হইয়া তাঁহার তাদৃশ গৌরব দর্শনে ও গুণকীর্ত্তন শ্রবণে চক্ষুকর্ণের চরিতার্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। কি চমৎকার! যে ব্যক্তি সহায়সম্পত্তিবিহীন হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করত সিংহভল্লুকের সহবাসী হইয়াছিল, যে নানা সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া পরিশেষে জীবন্মৃত্যুস্বরূপ দাসত্বদশাগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিই এক্ষণে পৃথ্বীপতির সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র নরগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া তাহাদিগের আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে লাগিল। পরমেশ্বরের কি অপার মহিমা! সাংসারিক বিভাগের অস্থায়িত্ব এবং ধর্ম্মপদার্থের অবিনশ্বরত্বের প্রমাণ দর্শাইতেছেন। ফলতঃ প্রধান মন্ত্রী এক্ষণে পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং বাল্যাবস্থায় নানাপ্রকার দুঃখ পাইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরম সুখ অধিকতর প্রীতিজনক বোধ হইতে লাগিল।

আলেপ্তাগীন্ রাজার একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যার যাদৃশ লাবণ্যমাধুরী তাহার গুণও তাদৃশ ছিল। অতএব দেশীয় এবং বৈদেশিক আঢ্য কুলীন সন্তানগণ তাহার পাণিগ্রহণাভিলাষে আসিয়া নিরন্তর উপাসনা করিত। কিন্তু রাজকন্যা উপাসনার বশ ছিলেন না। তিনি ক্রমে ক্রমে সকল বিবাহার্থীকেই বিদায় করিয়া অনূঢ়াবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। রাজার অন্য অপত্য ছিল না। কেবল সেই একমাত্র কন্যা। সুতরাং কন্যা বিবাহে সম্মতা হইয়া উপযুক্ত বরপাত্র গ্রহণ করেন, এমন একান্ত বাসনা থাকিলেও কন্যার অনভিমতে তাহার বিবাহ সম্পন্ন করণে ইচ্ছা করিতেন না।

প্রধানমন্ত্রীকে সর্ব্বদাই রাজবাটীর অভ্যন্তরে গমন করিতে হইত। সেই সকল সময়ে রাজকন্যার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন হইত। এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের উভয়েরই মানসে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল এবং দিন দিন উভয়েই উভয়ের গুণ পরিচিত হইয়া পরস্পর অধিকতর নৈকট্য বাসনা করিতে লাগিলেন। আন্তরিক ভাবমাত্রই নয়ন দ্বারা বিলক্ষণ প্রকাশমান হয়। বিশেষত প্রকৃত অনুরাগের অঙ্কুরোদয় হইলে প্রণয়িযুগলের প্রীতি প্রফুল্ল নেত্র এমত রমণীয়, সস্নেহ, সতৃষ্ণ দৃষ্টি ধারণ করে যে, দেখিবামাত্রই পরস্পরের মন বিকশিত হইয়া উঠে এবং কথা না কহিলেও তাদৃশ নয়নদ্বারাই মনোগত সমুদায় ভাব ব্যক্ত

হইয়া যায়। একদিন প্রধানমন্ত্রী রাজনন্দিনীর সহিত কথোপকথন কালে তাঁহার ঐরূপ দৃষ্টি নিরীক্ষণ করিয়া আপন মানস ব্যক্ত করণের সাহস প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কি বলিলেন, এবং গুণবতী জেহীরা কি উত্তর করিলেন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাবে শুদ্ধাত্মা মানবের চিত্ত যে কত প্রকার রমণীয় গুণধারণ করে তাহা কে বলিতে পারে? তখন শরীরের জড়তা অপগত হয়, অন্তঃকরণের অসাধুতা দূরীভূত হয়, জিহ্বাগ্রে সরস্বতী নৃত্য করেন, এবং সর্ব্বতোভাবে আত্মবিস্মৃতি উপস্থিত হওয়াতে অন্তরিন্দ্রিয়গণ পরোক্ষ দৃষ্টির প্রথম সোপান অবলম্বন করে। আহা! জগদীশ্বর যে প্রীতি-পদার্থকে পরমসুখের প্রধান বর্ত্ম করিয়া দিয়াছেন, অজিতেন্দ্রিয় মানবগণ নিরঙ্কুশ রিপুগণ কর্ত্তৃক সেই বর্ত্ম দ্বারাই কি বিষম বিপাকে পতিত হইতেছে। প্রধানমন্ত্রী আপন মনোগতভাব প্রকাশ করিলে পর সরলহৃদয়া রাজপুত্রীও সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। পরে কিঞ্চিৎকালান্তরে কহিলেন, "আমি তোমার সহিত মিলিত-জীবন হইয়া যাবজ্জীবন তোমার সুখ-দুঃখ ভাগিনী হইতে অসম্মতা নহি, কিন্তু অগ্রে পিতার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক, স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীই প্রধান গুরু, কিন্তু যে কামিনী অনূঢাবস্থায় পিতার অসম্মান করে, সে যে গৃহিণী হইয়া স্বামীর বশীভূতা হইবে এমত সম্ভাবনা অতি বিরল।" প্রধানমন্ত্রী বলিলেন, "আমি এইক্ষণে রাজ-সন্নিধানে চলিলাম, তাঁহাকে আমাদিগের মানস ব্যক্ত করিয়া বলিব। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন বটে, তথাপি আভিজাত্যাভিমান মানবগণের অন্তঃকরণে অতি প্রবল বলিয়া শঙ্কা হয়।"

সেই দিনই রাজা এবং রাজমন্ত্রী উভয়ের ঐ বিষয়ে কথোপকথন হইল। মন্ত্রী স্বীয় মনোগত ব্যক্ত করিলে ভূপাল কিছুমাত্র বিরূপ না হইয়া উত্তর করিলেন, "দেখ, জেহীরা আমার একমাত্র সন্তান---এই জীবন-বৃক্ষের একমাত্র পুষ্প, যাহার দ্বারা আমার সংসারকানন আমোদিত এবং অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হইয়া আছে। অতএব আমার একান্ত বাসনা যে, তাঁহাকে এমন পাত্রসাৎ করি, যাহাতে চিরকাল সুখভাগিনী হইয়া থাকে। অনেক রাজপুত্র এবং কুলীনসন্তান বিবাহার্থী হইয়া তাহার উপাসনা করিয়াছেন, সে কাহাকেও বরমালা প্রদানে সম্মতা হয় নাই---আমিও এই বিষয় তাহার অনভিমত করিতে চাহি না। অতএব তুমি অগ্রে তাহার মত কর তাহা হইলেই আমার সম্মতি পাইবে।" মন্ত্রিবর উত্তর করিলেন, "মহারাজ! আমি আপনকার কন্যার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে স্বামিত্বে বরণ করিতে সম্মতা আছে, কেবল আপনকার অনুমতির অপেক্ষা, এক্ষেত্রে আপনকার অনুকূলতার প্রতি আমার যাবজ্জীবনের সুখদুঃখ নির্ভর করিতেছে।" রাজা শুনিয়া হৃষ্টচিত্তে উত্তর করিলেন, "যদি তুমি জেহীরার সম্মতিলাভ করিয়া থাক, তবে আর আমার কোন প্রতিবন্ধকতা নাই, আমি এই দণ্ডেই অনুমতি দিতেছি, যে পরম পুরুষ মনুজগণের মধ্যে উদ্বাহসংস্কার সংস্থাপন করিয়াছেন তিনি এই কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাবহ করুন,---যাহা হউক, এই আমার পরম পরিতোষ যে, জেহীরা অনুপযুক্ত পাত্রে প্রীতি সমর্পণ করে নাই।"

অনন্তর কতিপয় দিবস মধ্যেই ভূপাল মহা সমারোহ পুরঃসর স্বীয় প্রিয়পাত্রের সহিত আত্মজার উদ্বাহসংস্কার সম্পন্ন করিলেন। অজ্ঞাতকুলশীল জনের সহিত কন্যার পরিণয় সম্বন্ধ করাতে দেশীয় কুলীনবর্গ মৎসর ভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু মন্ত্রীর গুণগ্রামে বশীভূত প্রজাসাধারণ অত্যন্ত প্রফুল্লমনে আনন্দ মহোৎসব করিতে লাগিল।

কিয়দ্দিবস পরে আলেপ্তাগীন্ গজনন্ নগরে রাজধানী সংস্থাপন করিয়া পঞ্চদশ বর্ষকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিলেন। তাঁহার পরলোক হইলে পুত্রপৌত্রাদি কেহ না থাকাতে ঐ জামাতাই রাজ্যাধিকারী হইয়া নিজ স্বপ্ন সফল বোধ করত সবক্তাগীন নামে বিখ্যাত হইলেন। ইঁহারই পুত্র গজনবী মহম্মদ, যৎকর্ত্তৃক এই ভারতভূমি সর্ব্ব প্রথমে আক্রান্ত এবং মুসলমানাধিকার সম্ভূত হয়।

মধুমতী

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কয় বৎসর পূর্ব্বে স্টীমারে ঢাকা হইতে কলিকাতায় যাতায়াত করিতে, মহম্মদপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রামের নীচে, মধুমতী নাম্নী তরঙ্গময়ী নদীপার হইতে হইতে তাহার নামান্তর "এলেন খালি।"

একদা নিদাঘের প্রচণ্ড ঝটিকাবসানে রাত্রিশেষে মধুমতীর উপকূলে সেই গ্রামে একখানি শিবিকা থামিল। ডাকের বেহারারা প্রথামত, শিবিকা রাখিয়া, বখ্‌শিষ লইয়া, পলায়ন করিল। ভিতর হইতে অতি সুন্দর পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় এক যুবাপুরুষ নির্গত হইয়া, ইতস্ততঃ অন্য বাহকদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া কিঞ্চিৎ দূরে গেলেন, এবং নিকটস্থ একখানি ভগ্ন কুটীরের দ্বারে আঘাত করিলেন। কুটীর বাসী জিজ্ঞাসা করিল, "কে দ্বার ঠেলে?" যুবক উত্তর করিলেন, "আমি পথিক, এই গ্রামে একদল ডাকের বেহারা থাকিবার কথা ছিল, তাহারা কোথায় বলিতে পার?" কুটীর বাসী কহিল, "তাহারা রাত দশটা পর্য্যন্ত এইখানে ছিল, কিন্তু ঝড় আসাতে চলিয়া গিয়াছে।" যুবক নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। রজনী দ্বিতীয় প্রহর, অনন্ত নীলাকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, এবং বিশাল তরঙ্গিণী মধুমতী হৃদয়ে ঝিকমিক করিয়া তৎপ্রতিবিম্ব নাচিতেছে। সুশীতল নৈদাঘ বায়ু মন্দ২ বহিতেছিল। পৃথিবী স্থির, সুশীতল, পশু, পক্ষী, গ্রামবাসী, সকলেই নীরব, কেবল কোথাও মনুষ্য পদশব্দে উত্তেজিত কুক্কুরের রব, আর কখন২ অতিদূরনিঃসৃত গ্রাম্য প্রহরীদিগের চীৎকারধ্বনি শুনা যাইতে ছিল। যুবক স্বভাবের সৌন্দর্য্য অবলোকনে অন্যমনা হইয়া মধুমতীর তটে পদ চারণ করিতে ছিলেন,—হঠাৎ চমৎকৃত হইয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন তাঁহার সম্মুখে জলের অনতিদূরে একটি শ্বেত পদার্থ। পদার্থটি মৃত মনুষ্য দেহ। তাহার অনতিদূরে দুই একখানি ভগ্ন কাষ্ঠ ও একখানি নৌকার হাল। বুঝিলেন, যে নিশারম্ভে যে প্রবল ঝটিকা হইয়াছিল, তৎ কর্ত্তৃক কোন নৌকা জলমগ্ন হইয়াছিল এবং এই হতভাগ্য ব্যক্তি তাহার একজন আরোহী।

যুবক রাজধানী সন্নিকটবর্ত্তী—লাগ্রামের একজন সৌষ্ঠবান্বিত ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী কায়স্থের পুত্র, তাঁহার নাম করালীপ্রসন্ন। তিনি বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হওনান্তর, মেডিকেলকলেজে চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। এবং তথায় যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া, গৌরবের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ব্ব বাঙ্গলায় এক প্রধান চিকিৎসকের পদে অভিষিক্ত হন। অদ্য ডাক যোগে কর্ম্মস্থানে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে এই আড্ডায় বাহক না পাওয়াতে, এই অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

করালীপ্রসন্ন ভাবিলেন, যদি এই ব্যক্তি এই রাত্রের ঝড়ে জলমগ্ন হইয়া থাকে তবে এখনও চেষ্টা করিলে, ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করা যাইতে পারে।

কবালীপ্রসন্ন মৃতদেহের নিকট যাইয়া, বিশেষ করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এবং দেখিলেন যে দ্বাবিংশতি বৎসব বয়স্কা পরমা সুন্দরীব দেহ। দেহ যেন পৃথিবীব বিপু বর্জ্জিত হইযা, স্বর্গীয় কান্তি ধারণ করিযাছে। এবং চন্দ্রালোকে বোধ হইল, যেন মৃত বমণীব ওষ্ঠে অপূর্ব্ব হাসি শোভা পাইতেছে। কবালীপ্রসন্ন অনেকক্ষণ অবধি অনন্যমনে শব নিবীক্ষণ কবিতে লাগিলেন। কবালী অনেক সুন্দরী দেখিযাছিলেন, কিন্তু তাঁহাব বোধ হইল, যেন, এমত সুন্দবী কখন তাঁহাব নয়ন গোচব হয নাই। কবালী নিঃসঙ্কোচে মৃত বমণীব দেহ স্পর্শ কবিলেন, এবং তাঁহার হস্ত পদাদি চালনা ও অন্যান্য কৌশলেব দ্বাবা দেহ হইতে জল নির্গত কবাইলেন, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক ফোঁটা জল পড়িল, ততক্ষণ চেষ্টাব ত্রুটী করিলেন না। তৎপবে মৃত দেহ ভূমিতে বাখিযা শিবিকা হইতে কোন দ্রব পদার্থ ও একখান ফ্লানেল লইযা গেলেন। এবং ঐ বস্ত্রদ্বাবা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মৃত বমণীব হস্তপদাদি ঘর্ষণ কবিতে লাগিলেন। তৎপবে দ্রব পদার্থ তাহাব ওষ্ঠ ভেদ কবিযা ঢালিলেন, কিন্তু পদার্থ তৎক্ষণাৎ দুই কর্শদিযা পড়িযাগেল, গলাধঃকরণ হইল না। ইত্যবসবে, কবালী মৃতদেহ কর্দ্দম হইতে পবিষ্কাব কবিযা ঘাসেব উপব বাখিলেন।

কবালী দুই তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু কোন মতেই কামিনীকে পুনর্জ্জীবিত কবিতে পাবিলেন না। শেষে হতাশ্বাস হইযা, শিবিকায প্রত্যাগমন কবিলেন এবং দ্বাব বন্ধ কবিযা নিদ্রা যাইবার চেষ্টা কবিলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না।

সেই নদী সৈকত শাযী অপূর্ব্ব মহিমাবিশিষ্ট মৃত বমণীব মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল। কবালী অন্যদিকে মন ফিবাইতে যত্ন কবিলেন, কিন্তু সফল হইলেন না।

তিনি শিবিকাব দ্বাবোদ্ঘাটন কবিলেন এবং সহসা তাঁহাব বোধ হইল যেন নিদাঘের গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় নৈশ সমীকবণ সেবনার্থ, কোন ব্যক্তি চন্দ্রালোকে মধুমতীতীরে শযন কবিযা আছে। সেই হতভাগিনী সুন্দরী। যাহাকে প্রাসাদোপবি সুকুমাব পুষ্পশয্যায আদরে শযন করাইয়া, যত্নে ব্যজন কবিযা, মধুর সঙ্গীতে নিদ্রিত করিযা, সৌন্দর্য্যমুগ্ধ স্বামীব আকাঙ্ক্ষা পবিতৃপ্ত হইত না, এখন সে নদী সৈকতে, কর্দ্দমশয্যায পড়িযা আছে। কবালী অল্প বযস্ক, মৃত সুন্দরীব জন্য তাঁহাব চক্ষে এক ফোঁটা জল পড়িল। কবালী অন্যমনস্ক হইবাব জন্য শিবিকাব ভিতবে আলো জ্বালিয়া, একখান পুস্তক পড়িতে চেষ্টা কবিলেন, অবশেষে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। আলো নির্ব্বাণ কবিযা শযন কবিলেন, কিন্তু, নিদ্রা কষ্টজনক হইল। কবালী নিদ্রায স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সেই মৃত কামিনী শ্মশান শয্যা ত্যাগ কবিযা, শিবিকাব দ্বাবোদ্ঘাটন পূর্ব্বক, তাঁহাব সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রেম পবিপূবিত লোচনে তাঁহাব প্রতি চাহিযা কি বলিতেছে। কবালী চমকিযা উঠিলেন, এবং শিবিকাব দ্বাব খোলা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। মধুমতীব তটে যেস্থলে মৃতদেহ বাখিযাছিলেন, সেইদিকে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ কবিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য! সেস্থলে শব নাই। চকিতেব ন্যায চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কোথাও কিছু দেখিতে পাইলেন না। যামিনী প্রায অবসন্না হইযাছে। চন্দ্র অস্তগত প্রায। পূর্ব্বদিক ঈষৎ পবিষ্কাব হইযাছে। বিহঙ্গমকুল কল কল বব কবিযা দিগ্দিগন্তে যাইতেছে। আব নদী মধুমতী ঊষাব খবতব সমীবণে চঞ্চলা হইযা কল কল বব কবিতেছে। কবালী ইতস্ততঃ দেখিতে২ মধুমতীব কূলেব দিকে চলিলেন কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কবালী একবাব মনে ভাবিলেন শৃগাল কুক্কুবে আহাব নিমিত্ত কোন বনে শব লইযা গিযাছে। এই স্থিব কবিযা শিবিকায প্রত্যাবর্ত্তন কবিলেন। শিবিকাব নিকট আসিযা তাঁহাব আব পা উঠিল না, শবীব বোমাঞ্চ হইল, বুদ্ধি লোপ হইল। মৃত বমণীদেহ নদীকূলশয্যা ত্যাগ কবিযা, কবালীব শিবিকা পার্শ্বে শযন কবিযা আছে।

করালী প্রসন্ন অনেকক্ষণ প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। একি কেহ শব তুলিয়া এখানে ফেলিয়া গেল? না পৈশাচ ধর্ম্ম প্রমাণীকৃত করিয়া শব এখানে আপনি আসিয়াছে?

স্থির বুদ্ধির নিকট কোন ভ্রম থাকে না। করালী শবের প্রকোষ্ঠে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া দেখিলেন জীবনস্রোতঃ বহিতেছে। নিঃশ্বাসাদি পরীক্ষা করিলেন, দেখিলেন, এ শব নহে, সুন্দরী জীবিতা। কিন্তু নিদ্রিতা অথবা মূর্চ্ছিতা। করালী এখন বুঝিলেন, যে, যুবতী তাঁহার চিকিৎসা প্রভাবে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া শিবিকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। এবং তাঁহারই দ্বারা শিবিকার দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছিল। পরে তিনি ক্লান্ত হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া থাকিবেন।

করালী ধীরে ধীরে যুবতীকে শিবিকার ভিতর শোয়াইলেন। গ্রামবাসী অনেককে পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়া, অতি ত্বরায় একখানি সৈয়দ পুরে পান্‌সী ভাড়া করিলেন, বাহক আনাইয়া, পালকী সহিত যুবতীকে নৌকায় তুলিলেন, এবং একটি কামরায় আপনি স্বয়ং শয্যা রচনা করিয়া, অতিযত্নে রমণীকে উহাতে স্থাপিত করিয়া, অনেক কৌশলে মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। দিনমণির উদয় হইল, পৃথিবী জ্যোতির্ম্ময়ী হইল, সঙ্গে২ করালীপ্রসন্নের হৃদয় জ্যোতির্ম্ময় হইল। যে রমণীর মৃতদেহ দেখিয়া অশ্রুপাত করিয়াছিলেন এক্ষণে সেই রমণী তাঁহারই যত্নে পুনর্জ্জীবিতা হইয়া, চক্ষুরুন্মীলন করিল। করালীর বোধ ছিল যে যুবতী অপরিচিত স্থানে অপরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া ভয় পাইবেন, কিন্তু তাহার কিছু চিহ্ন দেখিলেন না। যুবতী চৈতন্য পাইয়া কিছু খাইতে চাহিলেন। করালী তাঁহার পাথেয় খাদ্যদ্রব্য হইতে খাইতে দিলেন। রমণী আহার করিয়া নিদ্রাভিভূতা হইলেন, ইত্যবসরে করালী ইতি কর্ত্তব্যতা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। যুবতী যে সধবা নহে, তাহা তিনি তাহার অলঙ্কারবিহীন হস্ত দেখিয়া স্থির করিয়াছিলেন। যুবতী কে, কাহার কন্যা, কোথায় নিবাস, কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে বাটী পাঠাইবেন, আর কি প্রকারে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবেন এই সকল ভাবিতেছিলেন। এমত সময়ে রমণীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। করালী জিজ্ঞাসা করিলে, "এখন কেমন আছ" যুবতী কোন উত্তর না দিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং আপনার অঞ্চল লইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। ক্রমে অস্ফুট স্বরে গীতোদ্যম করিতে লাগিল। অব্যক্তনাদী কলবিহঙ্গমবৎ কণ্ঠ ধ্বনিত হইল কিন্তু অর্থযুক্ত কোন বাক্য নির্গত হইল না— যেন গীত মনে পড়িল না। করালী দেখিলেন, মুখের ভাব অজ্ঞান বালিকার ন্যায়। দৃষ্টির স্থিরতা নাই। অঙ্গস্খলিত বসন সাবধান করিবার ইচ্ছা নাই। সর্ব্বনাশ! একি পাগল! করালী পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কাহার কন্যা?" রমণী বিনা বাক্যে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল। "তোমার নাম কি?" তথাপি কোন উত্তর পাইলেন না। তৎপরে কিছুখাদ্য সামগ্রী লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "খাবে?" রমণী বালিকার ন্যায় হাস্য করিয়া খাদ্য লইয়া আহার করিল। করালী মাথায় হাতদিয়া বসিলেন, একটা উন্মাদিনী তাঁহার স্কন্ধে পড়িল।

রমণীর পূর্ব্ব স্মৃতি লোপ হইয়াছে সুতরাং তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু তিনি কি প্রকারে অপরিচিতা, বুদ্ধিহীনা স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া বেড়ান। এই সকল চিন্তায় তিনিও ক্ষিপ্তের ন্যায় হইলেন। করালী বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞ। সহসা কোন বিষয়ের মীমাংসা করিতে ক্ষমবান ছিলেন। তিনি এক্ষণে স্থির করিলেন, যে যুবতী বুদ্ধিহীনা হউক বা বুদ্ধিমতী হউক, যখন তাহার আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান পাওয়া যাইতেছে না, তখন তাহাকে আশ্রয় দেওয়ায় কোন দোষ নাই, বরং কর্ত্তব্য কার্য্য। অতএব যুবতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার মানসে, নিকটস্থ গ্রাম হইতে একটি দাসী আনাইয়া তাহার পরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিলেন। করালী পুনর্জ্জীবিতা রমণীর নাম করণ করিলেন। মধুমতী নদী তীরে তাহাকে কুড়াইয়া পাইয়াছেন, অতএব তাহার নাম দিলেন "মধুমতী।"

করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, কর্ম্মস্থানে গেলেন, এবং অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন। মধুমতীও যেমন বালিকা মাতার অনুরক্তা হয়, সেইরূপ করালীর অনুরক্তা হইলেন। যতক্ষণ তিনি বাসায় থাকিতেন ততক্ষণ মধুমতী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িতেন না। হয় তাঁহার কেতাব পত্র লইয়া, নতুবা অন্য কোন দ্রব্য লইয়া, তাঁহার সম্মুখে বসিয়া ক্রীড়া করিতেন।

এই প্রকার তিনমাস গেল। ক্রমে মধুমতীর মুখের ভাবান্তর হইতে লাগিল। যখন করালীকে দেখিতে পাইতেন, তখন বালিকা মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইয়া মুখমণ্ডলে যৌবনোপযোগী ভাব সঞ্চার হইতে থাকিত।

এইরূপে তাহার বুদ্ধি স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। যেমন বালিকাদিগের দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে, বর্ষে, স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে সেপ্রকারে নহে। যেমন শুষ্ক পল্লব রাশি মধ্যে অগ্নি রাখিয়া ফুৎকার দিলে অগ্নি একবারে প্রজ্জ্বলিত হয়, এ সেই প্রকার। অন্যান্য স্ত্রীলোক দিগের বুদ্ধির ন্যায় বুদ্ধি মধুমতী পুনঃপ্রাপ্তা হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পূর্ব্বস্মৃতি ফিরিয়া পাইলেন না। তিনি জলমগ্ন হইবার পূর্ব্বে কে ছিলেন তাহা আর মনে পড়িল না।

করালী একদিন পাঠাভ্যাস করাইতে২ তাঁহাকে জলমগ্ন বৃত্তান্ত সমুদয় অবগত করাইলেন এবং অনুরোধ করিলেন, জলমগ্নের পূর্ব্বাবস্থা স্মরণ কর, কিন্তু মধুমতীর কিছুই স্মরণ হইল না, বরং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, যেন কিছুই স্মরণ না হয়। যেন কিছুই স্মরণ না হয়। আর কেহ কি উন্মাদিনীর মত জগদীশ্বরের নিকট পূর্ব্বস্মৃতি লোপের প্রার্থনা করে? শত সহস্র লোক। যাহাদের পূর্ব্বকৃতাপরাধ ব্যাঘ্রোর বংশাবলীর ন্যায় শোণিতাক্ত কুণ্ডলদাম দোলাইয়া সর্ব্বদাই স্মৃতিপথে বিচরণ করে, তাহারাই স্মৃতিলোপের কামনা করে। কিন্তু মধুমতী লুপ্তস্মৃতির চিরলোপের কামনা করে কেন? করালী অনুসন্ধান করিলেন। দেখিলেন মধুমতী এখন সুখী---পাছে পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া এ আনন্দের বিঘ্ন করে এই আশঙ্কা। যেমন দর্পণে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিয়া লোকে আপন মুখ দেখে, তেমনি করালী, মধুমতীর হৃদয়ে আপন হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেখিলেন। দেখিলেন, উভয়েই প্রেমবিমুগ্ধ।

পুত্তলের প্রতি বালিকার প্রেমের ন্যায়, মধুমতীর প্রেম।—

এক দণ্ডের জন্য করালীকে না দেখিতে পাইলে, মধুমতী পাগলের ন্যায় হইত। করালী প্রসন্ন চিকিৎসা অনুরোধে দুই এক ঘণ্টা অনুপস্থিত থাকিতেন। কিন্তু মধুমতী এ সময় টুকু অসীম যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিতেন। মধুমতী পা ছড়াইয়া বসিয়া, অবোধ বালিকার ন্যায় রোদন করিতেন, এবং মধ্যে২ চমকিয়া উঠিতেন, যেন করালী প্রসন্নের জুতার শব্দ, অথবা দরওয়াজায় গাড়ী থামার শব্দ পাইতেন। অমনি চীৎকার করিয়া পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বামা বাবু এলেন বুঝি?" কিন্তু যখন বামার উত্তরে বুঝিতেন, যে তাঁহার ভ্রম মাত্র, তখন আবার পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিতেন।

করালীপ্রসন্ন পঞ্চবিংশতী বর্ষীয় যুবা পুরুষ, মধুমতীর ন্যায় ভুবন মোহিনী রূপসীর সহবাসে যে মন হারাইবেন, তাহার বিচিত্র কি? অষ্টে পৃষ্ঠে মধুমতীর প্রণয়পাশে জড়িত হইয়া অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলেন। মধুমতী স্ত্রীরত্ন, কেমন করে অধিকার করিবেন, অনুদিন তাহাই চিন্তা করিতেন। মধুমতী বিবাহিতা কি অবিবাহিতা সে বিষয় সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেন। মধুমতী বিধবা হইলে তাঁহার বিবাহের কোন আপত্তি ছিল না, কেননা তিনি ব্রাহ্ম, কিন্তু মধুমতী যে সধবা নন, সে বিষয়ে তাঁহার এক প্রকার সংশয় দূর হইয়াছিল, কেননা যখন মধুমতীকে মৃতাবস্থায় দেখিতে পান, তখন হস্তে একখানিও গহনা ছিল না। হইতে পারে দস্যু কর্ত্তৃক তাহা অপহৃত হইয়া থাকিবে। কিন্তু মধুমতীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তাঁহার মন এতই চঞ্চল হইয়াছিল, যে সে সংশয় মনে আসিল না। করালীপ্রসন্ন মধুমতীকে বিবাহ করাই স্থির করিলেন।

একদিন কবালীপ্রসন্ন মধুমতীকে পাঠাভ্যাস করাইতে২ কহিলেন, ''মধুমতি—'' মধুমতী তাহাব প্রতি চাহিযা বহিল। মুখে কথা ফুটিল না। কোন কোন সময়ে কবালীব সম্মুখে মধুমতীর কথা ফুটিত। যখন করালী প্রসন্ন প্রদীপ অথবা দ্বাবেব দিকে পশ্চাৎ কবিযা মধুমতীব সম্মুখে বসিতেন। তখন কথা ফুটিত। মধুমতী অমনি ব্যস্ত হইযা বলিতেন ''এই দিকে বস'' কেন না করালীর মুখ অন্ধকাব হওযাতে তিনি ভাল কবিযা দেখিতে পাইতেন না। এইদিকে বসিলে মুখ অন্ধকাব ঘুচিয়া আলোক মষ হইবে এবং মধুমতী তৃপ্তি পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। এদিন কবালীপ্রসন্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন, ''মধুমতি, তুমি সধবা না বিধবা'' তাহা কিছু তোমাব মনে পড়ে?

এবার মধুমতী কথা কহিল। বলিল, ''বিযেব কথা কিছু মনে পড়ে না। বোধ হয বিধবা।''

ক। ''আমাব তাই বোধ হয, কেননা, তোমায যখন নদীব তীবে পাইযাছিলাম, তখন তোমাব অঙ্গে কোন অলঙ্কাব ছিল না।

ম। ''তবে আমি বিধবা।'' কবালীব মুখ প্রফুল্ল হইল। পুনবপি বলিলেন, ''বিধবাব বিবাহ হয জান?''

ম। ''তোমাবই মুখে শুনিযাছি।''

ক। ''তুমি আবাব বিবাহ কবিবে?''

ম। ''কবিব না কেন।''

ক। ''কাকে বিযে করবে?''

ম। ''তুমি যাকে বল।''

ক। ''আমাকে?''

মধুমতী তখন লজ্জায মুখ নত করিয়া, মৃদু২ স্বরে কহিল, ''কবিব'' কবালী আব কখন মধুমতীকে লজ্জিত দেখেন নাই।

কবালী উঠিযা গেলেন। মধুমতী ক্ষিপ্তাব ন্যায হাসিতে ও কাঁদিতে আবম্ভ কবিল। সে কেবল আনন্দে।

বিবাহেব দিন স্থিব হইল। শুভক্ষণে, অশুভক্ষণে, তাঁহাদের বিবাহ হইল। কবালী বিদায লইযা, মধুমতীব সহিত স্বদেশে যাত্রা কবিলেন।

''আব কত দিনে আমবা সেই স্থানে পৌঁছিব'' মধুমতী একদিন নৌকাতে কবালীপ্রসন্নকে জিজ্ঞাসা কবিলেন। কবালী কহিলেন ''কোন স্থানে? যে স্থানে তোমায কুড়াইযা পাইযাছি? সে ঐস্থান।'' মধুমতী একবাব সেই স্থান নিকটস্থ হইযা দেখিতে চাহিলেন। প্রভুব আজ্ঞায মাঝিবা নৌকা অমনি কূলেব দিকে ফিবাইল। মধুমতী খড খড়ি খুলিযা দেখিতে লাগিলেন এবং ইচ্ছা কবিলেন সে রাত্রে সেখানে থাকেন। সুতবাং নৌকাও তীবলগ্ন হইল। বজনী দ্বিতীয প্রহব। মধুমতী সুখে কবালীপ্রসন্নেব ক্রোড়ে নিদ্রা যাইতে ছিলেন, আব করালীপ্রসন্নেব হাস্যময মুখ নিদ্রায স্বপ্নে দেখিতে ছিলেন। কিন্তু সে সুখেব স্বপ্ন ভাঙ্গিল। মধুমতীব নিদ্রাভঙ্গ হইল। কবালীও জাগিলেন। দেখিলেন যে ভীষণ তরঙ্গাভিঘাতে নৌকা দুলিতেছে। কবালী খড় খড়ি খুলিযা বাহিবে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কবিলেন, কিন্তু শিহবিযা উঠিযা অতি ব্যস্ত হইয়া মধুমতীকে হৃদযে টানিযা লইলেন। মধুমতী কবালীব ভযেব কাবণ কিছুই বুঝিতে পাবিলেন না। কিন্তু তিনি যে স্বামীব হৃদযে মাথা বাখিতে পাইলেন সেই অসীম সুখেতে কাঁদিতে লাগিলেন। কবালী বাহিরে দৃষ্টি নিঃক্ষেপ কবিয়া দেখিলেন যে অতিভীষণ অন্ধকারে দিঙমণ্ডল আচ্ছন্ন কবিযাছে প্রলয কালেব ন্যায বৃষ্টি, মুহুর্মুহুঃ অশনি নিপাত এবং অতি প্রচণ্ড ঝড় সকলে একত্রিত হইযা পৃথিবী রসাতলে দিতেছে। কিন্তু কবালীপ্রসন্ন বিদ্যুতালোকে দেখিলেন

যে এই ভীষণ সময়ে উন্মথিতা নদীর বিজন উপকূলে ঝড় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া এক দীর্ঘাকার পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। করালী কৌতূহলী হইয়া জনেক সচতুর মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন--- "ও কে দাঁড়াইয়া--- জান?"

মাঝি কিছুতে দেখিতে পাইল না। পুনরায় বিদ্যুৎ হানিলে দেখিতে পাইল এবং চমকিয়া উঠিল।

করালী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওকে চেন?"

মাঝি। ওকে আবার চিনি না---এ অঞ্চলে মাঝি মাল্লা যে এখানে ঝড় বৃষ্টিতে নৌকা লাগাইয়াছিল, সেই চিনিয়াছে।"

ক। "ও কে?"

মাঝি। কে তা কেউ জানে না, ও ভূত কি চোর তা কেউ জানে না, কিন্তু আজ মাস দুই তিন হইল রাত্রে ঝড় বৃষ্টির সময়ে এই নদী তীরে সকলেই দেখিতে পায়---

ক। তুমি কখনও দেখিয়াছিলে?

মা। মাঝিমাল্লার মধ্যে কে না দেখেছে? আমরা কলিকাতা হইতে আসিবার সময় একদিন ঝড় বৃষ্টির রাত্রে এইখানে নৌকা রাখিয়াছিলাম। আর ওকে ঐ স্থানে দেখিয়াছিলাম।

করালী অতিশয় কৌতূহলী হইয়া কূলের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বিদ্যুৎ হানিলে দেখিলেন যে দীর্ঘাকার পুরুষ অদৃশ্য হইয়াছে, পরে মাঝিকে বিদায় দিয়া নীরব হইয়া রহিলেন।

করালীপ্রসন্ন মধুমতীর সহিত স্বদেশে পৌঁছিলেন। পিতা মাতা মঙ্গলাচরণ করিয়া পুত্র পুত্রবধূ ঘরে লইলেন এবং মধুমতীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। মধুমতী এবং করালীপ্রসন্নের সুখের সীমা রহিল না। একদণ্ডের জন্য বিচ্ছেদ নাই, করালী দিবারাত্র ঘরে থাকিতেন, এবং মধুমতী অনিমিক লোচনে তাঁহার প্রতি চাহিয়া থাকিতেন। কখন যদি এক দণ্ডের জন্য বিচ্ছেদ হইত তবে মধুমতী বালিকার ন্যায় কাঁদিতেন। মধুমতীর এইপ্রকার ব্যবহারে পুরবাসী ও প্রতিবাসিগণ সকলেই বিরক্ত হইতেন।

অকস্মাৎ এই অনন্ত সুখের সাগর শুষ্ক হইল। যে দিনে বিধাতার লিখনানুসারে এক অশনিতে দুই জনের হৃদয় ভগ্ন হইবে সেই দিন প্রভাত হইতে চলিল। সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা আমরা কি প্রকারে বর্ণনা করিব? তাহার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা সম্ভব নহে।

করলীপ্রসন্ন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দুই চারি দিবসের জন্য কলিকাতায় গেলেন। নির্ব্বোধ মধুমতী অশান্তের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার সমবয়স্কা ননদিনী শ্যামাসুন্দরী অনেক বুঝাইলেন। মধুমতী শ্যামার কিছু অনুরক্তা ছিলেন, করালীর গমনের পর রাত্রে শ্যামাসুন্দরী তাহার শান্তনার নিমিত্ত একত্রে শয়ন করিলেন। মধুমতী ও শ্যামাসুন্দরী উভয়ের নিদ্রা আসিল না। শ্যামাসুন্দরীর গ্রীষ্মযন্ত্রণায়, মধুমতীর বিচ্ছেদ যন্ত্রণায়। শ্যামাসুন্দরীর প্রস্তাবানুসারে উভয়ে শয়নগৃহ ত্যাগ করিয়া পশ্চিমের এক বারেণ্ডায় বসিলেন। বারেণ্ডা অতি নিম্ন এমন কি বালকেরাও ভূমি হইতে সহজে তদুপরি উঠিতে পারে।

সম্মুখে ভাগীরথী, পশ্চাতে অতি বিস্তীর্ণ এক প্রান্তর। রজনী দ্বিতীয় প্রহর। পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রমা নিঃশব্দে আকাশে ভাসিতেছে, নৈশ সমীরণ অতি মন্দ২ হিল্লোলে জাহ্নবীহৃদয় চঞ্চল করিতেছে। মধুমতী ও তাহার ননদিনী দুরন্ত গ্রীষ্ম যন্ত্রণায় বারেণ্ডায় বসিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। "বউ তোর কি আগেকার কথা কিছু মনে পড়ে না?" মধুমতী উত্তর করিলেন "কিছুই না।" পরে উভয়ে নানাবিধ কথোপকথন হইতে লাগিল। অকস্মাৎ মধুমতী সশব্দে চিঁড়ে উঠিয়া বসিলেন। চন্দ্রিকা বিধৌত জাহ্নবীর উপকূল

হইতে সুকণ্ঠ নিঃসৃত সঙ্গীত ধ্বনি হইল। সঙ্গীত নৈশ সমীরণে আহরণ করিয়া জাহ্নবীর হৃদয়ে বিচরণ করিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ অমন করিয়া বসিলি যে?" মধুমতী উত্তর করিল, "ঠাকুরঝি, পূর্ব্বকার কথা আমার কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু এই গান শুনিয়া আমার একটী কথা মনে পড়িতেছে। আমি যেন একটি গান জানিতাম।"

শ্যামা। গান ত সকলেই জানে— সে আর মনে পড়িবার কথা কি?

গায়ক অতি পরিস্ফুট স্বরে আকাশ বিদীর্ণ করিয়া, গায়িতে লাগিল। মধুমতী বড় চঞ্চলা হইল—বলিল, "শুধু একটি গান জানিতাম তাহা নহে—একটি গান বড় ভাল বাসিতাম, সর্ব্বদাই শুনিতাম মনে হইতেছে। বুঝি সে এই সুর। এ সুরে আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। দেখ দেখি কথা বুঝা যায় কি না?" উভয়ে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক শুনিতে লাগিলেন। গীতের একটি পদ স্পষ্ট বুঝা গেল—

"আদর তরঙ্গ বহে, রূপের সাগরে—"

বিদ্যুতাগ্নিবৎ এই কথা মধুমতীর হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল। সেই পূর্ব্বশ্রুত গীত বটে। যেমন সভা মণ্ডপে পরিচারক একটি প্রদীপ লইয়া সহস্র দ্বীপ জ্বালিত করে, এই গীতে মধুমতীর সেই রূপ হইবার উপক্রম হইল। "আদর তরঙ্গ"—আদর—আদরিণী নামটি মনে পড়িল। কাহার নাম আদরিণী? তাহাও মনে পড়িল। মধুমতী মনশ্চক্ষে দেখিতে লাগিলেন—এক ক্ষুদ্র স্বচ্ছ পুষ্করিণী—চারি পাশে কদলী, দাড়িম্ব, আম্র (আম গাছ), তন্মধ্যে অনতি বৃহৎ বাসগৃহ। তন্মধ্যে আদরিণী—আদরিণী আর এক জন—এক দাড়িম্ব তলায় উভয়ে পরস্পর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া—মধুমতী তখন দুই হস্তে মুখাবরণ করিয়া চীৎকার করিল। শ্যামা দেখিলেন, তাঁহার কলেবর স্বেদাক্ত, কম্পবিশিষ্ট, এবং মূর্চ্ছার পূর্ব্বলক্ষণ বিশিষ্ট। মধুমতী চক্ষু বুজিয়া তাহার ননদিনী শ্যামাসুন্দরীর হস্ত দৃঢমুষ্টিতে ধরিলেন। শ্যামাসুন্দরী মধুমতীকে পীড়িত বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে বউ"। কিন্তু উত্তর নাই। মধুমতী মূর্চ্ছা যান নাই, অজ্ঞান হন নাই, চীৎকার করেন নাই, অথবা কাঁদেন নাই, কেবল মাত্র স্তম্ভিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া শ্যামাসুন্দরীর হস্ত ধারণ করিয়া রহিলেন। কিন্তু মূর্চ্ছার লক্ষণ বুঝিয়া তাঁহার ননদিনী তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া শয়ন গৃহে যাইয়া তাঁহাকে পর্য্যঙ্কে শয়ন করাইলেন। মধুমতী কলের পুত্তলির ন্যায় শুইলেন। শ্যামাসুন্দরী ও মধুমতী এক শয্যায় শয়ন করিলেন। যামিনী প্রভাত হইল। গবাক্ষ নিকটস্থ বৃক্ষে একটি পাপিয়ার ধ্বনিতে শ্যামার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নিদ্রা ভঙ্গ মাত্র মধুমতীর প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন, কিন্তু শিহরিয়া উঠিলেন। গত রাত্রে শ্যামা মধুমতীকে স্বর্ণপ্রতিমার ন্যায় দেখিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রাতে মধুমতীকে অঙ্গার খণ্ডের ন্যায় দেখিলেন। ছয় ঘণ্টার মধ্যে কি ভীষণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে! এ পরিবর্ত্তন কি শারীরিক পীড়ায় অথবা কোন মানসিক পীড়ায়? সরলা শ্যামাসুন্দরী শারীরিক পীড়া অনুভব করিলেন। এবং তদনুসারে কার্য্য করিয়া মধুমতীকে আরো পীড়িত করিতে লাগিলেন।

———

করালীপ্রসন্নের বৃহৎ পুরী নিঃশব্দ, জন মানব দেখা যায় না। কেবল মাত্র বড় দালানে চড়ুই পক্ষীর শব্দ শুনা যাইতেছে আর অন্তঃপুর মধ্যে এক কক্ষে শয্যাশায়ী একটি শীর্ণ দেহ স্ত্রীলোকের ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনা যাইতেছে। মধুমতী শয্যাশায়ী, কী পীড়ায় শয্যাশায়ী তাহা কোন চিকিৎসক নির্ণয় করিতে পারে নাই। করালীপ্রসন্ন অদ্যাপি বাটী প্রত্যাগমন করেন নাই, তজ্জন্য মধুমতীর পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাকুলতা নাই। মধুমতী বাহ্যিক ও মানসিক ক্ষমতা রহিত হইয়া মৃতবৎ শয্যায় মিশিয়া আছেন।

সন্ধ্যা হইল, পশ্চিম গগনে ঘোর মেঘাডম্বর হইল, রাত্র এক প্রহর, অতি নিবিড় অন্ধকারে পৃথিবী আবৃতা হইল। ক্রমে বৃষ্টির সহিত প্রচণ্ড ঝড় উঠিল। মধুমতী সেই জনহীন বৃহৎ

অট্টালিকার এক কক্ষে শয়ন করিয়া আছেন। শয্যাপার্শ্বে একটি আলোক জ্বলিতেছিল। নিঃশব্দ, কেবল বাহিরে ঝড় বৃষ্টির হু হু শব্দ ও তৎ কর্ত্তৃক কপাট জানেলার ঝন ঝনা শব্দ হইতেছিল। আলো কিছু মিট২ করিতেছিল। এমত সময়ে অকস্মাৎ, চিত্রপটে চিত্রমূর্ত্তিবৎ, মধুমতী মুক্ত দ্বারপথে এক মনুষ্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া, সেই বহুকাল বিস্মৃত মূর্ত্তি চিনিয়া মধুমতী উঠিয়া বসিলেন। মনুষ্য আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিল।

উভয়ে বহুক্ষণ নীরবে পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুরুষের চক্ষে অশ্রু বহিল। তিনি বলিলেন,

"তুমি এখানে কেন, আদরিণি?"

মধুমতী, অথবা আদরিণী কহিল, "নহিলে কোথায় যাইব? মধুমতীর তীরে যখন মরিয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমাকে কে বাঁচাইয়াছিল? যিনি বাঁচাইয়াছিলেন, তিনি আশ্রয় দিয়াছেন।"

লুপ্ত স্মৃতির পুনঃপ্রাপ্তির সঙ্গে২ মধুমতী বুদ্ধিও পুনঃপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন। আগত ব্যক্তি কহিল, "ভালই করিয়াছেন – আমি তাঁহার ঋণী হইয়াছি। কিন্তু তুমি এতদিন দেশে আসিয়াছ— একবার আমার সন্ধান কর নাই কেন? তুমি কি প্রকারে আমাকে ভুলিয়াছিলে?"

মধুমতী কহিল "কি প্রকারে ভুলিয়াছিলাম, তাহা শুনিলে তুমি বিশ্বাস করিবে না— তবে বলিয়া কি হইবে?"

উত্তরে তিনি কহিলেন, "তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই বিশ্বাস করিব—অথবা তাহা শুনিতেও চাই না। আমি যে তোমাকে আবার দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতেই আমি সুখী। এখন আমার সঙ্গে গৃহে চল।" যিনি বলিতেছিলেন, আহ্লাদে তাঁহার শরীর তর২ করিতে ছিল - কণ্ঠ গদগদ।

তখন মধুমতী, মুখ নত করিয়া, কম্পিত কলেবরে, অস্ফুটস্বরে কহিল, "গৃহে যাইব? আমার আর গৃহ নাই। তোমার সঙ্গে আর আমার সম্বন্ধ নাই। এ জীবন আর আমার নহে। যিনি ইহা রক্ষা করিয়াছেন, এক্ষণে ইহা তাঁহারই। তোমার আমার ইহাতে কোন অধিকার নাই।" শুনিয়া, আগন্তুকের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। প্রথমে তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না—পরে মধুমতীর বিস্ময়জনক কথার মর্ম্মানুধাবন করিয়া, স্বেদাক্ত কলেবরে, মস্তক ধারণ করিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আদরিণি, আমি যে তোমার স্বামী?"

আদরিণী কহিল "ছিলে, কিন্তু তোমার স্ত্রী মধুমতীর জলে ডুবিয়া মরিয়াছে।"

তখন মধুমতীর পূর্ব্বস্বামী, কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে, মধুমতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন,—বলিলেন, "আমি কখনই এ কথা বিশ্বাস করি না— আমার আদরিণী যে আমাকে এরূপ কথা বলিবে, ইহা বিশ্বাস করি না—তুমি আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছ। আমার এত যত্নের কি এই ফল? যে দিন তুমি জলমগ্না হইয়াছিল, সেই দিন হইতে আমি শ্মশানবাসী। সেই দিন হইতে, নদীর তীরে তীরে, শ্মশানে শ্মশানে, কাদায় কাদায়, উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছি। উন্মত্তের ন্যায় কি? আমি ত পাগলই হইয়াছিলাম—ঘাটে২ মাঝি মাল্লারা "গোপাল—পাগল" বলিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে দেখাইত। আমার শরীর দেখ, আদরিণি,—তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ, ইহাই আশ্চর্য্য—এমন দীন দরিদ্র কে আছে, কার শরীর অস্থি চর্ম্মাবশিষ্ট, শুষ্ক, মলিন—কার বস্ত্র এমন শতধা ছিন্ন —কার কেশ এমন রুক্ষ"

তিনি আর বলিতে পারিলেন না - রোদন করিতে লাগিলেন। কেহ আসিতেছে, পায়ের শব্দ হইল। গোপাল বলিলেন "কে আসিতেছে এ বাড়ীতে আমি চোর—সুতরাং আমি এখন চলিলাম- কাল আসিব।"

মধুমতী কহিল, "আসিও—কিন্তু কালি না। এ গৃহেব স্বামী গৃহে আসিলে আসিও। আব এখানে আসিও না। সন্ধ্যাব পর, ঐ গঙ্গাতীবে আসিও। সেই খানে আমাব সাক্ষাৎ পাইবে।"

গোপাল চলিযা গেল। যে টি ভয়ঙ্কব কথা আদবিণী যে তাঁহাকে বিসর্জ্জন দিয়া অন্যাকে বিবাহ কবিয়াছে—সে কথা গোপাল এখনও শুনে নাই। যাহা শুনিযাছিল, তাহাতেই তাহাব হৃদয ভগ্ন হইযাছিল।

পবদিন সন্ধ্যাব সময কবালীপ্রসন্ন কলিকাতা হইতে বাটী প্রত্যাগমন কবিলেন। মধুমতী তাঁহাকে দেখিযা পূর্ব্বেব ন্যায হাসামুখে নিকটে ছুটিযা গেলেন না। কেবল মাত্র ঈষৎ চঞ্চল হইলেন, যেমন চন্দ্রোদয়ে সাগব চঞ্চল হয, সেইরূপ চঞ্চল হইলেন।

কবালীপ্রসন্ন মধুমতীকে শীর্ণ দেখিযা অতি ব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইযাছে? কেন এত শীর্ণ হইযাছ?" মধুমতী উত্তর করিল না। কবালী পুনঃ২ জিজ্ঞাসা কবাতে কহিলেন "কিছু হয নাই," কবালী তথাচ কহিল, "কেন অমন হইয়াছ, আমাকে বলিবে না?" মধুমতী নীবব হইয়া রহিলেন, করালী অতি কাতব স্ববে কহিল, "যাহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য না দেখিলে কাঁদিতে তাহাব নিকট পীড়া গোপন কবিতেছ।" মধুমতী কোন উত্তব দিলেন না। কবালী ব্যথিত হইযা বসিয়া পড়িলেন। মধুমতী কবালীব মুখপ্রতি চাহিলেন, এবং দেখিলেন যে, তাহাব মুখমণ্ডল বক্তিমাবর্ণ হইযাছে, এবং চক্ষু ছলছল কবিতেছে। মধুমতী তথাপি কিছু বলিলেন না। কবালী অনেকক্ষণ অবধি সেইখানে বসিযা মধুমতীব প্রতি চাহিয়া বহিলেন এবং অনেক অনুনয় বিনয় দ্বাবা তাহাব প্রতি ভাবান্তরেব কাবণ জানিতে চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। কিন্তু মধুমতী ভ্রূক্ষেপও কবিলেন না। কবালী ব্যথিত ও দুঃখিত হইযা আপন শয্যা গৃহে যাইযা উপাধানে মুখ লুকাইযা বহিলেন। বোধ হয কাঁদিতে লাগিলেন।

বাত্র প্রায দুই প্রহব একটা হইযাছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হওযাতে অতি গাঢ় অন্ধকাব হইযাছিল। পৃথিবী নিঃশব্দ, করালীপ্রসন্নব বৃহৎ অট্টালিকাও নিঃশব্দ, কিন্তু এত গভীব বাত্রে করালীপ্রসন্ন দূবনিঃসৃত মনুষ্য পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কবালী কিছু বিস্মিত হইলেন, পদশব্দ ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। কবালী একবাব ভাবিলেন চোব আসিযাছে। আবাব ভাবিলেন যে, তাঁহার ভ্রম মাত্র, কিন্তু পদশব্দ এত স্পষ্ট শুনা যাইতে লাগিল যে, কবালী তাঁহাব ভ্রম মনে কবিযা নিশ্চিন্ত থাকিতে পাবিলেন না—ত্বরায় দ্বাবোদঘাটন পূর্ব্বক বাহিবে চতুর্দ্দিক অন্বেষণ কবিলেন। কিন্তু কিছু দেখিতে পাইলেন না। নিশ্চেষ্ট হইযা গৃহে প্রত্যাগমন কবিলেন। কিন্তু দ্বাব বন্ধ করিবামাত্র আবাব পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। স্থিব হইযা গৃহমধ্যদেশে দাঁড়াইযা শুনিতে লাগিলেন, হঠাৎ শব্দ থামিল, এবং তৎপবক্ষণেই গবাক্ষপথে শ্মশ্রুবিশিষ্ট এক বৃহৎ মনুষ্যমস্তক দেখিতে পাইলেন। অতি দ্রুত দ্বাবোদঘাটন পূর্ব্বক বাহিবে গেলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। করালীপ্রসন্নেব দুই মহল অন্তঃপুর উভয মহল আলো লইযা তন্ন তন্ন কবিযা অনুসন্ধান কবিযা শযন কক্ষে ফিবিযা আসিতেছিলেন। পথি মধ্যে অন্ধকাবে, বোধ হইল, এক জন স্ত্রীলোক দাঁড়াইযা আছে। জিজ্ঞাসা কবিলেন "কে ও?" স্ত্রীলোক কহিল "আমি"। কবালী স্ববে চিনিলেন মধুমতী। পুনবপি জিজ্ঞাসা কবিলেন, "এখানে কেন?"

মধুমতী কহিলেন, "কাহাকে খুঁজিতেছ?" কবালী কহিলেন, "জানলায এক বিকৃতাকাব মনুষ্য দেখিযাছি—তাহাকেই।" মধুমতী কহিলেন, "আমি তাহাকে চিনি—ঘবে চল বলিতেছি।"

মধুমতী কবালীব পশ্চাৎ২ তাঁহাব শয্যাগৃহে আসিলেন। তথায়, করালী পালঙ্কেব উপব চবণ লম্বিত কবিযা বসিলেন। মধুমতী তাঁহাব চবণ তলে বসিযা, তাহাব চবণ গ্রহণ কবিযা নীবব হইযা বহিলেন। কবালী বিস্মিত হইলেন বলিলেন "কে সে?" দেখিলেন, মধুমতী কাঁদিতেছে।

মধুমতী বলিলেন, "তুমি আমার জীবন দান করিযাছ—আমি তোমার নিকট যে ঋণে ঋণী মনুষ্যে তাহা শোধ করিতে পারে না। তাহার শোধ দূরে থাকে, আমি তাহার পরিবর্ত্তে গুরুতর অপরাধ করিযাছি- -তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা—যে জীবন তুমি রক্ষা করিযাছিলে তাহা আবার নষ্ট কর--চিকিৎসা শাস্ত্রে কি তাহার উপায় নাই?"

করালী অবাক হইলেন,- বলিলেন, "এ সকল কথা কেন? কে সে ব্যক্তি?"

মধুমতী শুষ্ক কণ্ঠে, রোদনোন্মুখবৎ নিঃশ্বাসে পূর্ব্ব স্মৃতি পুনরুদয়ের কথা বলিলেন। চিকিৎসাশাস্ত্রে পটু করালী সে বৃত্তান্ত বুঝিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন। তার পর মধুমতী বলিতে লাগিলেন, "তখন আমার সকল স্মরণ হইল। তখন মনে পড়িল, যে আমি যে তোমার নিকট বলিযাছিলাম, আমি বিধবা, সে মিথ্যা কথা। আমি সধবা। আমি লালগোপাল দত্তের স্ত্রী। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন। এখন যাঁহাকে দেখিযাছিলে, তিনিই আমার সেই পূর্ব্ব স্বামী।"

এই বলিযা মধুমতী কিযৎকাল স্তম্ভিত হইযা রহিলেন। করালীও নীরব হইযা রহিলেন। মধুমতী পুনর্ব্বপি বলিতে লাগিলেন, "যে গীত শুনিযা আমার সব মনে পড়িল তাহা তিনি অহরহঃ গাইতেন। আমি তাহা অহরহঃ শুনিতে ভালবাসিতাম—সে গীত আমার হাড়ে২ অঙ্কিত ছিল। পরদিন তিনি আসিযা সাক্ষাৎ করিযাছিলেন।"

এই বলিয়া মধুমতী নিরস্ত হইলেন। করালী কিছু বলিলেন না। অনেকক্ষণ নীরবে বসিযা বসিযা উঠিযা গেলেন। পৃথক শযন গৃহে গিযা দ্বার বদ্ধ করিলেন। করালীও দ্বার রুদ্ধ করিযা শযন করিলেন।

পর দিন উভয উভয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। ইচ্ছাপূর্ব্বকই সাক্ষাৎ করিলেন না। বিশেষ করালী অত্যন্ত ধর্ম্মভীত, তিনি বুঝিযাছিলেন, যে অন্য স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহার সহিত আদরিণীর বিবাহ ধর্ম্মতঃ নহে। এবং আদরিণী তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নহে। সে স্থানে তাঁহার সহিত সহবাস ঘোর পাপাচার। এদিকে মধুমতীর সহবাস পরিত্যাগ অপেক্ষা প্রাণ পরিত্যাগ সহজ। তিনি কর্তব্য-বিমূঢ় হইযা সমস্ত দিন দ্বার বদ্ধ করিযা কাঁদিতে লাগিলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অতীত হইযা চারি পাঁচ দণ্ড রাত্রি হইল। প্রথম রাত্রে জ্যোৎস্না। গোপাল অবধারিত সময গঙ্গাতীরে আসিযা দাঁড়াইল। কূলে কাহাকে দেখিতে পাইল না—কিন্তু দেখিল যে, বক্ষঃ পরিমিত জলে দাঁড়াইযা একজন স্ত্রীলোক গাত্র ধৌত করিতেছে। গোপাল চিনিল যে সেই আদরিণী। বলিল, "আমি আসিযাছি।"

আদরিণী বলিল, "আর একটু দাঁড়াও -আমার এখনও বিলম্ব আছে। দাঁড়াইযাই বা কি করিবে, আমার নিকটে এই জলে আইস, একবার আমরা অগাধ জলেও ডুবি নাই। এই বুক জলে ভয় কি? আমার যাহা বলিবার তাহা এই গঙ্গা জলে দাঁড়াইযা তোমাকে বলি।"

গোপাল জলে নামিযা আদরিণীর নিকটে গিযা দাঁড়াইল। আদরিণী বলিল, "আমি যাহা বলিব, বোধ হয তুমি তাহা বিশ্বাস করিবে না। তুমি বিশ্বাস কর বা না কর আমি সত্য কথা বলিব।"

এই বলিযা মধুমতী পূর্ব্ব ঘটনা সকল সেই জ্যোৎস্না প্রদীপ্ত গঙ্গাতরঙ্গ মধ্যে দাঁড়াইযা, সেই বিজন স্তব্ধ মধ্যে মৃদু গম্ভীর স্বরে আদ্যোপান্ত বিবরিত করিল। করালীর সহিত বিবাহের কথা বলিল। গোপাল মুমূর্ষবৎ সকল শুনিল। আদরিণীর কথা সমাপ্ত হইলে গোপাল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিযা বলিল।

"আমার যাহা কপালে ছিল তাহা ঘটিয়াছে। কিন্তু তুমি এত শত বিবাহ করিলেও আমার অত্যজা। তুমি আমার গৃহে চল। আমরা এ দেশ ত্যাগ করিয়া, দেশান্তরে গিয়া এ কলঙ্ক লুকাইব। কেহ জানিবে না —আমরা আবার সুখে দিন যাপন করিব।"

গোপালের অবিচলিত স্নেহ দেখিয়া, এবং আপনার পূর্ব্ব প্রণয় স্মরণ করিয়া আদরিণী গঙ্গাস্রোতের উপর দর বিগলিত অশ্রুধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন, আর দুইপদ অগ্রসর হইয়া, গলদেশ পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, মধুমতী অতি কাতর স্বরে বলিতে লাগিলেন,

"আমি এখন তোমাকে প্রতারণা করিব না—আমি তোমার গৃহে যাইব কি প্রকারে? আমি পরের। আমার প্রাণ পর্য্যন্ত পরের। আমি মহা পাপিষ্ঠা—আমি তোমার স্নেহ ভুলিয়া গিয়াছি। আমার সকল ভালবাসা নূতন স্বামীর প্রতি। আমি তোমার গৃহে যাইব না।"

এই বলিয়া আদরিণী আর একপদ জলে অগ্রসর হইলেন। জল চিবুক পর্য্যন্ত হইল। তখন মূর্খ গোপাল, আদরিণীর দূরভিসন্ধি সহসা বুঝিতে পারিয়া, ক্ষিপ্তের মত চীৎকার করিয়া নদীর তট প্রতিধ্বনিত করিতে লাগল,—ডাকিল, "আদরিণি--প্রাণাধিকে।—ওকি—রক্ষা কর এ সর্ব্বনাশ করিও না।" এই বলিয়া আদরিণীর উভয় হস্ত ধারণ করিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিল।

আদরিণী, অতি ধীরে অতি মৃদুস্বরে অধরপ্রান্তে বিশ্বমোহিনী হাসি হাসিয়া, বলিল, "আমি ফিরিব না। কিন্তু তোমার কাছে এক ভিক্ষা। একবার আমায় আলিঙ্গন কর—বুঝিব যে আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিলে। যদি আমায় একদিনও ভাল বাসিয়া থাক, তবে এইখানে আমায় একবার জন্মের শোধ আলিঙ্গন কর।" করালী প্রসন্ন তখন আদরিণীর মন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

তখন গোপাল গদগদ কণ্ঠে, অতি কষ্টে, বলিতে লাগিল। "তোমায় আলিঙ্গন করিব - আদরিণি। আমারই আদরিণী—আমার কত আদরের আদরিণী? তোমার সাধ মিটাইয়া, জন্মের শোধ আলিঙ্গন করিব। তুমি একা যাইও না। তুমি যদি ফিরিবে না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব।"

এই বলিয়া গোপাল চিবুক পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া, চিরপ্রেমভাগিনী আদরিণীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল।

তাহার পর উভয়কে, পৃথিবীতে আর কেহ কখন দেখিল না।

দামিনী

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বহুদিন হইল, একদিন সন্ধ্যার সময় সপ্তবৎসরবয়স্কা একটি বালিকা ভাগীরথীতীরে দাঁড়াইয়া, অনিমেষ-লোচনে স্রোতস্তাড়িত দীপমালা দেখিতে দেখিতে পশ্চাদ্বর্তিনী এক বৃদ্ধাকে বলিল, "আয়ি, আমার দীপ ভাসিয়া গেল।" আয়ী উত্তর করিলেন, "তা যাক, এখন তুমি ঘরে চল, অন্ধকার হইল।" "আর একটু দেখি" বলিয়া বালিকা দাঁড়াইয়া রহিল।

বালিকাটির নাম দামিনী। বৃদ্ধ মাতামহী ব্যতীত দামিনীর আর কেহই ছিল না, সেই মাতামহীর সঙ্গে আসিয়া দামিনী এই প্রথম দীপ ভাসাইল, দীপ ভাসিয়া গেল। অন্য বালিকার ন্যায় দামিনী হাসিল না, অন্য বালিকার ন্যায় "ঐ আমার দীপ যাইতেছে" বলিয়া আহ্লাদে সঙ্গিনীকে দেখাইল না, কেবল গম্ভীরভাবে একদৃষ্টিতে সেই দীপের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সেই অকূল নদীতে দামিনীর দীপ একা ভাসিয়া চলিল। দামিনীর দীপ দামিনী আপনি ভাসাইয়াছে এক্ষণে আর উপায় নাই, অতএব কাতর অন্তরে দামিনী বলিতে লাগিল, "হে ঠাকুর! আমার দীপকে রক্ষা কর।"

অন্ধকার ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল দেখিয়া, মাতামহী দামিনীকে গৃহে লইয়া চলিলেন। দামিনী গম্ভীরভাবে কেবল দীপের গতি ভাবিতে ভাবিতে গৃহে গেল। প্রাঙ্গণপার্শ্বে একটি কলসে জল ছিল, দামিনী সেই জলে আপন ক্ষুদ্র পদদ্বয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি দ্বারা প্রক্ষালন করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিল। শয়নমাত্রই নিদ্রা আসিল। নিদ্রায় স্বপ্ন দেখিতে লাগিল—যেন মেঘ অন্ধকারে ভারী হইয়া নদীর উপর নামিয়া পড়িয়াছে। ঐ মেঘ দেখিয়া দামিনীর দীপ যেন ভয়ে অল্প অল্প জ্বলিতে জ্বলিতে পলাইতেছিল, এমত সময়ে পতনোন্মুখ ভয়ানক ভয়ানক তরঙ্গ আসিয়া তাহার চারি দিকে ঘেরিল। ঐ তরঙ্গের মধ্যে একটির চূড়ার উপর গম্ভীরভাবে একটি বিড়াল বসিয়া আছে। দামিনী চিনিল যে, সেইটি তাহাদের পাড়ার দুরন্ত বিড়াল, সেটি তাহাকে দেখিলেই নখাঘাত করিতে আসিত। দামিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে কেমন চক্ষু মুদিয়া চীৎকার করিত, কখনও পলাইতে পারিত না। এক্ষণে তরঙ্গচূড়ায় সেই বিড়ালকে দেখিয়া দামিনী ভয়ে মাতামহীর অঞ্চল ধরিয়া চক্ষু মুদিল। বৃদ্ধা যেন ক্রুদ্ধা হইয়া আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া লইয়া দামিনীর ক্ষুদ্র দেহ সেই অগাধ জলে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। দামিনী চীৎকার করিয়া উঠিল। মাতামহী "ভয় কী" বলিয়া নিদ্রিতা দামিনীকে ক্রোড়ে টানিয়া লইলেন। দামিনী নিদ্রাভঙ্গে "আমার মা কোথায়" বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অভাগিনীর মা ছিল না। তিন বৎসর পূর্ব্বে তাহার মাতা নিরুদ্দেশ হইয়াছিল।

পরদিবস প্রাতে দ্বাদশবর্ষীয় একটি বালক পাঠশালায় যাইতেছিল, দামিনীর গৃহদ্বারে দাঁড়াইয়া পক্ষীশাবকের নিমিত্ত পতঙ্গ সংগ্রহ হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিল। দামিনী একা বসিয়াছিল, বালকের প্রশ্নে কেবল মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল। বালক অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা

করিল, "জ্বর হইয়াছে কি?" দামিনী আবার মাথা নাড়িল। বালক বলল, "আয়ীর উপর রাগ করিয়াছ?" দামিনী কোন উত্তর দিল না। বালক বস্ত্রাগ্র হইতে কতকগুলি পতঙ্গ দামিনীর নিকট রাখিয়া চলিয়া গেল।

বালকটির নাম রমেশ। দামিনীর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ ছিল না, প্রতিবাসী বলিযা দামিনী তাহাকে রমেশদাদা বলিযা ডাকিত। দামিনী রমেশের বড় অনুগত ছিল। যে বিড়ালটিকে দামিনী বড় ভয করিত, রমেশ তাহাকে দেখিলেই মারিত। স্নানের সময রমেশ স্রোতে সন্তরণ করিয়া দামিনীর নিমিত্ত পুষ্প ধরিয়া আনিত; দামিনী তাহা লইযা হাসিতে হাসিতে কেশে পরিত; পরা হইলে মাথা নামাইযা জিজ্ঞাসা করিত, "রমেশদাদা, দেখ, হয়েছে?" রমেশ প্রায় ভাল বলিত, আবার মধ্যে মধ্যে মনোনীত না হইলে আপনি পরাইযা দিত। রমেশ জানিত যে, গ্রামের সকল বালিকার অপেক্ষা দামিনী শান্ত আর দুঃখিনী। আর দামিনী ভাবিত যে, গ্রামের সকল বালক অপেক্ষা রমেশদাদা তাহার "আপনার জন"। আর কেহ ত তাহার জন্য ফুল কুড়ায় না, পতঙ্গ ধরে না, বিড়াল মারে না। এই জন্য রমেশদাদাকে দেখিলেই দামিনী দৌড়িযা নিকটে যাইযা দাঁড়াইত, হাসিমুখে সকল কথার উত্তর দিত। কিন্তু এই দিন রমেশকে দেখিযা আর পূর্ব্বানুরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। দামিনী শৈশবগম্ভীর হইযাছে।

দামিনী শৈশবে এত গম্ভীরপ্রকৃতি কেন? যে সুখী, সেই চঞ্চল, যে দুঃখী, সেই শান্ত, সেই ধীর, সেই গম্ভীর। এক দারুণ দুঃখে দামিনী এই শৈশবে কাতর। দামিনীর মা কোথা? তাহার মা কি মরিয়াছেন? তা হইলে লোকে বলে না কেন? পাড়ায সকল ছেলে, মার কোলে শোয, মার হাতে খায, মার কথা শোনে, মার মুখপানে চায, মার সঙ্গে গল্প করে, মার সঙ্গে কোন্দল করে, মার কাছে দৌরাত্ম্য করে, দামিনীরই কপালে এই সকল হলো না কেন? আয়ী আছে—আয়ী বেশ—মার মত ভালবাসে—তবু মা! মার আদর কেমন! তিন বৎসর বযসে দামিনী মা হারাইয়াছিল, দামিনীর মাকে একটু একটু মনে পড়িত।—একটু একটু—কেবল ছায়াটী—কেবল একখানি শরীর আর একখানি মুখ—তাতে আহ্লাদ আর হাসি—যেমন, যে বাল্যকালে দুর্গোৎসব দেখিয়াছে—আর কখন দেখে নাই—তাহার যেমন প্রৌঢ়াবস্থায সেই দুর্গাপ্রতিমা মনে পড়ে, দামিনীর তেমনি মাকে মনে পড়িত। দামিনী কত সময়ে মনে মনে মাকে গড়িত—বসনে, অলঙ্কারে, মনে মনে সাজাইত,—তাহার উপর হাসিতে, আদরে প্রতিমার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়ে সাজাইত—সাজাইযা মনে মনে মা! মা! মা! বলিয়া ডাকিত।

আজি মার কথা ভাবিতে ভাবিতে, মার কথা, দীপের কথা, স্বপ্নের কথা, রমেশের কথা, সব কেমন মিশাইয়া মনের ভিতর গোলমাল হইল। দামিনী ভাবিল, মরি ত বেশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দশ বৎসর পরে আর একদিবস অপরাহ্নে একটী ক্ষুদ্র শযনগৃহে দামিনী একা শয্যারচনা করিতেছিলেন। পশ্চিমদিকের ক্ষুদ্র বাতাযন দিয়া সূর্য্যকিরণ শয্যায পড়িয়া দামিনীর মুখকমলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। তাঁহার নাসাগ্রে এবং কপোলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর্ম্মবিন্দু ক্ষুদ্র মুক্তারাজীর ন্যায শোভা পাইতেছিল। দামিনী একখানি সিক্ত গাত্রমার্জ্জনী লইযা গাত্রমার্জ্জনা আরম্ভ করিলেন।

দামিনী আর ক্ষুদ্র বালিকা নাই, এক্ষণে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক্ষণে সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইযাছে। শরীরের গুরুত্বানুরূপ আবার অঙ্গচালনায গাম্ভীর্য্য জন্মিযাছে। দামিনী স্বভাবতঃ গৌরাঙ্গী, এক্ষণে সেই বর্ণ অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল হইযাছে।

গাত্রমার্জ্জনা সমাধা কবিয়া দামিনী একখানি দর্পণ তুলিতেছিলেন, এমত সময়ে প্রাঙ্গণ হইতে একটী স্বর তাঁহাব কর্ণে প্রবেশ কবিল। দামিনী অমনি চঞ্চল হইয়া দর্পণ ফেলিয়া দ্বারে যাইয়া দাঁড়াইলেন বালিকাবযসে যাঁহারে দামিনী রমেশদাদা বলিতেন, তিনি প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আপনার বিমাতার সহিত কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রতি সস্নেহলোচনে দামিনী চাহিয়া রহিলেন।

রমেশ দামিনীর স্বামী, দামিনীব সর্ব্বস্ব।

কথা সমাধা হইলে রমেশ আপন শযনকক্ষে প্রবেশ কবিলেন। শয্যায দুই একটি পুষ্প পড়িয়া আছে দেখিয়া, দামিনীকে বলিলেন, "কোন্ চোরে আমার নামাবলী থেকে ফুল চুবি করেছে রে?"

দামিনী বলিল, "খুব কবেছে, উনি ফুল এনে নামাবলীতে বেঁধে রাখতে পারেন, আর লোকে চুবি করতে পারে না? খুব কবেছে—চুরি কবেছে।"

বমেশ বলিলেন, "খুব কবেছে বই কি? চোবকে একবাব ধবিতে পাবিলে বুঝিতে পাবি।"

চোব আসিযা ধবা দিল।

রমেশ দুই হস্তে দামিনীর দুই গাল ধবিলেন, দুই কবে দামিনীর দুই কর্ণ আবরণ কবিযা মুখখানি তুলিয়া ধবিয়া দেখিতে লাগিলেন। দামিনী বমেশেব দুই বাহু ধবিয়া উর্দ্ধমুখে বমেশকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব।" দামিনীর চক্ষু অমনি জলে পুরিযা আসিল। দামিনী কাঁদিয়া উঠিলেন।

বমেশ দামিনীকে ছাড়িয়া দিযা ভগ্নস্বরে বলিলেন, "তুমি কি নিত্য কাঁদিবে?" দামিনী চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিলেন, "তুমি নিত্য আদব কব কেন?"

এই সময দ্বাবের পার্শ্বে ঘন ঘন নিশ্বাসেব শব্দ হইয়া উঠিল। যেন আর একজন কেহ কাঁদিল। দামিনী ও রমেশ উভয়ে ব্যস্ত হইযা সেই দিকে দেখিতে গেলেন। দেখিলেন, একজন অপবিচিতা অর্দ্ধবযস্কা স্ত্রীলোক অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে চলিয়া যাইতেছে। দামিনী তাহার সঙ্গে সঙ্গে গেলেন, বহির্দ্বার পর্য্যন্ত দামিনী গেলে স্ত্রীলোকটী ফিরিযা দাঁড়াইল। হঠাৎ তাহাকে উন্মাদিনী বলিয়া বোধ হইল। দেখিয়া, দামিনীব যেন কি মনে পড়িল—কিন্তু কি মনে পড়িল, তাহা স্থির কবিতে পাবিলেন না। উন্মাদিনী হঠাৎ দামিনীব গলা ধবিয়া তাহার বক্ষে মাথা দিযা মা! মা! বলিযা কাঁদিতে লাগিল—কত কি বলিল—কত আশীর্ব্বাদ কবিল—দামিনী কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না,—কিন্তু তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন।—কান্না দেখিলে কান্না পায বলিয়া, কি কেন—তাহা জানি না।

দামিনী ধীবে ধীবে উন্মাদিনীব আলিঙ্গন হইতে আপনাকে বিমুক্তা কবিয়া জিজ্ঞাসা কবিলেন, "হাঁ গা তুমি কে গা?"

উন্মাদিনী কিছু বলিল না, "মা মা"। বলিযা কাঁদিতে লাগিল। দামিনী বলিলেন, "কাঁদিতেছ কেন?"

উন্মাদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাব মা আছে?"

দামিনী কাঁদো কাঁদো হইযা বলিলেন, "বিধাতা জানেন", বলিযাই কাঁদিতে আরম্ভ কবিলেন।

পাগলী বলিল, "দেখ, তোমার মাব নামেই তুমি কাঁদিতেছ—আমি আজ আমার মা পাইযাছি—আমি কাঁদিব না?"

একটী কথা সহসা বিদ্যুতেব মত দামিনীব মনেব ভিতব চমকিল— "এই আমাব মা নয তঃ"

হাঁ, সেই ত মা। দামিনীব মা যে স্বামীব শোকে পাগল হইয়া পলাইযাছিল। কোথায় গিযেছিল, কোথায ছিল, তাহা কে জানে? দিনকত ভৈরবী হইয়া ত্রিশূল ধবিযা বেড়াইয়াছিল।

আবাব বহুকাল পরে সংসাব মনে পড়িল—দামিনীকে দেখিতে আসিল—লুকাইয়া দামিনীকে দেখিতেছিল। দামিনীব মনে হঠাৎ উদয় হইল—"এই আমাব মা নয ত?"

এমন সময পশ্চাৎ হইতে রমেশেব বিমাতা ডাকিলেন। দামিনী চমকিযা ফিবিলেন। যেখানে পাগলী দাঁড়াইযাছিল, সে দিকে আবাব দেখিলেন, পাগলী চলিয়া গিয়াছে। একবাব ভাবিলেন, তাহার অনুসবণ কবি, দুই এক পদ অগ্রসব হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিযা আসিলেন। রমেশ জিজ্ঞাসা কবিলেন, "স্ত্রীলোকটী কে?" দামিনী অন্যমনে মৃদুভাবে ভাবিতে ভাবিতে উত্তব করিলেন, "পাগল।"

বমেশ আর কোন কথা না বলিযা বহির্ব্বাটীতে গেলেন। দামিনী শয়নঘরে প্রবেশ কবিয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া নিঃশব্দে কাঁদিলেন, দুই একবার অস্ফুটস্বরে মা বলিযা ডাকিলেন। শৈশবে মা হারাইযাছেন, সেই অবধি মা বলিযা ডাকেন নাই। এক্ষণে পাগলেব কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিতে বড় সাধ হইল। দামিনী বালিশে মুখ লুকাইয়া কত কাঁদিলেন।

তৃতীয় পবিচ্ছেদ

যে গ্রামে বমেশ বাস করিতেন, তাহাব দক্ষিণপ্রান্তে ভাগীরথীতীবে একটা ভগ্ন অট্টালিকা ছিল। প্রবাদ আছে, পূর্ব্বকালে এক বাজা আপন মাতাব গঙ্গাবাসের নিমিত্ত ঐ অট্টালিকা প্রস্তুত কবাইযাছিলেন, কিন্তু কোন দৈব ঘটনায ঐ অট্টালিকায একটি স্ত্রী-হত্যা হওয়ায বাজাব মাতা উহা পবিত্যাগ কবেন। সেই পর্য্যন্ত কেহ তাহায বাস কবে নাই। অট্টালিকাব ক্রমে ভৌতিক অপবাদ জন্মিল। শেষে দিবাভাগেও কেহ এ অট্টালিকার নিকট গিযা গতিবিধি করিতে সাহস কবিত না।

পাগলী দেখিল যে, এই ভয়ানক ভগ্ন অট্টালিকা তাহাব বাসোপযোগী। অতএব গোপনে তথায় বাস করিতে লাগিল। দামিনীর সহিত সাক্ষাৎ কবিযা পাগলেব অনেক মতিস্থিব হইয়াছিল, তথাপি মধ্যে মধ্যে দামিনীকে চুবি কবিযা এই গোপনীয় স্থানে আনিযা একা দেখিবে, এই মনে মনে স্থিব কবিত। আবার পবক্ষণেই ইহার অকর্ত্তব্যতা বুঝিতে পাবিত। পাছে চাঞ্চল্যপ্রযুক্ত আত্মপরিচয় দিয়া জামাতার কলঙ্ক বটায, এই ভয়ে আর দামিনীব বাটীতে যাইত না। একা ভগ্ন অট্টালিকায বসিযা আপনা আপনি উদ্দেশে দামিনীকে আদব কবিত, দামিনীকে কিরূপে বমেশ আদব করিতে ছিল, আবার তাহাই ভাবিত।

একদিবস বাত্রি দুই প্রহবেব সময় পাগলী স্নিগ্ধ গঙ্গাজলে অবগাহন কবিযা ভগ্ন অট্টালিকাব ছাদেব উপর বসিয়া অন্ধকাবে কেশ শুকাইতেছিল। কেশরাশি নানাদিকে নানাভঙ্গীতে তুলিতেছিল, ফেলিতেছিল। এমন সময পূর্ব্বদিকেব অশ্বত্থবৃক্ষমূলে হঠাৎ এক অশ্বেব চীৎকাব শুনিতে পাইল। দক্ষিণকরে কেশগুচ্ছ ধরিয়া অতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বৃক্ষমূল প্রতি চাহিয়া বহিল। দেখিল, ক্রমে দুই একটী মশাল জ্বালিত হইল, এবং তদালোকে কতকগুলি অস্ত্রধারী সৈনিক আর এক অশ্বাবোহী পুরুষ দৃষ্ট হইল। পাগলী প্রথমে ভাবিল, ইহাবা ডাকাইত, পাছে ইহাবা আমার দামিনীব ঘরে ডাকাতী করে, এই আশঙ্কায় দ্রুতবেগে ছাদেব উপর হইতে অবতবণ করিয়া ডাকাতদিগের নিকট যাইতে ইচ্ছা করিল। ফিবিযা ঝটিতি গৃহে আসিযা ভৈরবীবেশ ধাবণ কবিযা, কবাল ত্রিশূল হস্তে লইযা সদর্পে চলিল। কথঞ্চিৎ নিকটবর্ত্তী হইযা একখানি পাল্কী দেখিয়া ভাবিল, ইহারা ডাকাত নহে, ডাকাতের সঙ্গে পাল্কী থাকে না। ইহারা ববযাত্রী হইবে। পাগলী তাহাদের সঙ্গে চলিল। দামিনীব বিবাহ সে দেখিতে পায নাই, অতএব বিবাহ দেখিব মনে করিয়া পবম আহ্লাদ-পূর্ব্বক পাল্কীব সঙ্গে সঙ্গে চলিল। অন্ধকাবে তাহাকে কেহই প্রথমে দেখিতে পায় নাই, শেষ কতদূর গেলে একজন শিবিকাবাহক তাহাকে দেখিযা কষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে রে, তুই এমত সময আমাদেব সঙ্গে যাইতেছিস্?" পাগলী

উত্তর করিল, "আমি তোমাদের সঙ্গে বিবাহ দেখিতে যাইতেছি, তোমাদেব সঙ্গে বাদ্যকব নাই কেন?"

বাহক উত্তব করিল, "এ বড় ভযানক বিবাহ, এ বিবাহে বাদ্য থাকে না।" পাগলী এ কথায় মনোনিবেশ না করিয়া আপন ইচ্ছানুসাবে জিজ্ঞাসা কবিল, "কাহাব বাড়ীব বর, কাহার বাড়ীর কনে?" বাহক কহিল, "হিন্দুর কনে, মুসলমানেব বব।" পাগলী উত্তব কবিল, "মিছে কথা।" বাহক দেখিল যে, স্ত্রীলোকটী পাগল, অতএব তাহাব সঙ্গে রঙ্গ কবিতে লাগিল। "কে বব?" এই কথা উন্মাদিনী পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা কবায় বাহক অশ্বারোহীকে দেখাইয়া দিল। উন্মাদিনী দেখিল, অসম্ভব নহে, বযস অল্প, জরির কাপড় পরিধান। আর কোন শব্দ না কবিয়া সঙ্গে চলিল।

সঙ্গীদিগের পবিচয় দিতে বাহকেব প্রতি বিশেষ নিষেধ ছিল, কিন্তু সে নিষেধ তাহাব পক্ষে ক্রমে ভার হইয়া উঠিতেছিল। পাগলীকে পাইয়া বাহক মনে কবিযাছিল যে, সে ভাব নামাইবে, কিন্তু পাগলী আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না কবায তাহাব আশা পবিতৃপ্ত কবিবাব ব্যাঘাত জন্মিল। শেষ বাহক পাগলীকে বলিল, "তুমি স্ত্রীলোক, আমাদেব সঙ্গে যাওযা ভাল নহে, এখনই কাটাকাটি হইবে, অতএব তুমি পালাও।" পাগলী বলিল, "বিবাহ শুভ কর্ম্ম, ইহাতে কাটাকাটি হইবে কেন?" বাহক উত্তব কবিল, "এ ব্যাপার বিবাহেব নহে। যিনি তাজ পবিযা তববারি লইযা ঘোড়াব উপব যাইতেছেন উনি আমাদেব ফৌজদাবের পুত্র। এই গ্রামে একটি অদ্ভুত সুন্দবী আছে শুনিযা তাহাকে কাড়িযা লইতে যাইতেছেন, তাই বলিতেছিলাম, কাটাকাটি হইব।"

পাগলী শিহবিযা উঠিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "কাহাব কন্যা লইযা যাইবে?" বাহক বলল, "আমি সবিশেষ জানি না শুনিযাছি কোন ভট্টাচার্য্যেব পুত্রবধূ; যুবতীব স্বামী নাকি অদ্য কযেক দিন হইল শিষ্যালযে গিয়াছে। সুন্দবীর নাম বুঝি দামিনী।"

এই কথা শুনিবামাত্র পাগলী ফণিনীব ন্যায বাহকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথরোধ কবিল, দক্ষিণ হস্তে ত্রিশূল তুলিল। সে মূর্ত্তি দেখিযা বাহক ভযে বলিল, "আমি দবিদ্র বাহক, পেটেব জ্বালায় সকল কবি, আমাকে মাবিলে কি হইবে? আমি হিন্দু, অতএব হিন্দুব অত্যাচার আমার ইচ্ছা নয। এক্ষণে গোলযোগ কবিলে এই যবনেবা তোমাকে খণ্ড খণ্ড কবিযা ফেলিবে, অতএব আমার পরামর্শ শুন। তুমি অন্য পথ দিযা দ্রুত যাইযা গ্রামবাসীদিগকে জাগ্রত কর, সকলে একত্র প্রতিবন্ধক হইলে সফল হইতে পাবিবে, নতুবা আব উপায় নাই।"

পাগলী শুনিবামাত্র ছুটিল, গ্রামেব মধ্যে যাইযা দ্বাবে দ্বাবে চীৎকার কবিতে লাগিল, বলিতে লাগিল, "হিন্দুব হিন্দুত্ব যায, সকলে উঠ, সীতাব সতীত্ব যায়, একবাব সকলে উঠ। ফৌজদারের পুত্র আসিযা তাহাব পুত্রবধূকে হরণ কবে, একবাব সকলে উঠ।"

কেহই উঠিল না। কেহ বলিল, "যাউক শত্রু পবে পবে।" কেহ বলিল, "পরের নিমিত্ত মাথা দিবার আমাব কি প্রয়োজন পড়িযাছে?" কেহ বলিল, "অদিতিব সর্ব্বনাশ হয যদি, তাহাকে আমার কি ক্ষতি?"

ক্ষতি আছে। আমরা ভিন্ন তাহা অপবদেশীয় সকলে বুঝে। বিপদ অদ্য আমাব, কল্য তোমার, অত্যাচাব এক ঘবে প্রবেশ কবিতে পাইলে সকল ঘবে পথ পায। অগ্নি এক ঘবে লাগিলে সকল ঘর আক্রমণ করে। পবেব ঘরেব অগ্নি যে নিবায, কেবল সেই আপনাব ঘর রক্ষা করে। এ বোধ বাঙ্গলা হইতে অনেক কাল অন্তর্হিত হইযাছে, অতএব পাগলীব চীৎকারে কেহই উঠিল না।

দুর্বৃত্ত যবনেব অত্যাচাব কেহ নিবারণ করিল না, রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ একা, তাহে বৃদ্ধ, দামিনীকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। যবনেরা দ্বার ভাঙ্গিযা মূর্চ্ছিতা দামিনীকে লইযা গেল।

পাগলী দেখিল, কেহই উঠিল না, কেহই সহাযতা করিল না। বমেশের গৃহদ্বাবে আসিয়া দেখিল, সকল ফুবাইযাছে; দামিনীকে লইয়া গিযাছে। তখন পাগলীব কপালমধ্যে যেন অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। পাগলী পূর্ব্বতন উন্মত্তা হইযা সিংহীর ন্যায় ক্ষণেক দাঁড়াইল। শেষে ত্রিশূল তুলিয়া ছুটিল।

যবনেবা এক প্রান্তরেব মধ্য দিয়া দামিনীকে লইযা যাইতেছিল। পাল্কীব চারিদিকে অস্ত্রধাবী পদাতিক। সর্ব্ব পশ্চাতে ফৌজদাবপুত্র অশ্বাবোহণে যাইতেছিল। পাগলী বাযুবেগে তথায় উপস্থিত হইযা ত্রিশূল নিক্ষেপ করিল। ত্রিশূল ফৌজদাবপুত্রেব পৃষ্ঠদেশ প্রবেশ কবিযা সম্মুখে ঈষৎ দেখা দিল। ফৌজদারপুত্রের শরীব প্রথমে দুলিল, শেষে অশ্বপৃষ্ঠচ্যুত হইয়া পডিযা গেল। পাগলী বিকট হাসি হাসিল; অশ্ব চমকিয়া উঠিল, পদাতিকেবা ফিবিযা দেখিল।

পাগলী আবার বিকট হাসি হাসিতে হাসিতে ছুটিল। দামিনীকে আব তাহার স্মবণ হইল না। সেই অবধি পাগলীকেও আব কেহ দেখিতে পাইল না। পদাতিকেরা দেখিল যে, ফৌজদারপুত্র সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ধবাধবি কবিযা পাল্কীতে তুলিল। পাল্কী হইতে দামিনীকে ফেলিযা দিয়া গেল। দামিনী একা প্রান্তবে পড়িয়া বহিলেন। নবপল্লবীতে পুষ্পিত লতাবৃক্ষ হইতে ছিঁড়িযা পথে ফেলিয়া গেলে যেমন বাতাসে তাহা উলটি পালটি কবিতে থাকে, প্রান্তরে পডিয়া দামিনীব সেইরূপ দশা ঘটিল। বাতাসে তাঁহাব অঞ্চল উলটি পালটি কবিতে লাগিল।

চতুর্থ পবিচ্ছেদ

বাত্রি প্রভাত হইল। রমেশের পিতা অদিতি বিশারদ নামাবলী স্কন্ধে লইয়া বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। প্রাতঃসন্ধ্যা হয় নাই, দামিনী নাই সন্ধ্যার আয়োজন আব কে করিয়া দিবে? বিশারদ অতি বিমর্ষভাবে একা বসিযা রহিলেন, ক্রমে প্রতিবাসীগণ, গ্রামবাসীগণ, আত্মীয়-কুটুম্বগণ আত্মীযতা কবিতে আসিতে লাগিলেন। কেহ আসিযা বলিলেন, "কি বিপদ, কি বিপদ।" কেহ বলিলেন, "কখন্ কাহাব কি ঘটে কে বলিতে পাবে?" কেহ বলিলেন, "অদৃষ্টই মূল।" অদিতি বিশাবদ ইহাব কোন কথাতেই উত্তব করিলেন না দেখিযা গণেশচন্দ্র নামে জনৈক মধ্যবয়স্ক স্থূলশবীব প্রতিবাসী জিজ্ঞাসা কবিলেন, "পূর্ব্বে ইহাব কোন সূচনা ছিল না? অর্থাৎ পূর্ব্বে কি মহাশয কিছুই জানিতে পারেন নাই?" অদিতি বিশাবদ ধীবে ধীরে নিশ্বাস ত্যাগ কবিযা বলিলেন, "যদি পূর্ব্বে জানিতে পাবিব, তবে এমন ঘটিবেই বা কেন? রমেশকেই বা বিদেশে যেতে দিব কেন? এই বাত্রে বমেশ থাকিলে শৃগালেব সাধ্য কি যে সিংহেব গৃহে প্রবেশ কবে?"

গণেশচন্দ্র বলিলেন, "বমেশের প্রয়োজন কি? আমবাই যে আপনার পুত্রবধূকে বক্ষা করিতে পারিতাম। তবে কি জানেন, সকল সময সাহস হয না, যবনেবা প্রায় বিশজন, আমবা একা, বিশেযতঃ তখন যদি সদববাড়ীতে থাকিতাম, তবে যা হয, একখানা কবিয়া বসিতাম। কিন্তু আপনাব দুর্ভাগ্য বশতঃ অথবা বমেশেব দুবদৃষ্ট বশতঃ আমি তখন অন্দবে শযন করিযাছিলাম। শয়ন কবিলে সহজে উঠা যায না, তথাপি ব্রাহ্মণীব কথায উঠিলাম, ভাল করে কাপড পবিলাম, সেই অন্ধকাবে অনুসন্ধান কবিযা নস্য শম্বুক বাহিব কবিলাম, এক টীপ বিলক্ষণ করিয়া গ্রহণ কবিলাম, এ সকল কার্য্যে নস্য আবশ্যক। তাহার পব দেখি

আমি ঘর্ম্মাক্তকলেবর। এ সকল কার্য্যে ঘর্ম্ম ভাল নহে; কি জানি, পাছে যবনেরা পিছলে পলায়, এই মনে করিয়া গাত্রমার্জ্জনী দ্বাবা বিলক্ষণ করিয়া ঘর্ম্ম পরিষ্কার করিলাম; সকল বিষয় এককালে স্মবণ হয় না, গাত্রমার্জ্জনী বাখিলে অস্ত্রেব কথা মনে পড়িল। আমি বলিলাম, 'পুতির তক্তা আন।' ব্রাহ্মণী বলিলেন, 'তাহাব কর্ম্ম নহে।' শেষে একটি শিশু, আমার সপ্তম সন্তান, একটী ইট আনিযা দিল। আমি সেই ইট হাতে করিয়া ছাদে আসিয়া দেখি, দুর্বৃত্তেরা তখন ফিবিয়া যাইতেছে; আমি অমনি সেই ইট ছুঁড়িলাম।"

প্রতিবাসী এইরূপ আত্মবীবত্বের পবিচয় দিতেছেন, এমত সময একজন কৃষক আসিযা বলিল যে, ফৌজদারপুত্র মাবা পড়িয়াছে। কে তাহাবে মাবিয়াছে, তাহার স্থিব নাই।

গণেশচন্দ্র আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "তবে সে আমাবই ইটে মবিয়াছে; নিশ্চয় বলিতেছি, আমিই যবন মারিয়াছি। আমার অব্যর্থ সন্ধান।"

আব একজন ঈষৎ হাসিযা বলিল, "ওরূপ কথা মুখে আনা ভাল নহে। যিনি মরিযাছেন, তিনি ফৌজদাবেব একমাত্র পুত্র, সে পুত্রকে যে মাবিযাছে, তাহাব অদৃষ্টে নিশ্চয় শূল আছে।"

গণেশ অমনি ভযে জড়বৎ হইলেন। কম্পান্বিত-স্ববে বলিতে লাগিলেন, "আমি উপহাস কবিতেছিলাম, আমি তা বলি নাই; আমি কি বলিতেছি, কিছুই নহে। আমাব দ্বারা হাকিমেব অনিষ্ট হইবে, কখনও সম্ভব নহে। আমি ববং বলিতেছি যে, এত ডাকাডাকি কবেছে, তথাপি আমি কথা কই নাই। বমেশ বড, না হাকিম বড?" এই বলিতে বলিতে তিনি পলাইলেন।

যে ব্যক্তি ফৌজদাবপুত্রেব মৃত্যুসংবাদ আনিয়াছিল, সে অদিতি বিশাবদকে বলিল যে, মহাশযেব পুত্রবধূ বাড়ী ফিবিযা আসিতেছেন। এই কথা শুনিবামাত্র বিশাবদ সকলেব মুখ প্রতি চাহিলেন। কেহ কিছু বলিলেন না। শেষে অদিতি বিশাবদ আপনিই সকলকে জিজ্ঞাসা কবিলেন যে, "এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? আমার পুত্রবধূ যবনস্পৃষ্টা হইযাছেন, এক্ষণে তাঁহাকে গ্রহণ কবা যাইতে পাবে কি না?" সকলে উত্তব কবিল যে, মহাশয অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইহার ইতিকর্ত্তব্যতা আপনিই মীমাংসা করুন। অদিতি বিশাবদ কিঞ্চিৎ ভাবিলেন, শেষে অন্দবে যাইযা গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন।

গৃহিণী বলিলেন, "সেই বউকে আবাব ঘবে? তোমাব ইচ্ছা হয, তুমি স্বতন্ত্র গৃহে লইযা সংসাব কর।"

কর্ত্তা বলিলেন, "কেন, তাহার ত কোন দোষ নাই।"

গৃ। "দোষ তবে সকল আমাব?"

ক। "না, তোমাব দোষ দিই নাই। আমি জিজ্ঞাসা কবি, পুত্রবধূকে গ্রহণ কবিলে কি দোষ হইতে পাবে?"

গৃ। "দোষ অনেক। প্রথমত লোকে গালে কালি-চূণ দিবে, দ্বিতীযতঃ শিষ্যেবা ত্যাগ করিবে, তখন আমাব এই শিশু সন্তানেব কি উপায হইবে?"

ক। "কেন লোকেবা দোষ দিবে? আমাদেব পুত্রবধূ কুলত্যাগী নহে, ইচ্ছা পূর্ব্বক যায নাই, যবন-গৃহেও যায় নাই, পথ হইতে ফিবিযা আসিযাছে।"

গৃ। "কুলত্যাগ নহে? ইচ্ছাপূর্ব্বক যায নাই, এ কথা তোমায কে বলিল? তুমি সকল সংবাদই প্রায় জান। কয দিবস পর্য্যন্ত এক মাগী পাগলেব বেশ ধবিযা যাতাযাত কবিতেছিল, সে দিবস সন্ধ্যার সময বধূকে লইযা পলাইতেছিল, আমি যাইযা ফিবাইযা আনিলাম। ফিবে এসে বালিশ মুখে দিযা যে আবাব মেযেব কান্না। আমি কি সকল কথা তোমায বলি। তোমার পুত্রবধূ যখন দেখিল যে, আমি থাকিতে আব পালাতে পাবিবে না, তখন এই পবামর্শ কবিয়া লোকজন আনাইযা চলিযা গেল।"

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা বিস্মিত হইলেন, দুই একবার বলিলেন, "শাস্ত্র মিথ্যা হয় না, স্ত্রীচরিত্র কে বুঝিতে পারে?" শেষে বলিলেন, "তুমি যাহা বলিলে, তাহা আমার বিশ্বাস হইল। আমি কদাচ তাহাকে আর গ্রহণ করিব না।"

অদিতি বিশারদ বহির্ব্বাটীতে আসিয়া সকলকে বলিলেন, "আমার ভ্রম হইয়াছিল, মনে করিয়াছিলাম আমার পুত্রবধূ নির্দ্দোষী, এক্ষণে জানিলাম, তাহা নহে। তোমরা আমার আত্মীয় তোমাদিগের নিকট বলিতে লজ্জা কি? আমার পুত্রবধূ কুলটা। অনেকদিন পর্য্যন্ত গৃহত্যাগ করিয়া যাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু গৃহিণীর সতর্কতা হেতু সফল হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি আমার এই ঘর দ্বার ভগ্ন হওয়া সে কেবল আমার কুলবধূর পরামর্শ ও কৌশলে হইয়াছে। সে যাহা হউক, যদি তাঁহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া আমরা স্বীকার করি, তথাপি তিনি যে যবনস্পৃষ্টা হইয়াছেন, সে বিষয় ত আর সন্দেহ নাই। অতএব শাস্ত্রানুসারে তাহাকে আর কেমন করিয়া গ্রহণ করি? শাস্ত্রে সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত আছে, এ পাপেরও অবশ্য আছে, কিন্তু বধূকে গ্রহণ করিলে আর একটী বিপদ আছে। ফৌজদার মনে করিবেন যে, আমরাই তাঁহার পুত্রকে হত্যা করিয়া বধুকে ঘরে আনিয়াছি। আমি কি, যে কেহ বধূকে আশ্রয় দিবে, তাহারই প্রতি সেই সন্দেহ হইবে। অতএব আত্মরক্ষা মানুষের প্রধান ধর্ম্ম, শাস্ত্রে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। এক্ষণে স্থির করিয়াছি, পুত্রবধূ গৃহে আসিতে চাহিলে আর আমি তাঁহাকে স্থান দিব না। তোমরা এ পরামর্শে কি বল?"

সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "এ ভাল যুক্তি করিয়াছেন, আমরাও এ পরামর্শানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিব। আমরাও কেহ আপনার পুত্রবধূকে স্থান দিব না; অন্য কেহ স্থান দিতে চাহিলে নিবারণ করিব। কেন একটা পাপিষ্ঠার নিমিত্ত গ্রামস্থ সকলে বিপদ্‌গ্রস্ত হই? বিশেষতঃ কুলটাকে গ্রামে স্থান দেওয়া উচিত নহে, এখানে স্থান না পাইলে সে আপনিই অন্যত্র যাইবে।"

সকলে এই পরামর্শ করিয়া আপন গৃহ সাবধান করিতে উঠিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সকলে স্ব স্ব গৃহে গেলে পর কিঞ্চিৎ বিলম্বে গৃহিণী কর্ত্তাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তোমার দেশউজ্জ্বল মুখউজ্জ্বল কুলবধূ আসিতেছেন, এখন কি বলিতে হয় যাইয়া বল।" ইহা শুনিয়া অদিতি বিশারদ খিড়কীদ্বারের নিকট যাইয়া দাঁড়াইলেন। দামিনী মুখ ঢাকিয়া অধোমুখে ধীরে ধীরে আসিতেছিলেন, দ্বারে শ্বশুরকে দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া উঠিলেন, বড় যন্ত্রণা পাইয়াছেন। অন্যদিন হইলে সে ক্রন্দন দেখিয়া অদিতি বিশারদ আপনিও কাঁদিতেন, কিন্তু এ সময় তিনি কাঁদিলেন না; চক্ষে জল আসিয়াছিল, স্ত্রীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া তাহা সংবরণ করিলেন। পরে নস্য-শম্বুক বাহির করিয়া দুই একবার তাহাতে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া শেষ দীর্ঘ টানে এক টিপ টানিয়া চক্ষু মুদিয়া বলিলেন, "বৎসে। আমি সকল দিক ভাবিয়া দেখিলাম, তোমায় আর গ্রহণ করিতে পারি না, তুমি যবনস্পৃষ্টা হইয়াছ, ব্রাহ্মণগৃহে আর তুমি স্থান পাইতে পার না, অতএব স্থানান্তরে যাও।" এই বলিয়া অদিতি বিশারদ দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন, দামিনী প্রথম বুঝিতে পারিলে না; ক্রমে শ্বশুরের প্রত্যেক বাক্য স্মরণ করিয়া অর্থ বুঝিলেন, কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না, ভাবিলেন, ইহা স্বপ্ন হইবে। স্বপ্ন কি না স্থির করিবার নিমিত্ত চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। নিকটে তিন্তিড়ীবৃক্ষ, তাহার শুষ্ক ডালে একটী চিল বসিয়া আছে, খিড়কী পুষ্করিণীর কাল জলে ডাহুক সাঁতার দিতেছে, ঘাটের নিকট জলে উচ্ছিষ্ট পাত্র রহিয়াছে; যে দাসী তাহা জলে রাখিয়া গিয়াছে, তাহার জলসিক্ত পদচিহ্ন সোপানে স্পষ্ট রহিয়াছে। শ্বশুর যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এখনও তাহা রুদ্ধ

রহিয়াছে। দামিনী একবার সেই দ্বারে হাত দিয়া দেখিলেন পরে আপনার গাত্রে চক্ষে হাত দিয়া দেখিলেন, স্বপ্ন নহে—সকলই সত্য। গৃহে প্রবেশ করিতে নিষেধ সত্য—দামিনী 'ব্রাহ্মণের অগ্রাহ্য' এই কথা যাহা শুনিযাছিলেন, তাহাও স্বপ্ন নহে। দামিনীর চক্ষে সূর্য্য নিবিযা গেল, সকলই অন্ধকার হইল, দামিনী পডিযা গেলেন।

ক্ষণকাল বিলম্বে পাড়ার অনেকগুলি বৃদ্ধা মধ্যবযস্কা যুবতী, বালিকা সকলে আসিযা দামিনীকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। দামিনী তখনও মতিস্থির করিতে পারেন নাই। যেখানে পডিযা গিয়াছিলেন সেইখানে নতমুখে বসিয়া একটী দুর্ব্বাদল নখদ্বারা অন্যমনস্কে ছিঁড়িতেছিলেন। অন্যমনস্কে হউক, আর সমনস্কে হউক, তাঁহার নয়ন হইতে বারিধারা বহিতেছিল।

প্রতিবাসীদিগের মধ্যে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "এমনও কপাল করে ভাবতে এসেছিলে। আহা! কি অদৃষ্ট! কি দুর্ভাগ্য।" দামিনী ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপ্রতি ব্যথিত হরিণীর ন্যায় চাহিযা রহিলেন। বৃদ্ধা বলিলেন, "এ মুখ প্রতি পোড়া শ্বশুর একবার ফিরে চাহিল না। ধর্ম্ম বড হল না, জাত বড় হল, আ রে পোড়া বিধাতা। কপালে মন্দ লিখিতে আর কি লোক পেলে না? এই বযসে এই কষ্ট! আহা! মরি মরি মরি! মেযে ত নয, যেন স্বর্ণলতা!"

আর একজন মধ্যবয়স্কা বলিলেন, "আহা! দামিনী আমাদের চিরদুঃখিনী, বুড়া মাতামহী দামিনীর বিবাহ দিযা বলিয়াছিল যে, 'এতদিন আমার দামিনীর উপায হইল, এখন আমি নিশ্চিন্ত হইযা মরিতে পারিব।' আহা। যদি বুড়ি বেঁচে থাকিত, তবে দামিনী দাঁডাইবার একটা স্থান পাইত। এখন আর দামিনীর দাঁড়াইবার স্থান নাই।"

দামিনীর অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিল, শেষে দামিনী মাতামহীর জন্য কাঁদিয়া উঠিলেন। উদ্দেশ্যে মাতামহীকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, "আয়ি! আমায কার কাছে ফেলে আপনি চলে গেলেন?" এই ক্রন্দনধ্বনি শুনিযা তাহার শ্বাশুডী রাগভরে সশব্দে খিডকীর দ্বার খুলিযা দাঁডাইলেন ও তিরস্কার আরম্ভ করিলেন। "বলি বউ। তোমার কেমন আক্কেল আচরণ! এই দুই প্রহর বেলা গৃহস্থের দ্বারে বসিযা মরা কান্না আরম্ভ করিলে? জান না কি যে, এতে গৃহস্থের অমঙ্গল হয়?" প্রতিবাসিনীদিগকে লক্ষ্য করিযা বলিলেন, "আর তোমাদেরই বা কি আচরণ! আপনার আপনার ঝি-বউ ঘরে রেখে পরের বউ নাচাতে এলে। এখন সকলে সময পাইয়াছ, ভাল, পরমেশ্বর আমাকেও একদিন দিবেন, আমিও একদিন পাব।"

কেহ কোন উত্তর করিল না, সকলেই একে একে চলিয়া গেল। দামিনীও চক্ষের জল মুছিয়া নিঃশব্দে বসিযা রহিলেন। প্রতিবাসিনীরা আপন আপন গৃহকার্য্যে গেল। তাঁহাদের একজন সমবয়স্কা একটু দূরে গিযা দাঁড়াইযা ছিলেন। রমেশের বিমাতা পূর্ব্বমত দ্বার রুদ্ধ করিলে দামিনীর নিকট আসিযা বলিলেন, "একবার উঠ ত।" দামিনী বলিলেন, "আমি আর কোথাযও যাব না, কোথায়ও যাইবার আর আমার স্থান নাই, কেহ আর আমায় স্থান দিবে না।" সমবযস্কা বলিল, "তবে কি এইখানে মরিবি?" দামিনী উত্তর করিলেন, "এইখানেই মরিব। আমার স্থান কোথায? তিনি আমায এইখানে রাখিযা গেছেন আমি এইখানেই থাকিব, যতদিন তিনি না আসেন, ততদিন যেমন করে পারি বাঁচিব। আমি তাঁরে না দেখে মরিতে পারিব না।"

এই বলিযা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। সমবয়স্কা বলিলেন, "অন্যত্র না যাও, এই বৃক্ষমূলে আসিয়া বস, রৌদ্র অসহ্য হইয়াছে, আমরা আর দাঁডাইতে পারিব না।" দামিনী এই কথায় ধীরে ধীরে সেই বৃক্ষমূলে গিযা বসিলেন, ধীরে ধীরে বলিলেন, "আপনার গৃহে যাও, তোমার গৃহ আছে, গৃহে তোমায না দেখিলে তোমার মা ব্যস্ত হবেন, আবার বুড়া মানুষ, এই রৌদ্রে তোমায খুঁজিতে আসিবেন।"

প্রতিবাসিনী গৃহে গেলেন, কিন্তু বিস্তব ক্ষণ থাকিতে পারিলে না; অপরাহ্ন না হইতে অদিতি ভট্টাচার্য্যের বাটীর পশ্চাতে আসিযা উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, দামিনী পূর্ব্বমত একা বৃক্ষমূলে অন্যমনস্কে বসিয়া একটী পক্ষী দেখিতেছেন। আব চক্ষে জল নাই।

প্রতিবাসিনী আসিযা দামিনীর নিকটে বসিলেন। পবস্পর কেহই ক্ষণকাল পর্য্যন্ত কথা কহিলেন না। পরে দামিনী বলিলেন, "যদি এই রাত্রে তিনি আসেন।"

প্র। "কে? তোমার স্বামী? তা আসেন ত ভালই হয। যাহা হউক, ভালমন্দ একটা স্থিব হইয়া যায।"

দা। "তিনি যদি আসিযা পথ হইতে ফিরে যান?"

প্র। "সে কি! তা কি হইতে পারে?"

দা। "পারে। পথে যদি তাঁরে কেহ কোন কথা শুনায়। তিনিও কি আমায ত্যাগ কবিবেন?"

প্র। "কি জানি ভাই। পুরুষের মন কখন কেমন থাকে, তা কে বলিতে পাবে?"

দা। "তিনি আমায কত ভালবাসেন। আমায দেখিতে দেখিতে কাঁদেন। আমায দেখিবাব তাঁর কত সাধ। দেখিবার নিমিত্ত কত ছল করে আমাব কাছে আসিযা বসেন, কতবাব কতদিকে বসে দেখেন। আবার কপালে হাত দিয়া দেখেন, দাড়িতে হাত দিযা দেখেন, ওষ্ঠে হাত দিয়া দেখেন, দেখিযা আর তাঁহার পরিতৃপ্তি হয় না। রাত্রে নিদ্রাভঙ্গে উঠিযা আমার মুখের উপর চাহিয়া থাকেন, আমি পোড়া চক্ষু বুজিযা ঘুমাইযা থাকি।"

এই বলিতে বলিতে দামিনীব নযন অশ্রুপূর্ণ হইল। দামিনী কাঁদিতে লাগিলেন। প্রতিবাসিনী বলিলেন, "সন্ধ্যা হইল, বাত্রি যাপন কিরূপ হইবে? কোথা থাকিবে?" দামিনী প্রথমে বলিলেন, "কি জানি", পরক্ষণেই বলিলেন, "এইখানে থাকিব। কে আমায স্থান দিবে?"

প্রতিবাসিনী শিহরিযা বলিলেন, "তা কি স্ত্রীলোকেব সাধ্য? এই অন্ধকাব বনমধ্যে একা পুরুষে থাকিতে পাবে না, তুমি কেমন কবিযা থাকিবে? বাত্রেব নিমিত্ত ঘবে অন্য কোন চালায় শ্বাশুড়ী কি স্থান দিবেন না? অবশ্যই দিবেন।"

দামিনীও সেই আশা কবিযাছিলেন। তিনি নিশ্চয় মনে কবিযাছিলেন যে, রাত্রে কেহ না কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া লইযা যাইবে, কিন্তু বাত্রি হইল, প্রতিবাসিনী চলিয়া গেল। কেহ তাঁহাব তত্ত্ব করিল না। খিড়কীদ্বাব এতক্ষণ মুক্ত ছিল, শেষে তাহাও বন্ধ হইল।

দামিনী একা অন্ধকারে বসিযা বহিলেন। রাত্রি ক্রমে গভীব হইল। দূবে যে দুই একটী দীপালোক দেখা যাইতেছিল, তাহা একে একে নিবিযা গেল। গ্রামবাসীরা নিশ্চিন্ত হইয়া সকলে নিদ্রা গেলেন, দামিনীব ভাবনা কেহ ভাবিল না। দামিনী আপনাব ভাবনা আপনি ভাবিতে লাগিল। ক্রমে দুই একবাব ভয পাইতে লাগিল, অন্ধকাবে নানাদিকে নানা মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। একা থাকা বিষম হইয়া উঠিল। একে সমস্ত দিন অনাহার, তাহে আবাব সমস্ত দিন কাঁদিয়াছেন, শরীব অবসন্ন হইযা আসিল, দামিনী ধূলায শযন কবিলেন, শীঘ্র নিদ্রা আসিল। স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে ডাকিল, "মা!" স্বপ্নে যেন উত্তব দিলেন "মা।" স্বপ্নে বোধ হইল, তাঁহার মা বলিতেছেন, "উঠ মা। এঘরে আব কাজ কি?"

পবদিন, প্রাতে উঠিযা কেহ আব দামিনীকে দেখিতে পাইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দশ বাবো দিবস পবে রমেশ বাটী আসিযা সকল শুনিলেন। পিতাকে কিছু বলিলেন না, বিমাতাব প্রতি দোযারোপ করিলেন না, কাহাকেও কিছু না বলিযা বাটী হইতে চলিযা গেলেন। গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঁচ সাত দিবস ভ্রমণ কবিলেন, কোথাও দামিনীব সন্ধান পাইলেন না।

শেষে এক দিবস রাত্রিশেষে বিষণ্ণভাবে বাটী প্রত্যাগমন কবিতেছিলেন, নদীতীবে ভগ্ন অট্টালিকা দেখিযা দাঁড়াইলেন। ভগ্ন অট্টালিকাব অবস্থাসহিত আপনার সাদৃশ্য দেখিলেন। অট্টালিকার আলিসা ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষ আপন আপন মূল বিদ্ধ কবিযা সাহঙ্কাবে দুলিতেছে। দুর্ব্বল অট্টালিকা একা নদীতীবে দাঁড়াইযা তাহা সহ্য কবিতেছে।

রমেশ অগ্রসব হইলেন, দ্বাবে যাইযা দাঁড়াইলেন। দ্বাব মুক্ত ছিল, গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাব সমাগমশব্দে অসংখ্য চামচিকা, বাদুড় অন্ধকারে উড়িতে লাগিল। ক্ষণকাল পবে ক্রমে ক্রমে তাহাদেব শব্দ থামিল। ঘব ভয়ানক গম্ভীর হইল। রমেশ দাঁড়াইযা বহিলেন। পবক্ষণেই কক্ষান্তবে মনুষ্য-কণ্ঠ-নিঃসৃত একটু মৃদু শব্দ শুনিলেন। রমেশেব শবীব কণ্টকিত হইল। বমেশ সাবধানে নিঃশব্দে সেই দিকে গেলেন, অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে দেখিলেন, মৃত্যুশয্যায একটী রুগ্ন মনুষ্যদেহ পড়িয়া বহিযাছে।

বমেশ কি ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নবদেহ একেবাবে সংজ্ঞাহীন হয নাই, তাহাব কণ্ঠস্বব আবার অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে লাগিল, "আযি। এলে? বসো, আব বিলম্ব কবিব না, কেবল একবাব বমেশকে দেখে আসি।"

বমেশ চীৎকাব করিয়া কাঁদিযা উঠিলেন, "দামিনী, দামিনী! আমি এসেছি, আর কখন তোমা ছাড়া হব না।"

দামিনী কোন উত্তব দিল না। বমেশ আছড়াইযা পড়িযা চীৎকার কবিতে লাগিলেন, "আবাব কথা কও; অনেক দিন কথা শুনি নাই, আবাব কথা কও।" আব কোন উত্তব নাই; সকল নিঃশব্দ। বমেশ কতক বুঝিলেন, রুদ্ধশ্বাসে গ্রামমধ্যে গেলেন। তথা হইতে দীপ জ্বালিবার দ্রব্যাদি লইয়া আসিলেন। দীপ জ্বালিলেন। দেখিলেন, সেখানে আব একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসিযা দামিনীর প্রতি চাহিয়া রহিযাছে। দামিনী এ জন্মের মত চক্ষু মুদিযাছেন।

বমেশকে দেখিয়া বৃদ্ধা হাসিযা উঠিল, সে ভীষণ হাসি দেখিযা রমেশেব শরীর বোমাঞ্চিত হইল। বৃদ্ধা উঠিল, দাঁড়াইযা একদৃষ্টিতে রমেশেব দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ চিনিলেন,, এই পূর্ব্বপরিচিতা পাগলী।

পাগলী একবার অঙ্গুলিনির্দ্দেশ কবিযা বলিল, "চুপ, আমার দামিনী ঘুমাইতেছে, ঘুমাইতেছে।" পরক্ষণেই আবাব বিকট হাসি হাসিযা বমেশেব উপব পড়িয়া বমেশের গলদেশ বজ্রবৎ টিপিযা বলিল, "আমি চিনিয়াছি, তুই বমেশ; তোর জন্যই আমাব দামিনী মবিযাছে।"

বমেশেব শ্বাস রুদ্ধ হইল, চক্ষুর শিবাসকল উঠিল। বমেশ বাক্যবহিত, শক্তিবহিত, শেষে দামিনীব পার্শ্বে পড়িয়া গেলেন। পাগলী আবার বমেশেব গলদেশ পূর্ব্বমত ধবিল। এবাব সকল ফুবাইল।

যুগলাঙ্গুরীয়

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুই জনে উদ্যানমধ্যে লতামণ্ডপতলে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তখন প্রাচীন নগব তাম্রলিপ্তের* চরণ ধৌত করিযা অনন্ত নীল সমুদ্র মৃদু মৃদু নিনাদ কবিতেছিল।

তাম্রলিপ্ত নগবেব প্রান্তভাগে, সমুদ্রতীরে এক বিচিত্র অট্টালিকা ছিল। তাহার নিকট একটি সুনির্ম্মিত বৃক্ষবাটিকা। বৃক্ষবাটিকার অধিকারী ধনদাস নামক একজন শ্রেষ্ঠী। শ্রেষ্ঠীব কন্যা হিরন্ময়ী লতামণ্ডপে দাঁড়াইয়া এক যুবা পুরুষেব সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন।

হিবণ্ময়ী বিবাহেব বয়স অতিক্রম কবিযাছিলেন। তিনি ঈপ্সিত স্বামীর কামনায় একাদশ বৎসরে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চ বৎসর, এই সমুদ্রতীববাসিনী সাগবেশ্ববী নাম্নী দেবীব পূজা করিযাছিলেন, কিন্তু মনোরথ সফল হয় নাই। প্রাপ্তযৌবনা কুমারী কেন যে এই যুবাব সঙ্গে একা কথা কহেন, তাহা সকলেই জানিত। হিবন্ময়ী যখন চাবি বৎসবেব বালিকা, তখন এই যুবার বয়ঃক্রম আট বৎসব। ইঁহার পিতা শচীসুত শ্রেষ্ঠী ধনদাসেব প্রতিবাসী, এজন্য উভয়ে একত্র বাল্যক্রীড়া করিতেন। হয শচীসুতেব গৃহে, নয় ধনদাসের গৃহে, সর্ব্বদা একত্র সহবাস করিতেন। এক্ষণে যুবতীব বয়স ষোড়শ, যুবাব বয়স বিংশতি বৎসব, তথাপি উভয়েব সেই বালসখিত্ব সম্বন্ধই ছিল। একটু মাত্র বিঘ্ন ঘটিযাছিল। যথাবিহিত কালে উভয়েব পিতা, এই যুবক যুবতীর পরস্পরেব সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ কবিযাছিলেন। বিবাহেব দিন স্থিব পর্য্যন্ত হইয়াছিল। অকস্মাৎ হিরণ্ময়ীর পিতা বলিলেন, "আমি বিবাহ দিব না।" সেই অবধি হিবন্ময়ী আর পুরন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিতেন না। অদ্য পুবন্দর অনেক বিনয কবিযা, বিশেষ কথা আছে বলিয়া, তাঁহাকে ডাকিয়া আনিযাছিলেন। লতামণ্ডপতলে আসিয়া হিরন্ময়ী কহিল, "আমাকে কেন ডাকিয়া আনিলে? আমি এক্ষণে আর বালিকা নহি, এখন আর তোমাব সঙ্গে এমত স্থানে একা সাক্ষাৎ করা ভাল দেখায না। আব ডাকিলে আমি আসিব না।"

ষোল বৎসবের বালিকা বলিতেছে, "আমি আব বালিকা নহি" ইহা বড মিষ্ট কথা। কিন্তু সে রস অনুভব কবিবাব লোক সেখানে কেহই ছিল না। পুবন্দবের বযস বা মনেব ভাব সেরূপ নহে।

পুরন্দর মণ্ডপবিলম্বিত লতা হইতে একটি পুষ্প ভাঙ্গিয়া লইযা তাহা ছিন্ন করিতে করিতে বলিলেন, "আমি আব ডাকিব না। আমি দূব দেশে চলিলাম। তাই তোমাকে বলিয়া যাইতে আসিয়াছি।"

হি। দূরদেশে? কোথায?

পু। সিংহলে।

---

* আধুনিক তমলুক। পুবাবৃত্তে পাওয়া যায যে, পূর্ব্বকালে এই নগব সমুদ্রতীরবর্ত্তী ছিল।

হি। সিংহলে? সে কি? কেন সিংহলে যাইবে?

পু। কেন যাইব? আমরা শ্রেষ্ঠী---বাণিজ্যার্থ যাইব। বলিতে বলিতে পুরন্দরের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল।

হিরণ্ময়ী বিমনা হইলেন। কোন কথা কহিলেন না, অনিমেষলোচনে সম্মুখবর্ত্তী সাগরতরঙ্গে সূর্য্যকিরণের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল, মৃদুপবন বহিতেছে,— মৃদুপবনোত্থিত অতুঙ্গ তরঙ্গে বালারুণরশ্মি আরোহণ করিয়া কাঁপিতেছে — সাগরজলে তাহার অনন্ত উজ্জ্বল রেখা প্রসারিত হইয়াছে—শ্যামাঙ্গীর অঙ্গে রজতালঙ্কারবৎ ফেননিচয় শোভিতেছে, তীরে জলচর পক্ষিকুল শ্বেতরেখা সাজাইয়া বেড়াইতেছে। হিরণ্ময়ী সব দেখিলেন,—নীলজল দেখিলেন, তরঙ্গশিরে ফেনমালা দেখিলেন, সূর্য্যরশ্মির ক্রীড়া দেখিলেন,—দূরবর্ত্তী অর্ণবপোত দেখিলেন, নীলাম্বরে কৃষ্ণবিন্দুবৎ একটি পক্ষী উড়িতেছে, তাহাও দেখিলেন। শেষে ভূতলশায়ী একটি শুষ্ক কুসুমের প্রতি দৃষ্টি করিতে করিতে কহিলেন, 'তুমি কেন যাবে—অন্যান্য বার তোমার পিতা যাইয়া থাকেন।"

পুরন্দর বলিল, "আমার, পিতা বৃদ্ধ হইতেছেন। আমার এখন অর্থোপার্জ্জনের সময় হইয়াছে। আমি পিতার অনুমতি পাইয়াছি।"

হিরণ্ময়ী লতামণ্ডপের কাষ্ঠে ললাট রক্ষা করিলেন। পুরন্দর দেখিলেন, তাঁহার ললাট কুঞ্চিত হইতেছে, অধর স্ফুরিত হইতেছে, নাসিকারন্ধ্র স্ফীত হইতেছে। দেখিলেন যে, হিরণ্ময়ী কাঁদিয়া ফেলিলেন।

পুরন্দর মুখ ফিরাইলেন। তিনিও একবার আকাশ, পৃথিবী, নগর, সমুদ্র সকল দেখিলেন, কিন্তু কিছুতেই রহিল না—চক্ষুর জল গণ্ড বহিয়া পড়িল। পুরন্দর চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "এই কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। যে দিন তোমার পিতা বলিলেন, কিছুতেই আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিবেন না, সেই দিন হইতেই আমি সিংহলে যাইবার কল্পনা স্থির করিয়াছিলাম। ইচ্ছা আছে যে, সিংহল হইতে ফিরিব না। যদি কখন তোমায় ভুলিতে পারি, তবেই ফিরিব। আমি অধিক কথা বলিতে জানি না, তুমিও অধিক কথা বুঝিতে পারিবে না। ইহা বুঝিতে পারিবে যে, আমার পক্ষে জগৎসংসার এক দিকে, তুমি একদিকে হইলে, জগৎ তোমার তুল্য নহে।" এই বলিয়া পুরন্দর হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া পাদচারণ করিয়া অন্য একটা বৃক্ষের পাতা ছিঁড়িলেন। অশ্রুবেগ কিঞ্চিৎ শমিত হইলে, ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন, "তুমি আমায় ভালবাস, তাহা জানি। কিন্তু যবে হউক, অন্যের পত্নী হইবে। অতএব তুমি আর আমায় মনে রাখিও না। তোমার সঙ্গে যেন এ জন্মে আমার আর সাক্ষাৎ না হয়।"

এই বলিয়া পুরন্দর বেগে প্রস্থান করিলেন। হিরন্ময়ী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রোদন সংবরণ করিয়া একবার ভাবিলেন, "আমি যদি আজি মরি, তবে কি পুরন্দর সিংহলে যাইতে পারে? আমি কেন গলায় লতা বাঁধিয়া মরি না—কিম্বা সমুদ্রে ঝাঁপ দিই না?" আবার ভাবিলেন, "আমি যদি মরিলাম, তবে পুরন্দর সিংহলে যাক না যাক তাতে আমার কি?" এই ভাবিয়া হিরন্ময়ী আবার কাঁদিতে বসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কেন যে ধনদাস বলিয়াছিলেন যে, "আমি পুরন্দরের সঙ্গে হিরণের বিবাহ দিব না" তাহা কেহ জানিত না। তিনি তাহা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন "বিশেষ কারণ আছে।" হিরণ্ময়ীর অন্যান্য অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু ধনদাস কোন সম্বন্ধেই সম্মত হইলেন না। বিবাহের কথামাত্রে কর্ণপাত করিতেন না। "কন্যা বড় হইল" বলিয়া গৃহিণী তিরস্কার করিতেন, ধনদাস শুনিতেন না। কেবল বলিতেন, "গুরুদেব আসুন---তিনি আসিলে এ কথা হইবে।"

পুরন্দর সিংহলে গেলেন। তাঁহার সিংহল যাত্রার পর দুই বৎসর এইরূপে গেল। পুরন্দর ফিরিলেন না। হিরণ্ময়ীর কোন সম্বন্ধ হইল না। হিরণ অষ্টাদশ বৎসরের হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ নবপল্লবিত চূতবৃক্ষের ন্যায় ধনদাসের গৃহ শোভা করিতে লাগিল।

হিরণ্ময়ী ইহাতে দুঃখিত হয়েন নাই। বিবাহের কথা হইলে পুরন্দরকে মনে পড়িত, তাঁহার সেই ফুল্লকুসুমমালামণ্ডিত কুঞ্চিতকৃষ্ণকুন্তলাবালীবেষ্টিত সহাস্য মুখমণ্ডল মনে পড়িত, তাঁহার সেই দ্বিরদশুভ্র স্কন্ধদেশে স্বর্ণপুষ্পশোভিত নীল উত্তরীয় মনে পড়িত, পদ্মহস্তে হীরকাঙ্গুরীয়গুলি মনে পড়িত; হিরণ্ময়ী কাঁদিতেন। পিতার আজ্ঞা হইলে যাহাকে তাহাকে বিবাহ করিতে হইত। কিন্তু সে জীবন্মৃত্যুবৎ হইত। তবে তাঁহার বিবাহোদ্যোগে পিতাকে অপ্রবৃত্ত দেখিয়া আহ্লাদিত হউন বা না হউন, বিস্মিতা হইতেন। লোকে এত বয়স অবধি কন্যা অবিবাহিতা রাখে না—রাখিলেও তাহার সম্বন্ধ করে। তাঁহার পিতা সে কথায় কর্ণ পর্য্যন্ত দেন না কেন? এক দিন অকস্মাৎ এ বিষয়ের কিছু সন্ধান পাইলেন।

ধনদাস বাণিজ্যহেতু চীনদেশে নির্ম্মিত একটি বিচিত্র কৌটা পাইয়াছিলেন। কৌটা অতি বৃহৎ—ধনদাসের পত্নী তাহাতে অলঙ্কার রাখিতেন। ধনদাস কতকগুলিন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া পত্নীকে উপহার দিলেন। শ্রেষ্ঠিপত্নী পুরাতন অলঙ্কারগুলিন কৌটাসমেত কন্যাকে দিলেন। অলঙ্কারগুলিন রাখা ঢাকা করিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন যে, তাহাতে একখানি ছিন্ন লিপির অর্দ্ধাবশেষ রহিয়াছে।

হিরণ্ময়ী পড়িতে জানিতেন। তাহাতে প্রথমেই নিজের নাম দেখিতে পাইয়া কৌতূহলাবিষ্ট হইলেন। পড়িয়া দেখিলেন যে, যে অর্দ্ধাংশ আছে, তাহাতে কোন অর্থবোধ হয় না। কে কাহাকে লিখিয়াছিল, তাহাও কিছুই বুঝা গেল না। কিন্তু তথাপি তাহা পড়িয়া হিরণ্ময়ীর মহাভীতিসঞ্চার হইল। ছিন্ন পত্রখণ্ড এইরূপ।

জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলা
হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলি।
বাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।
সর মুখ পরস্পরে।
হইতে পারে

হিরণ্ময়ী কোন অজ্ঞাত বিপদ আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন। কাহাকে কিছু না বলিয়া পত্রখণ্ড তুলিয়া রাখিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুই বৎসরের পর আরও এক বৎসর গেল। তথাপি পুরন্দরের সিংহল হইতে আসার কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। কিন্তু হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে তাঁহার মূর্ত্তি পূর্ব্ববৎ উজ্জ্বল ছিল। তিনি মনে মনে বুঝিলেন যে, পুরন্দরও তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই—নচেৎ এত দিন ফিরিতেন।

এইরূপে দুই আর এক তিন বৎসর গেলে, অকস্মাৎ এক দিন ধনদাস বলিলেন যে, "চল, সপরিবারে কাশী যাইব। গুরুদেবের নিকট হইতে তাঁহার শিষ্য আসিয়াছেন। গুরুদেব সেইখানে যাইতে অনুমতি করিয়াছেন। তথায় হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইবে। সেইখানে তিনি পাত্র স্থির করিয়াছেন।"

ধনদাস, পত্নী ও কন্যাকে লইয়া কাশী যাত্রা করিলেন। উপযুক্ত কালে কাশীতে উপনীত হইলে পর, ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামী আসিয়া সাক্ষাৎ করিলেন। এবং বিবাহের দিন স্থির করিয়া যথাশাস্ত্র উদ্যোগ করিতে বলিয়া গেলেন।

বিবাহের যথাশাস্ত্র উদ্যোগ হইল, কিন্তু ঘটা কিছুই হইল না। ধনদাসেব পবিবাবস্থ ব্যক্তি ভিন্ন কেহই জানিতে পারিল না যে, বিবাহ উপস্থিত। কেবল শাস্ত্রীয় আচার সকল রক্ষা করা হইল মাত্র।

বিবাহের দিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—এক প্রহর বাত্রে লগ্ন, তথাপি গৃহে যাহাবা সচবাচব থাকে, তাহাবা ভিন্ন আব কেহ নাই। প্রতিবাসীবাও কেহ উপস্থিত নাই। এ পর্য্যন্ত ধনদাস ভিন্ন গৃহস্থ কেহও জানে না যে, কে পাত্র— কোথাকার পাত্র। তবে সকলেই জানিত যে, যেখানে আনন্দস্বামী বিবাহের সম্বন্ধ কবিযাছেন, সেখানে কখন অপাত্র স্থিব করেন নাই। তিনি যে কেন পাত্রেব পবিচয ব্যক্ত কবিলেন না, তাহা তিনিই জানেন—তাঁহাব মনেব কথা বুঝিবে কে? একটি গৃহে পুবোহিত সম্প্রদানের উদ্যোগাদি করিয়া একাকী বসিয়া আছেন। বাহিরে ধনদাস একাকী ববের প্রতীক্ষা কবিতেছেন। অন্তঃপুরে কন্যাসজ্জা করিয়া হিরণ্ময়ী বসিযা আছেন—আর কোথাও কেহ নাই। হিরণ্ময়ী মনে মনে ভাবিতেছেন—"এ কি রহস্য। কিন্তু পুরন্দবেব সঙ্গে যদি বিবাহ না হইল—তবে যে হয তাহাব সঙ্গে বিবাহ হউক— সে আমাব স্বামী হইবে না।"

এমন সময়ে ধনদাস কন্যাকে ডাকিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহাকে সম্প্রদানেব স্থানে লইয়া যাইবাব পূর্ব্বে, বস্ত্রেব দ্বাবা তাঁহাব দুই চক্ষুঃ দৃঢতব বাঁধিলেন। হিবণ্ময়ী কহিলেন, "এ কি পিতা?" ধনদাস কহিলেন, "গুরুদেবেব আজ্ঞা। তুমিও আমাব আজ্ঞামত কার্য্য কব। মন্ত্রগুলি মনে মনে বলিও।" শুনিযা হিবন্ময়ী কোন কথা কহিলেন না। ধনদাস দৃষ্টিহীনা কন্যার হস্ত ধবিযা সম্প্রদানেব স্থানে লইযা গেলেন।

হিবণ্ময়ী তখন উপনীত হইযা যদি কিছু দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে দেখিতেন যে, পাত্রও তাঁহাব ন্যায আবৃতনয়ন। এইরূপে বিবাহ হইল। সেই স্থানে গুরু পুবোহিত এবং কন্যাকর্ত্তা ভিন্ন আব কেহ ছিল না। বব কন্যা কেহ কাহাকে দেখিলেন না। শুভদৃষ্টি হইল না।

সম্প্রদানান্তে আনন্দস্বামী ববকন্যাকে কহিলেন যে, "তোমাদিগেব বিবাহ হইল, কিন্তু তোমবা পরস্পবকে দেখিলে না। কন্যাব কুমাবী নাম ঘুচানই এই বিবাহের উদ্দেশ্য, ইহজন্মে কখন তোমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইবে কি না, বলিতে পারি না। যদি হয়, তবে কেহ কাহাকে চিনিতে পারিবে না। চিনিবাব আমি একটি উপায় কবিযা দিতেছি। আমাব হাতে দুইটি অঙ্গুবীয় আছে। দুইটি ঠিক এক প্রকাব। অঙ্গুবীয যে প্রস্তরে নির্ম্মিত, তাহা প্রায পাওযা যায় না। এবং অঙ্গুবীযেব ভিতবেব পৃষ্ঠে একটি মযূব অঙ্কিত আছে। ইহার একটি ববকে, একটি কন্যাকে দিলাম। এরূপ অঙ্গুবীয অন্য কেহ পাইবে না—বিশেষ এই মযূবেব চিত্র অননুকরণীয। ইহা আমাব স্বহস্তখোদিত। যদি কন্যা কোন পুরুষেব হস্তে এইরূপ অঙ্গুরীয দেখেন, তবে জানিবেন যে, সেই পুরুষ তাঁহার স্বামী। যদি বব কখন কোন স্ত্রীলোকেব হস্তে এইরূপ অঙ্গুবীয দেখেন, তবে জানিবেন যে, তিনিই তাঁহার পত্নী। তোমবা কেহ এ অঙ্গুবীয় হারাইও না, বা কাহাকে দিও না, অন্নাভাব হইলেও বিক্রয় করিও না। কিন্তু ইহাও আজ্ঞা করিতেছি যে, অদ্য হইতে পঞ্চ বৎসর মধ্যে কদাচ এই অঙ্গুবীয পরিও না। অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী, বাত্রি একাদশ দণ্ড হইযাছে, ইহাব পব পঞ্চম আষাঢেব শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড বাত্রি পর্য্যন্ত অঙ্গুবীয ব্যবহাব নিষেধ কবিলাম। আমাব নিষেধ অবহেলা কবিলে গুরুতব অমঙ্গল হইবে।

এই বলিয়া আনন্দস্বামী বিদায় হইলেন। ধনদাস কন্যাব চক্ষুব বন্ধন মোচন কবিলেন। হিবণ্ময়ী চক্ষু চাহিযা দেখিলেন যে গৃহমধ্যে কেবল পিতা ও পুবোহিত আছেন - তাঁহাব স্বামী নাই। তাঁহার বিবাহরাত্রি একাই যাপন করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিবাহান্তে ধনদাস স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া দেশে ফিবিয়া আসিলেন। আবও চাবি বৎসব অতিবাহিত হইল। পুরন্দব ফিরিয়া আসিলেন না—হিবণ্ময়ীব পক্ষে এখন ফিবিলেই কি, না ফিবিলেই কি?

পুবন্দর যে এই সাত বৎসবে ফিবিল না, ইহা ভাবিয়া হিবণ্ময়ী দুঃখিতা হইলেন। মনে ভাবিলেন, "তিনি যে আজও আমায ভুলিতে পাবেন নাই বলিয়া আসিলেন না, এমত কদাচ সম্ভবে না। তিনি জীবিত আছেন কি না সংশয। তাঁহাব দেখাব আমি কামনা কবি না, এখন আমি অন্যেব স্ত্রী, কিন্তু আমাব বাল্যকালেব সুহৃৎ বাঁচিযা থাকুন, এ কামনা কেন না কবিব?"

ধনদাসেরও কোন কারণে না কোন কারণে চিন্তিত ভাব প্রকাশ হইতে লাগিল, ক্রমে চিন্তা গুরুতর হইয়া শেষে দারুণ রোগে পরিণত হইল। তাহাতে তাঁহাব মৃত্যু হইল। ধনদাসেব পত্নী অনুমৃতা হইলেন। হিরণ্ময়ীব আব কেহ ছিল না এজন্য হিবণ্ময়ী মাতাব চবণ ধাবণ কবিয়া অনেক রোদন করিয়া কহিলেন যে, তুমি মরিও না। কিন্তু শ্রেষ্ঠিপত্নী শুনিলেন না। তখন হিরণ্ময়ী পৃথিবীতে একাকিনী হইলেন।

মৃত্যুকালে হিরণ্ময়ীর মাতা তাঁহাকে বুঝাইযাছিলেন যে, "বাছা, তোমার কিসেব ভাবনা? তোমার একজন স্বামী অবশ্য আছেন। নিযমিত কাল অতীত হইলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে। না হয়, তুমিও নিতান্ত বালিকা নহ। বিশেষ পৃথিবীতে যে সহায প্রধান—ধন—তাহা তোমার অতুল পরিমাণে রহিল।"

কিন্তু সে আশা বিফল হইল—ধনদাসেব মৃত্যুর পব দেখা গেল যে, তিনি কিছুই রাখিয়া যান নাই। অলঙ্কার অট্টালিকা এবং গার্হস্থ্য সামগ্রী ভিন্ন আব কিছুই নাই। অনুসন্ধানে হিরণ্ময়ী জানিলেন যে, ধনদাস কয়েক বৎসব হইতে বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইযা আসিতেছিলেন। তিনি তাহা কাহাকেও না বলিয়া শোধনেব চেষ্টায ছিলেন। ইহাই তাঁহাব চিন্তাব কাবণ। শেষে শোধনও অসাধ্য হইল। ধনদাস মনেব ক্লেশে পীড়িত হইয়া পবলোকপ্রাপ্ত হইযাছিলেন।

এই সকল সংবাদ শুনিয়া অপরাপর শ্রেষ্ঠীবা আসিযা হিবণ্ময়ীকে কহিল যে, তোমাব পিতা আমাদের ঋণগ্রস্ত হইযা মরিযাছেন। আমাদিগেব ঋণ পবিশোধ কব। শ্রেষ্ঠিকন্যা অনুসন্ধান কবিয়া জানিলেন যে, তাহাদেব কথা যথার্থ। তখন হিবন্ময়ী সর্ব্বস্ব বিক্রয কবিযা তাহাদের ঋণ পরিশোধ কবিলেন। বাসগৃহ পর্য্যন্ত বিক্রয কবিলেন।

এখন হিরণ্ময়ী অন্নবস্ত্রেব দুঃখে দুঃখিনী হইয়া নগরপ্রান্তে এক কুটীবমধ্যে একা বাস করিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এক সহায পবম হিতৈষী আনন্দস্বামী, কিন্তু তিনি তখন দূরদেশে ছিলেন। হিবণ্ময়ীব এমন একটি লোক ছিল না যে, আনন্দস্বামীব নিকট প্রেরণ কবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হিবণ্ময়ী যুবতী এবং সুন্দবী—একাকিনী এক গৃহে শযন করা ভাল নহে। আপদ্‌ও আছে—কলঙ্কও আছে। অমলা নামে এক গোপকন্যা হিবণ্ময়ীব প্রতিবাসিনী ছিল। সে বিধবা—তাহার একটি কিশোববযস্ক পুত্র এবং কযেকটি কন্যা। তাহাব যৌবনকাল অতীত হইয়াছিল। সচ্চরিত্রা বলিযা তাহাব খ্যাতি ছিল। হিবণ্ময়ী রাত্রিতে আসিয়া তাহাব গৃহে শযন করিতেন।

এক দিন হিবণ্ময়ী অমলাব গৃহে শযন কবিতে আসিলে পব অমলা তাহাকে কহিল, "সংবাদ শুনিয়াছ, পুবন্দব শ্রেষ্ঠী না কি আট বৎসবেব পব নগবে ফিবিয়া আসিয়াছে।" শুনিয়া হিরণ্ময়ী মুখ ফিবাইলেন—চক্ষুব জল অমলা না দেখিতে পায। পৃথিবীব সঙ্গে হিরণ্ময়ীব শেষ সম্বন্ধ ঘুচিল। পুবন্দব তাঁহাকে ভুলিয়া গিযাছে। নচেৎ ফিবিত না। পুবন্দব এক্ষণে মনে

রাখুক বা ভুলুক, তাঁহার লাভ বা ক্ষতি কি? তথাপি যাহার স্নেহের কথা ভাবিয়া যাবজ্জীবন কাটাইয়াছেন, সে ভুলিয়াছে ভাবিতে হিরণ্ময়ীর মনে কষ্ট হইল। হিরণ্ময়ী একবার ভাবিলেন— "ভুলেন নাই—কত কাল আমার জন্য বিদেশে থাকিবেন? বিশেষ তাহাতে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে—আর দেশে না আসিলে চলিবে কেন?" আবার ভাবিলেন, "আমি কুলটা সন্দেহ নাই—নহিলে পুরন্দরের কথা মনে করি কেন?"

অমলা কহিল, "পুরন্দরকে কি তোমার মনে পড়িতেছে না? পুরন্দর শচীসুত শেঠির ছেলে।"

হি। চিনি।

অ। তা সে ফিরে এসেছে —কত নৌকা যে ধন এনেছে, তাহা গুণে সংখ্যা করা যায় না। এত ধন না কি এ তাম্রলিপে কেহ কখন দেখে নাই।

হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে রক্ত একটু খর বহিল। তাঁহার দারিদ্র্যদশা মনে পড়িল, পূর্ব্বসম্বন্ধও মনে পড়িল। দারিদ্র্যের জ্বালা বড় জ্বালা। তাহার পরিবর্ত্তে এই অতুল ধনরাশি হিরণ্ময়ীর হইতে পারিত, ইহা ভাবিয়া যাহার খুব রক্ত না বহে, এমন স্ত্রীলোক অতি অল্প আছে। হিরণ্ময়ী ক্ষণেক কাল অন্যমনে থাকিয়া পরে অন্য প্রসঙ্গ তুলিল। শেষ শয়নকালে জিজ্ঞাসা করিল "অমলে, সেই শ্রেষ্ঠিপুত্রের বিবাহ হইয়াছে?"

অমলা কহিল, "না, বিবাহ হয় নাই।"

হিরণ্ময়ীর ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইল। সে রাত্রিতে আর কোন কথা হইল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরে এক দিন অমলা হাসিমুখে হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিয়া মধুর ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, "হাঁ গা বাছা তোমার কি এমনই ধর্ম্ম?"

হিরণ্ময়ী কহিল, "কি করিয়াছি?"

অম। আমার কাছে এত দিন তা বলিতে নাই?

হি। কি বলি নাই?

অম। পুরন্দর শেঠির সঙ্গে তোমার এত আত্মীয়তা।

হিরণ্ময়ী ঈষল্লজ্জিতা হইলেন, বলিলেন, "তিনি বাল্যকালে আমার প্রতিবাসী ছিলেন—তার বলিব কি?"

অম। শুধু প্রতিবাসী? দেখ দেখি কি এনেছি।

এই বলিয়া অমলা একটি কৌটা বাহির করিল। কৌটা খুলিয়া তাহার মধ্য হইতে অপূর্ব্ব-দর্শন, মহাপ্রভাযুক্ত, মহামূল্য হীরার হার বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দেখাইল। শ্রেষ্ঠিকন্যা হীরা চিনিত— বিস্মিতা হইয়া কহিল, "এ যে মহামূল্য—এ কোথায় পাইলে?"

অম। ইহা তোমাকে পুরন্দর পাঠাইয়া দিয়াছে। তুমি আমার গৃহে থাক শুনিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইহা তোমাকে দিতে বলিয়াছে।

হিরণ্ময়ী ভাবিয়া দেখিল, এই হার গ্রহণ করিলে, চিরকাল জন্য দারিদ্র্য মোচন হয়। ধনদাসের আদরের কন্যা আর অন্নবস্ত্রের কষ্ট সহিতে পারিতেছিল না। অতএব হিরণ্ময়ী ক্ষণেক বিমনা হইল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "অমলা তুমি বণিক্‌কে কহিও যে, আমি ইহা গ্রহণ করিব না।"

অমলা বিস্মিতা হইল। বলিল, "সে কি? তুমি কি পাগল, না আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না?"

হি। আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতেছি আর পাগলও নই। আমি উহা গ্রহণ করিব না।

অমলা অনেক তিরস্কার করিতে লাগিল। হিরণ্ময়ী কিছুতেই গ্রহণ করিলেন না। তখন অমলা হার লইয়া রাজা মদনদেবের নিকটে গেল। রাজাকে প্রণাম করিয়া হার উপহার দিল। বলিল, "এ হার আপনাকে গ্রহণ করিতে হইবে। এ হার আপনারই যোগ্য।" রাজা হার লইয়া অমলাকে যথেষ্ট অর্থ দিলেন। হিরণ্ময়ী ইহার কিছুই জানিল না।

ইহার কিছু দিন পরে পুরন্দরের এক জন পরিচারিকা হিরণ্ময়ীর নিকটে আসিল। সে কহিল, "আমার প্রভু বলিয়া পাঠাইলেন যে, আপনি যে পর্ণকুটীরে বাস করেন, ইহা তাঁহার সহ্য হয় না। আপনি তাঁহার বাল্যকালের সখী, আপনার গৃহ তাঁহার গৃহ একই। তিনি এমন বলেন না যে, আপনি তাঁহার গৃহে গিয়া বাস করুন। আপনার পিতৃগৃহ তিনি ধনদাসের মহাজনের নিকট ক্রয় করিয়াছেন। তাহা আপনাকে দান করিতেছেন। আপনি গিয়া সেইখানে বাস করুন, ইহাই তাঁহার ভিক্ষা।

হিরণ্ময়ী দারিদ্র্য জন্য যত দুঃখভোগ করিতেছিলেন, তন্মধ্যে পিতৃভবন হইতে নির্ব্বাসনই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর বোধ হইত। যেখানে বাল্যক্রীড়া করিয়াছিলেন, যেখানে পিতা মাতা সহবাস করিতেন, যেখানে তাঁহাদিগের মৃত্যু দেখিয়াছেন, সেখানে যে আর বাস করিতে পান না, এ কষ্ট গুরুতর বোধ হইত। সেই ভবনের কথায় তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি পরিচারিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এ দান আমার গ্রহণ করা উচিত নহে—কিন্তু আমি এ লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। তোমার প্রভুর সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হউক।"

পরিচারিকা প্রণাম করিয়া বিদায় হইল। অমলা উপস্থিতা ছিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, "অমলা, তথায় আমার একা বাস করা যাইতে পারে না। তুমিও তথায় বাস করিবে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল। উভয়ে গিয়া ধনদাসের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন।

তথাপি অমলাকে সর্ব্বদা পুরন্দরের গৃহে যাইতে হিরণ্ময়ী এক দিন নিষেধ করিলেন। অমলা আর যাইত না।

পিতৃগৃহে গমনাবধি হিরণ্ময়ী একটা বিষয়ে বড় বিস্মিতা হইলেন। এক দিন অমলা কহিল, "তুমি সংসারনির্ব্বাহের জন্য ব্যস্ত হইও না, বা শারীরিক পরিশ্রম করিও না। রাজবাড়ী আমার কার্য্য হইয়াছে—আর এমন অর্থের অভাব নাই। অতএব আমি সংসার চালাইব—তুমি সংসারে কর্ত্রী হইয়া থাক।" হিরণ্ময়ী দেখিলেন, অমলার অর্থের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য। মনে মনে নানা প্রকার সন্দিহান হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহের পর পঞ্চমবৎসরের শুক্লা পঞ্চমী আসিয়া উপস্থিত হইল। হিরণ্ময়ী এ কথা স্মরণ করিয়া সন্ধ্যাকালে বিমনা হইয়া বসিয়াছিলেন। ভাবিতেছিলেন, "গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে আমি কালি হইতে অঙ্গুরীয়টি পরিতে পারি। কিন্তু পরিব কি? পরিয়া আমার কি লাভ? হয়ত স্বামী পাইব, কিন্তু স্বামী পাইবার আমার বাসনা নাই। অথবা চিরকালের জন্য কেনই বা পরের মূর্ত্তি মনে আঁকিয়া রাখি? এ দুরন্ত হৃদয়কে শাসিত করাই উচিত। নহিলে ধর্ম্মে পতিত হইতেছি।"

এমন সময়ে অমলা বিস্ময়বিহ্বলা হইয়া আসিয়া কহিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। না জানি কি হইবে।"

হি। কি হইয়াছে?

অ। রাজপুরী হইতে তোমার জন্য শিবিকা লইয়া দাস দাসী আসিয়াছে। তোমাকে লইয়া যাইবে।

হি। তুমি পাগল হইয়াছ। আমাকে রাজবাড়ী হইতে লইতে আসিবে কেন?

এমন সময়ে রাজদূতী আসিয়া প্রণাম করিল এবং কহিল যে, "রাজাধিরাজ পরম ভট্টারক শ্রীমদনদেবের আজ্ঞা যে, হিরণ্ময়ী এই মুহূর্তেই শিবিকারোহণে রাজাবরোধে যাইবেন।"

হিরণ্ময়ী বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু অস্বীকার করিতে পারিলেন না। রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। বিশেষ রাজা মদনদেবের অবরোধে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। রাজা পরম ধার্ম্মিক এবং জিতেন্দ্রিয় বলিয়া খ্যাত। তাঁহার প্রতাপে কোন রাজপুরুষও কোন স্ত্রীলোকের উপর কোন অত্যাচার করিতে পারে না।

হিরণ্ময়ী অমলাকে বলিলেন, "অমলে, আমি রাজদর্শনে যাইতে সম্মতা। তুমি সঙ্গে চল।"

অমলা স্বীকৃতা হইল।

তৎসমভিব্যাহারে শিবিকারোহণে হিরণ্ময়ী রাজাবরোধমধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। প্রতিহারী রাজাকে নিবেদন করিল যে, শ্রেষ্ঠিকন্যা আসিয়াছে। রাজাজ্ঞা পাইয়া প্রতিহারী একা হিরণ্ময়ীকে রাজসমক্ষে লইয়া আসিল। অমলা বাহিরে রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী রাজাকে দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন। রাজা দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, কবাটবক্ষ, দীর্ঘহস্ত, অতি সুগঠিত আকৃতি, ললাট প্রশস্ত, বিস্ফারিত, আয়ত চক্ষু, শান্ত মূর্ত্তি— এরূপ সুন্দর পুরুষ কদাচিৎ স্ত্রীলোকের নয়নপথে পড়ে। রাজা শ্রেষ্ঠিকন্যাকে দেখিয়া জানিলেন যে, রাজাবরোধেও এরূপ সুন্দরী দুর্লভ।

রাজা কহিলেন, "তুমি হিরণ্ময়ী?"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "আমি আপনার দাসী।"

রাজা কহিলেন, "কেন তোমাকে ডাকাইয়াছি, তাহা শুন। তোমার বিবাহের কথা মনে পড়ে?"

হি। পড়ে।

রাজা। সেই রাত্রে আনন্দস্বামী তোমাকে যে অঙ্গুরীয় দিয়াছিলেন, তাহা তোমার কাছে আছে?

হি। মহারাজ! সে অঙ্গুরীয় আছে। কিন্তু সে সকল অতি গুহ্য বৃত্তান্ত, কি প্রকারে আপনি তাহা অবগত হইলেন?

রাজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া কহিলেন, "সে অঙ্গুরীয় কোথায় আছে? আমাকে দেখাও।"

হিরণ্ময়ী কহিলেন, "উহা আমি গৃহে রাখিয়া আসিয়াছি। পঞ্চ বৎসর পরিপূর্ণ হইতে আরও কয়েক দণ্ড বিলম্ব আছে---অতএব তাহা পরিতে আনন্দস্বামীর যে নিষেধ ছিল - তাহা এখনও আছে।"

রাজা। ভালই--কিন্তু সেই অঙ্গুরীয়ের অনুরূপ দ্বিতীয় যে অঙ্গুরীয় তোমার স্বামীকে আনন্দস্বামী দিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে চিনিতে পারিবে?

হি। উভয় অঙ্গুরীয় একই রূপ, সুতরাং দেখিলে চিনিতে পারিব।

তখন প্রতিহারী রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এক সুবর্ণের কৌটা আনিল। রাজা তাহার মধ্য হইতে একটি অঙ্গুরীয় লইয়া বলিলেন, "দেখ, এই অঙ্গুরীয় কাহার?"

হিরণ্ময়ী অঙ্গুরীয় প্রদীপালোকে বিলক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "দেব! এই আমার স্বামীর অঙ্গুরীয় বটে, কিন্তু আপনি ইহা কোথায় পাইলেন?" পরে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "দেব! ইহাতে জানিলাম যে, আমি বিধবা হইয়াছি। স্বজনহীন মৃতের ধন আপনার হস্তগত হইয়াছে। নহিলে তিনি জীবিতাবস্থায় ইহা ত্যাগ করিবার সম্ভাবনা ছিল না।"

রাজা হাসিযা কহিলেন, "আমার কথায় বিশ্বাস কর, তুমি বিধবা নহ।"

হি। তবে আমাব স্বামী আমার অপেক্ষাও দরিদ্র। ধনলোভে ইহা বিক্রয় করিয়াছেন।

রা। তোমার স্বামী ধনী ব্যক্তি।

হি। তবে আপনি বলে ছলে কৌশলে তাঁহার নিকট ইহা অপহরণ করিয়াছেন।

বাজা এই দুঃসাহসিক কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বললেন, "তোমার বড় সাহস! রাজা মদনদেব চোর, ইহা আর কেহ বলে না।"

হি। নচেৎ আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন?

বা। আনন্দস্বামী তোমার বিবাহের বাত্রে ইহা আমাব অঙ্গুলিতে পরাইযা দিয়াছেন।

হিরণ্ময়ী তখন লজ্জায় অধোমুখী হইয়া কহিলেন, 'আর্য্যপুত্র! আমার অপরাধ ক্ষমা করুন—আমি চপলা, না জানিযা কটু কথা বলিয়াছি।'

নবম পরিচ্ছেদ

হিরণ্ময়ী বাজমহিষী, ইহা শুনিয়া হিরণ্ময়ী অত্যন্ত বিস্মিতা হইলেন। কিন্তু কিছুমাত্র আহ্লাদিত হইলেন না। বরং বিষণ্ণা হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন যে, "আমি এত দিন পুবন্দরকে পাই নাই বটে, কিন্তু পবপত্নীত্বেব যন্ত্রণাভোগ করি নাই। এক্ষণ হইতে আমার সে যন্ত্রণা আবন্ত হইল। আর আমি হৃদয়মধ্যে পুরন্দরেব পত্নী—কি প্রকারে অন্যানুরাগিণী হইযা এই মহাত্মার গৃহ কলঙ্কিত করিব?' হিবণ্ময়ী এইরূপ ভাবিতেছিলেন, এমত সময়ে রাজা বলিলেন, "হিরণ্ময়ী! তুমি আমাব মহিষী বটে, কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে আমাব কযেকটি কথা জিজ্ঞাস্য আছে। তুমি বিনা মূল্যে পুবন্দবেব গৃহে বাস কব কেন?"

হিরণ্ময়ী অধোবদন হইলেন। বাজা পুনবপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাব দাসী অমলা সর্ব্বদা পুবন্দরের গৃহে যাতাযাত কবে কেন?"

হিবণ্ময়ী আরও লজ্জাবনতমুখী হইয়া রহিলেন, 'ভাবিতেছিলেন বাজা মদনদেব কি সর্ব্বজ্ঞ?"

তখন রাজা কহিলেন, "আর একটা গুরুতব কথা আছে। তুমি পরনারী হইযাও পুরন্দরপ্রদত্ত হীবকহার গ্রহণ কবিযাছিলে কেন?"

এবার হিবণ্ময়ী কথা কহিলেন। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র, জানিলাম আপনি সর্ব্বজ্ঞ নহেন। হীবকহাব আমি ফিবাইয়া দিযাছি।"

রাজা। তুমি সেই হাব আমাব নিকট বিক্রয কবিয়াছ। এই দেখ সেই হাব।

এই বলিয়া রাজা কৌটাব মধ্য হইতে হার বাহিব কবিযা দেখাইলেন। হিবণ্ময়ী হীরকহার চিনিতে পাবিয়া বিস্মিতা হইলেন। কহিলেন, "আর্য্যপুত্র, এ হাব কি আমি স্বযং আসিযা আপনাব কাছে বিক্রয় কবিয়াছি?"

রা। না, তোমার দাসী বা দূতী অমলা আসিযা বিক্রয করিযাছে। তাহাকে ডাকাইব?

হিবণ্ময়ীব অমর্ষান্বিত (অসহিষ্ণু) বদনমণ্ডলে একটু হাসি দেখা দিল। বলিলেন, "আর্য্যপুত্র! অপরাধ ক্ষমা করুন। অমলাকে ডাকাইতে হইবে না—আমি এ বিক্রয় স্বীকার করিতেছি।"

এবার রাজা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "স্ত্রীলোকের চরিত্র অভাবনীয়। তুমি পবেব পত্নী হইয়া পুরন্দরের নিকট কেন এ হাব গ্রহণ কবিলে?"

হি। প্রণয়োপহার বলিযা গ্রহণ কবিযাছি।

রাজা আবও বিস্মিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি? কি প্রকাবে প্রণয়োপহাব?"

হি। আমি কুলটা। মহারাজ! আমি আপনাব গ্রহণের যোগ্য নহি। আমি প্রণাম কবিতেছি, আমাকে বিদায় দিন। আমাব সঙ্গে বিবাহ বিস্মৃত হউন।

হিরণ্ময়ী রাজাকে প্রণাম করিয়া গমনোদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে রাজার বিস্ময়বিকাশক মুখকান্তি অকস্মাৎ প্রফুল্ল হইল। তিনি উচ্চৈর্হাস্য করিয়া উঠিলেন। হিরণ্ময়ী ফিরিল।

রাজা কহিলেন, "হিরণ্ময়ী! তুমিই জিতিলে,—আমি হারিলাম। তুমি কুলটা নহ, আমিও তোমার স্বামী নহি! যাইও না।"

হি। মহারাজা! তবে এ কাণ্ডটা কি, আমাকে বুঝাইয়া বলুন। আমি অতি সামান্যা স্ত্রী—আমার সঙ্গে আপনার তুল্য গম্ভীরপ্রকৃতি রাজাধিরাজের রহস্য সম্ভবে না।

রাজা হাস্যত্যাগ না করিয়া বলিলেন, "আমার ন্যায় রাজারই এরূপ রহস্য সম্ভবে। ছয় বৎসর হইল, তুমি একখানি পত্রার্দ্ধ অলঙ্কারমধ্যে পাইয়াছিলে? তাহা কি আছে?"

হি। মহারাজ! আপনি সর্ব্বজ্ঞই বটে। পত্রার্দ্ধ আমার গৃহে আছে।

রা। তুমি শিবিকারোহণে পুনশ্চ গৃহে গিয়া সেই পত্রার্দ্ধ লইয়া আইস। তুমি আসিলে আমি সকল কথা বলিব।

হিরণ্ময়ী রাজার আজ্ঞায় শিবিকারোহণে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং তথা হইতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পত্রার্দ্ধ লইয়া পুনশ্চ রাজসন্নিধানে আসিলেন। রাজা সেই পত্রার্দ্ধ দেখিয়া, আর একখানি পত্রার্দ্ধ কৌটা হইতে বাহির করিয়া হিরণ্ময়ীকে দিলেন। বললেন, "উভয় অর্দ্ধকে মিলিত কর।" হিরণ্ময়ী উভয়ার্দ্ধ মিলিত করিয়া দেখিলেন, মিলিল। রাজা কহিলেন, "উভয়ার্দ্ধ একত্রিত করিয়া পাঠ কর।" তখন হিরণ্ময়ী নিম্নলিখিত মত পাঠ করিলেন।

"(জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখিলাম) যে, তুমি যে কল্পনা করিয়াছ, তাহা কর্ত্তব্য নহে। (হিরণ্ময়ী তুল্য সোণার পুত্তলিকে) কখন চিরবৈধব্যে নিক্ষিপ্ত করা যাইতে পারে না। তাহার (বিবাহ হইলে ভয়ানক বিপদ।) তাহার চিরবৈধব্য ঘটিবে গণনা দ্বারা জানিয়াছি। তবে পঞ্চ বৎসর (পর্য্যন্ত পরস্পরে) যদি দম্পতি মুখদর্শন না করে, তবে এই গ্রহ হইতে যাহাতে নিষ্কৃতি (হইতে পারে) তাহার বিধান আমি করিতে পারি।"

পাঠ সমাপন হইলে রাজা কহিলেন, "এই লিপি আনন্দস্বামী তোমার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।"

হি। তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছি। কেন বা আমাদিগের বিবাহকালে নয়নাবৃত হইয়াছিল— কেনই বা গোপনে সেই অদ্ভুত বিবাহ হইয়াছিল—কেনই বা পঞ্চ বৎসর অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু আর ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

রাজা। আর ত অবশ্য বুঝিয়াছ যে, এই পত্র পাইয়াই তোমার পিতা পুরন্দরের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিলেন। পুরন্দর সেই দুঃখে সিংহলে গেল।

এ দিকে আনন্দস্বামী পাত্রানুসন্ধান করিয়া একটি পাত্র স্থির করিলেন। পাত্রের কোষ্ঠী গণনা করিয়া জানিলেন যে, পাত্রটির অশীতি বৎসর পরমায়ু। তবে অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে মৃত্যুর এক সম্ভাবনা ছিল। গণিয়া দেখিলেন যে, ঐ বয়স অতীত হইবার পূর্ব্বে এবং বিবাহের পঞ্চবৎসরমধ্যে পত্নীশয্যায় শয়ন করিয়া তাঁহার প্রাণত্যাগ করিবার সম্ভাবনা। কিন্তু যদি কোন রূপে পঞ্চ বৎসর জীবিত থাকেন, তবে দীর্ঘজীবী হইবেন।

অতএব পাত্রের ত্রয়োবিংশতি বৎসর অতীত হইবার সময়ে বিবাহ দেওয়া স্থির করিলেন। কিন্তু এত দিন অবিবাহিত থাকিলে পাছে তুমি কোন প্রকার চঞ্চলা হও, বা গোপনে কাহাকে বিবাহ কর, এই জন্য তোমাকে ভয় দেখাইবার কারণে এই পত্রার্দ্ধ তোমার অলঙ্কারমধ্যে রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে বিবাহ দিয়া পঞ্চ বৎসর সাক্ষাৎ না হয়, তাহার জন্য যে যে কৌশল করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত আছে। সেই জন্যই পরস্পরের পরিচয় মাত্র পাও নাই।

কিন্তু সম্প্রতি কয়েক মাস হইল বড় গোলযোগ হইয়া উঠিযাছিল। কয়েক মাস হইল আনন্দস্বামী এ নগরে আসিয়া তোমাব দাবিদ্র্য শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তিনি তোমাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ কবেন নাই। তিনি আসিযা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তোমার বিবাহ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক কহিলেন। পরে কহিলেন. আমি যদি জানিতে পারিতাম যে, হিরণ্ময়ী একপ দরিদ্রাবস্থায় আছে তাহা হইলে আমি উহা মোচন করিতাম। এক্ষণে আপনি উহার প্রতিকাব করিবেন। এ বিষয়ে আমাকেই আপনাব ঋণী জানিবেন। আপনাব ঋণ আমি পরিশোধ কবিব। সম্প্রতি আমার আব একটি অনুবোধ বক্ষা করিতে হইবে। হিরণ্ময়ীব স্বামী এই নগবে বাস করিতেছেন। উহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ না হয়, ইহা আপনি দেখিবেন। এই বলিয়া তোমার স্বামীব পরিচয়ও আমাব নিকটে দিলেন। সেই অবধি অমলা যে অর্থব্যয়েব দ্বারা তোমাব দাবিদ্র্যদুঃখ মোচন কবিযা আসিতেছে, তাহা আমা হইতে প্রাপ্ত। আমি তোমার পিতৃগৃহ ক্রয় করিযা তোমাকে বাস কবিতে দিযাছিলাম। হাব আমিই পাঠাইয়াছিলাম—সেও তোমাব পরীক্ষার্থ।"

হি। তবে আপনি এ অঙ্গুরীয় কোথায় পাইলেন? কেনই বা আমাব নিকট স্বামিরূপে পরিচয় দিয়া, আমাকে প্রতারিত করিয়াছিলেন? পুরন্দরের গৃহে বাস কবিতেছি বলিযা কেনই বা অনুযোগ করিতেছিলেন?

রাজা। যে দণ্ডে আমি আনন্দস্বামীর অনুজ্ঞা পাইলাম, সেই দণ্ডেই আমি তোমার প্রহবায লোক নিযুক্ত করিলাম। সেই দিনই অমলা দ্বারা তোমার নিকট হাব পাঠাই। তাব পর অদ্য পঞ্চম বৎসব পূর্ণ হইবে জানিযা, তোমার স্বামীকে ডাকাইয়া, কহিলাম, তোমার বিবাহবৃত্তান্ত আমি সমুদায় জানি। তোমার সেই অঙ্গুরীয়টি লইয়া একাদশ দণ্ড রাত্রেব সময়ে আসিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিলন হইবে।' তিনি কহিলেন যে, মহারাজেব আজ্ঞা শিবোধার্য্য, কিন্তু বনিতার সহিত মিলনের আর স্পৃহা নাই। না হইলেই ভাল হয়। আমি কহিলাম, আমার আজ্ঞা। তাহাতে তোমার স্বামী স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু কহিলেন যে, 'আমাব সেই বনিতা সচ্চরিত্রা কি দুশ্চরিত্রা, তাহা আপনি জানেন। যদি দুশ্চবিত্রা স্ত্রী গ্রহণ করিতে আজ্ঞা কবেন, তবে আপনাকে অধর্ম্ম স্পর্শিবে'। আমি উত্তর করিলাম, 'অঙ্গুরীযটি দিযা যাও। আমি তোমার স্ত্রীর চরিত্র পরীক্ষা কবিয়া গ্রহণ করিতে বলিব।' তিনি কহিলেন, 'এ অঙ্গুরীয অন্যকে বিশ্বাস কবিয়া দিতাম না, কিন্তু আপনাকে অবিশ্বাস নাই।' আমি অঙ্গুবীয লইযা তোমার যে পরীক্ষা করিয়াছি, তাহাতে তুমি জয়ী হইয়াছ।

হি। পরীক্ষা ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

এমন সময়ে রাজপুবে মঙ্গলসূচক ঘোরতর বাদ্যোদ্যম হইয়া উঠিল। বাজা কহিলেন, "রাত্রি একাদশ দণ্ড অতীত হইল—পরীক্ষার কথা পশ্চাৎ বলিব। এক্ষণে তোমাব স্বামী আসিয়াছেন, শুভলগ্নে তাঁহার সহিত শুভদৃষ্টি কর।"

তখন পশ্চাৎ হইতে সেই কক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এক জন মহাকায় পুরুষ সেই দ্বারপথে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। রাজা কহিলেন, "হিরন্ময়ি ইনিই তোমার স্বামী।"

হিরণ্ময়ী চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল—জাগ্রৎ স্বপ্নের ভেদজ্ঞানশূন্যা হইলেন। দেখিলেন, পুরন্দব!

উভয়ে উভয়কে নিরীক্ষণ করিয়া স্তম্ভিত, উন্মত্তপ্রায় হইলেন। কেহই যেন কথা বিশ্বাস কবিলেন না।

বাজা পুরন্দরকে কহিলেন, 'সুহৃৎ, হিরণ্ময়ী তোমার যোগ্যা পত্নী। আদরে গৃহে লইযা যাও। ইনি অদ্যাপি তোমাব প্রতি পূর্ব্ববৎ স্নেহময়ী। আমি দিবারাত্র ইঁহাকে প্রহবাতে রাখিযাছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে, ইনি অনন্যানুরাগিণী, তোমার ইচ্ছাক্রমে উঁহাব

পরীক্ষা করিযাছি, আমি উঁহার স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই। আপনাকে হিরণ্ময়ীর স্বামী বলিয়া পরিচিত করিয়া ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, হিরণ্ময়ীকে তোমার প্রতি অসৎপ্রণয়াসক্ত বলিয়া সন্দেহ করি। যদি হিরণ্ময়ী তাহাতে দুঃখিতা হইত, 'আমি নির্দোষী, আমাকে গ্রহণ করুন' বলিয়া কাতর হইত, তাহা হইলে বুঝিতাম যে, হিরন্ময়ী তোমাকে ভুলিয়াছে। কিন্তু হিরন্ময়ী তাহা না করিয়া বলিল, মহারাজ, আমি কুলটা, আমাকে ত্যাগ করুন'। হিরণ্ময়ী! তোমার তখনকার মনের ভাব আমি সকলই বুঝিয়াছিলাম। তুমি অন্য স্বামীর সংসর্গ করিবে না বলিয়াই আপনাকে কুলটা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা সুখী হও।"

হি। মহারাজ! আমাকে আর একটি কথা বুঝাইয়া দিন। ইনি সিংহলে ছিলেন, কাশীতে আমার সঙ্গে পরিণয় হইল কি প্রকারে? যদি ইনি সিংহল হইতে সে সময় আসিয়াছিলেন, তবে আমরা কেহ জানিলাম না কেন?

রাজা। আনন্দস্বামী এবং পুরন্দরের পিতায় পরামর্শ করিয়া সিংহলে লোক পাঠাইয়া ইঁহাকে সিংহল হইতে একেবারে কাশী লইয়া গিয়াছিলেন, পরে সেইখান হইতে ইনি পুনশ্চ সিংহল গিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তে আসেন নাই। এই জন্য তোমরা কেহ জানিতে পার নাই।

পুরন্দর কহিলেন, "মহারাজ! আপনি যেমন আমার চিরকালের মনোরথ পূর্ণ করিলেন, জগদীশ্বর এমনই আপনার সকল মনোরথ পূর্ণ করুন। অদ্য আমি যেমন সুখী হইলাম, এমন সুখী কেহ আপনার রাজ্যে কখন বাস করে নাই।"

গুরুদেব

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

পরদিন ঘনশ্যাম পুনরায় গল্প আরম্ভ করিলেন। গড়গড়ি মহাশয় বলিতেছেন ঃ

যদিও আমি নিজে এ পর্য্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করি নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত শ্রীল গোলোক চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমাদের বংশের গুরুদেব। ঠাকুর মহাশয়ের বাটী আমাদেরই গ্রামে। কিন্তু তিনি বার মাস কলিকাতাতেই থাকিতেন, কেবল প্রতি বৎসর পূজার সময় এক মাসের জন্য দেশে গমন করিতেন। আমি মনে করিলাম যে, কনিষ্ঠকে বুঝাইবার নিমিত্ত ঠাকুর মহাশয়কে অনুরোধ করি। ঠাকুর মহাশয় পূর্ব্বে একটি হোটেল করিয়াছিলেন। হোটেলের কাজে তাঁহার লাভ হয় নাই। এক্ষণে তিনি পাঁঠার দোকান করিয়াছেন। সন্ধান করিয়া আমি সেই পাঁঠার দোকানে গিয়ে উপস্থিত হইলাম। রাস্তার ধারেই দোকান। সেই দোকানে দুইটি ছাড়ানো ছাগল ঝুলিতেছিল। ঠাকুর মহাশয় তখন ব্যস্ত ছিলেন। এক জন খরিদ্দারকে তখন তিনি আধ সের মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। ঠাকুর মহাশয় বলিতেছিলেন যে, সে মাংস টাট্‌কা। খরিদ্দার বলিতেছিল যে, সে মাংস বাসি। খরিদ্দার বলিল যে, সে খাসি, ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, সে পাঁঠা। খরিদ্দার বলিল যে, পিঠের দাঁড়ার মাংস ভাল, সেই মাংস আমি লইব। ঠাকুর মহাশয় বলিলেন যে, পাঁজরার মাংস ভাল, তাহাই লইয়া যাও।

মাংস লইয়া খরিদ্দার প্রস্থান করিল, ঠাকুর মহাশয়কে আমি ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম। ঠাকুর মহাশয়ের দক্ষিণ পদ কিছু স্থূল ছিল, অর্থাৎ সে পায়ে গোদ ছিল। সেই স্থূল পাদপদ্মটি তিনি আমার মস্তকে তুলিয়া দিলেন। গোদের গাঁজ হইতে রস প্রবাহিত হইয়া আমার মস্তক সিক্ত হইল , দুই চারি ফোঁটা আমার চক্ষুর উপর দিয়া বহিয়া গেল। নানারূপ আশিস্ বচনে সম্ভাষণ করিয়া ঠাকুর মহাশয় আমাকে বাড়ীর ভিতর লইয়া যাইলেন। একখানি খোলার বাটীতে ঠাকুর মহাশয়ের দোকান ছিল। পথের ধারেই দোকান। তাহার পশ্চাতেই ভিতর দিকে খোঁয়াড়। সেই খোঁয়াড়ের ভিতর অনেকগুলি ছাগল ছিল। খোঁয়াড়টি দিন দুই প্রহরেও অন্ধকারে পরিপূর্ণ থাকে। সে নিমিত্ত কিরূপ ছাগল ও কতগুলি ছাগল তাহার ভিতর ছিল, প্রথম তাহা আমি দেখিতে পাই নাই। খোঁয়াড়ের পশ্চাতে বাটীর সর্ব্বশেষে, আর একখানি ঘর। সেই ঘরে ঠাকুর মহাশয় রন্ধন ও শয়ন করেন। এই ঘরখানির সম্মুখে একটি রোয়াক ও তাহার পর একটু উঠান ছিল। সে জন্য খোঁয়াড়ের ন্যায় এ স্থানে অন্ধকার ছিল না। ঠাকুর মহাশয় সেই রোয়াকে আমাকে বসাইলেন। কলিকাতার ও দেশের নানারূপ কথার পর, আমার ভ্রাতার কথা গুরুদেবকে আমি বলিলাম। কিন্তু গুরুদেব আমার সে কথায় বড় কান দিলেন না। এই সম্বন্ধে তিনি যাহা কিছু বলিলেন, আমার ভ্রাতার পক্ষেই তাহা তিনি বলিলেন। "সে বিশেষ কোন মন্দ কাজ করে নাই, বয়সকালে এইরূপ সকলেই করিয়া থাকে, বড় হইলে তাহার চরিত্র সংশোধিত হইয়া যাইবে," এইরূপ ভ্রাতার পক্ষ হইয়াই তিনি আমাকে বুঝাইলেন। লোকপরম্পরায় আমি ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের সহিত

আমার ভ্রাতার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। ঠাকুর মহাশয়ের বয়ঃক্রম পঞ্চাশের অধিক, আমার ভ্রাতার ইয়ার তিনি নহেন।

কিন্তু অনেকগুলি খোলার বাটী-নিবাসিনীদিগের সহিত ঠাকুর মহাশয়ের আলাপ পরিচয় ছিল, কারণ, তাহাদের বাটী ফলাহার করিয়া তিনি বাসা-খরচ বাঁচাইতেন ও দক্ষিণা গ্রহণে যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতেন। আমি শুনিয়াছিলাম যে, ঠাকুর মহাশয়ের উদ্যোগে দুই একজন খোলার বাটী-নিবাসিনীর সহিত আমার ভ্রাতার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। কিন্তু এ সকল কথা আমি বিশ্বাস করি নাই। এক্ষণে মনে সন্দেহ হইল যে, গুরুর যে ভাবে চলিতেছে, সেই ভাবে চলিলে গুরুদেবের লাভ আছে, নিতান্ত অলাভ নাই। কথোপকথন করিতে করিতে খোঁয়াড়ের ভিতর হইতে ছাগলদিগের কাতরসূচক চীৎকার আমি বার বার শুনিতে পাইলাম। অনেকক্ষণ সেই স্থানে বসিয়া এখন আর আমার ততটা অন্ধকার বোধ হইল না। আমি দেখিলাম যে, ছাগলগুলি অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় ও পিপাসায় তাহারা ছট্‌ফট্ করিতেছে। খোঁয়াড়ে স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। তাহার ভিতর দশটি ছাগল ধরে কি না সন্দেহ। কিন্তু ঠেশা-ঠেশি করিয়া ঠাকুর মহাশয় পঁচিশটির অধিক ছাগলে তাহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। অতি কষ্টে গায়ে গায়ে ঠেশা-ঠেশি করিয়া তাঁহারা দাঁড়াইয়াছিল, শয়ন করিবার স্থান একেবারেই ছিল না।

আমি বলিলাম, "ঠাকুর মহাশয়! আপনার ছাগলগুলির বোধহয় বড় জল পিপাসা পাইয়াছে।"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "দুই একদিনের মধ্যে সমুদয় শেষ হইয়া যাইবে। জল দিবার আর আবশ্যক নাই।"

আমি বলিলাম,—"উহাদের ক্ষুধাও বোধহয় পাইয়াছে।"

গুরুদেব বলিলেন,—"ক্ষুধা নিশ্চয় পাইয়াছে। আজ তিন দিন উহাদিগকে ক্রয় করিয়া আনিয়াছি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "উহাদিগকে কি খাইতে দেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "খাইতে! খাইতে আবার কি দিব! খাইতে দিলে আর ব্যবসা চলে না।"

আমি বলিলাম, "এরূপ কয় দিন ইহারা অনাহারে থাকে?"

গুরুদেব বলিলেন, "সাত আট দিনের অধিক ইহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হয় না। সাত আট দিনের মধ্যেই এক এক খেপ শেষ হইয়া যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "একটু একটু জল পান করিতে দেন না কেন?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "উহারা গায়ে গায়ে দাঁড়াইয়া আছে। পিপাসায় উহাদের জ্ঞান নাই। জল দিলে বড়ই গোলমাল করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এ সাত আট দিন একটু জল পর্য্যন্ত উহারা পায় না?"

গুরুদেব বলিলেন, "পূর্ব্বে দুই এক দিন অন্তর এক আধ কলসী জল দিতাম। কিন্তু জল দেখিলে তাহা পান করিবার নিমিত্ত বড়ই হুড়ামুড়ি করে। সে জন্য আর দিই না।"

খোঁয়াড়ের দিকে একটু নিরীক্ষণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এগুলি কি খাসি?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "খাসি! খাসি কোথায় পাইব! খাসির দাম দিবে কে? দুই পয়সা উপার্জ্জন হইবে বলিয়া ব্যবসা করিতেছি। খাসির মাংস দিলে কি আর চলে!"

আমি বলিলাম, "পাঁঠাও তো নয়!"

গুরুদেব বলিলেন, "পাঁঠা! তুমি পাগল! পাঁঠার দাম কত! লোককে দেখাইবার নিমিত্ত কেবল তিন চারিটা পাঁঠা রাখিয়াছি। বাকিগুলি পাঁঠী।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "পাঁঠী। স্ত্রী পশু না খাইতে নাই?"

গুরুদেব উত্তর করিলেন, "আমি নিজে খাই না, আমি বিক্রয় করি। আমার শিষ্য যজমান আছে। মাছ-মাংস একেবারেই আমি খাই না। সকলেই জানে যে, গোলোক চক্রবর্ত্তী নিষ্ঠাবান্ সদ্‌ব্রাহ্মণ। লেখা-পড়া জানি না, নিজের নামটিও সই করিতে পারি না, ঢেরা দিয়া সারি। তবুও দেখ, এই নিষ্ঠার জন্য তোমার বাপ-মায়ের কল্যাণে সকলেই আমাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।"

আমাদের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় বাহিরে একজন খরিদদার আসিয়া উপস্থিত হইল। ঠাকুর মহাশয় তাড়াতাড়ি বাহিরে গমন করিলেন। খরিদদারের সহিত তাঁহার কথা-বার্ত্তায় আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সে পাঁঠার মাংস ভিন্ন অন্য মাংস লইবে না; পাঁঠা তাহাকে দেখাইয়া তৎক্ষণাৎ কাটিয়া দিতে হইবে। তাহার জন্য সে অধিক মূল্য দিতে প্রস্তুত আছে। খোঁয়াড়ের ভিতর যে তিন চারিটি পাঁঠা ছিল, তাহার একটিকে ঠাকুর মহাশয় অনেক কষ্টে বাহির করিয়া খরিদদারকে দেখাইলেন। ক্রেতার তাহা মনোনীত হইল। তাহার পর ঠাকুর মহাশয় সেই পাঁঠাকে বাটীর ভিতর আনিলেন। যে স্থানে আমি বসিয়াছিলাম, তাহার নিকটে দুইটি খোঁটা ভূমিকে প্রোথিত ছিল। পাঁঠাকে ফেলিয়া ঠাকুর মহাশয় তাহাকে সেই খোঁটায় বাঁধিলেন। তাহার পর, তাহার মুখদেশ নিজের পা দিযা মাড়াইয়া জীয়ন্ত অবস্থাতেই মুণ্ডদিক হইতে ছাল ছাড়াইতে আরম্ভ করিলেন। পাঁঠার মুখ গুরুদেব মাড়াইয়া আছেন, সুতরাং সে চীৎকার করিয়া ডাকিতে পারিল না। কিন্তু তথাপি তাহার কণ্ঠ হইতে মাঝে মাঝে এরূপ বেদনাসূচক কাতরধ্বনি নির্গত হইতে লাগিল যে, তাহাতে আমার বুক যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তাহার পর তাহার চক্ষু দুইটি! আহা! আহা! সে চক্ষু দুইটির দুঃখ আক্ষেপ ও ভর্ৎসনাসূচক ভাব দেখিয়া আমি যেন জ্ঞান-গোচরশূন্য হইয়া পড়িলাম। সে চক্ষু দুইটির ভাব এখনও মনে হইলে আমার শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। আমি বলিয়া উঠিলাম, "ঠাকুর মহাশয়! ঠাকুর মহাশয়! করেন কি? উহার গলাটা প্রথমে কাটিয়া ফেলুন। প্রথমে উহাকে বধ করিয়া তাহার পর উহার চর্ম্ম উত্তোলন করুন।"

ঠাকুর মহাশয় উত্তর করিলেন, "চুপ! চুপ! বাহিরের লোক শুনিতে পাইবে। জীয়ন্ত অবস্থায় ছাল ছাড়াইলে ঘোর যাতনায় ইহার শরীর ভিতরে ভিতরে অল্প অল্প কাঁপিতে থাকে। ঘন ঘন কম্পনে ইহার চর্ম্মে এক প্রকার সরু সরু সুন্দর রেখা অঙ্কিত হইযা যায়। এরূপ চর্ম্ম দুই আনা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। প্রথম বধ করিয়া তাহার পর ছাল ছাড়াইলে সে চামড়া দুই আনা কমমূল্যে বিক্রীত হয়। জীয়ন্ত অবস্থায় পাঁঠার ছাল ছাড়াইলে আমার দুই আনা পয়সা লাভ হয়। ব্যবসা করিতে আসিয়াছি, বাবা! দয়া-মায়া করিতে গেলে আর ব্যবসা চলে না।"

ঠাকুর মহাশয় এইরূপ বলিতে লাগিলেন, আর ও দিকে তাঁহার হাত চলিতে লাগিল। সিদ্ধহস্ত! শীঘ্রই অনেক চর্ম্ম তিনি তুলিয়া ফেলিলেন। আর একবার আমি পাঁঠার চক্ষু দুইটির দিকে চাহিয়া দেখিলাম। সেই চক্ষু দুইটি যেন আমাকেও ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, "আমি দুর্ব্বল, আমি নিঃসহায়, এ ঘোর যাতনা তোমরা আমাকে দিলে, মাথার উপর ভগবান কি নাই!"

আমি এ নিষ্ঠুর দৃশ্য আর দেখিতে পারিলাম না। তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম।

বাসায় প্রত্যাগমন করিযা ভ্রাতাকে পুনর্ব্বার আমি অনেক বুঝাইলাম ও তাহাকে দেশে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু কিছুতেই সে আমার সহিত দেশে গমন করিল না। নিরাশ হইয়া পর দিন আমি একেলাই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম।

দেশে প্রত্যাগমন করিয়া কিছুদিন পবে শুনিলাম যে, যে দিন ঠাকুর মহাশয়েব সহিত আমার কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, ঠিক তাহার পরদিন পুনরায় যখন তিনি ঐরূপ চর্ম্মোত্তোলন কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন, সেই সময় পুলিশের লোকে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে এই কাজের নিমিত্ত তাঁহাব আবও তিনবাব জবিমানা হইযাছিল। সে জন্য এবাব তাঁহাব কিছু অধিক অর্থ দণ্ড হইল।

ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায পবিত্যাগ করিয়া কিছু দিন পরে গুরুদেব দেশে প্রত্যাগমন কবিলেন। দেশে আসিয়া তিনি সকলেব নিকট বলিযা বেড়াইতে লাগিলেন যে, জীবন্ত ছাগলের চর্ম্ম উত্তোলন বিষয়ে আমিই কলিকাতার পুলিশের নিকট সংবাদ দিয়াছিলাম, আমা হইতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। লোকের নিকট এইরূপ বলিয়া তিনি আমাকে অভিশাপ প্রদান করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ ছিলাম। কিন্তু কেহই আমাব কথা বিশ্বাস কবিল না। সকলেই আমাকে ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই বলিল যে, যে লোক গুরুর সর্ব্বনাশ করিতে পারে, তাহাব মত পাষণ্ড আব জগতে নাই।

এই পর্য্যন্ত বলিয়া ঘনশ্যাম সে রাত্রি গল্প বন্ধ করিলেন।

বিরহে পাগল

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

রাজা উর্বশীকে পাইয়া কৃতার্থ হইযাছেন। ভরতমুনির শাপে উর্বশীরও বর হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশীকে রাজার হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। পাটবানী সতীনপনা ভুলিয়া উর্বশীকে ভগিনী বলিয়া মনে কবেন। সুতরাং রাজা ও উর্বশী দুইয়ে এখন এক। রাজা যদি মহাদেব হইতেন, হয় ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্তি হইয়া যাইতেন। এ প্রণয়-মিলনে যে সুখ, রাজাব তাহাব চরম হইয়া উঠিযাছে। কিন্তু বাজধানী আর ভাল লাগিতেছে না। এখানে লোকজন অনেক, কাজকর্ম অনেক, ব্যাঘাত অনেক, সুতরাং এ জায়গাটা ছাড়িতে হইবে। এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে রাজা দেখিবেন উর্বশী আর উর্বশী দেখিবেন রাজা। তবেই তো মিলনের চরম হইবে। তবেই তো দ্বৈতভাবে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে। জায়গাটাও মনোরম হওযা চাই, নেহাৎ মরুভূমিতে হইবে না, বনে জঙ্গলে হইবে না, পাহাড় পর্বতেও হইবে না। যেখানে ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ, শ্রম, ক্লান্তি, ইহার একটিও থাকিবে অথবা একটুও থাকিবে, সেখানেও অদ্বৈতভাবের ব্যাঘাত হইবে। তাই উর্বশী স্থির কবিলেন, গন্ধমাদন যাইতে হইবে। বরফের পাহাড়ের নিকটে, অথচ তত শীত নহে, তত বরফ পড়ে না, এমন জাযগায় গন্ধমাদন নামে এক পর্বত আছে। পর্বতের গায়ে, পাশে, মাথায কেবল ফুল ফুটিয়া আছে। ফুলেব গন্ধে যে শুধু চারিদিক্ আমোদ করিযা আছে, এমন নহে, এ গন্ধে লোকেও পাগল হয। কেহ কেহ বলে, সেখানে গেলে লোকে কেবল হাসিতে থাকে, এত হাসি হাসে যে হাসিতে হাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফুলেব ধূলায় আকাশ ভরিয়া যায়। বদরিকাশ্রমেব উত্তবে বরফের পাহাড়েব ঠিক নীচে এইরূপ একটি পাহাড আছে, উহাকেই গন্ধমাদন বলে। শীতকালে বরফ পড়ে। গরমেব সময় বরফ গলিয়া গিয়া নানারূপ সুগন্ধি ফুলের গাছ গজাইযা উঠে। বর্ষায় যখন ফুল ফুটে, তখন গন্ধমাদন নামটি সার্থক হয।

উর্বশী রাজাকে বলিলেন, 'চল আমবা দুজনে গন্ধমাদন যাই। সেখানে আমাদেব সঙ্গে আর কেহই থাকিবে না। রাজ্যের ভাব মন্ত্রীদেব উপব দাও, নিশ্চিন্ত হইযা আমরা দুজনে সেখানে থাকি। চাকর-চাকরানী, খানসামা খিদমদগার কিছুরই দরকাব নাই। তোমাব সঙ্গে কেবল থাকিবে তোমাব অপরূপ রূপ আর সে রূপ দেখিবাব জন্য থাকিবে কেবল আমাব দুটি চক্ষু। সে পাহাড়ের উপব দিয়া একটি নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে, ধীবে ধীবে বহিতেছে বলিয়া দেবতারা তাহাব নাম বাখিয়াছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর দুই দিকে এখন প্রকাণ্ড চড়া, সে চড়ায় কেবল বালি! চল, সেই চড়ায গিয়া আমরা বেড়াই। প্রণযেব মিলনেব সেই তো স্থান।'

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা বাজা ও উর্বশী মন্দাকিনীব তীবে গন্ধমাদন পর্বতে একেবারে জনশূন্য স্থানে পরম সুখে বাস কবিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ হইতে তফাৎ হইয়া তথায় তাঁহারা

দুজনেই—নতুন জগৎই বল, আর নতুন স্বর্গই বল, বা নতুন বৈকুণ্ঠই বল, নতুন সুখাবতীই বা বল, গড়িয়া লইলেন।

তাঁহারা কিরূপ সেখানে কালযাপন করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস সে কথা বলেন নাই। কিন্তু সেটা সকলেই মনে মনে আঁচিয়া লইতে পারেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। গ্রীষ্ম যায়—বর্ষা আসে, এমন সময় একটি বিদ্যাধরের মেয়ে দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উর্বশীর একটুও সহ্য হইল না। যেখানে ভালবাসার মাত্রাটা বড় বেশি, সেখানে রাগের মাত্রাও খুব বেশি। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আর একজনের দিকে চাহিবে! উর্বশী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, উর্বশীর রাগ পড়িল না। তিনি রাগে গর-গর হইয়া মন্দাকিনীর বালির উপর দিয়া চলিলেন, রাজাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অনেক দূর গিয়া উর্বশী একটি বাগান দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন বাগানে ঢুকিতে গেলেন, অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাজা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কোথাও উর্বশী নাই। রাজা তখন একা—একেবারে একা। একজন সঙ্গী ছিল, তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ যে ভয়ানক একা! তাহার উপর গন্ধমাদনের গন্ধ। সে গন্ধে অন্য লোক তো একেবারেই পাগল হয়। তাহার উপর এই অদ্ভুত বিরহ! মিলনের আশাও নাই। কালিদাস একবার এইরূপ বিরহে ফেলিয়া বেচারা যক্ষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাই সে জড় পদার্থ মেঘকে দূত করিয়া আপন স্ত্রীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার তো আশা ছিল, বৎসরের পর আবার মিলন হইবার আশা ছিল। সে সেই আশায় বুক বাঁধিয়াছিল, তবে বর্ষা আসায় তাহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল, তাই সে একটু পাগলামী করিয়াছিল। কিন্তু এবার তো সে আশা নাই। উর্বশী অপ্সরা, সে অদৃশ্য হইয়া গেল, কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই। যদি আসে তো কবে আসিবে, তাহার ঠিকানা নাই, তাহাতে স্থানটা গন্ধমাদন, আবার বর্ষা আসিতেছে। সুতরাং রাজা একেবারে পাগল হইয়া গেলেন—উন্মাদ পাগল হইয়া গেলেন। এ দিকে উর্বশী ও দিকে উর্বশী ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিন-রাত্রি নাই, কেবল ছুটাছুটি। এমন সময়ে মেঘ উঠিল। রাজার বা যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাও লোপ হইল। ভালবাসার সামগ্রী কাছে থাকিলেও মেঘ উঠিলে মনটা কেমন কেমন করে, কি যেন হারাইয়াছি, হারাইয়া যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়, তাহা পাইব কি না ভাবিয়া অধীর হইতে হয়। রাজা যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতে তিনি যে পাগল হইবেন—উন্মাদ হইবেন—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইবেন—সব উল্টাপাল্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

কালিদাস মেঘদূতে যক্ষকে পাগল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাগল সাজাইতে পারেন নাই। এখানে রাজাকে পাগল সাজাইয়াছেন। বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—"ততঃ প্রবিশতি উন্মত্তবেশো রাজা" রাজা উন্মত্ত অর্থাৎ পাগলের বেশে প্রবেশ করিলেন। কোন কোন পুঁথিতে রাজা যে আসিতেছেন, সেটা জানাইয়া দিবার জন্য একটি প্রাকৃত গান আছে। গান যে কে গাহিল, তাহার নির্ণয় নাই, বোধ হয় নেপথ্য হইতে কেহ গাহিয়া দিল, কিন্তু নেপথ্যে বলিয়া যেমন অন্য অন্য জায়গায় লেখা থাকে, তেমন লেখা কিছুই নাই। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এ পুঁথির পাঠ নয়। নাই হউক ঠিক, কিন্তু উহাতে রাজার পাগল-বেশের একটা বর্ণনা আছে। গানে বলিতেছে—

"হাতী আপন ভালবাসার বিরহে উন্মাদ হইয়াছে, নানারূপ উল্টা পাল্টা পাগলামীর লক্ষণ দেখাইতেছে। গাছের পাতা আর ফুল ছিঁড়িয়া দেহের সম্মুখভাগটা সাজাইয়াছে, আর বনের ভিতর ঢুকিতেছে।" গান গাওয়ার পরই রাজা আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টি আকাশের

দিকে, সেটা একটা পাগলেরই লক্ষণ—সাজগোজও পাগলের মত। আসিয়াই রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—'রে দুরাত্মা রাক্ষস, তুই আমার ভালবাসার জিনিস চুরি করিয়া কোথায় যাইতেছিস্?'' খানিক্ এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন—''পাহাড়ের আগা হইতে আকাশে উঠিয়া আমার উপর তীর ছুড়িতেছিস্?'' খানিক পরে ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—''হায় হায়। এ তো দুরাত্মা রাক্ষস নয়, এ যে নতুন মেঘ। এ তো ধনুক নয়, এ যে রামধনু। এ তো বাণ নয়, এ যে বৃষ্টির ধারা। এ তো উর্বশী নয়, এ যে বিদ্যুৎ, যেন কষ্টিপাথরে সোনার দাগ!''

বোধ হয়, বৃষ্টির ধারা পাগলের মাথায় পড়ায় সে একটু সুস্থ হইল। তাঁহার জ্ঞান কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে তখন টের পাইল যাহা রাক্ষস ভাবিয়াছিল, তাহা রাক্ষস নয়, যাহাকে উর্বশী ভাবিয়াছিল, সে উর্বশী নয়। যে পুঁথির কথা পূর্বে বলিয়াছি, তাহাতে এইখানে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন লেখা আছে, আপনার ভ্রম বুঝিয়া লজ্জিত হন লেখা আছে, মেঘের কাছে মাপ চাওয়ার কথা লেখা আছে, আরও কত কি কথা আছে, কিন্তু সে সব কথা এখন আর বলিব না। যদি বারান্তরে সে সকল পুঁথির কথা বলিতে পারি, বলিব। এখন রাজার পাগলামীটি কালিদাস যেমন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাই বলি। তবে যখন অন্য পুঁথির কথা পাড়িয়া রসভঙ্গ করিয়াছি, তখন একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমার ঐ বাড়তি কথাগুলি কালিদাসের বলিয়া বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই, কালিদাস কখন কোন বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেন নাই। তিনি বেশ জানিতেন, সব অত্যাচার সহ্য যায়—রাজার অত্যাচার সহ্য যায়, ধর্মের অত্যাচার সহ্য যায়, পুলিসের অত্যাচার সহ্য যায়, ভালবাসার অত্যাচার সহ্য যায়; কবির অত্যাচার সহ্য যায় না। কবি যে কথাটি তাহার ভাল লাগিয়াছে, সেইটি ফেনাইয়া ফুলাইয়া বাড়াইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবেন, এটা কেহই সহিবে না। তাই কালিদাস কখনও কোনও জায়গায় বাড়াবাড়ি করেন না। আর বাড়াবাড়ি করেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহার এত আদর। তিনি ''জগতের কালিদাস'' হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজা বলিলেন—''তাই ত, এ যদি মেঘ, রাক্ষস নয়, ওটা যদি বিদ্যুৎ, উর্বশী নয়, তবে উর্বশী গেল কোথায়? সে ত অপ্সরা, বড় রাগ হইয়াছে বলিয়া কি দেবশক্তিতে লুকাইয়া আছে? তাত হ'তে পারে না। সে বেশিক্ষণ রাগ করিয়া থাকে না। তবে কি সে স্বর্গে চলিয়া গেল? সেও ত হ'তে পারে না, আমার উপর তার যে বড় টান। তবে কি তাহাকে কেহ হরিয়া লইয়া গিয়াছে? সেও ত হ'তে পারে না, অসুরেও আমার কাছ থেকে তাকে হরিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তবে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এ ব্যাপারটা কি?'' রাজা একবার এদিক্, একবার ওদিক্, একবার ডাহিনে, একবার বামে দেখিতে লাগিলেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—''যাদের ভাগ্য মন্দ, তাদের দুঃখের পর দুঃখই আসে। এই দেখ না—একে ত উর্বশী কাছে নাই, আমি যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছি, তাহার উপর আবার মেঘ দেখা দিতেছে। দিনে আর গরম থাকিবে না, আমার সমস্ত দিনই বিরহেই কেবল ছট্‌ফট করিতে হইবে। তাই বা কেন হইবে? কেনই বা কষ্ট পাইব? মুনিরা ত বলেন, 'রাজা কালস্য কারণম্।' আমিই যদি কালের কারণ হইলাম, আমি কেন বলি না, বর্ষা, তুমি এখন আসিও না। তাহা হইলেই ত সব চুকিয়া যায়। কিন্তু তাও কি হয়? আমি যে রাজা বনে একলা রহিয়াছি, তবুও ত আমি রাজা। আমার ত রাজার চিহ্ন কিছুই নাই, কিন্তু বর্ষাকাল যে আমার সব রাজচিহ্ন আনিয়া দিতেছে। দেখ না, মেঘ আমার চাঁদোয়া হইয়াছে। রাজার চাঁদোয়ায় সোনার কাজ করা থাকে, বিদ্যুৎগুলিই সে সোনালির কাজ। রাজার চামর থাকে, হিজল গাছের বড় বড় মঞ্জরীগুলি চামরের কাজ করিতেছে। রাজার ভাট-চারণ থাকে, মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরেরা ডাকিতেছে, তাহাতেই ভাট-চারণের কাজ হইতেছে। সওদাগরেরা

রাজাকে ভেট দেয়; পাহাড়গুলাই সওদাগর হইয়াছে আর পাহাড়ের গা ধুইয়া কত কি আমার নিকটে আসিয়া পাড়িতেছে, তাহাই আমার ভেট হইতেছে।

দূর হউক ছাই, ও সব কথা আর ভাবিব না। বেশভূষার গরব ক'রে আর কি হবে? যাই, তাহারই সন্ধানে যাই—যার বিহনে সব অন্ধকার দেখিতেছি। এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে একটি ভূঁই-চাঁপা ফুল রাজার চোখে পড়িয়া গেল, তাঁহার বোধ হইল যেন, তাঁহার "ভালবাসার"র চোখটি দেখিতে পাইলেন। রাগে যেন উর্বশীর চোখে জল আসিয়াছে, আব চোখের কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ভূঁইচাপার পাপড়ীগুলি একটু লাল্চে হয়, আর বর্ষায় তাহার ভিতরে জল থাকে। ভূঁইচাঁপা দেখিয়া রাজা অধীর হইয়া উঠিলেন,—বলিলেন, তিনি যে কোন্ পথে গিয়াছেন, কেমন করিয়া টের পাইব? বনের বালিতে বর্ষার জল পড়িয়াছে, তাহর উপর দিয়া যদি তিনি চলিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তো তাঁহার পায়ের দাগ দেখিয়াই চিনিতে পারি। কারণ, সে দাগটি পিছন দিকে গভীর হইবে, আর সে দাগের পাশে আল্তার দাগ থাকিবে।

এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া, আনন্দে আটখানা হইয়া রাজা বলিলেন, "বাঃ, বাঃ! পেয়েছি—পেয়েছি। এই যে তাঁহার বুকের কাপড়, সবুজ চেলি, ঠিক যেন শুক পাখীর পেটের রঙ্। রাগে যখন তাঁর চোখের জল পড়িযাছে, সে জল ঠোঁটের উপর পড়িয়াছে। লাল রঙকরা ঠোঁটে লাল রঙ গলিয়া সে জল লাল হইয়া গিয়াছে, আব বুকের কাপড়ে পড়িয়াছে। বোধ হয়, রাগে চলিয়া যাইবার সময কাপড়খানি খসিয়া পড়িয়াছে।" বেশ করিয়া কাপড়খানি রাজা ঠাহরাইয়া দেখিলেন আর বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! এ যে কাপড় নয়, ঘাসেব জমিব মাঝে মাঝে ইন্দ্রকীট বহিযাছে।"

ইন্দ্রকীট নামে রাঙা বাঙা ছোট্ট ছোট্ট এক রকম পোকা আছে। বর্ষাব প্রথম ভাগে তাহাবা মাঠেব অনেক জাযগা ছাইয়া থাকে। ঘাসেব জমির উপর ইন্দ্রকীটের ঝাঁক পড়ায় সবুজ চেলির উপর রঙ গোলা চোখেব জলের মত বোধ হইতেছিল।

এ নির্জন বনে কাহাব কাছে তাহাব সন্ধান পাই বলিয়া পাগল চাবিদিকে চাহিতে লাগিল, দেখিল, একটা ময়ূর, বর্ষার জলে যে জাযগায় শিলাজতু ভিজিয়া বহিযাছে, তাহারই একটা পাথরের উপর আনন্দেতে ঘাড় উচা করিয়া কেকা বব কবিবাব চেষ্টায আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিল, "ময়ূব হে, তুমি কি আমাব প্রিযাকে দেখিযাছ? সে এই বনে কোথায আছে কি বলিতে পার?"

গেল যা! আমাব কথার জবাব না দিযাই নাচিতে লাগিল। নাচে কেন? কিসে ওর এত আনন্দ হয়েছে? বুঝেছি—বুঝেছি, আমাব ভালবাসার ধন নাশ হইয়াছে, ময়ূরের বড় আনন্দ। এত দিনে উহার পেখমের আব কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তাই এত আনন্দ। উর্বশীব খোঁপা যখন খুলিয়া যাইত, আর তাহাব ফুলগুলি দেখা যাইত, তখন যে কেহও ময়ূরের পেখমেব দিকে চাহিতও না। আজ সে নাই, তাই এত আনন্দ। যাক্ যাক্, পরের দুঃখে যার সুখ, সে পাষণ্ডকে কোন কথা আব জিজ্ঞাসা কবিব না।

বাঃ! এই যে এদিকে একটি কোকিলা জামগাছেব ডালে ব'সে আছে। আজ ওর ভাবি আনন্দ; গ্রীষ্ম শেষ হইয়াছে, বেশ ঠাণ্ডা পড়িযাছে। পাখীর মধ্যে কোকিলই পণ্ডিত, আমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

ওহে কোকিল, তুমি তো মদনের দূত, মান ভাঙাতে তোমাব মত এ দুনিযায আর কে আছে? হয় তাকে আমাব কাছে এনে দাও, না হয় আমায তার কাছে নিযে চল। কি বল্লে? আমি তাকে এত ভালবাসি, তবে সে কেন চ'লে গেল? শোন তবে. সে চটেছে; কিন্তু কেন, সে কথা আমি বলিতে পারি না। আমি তাঁব কাছে এতটুকুও অপরাধ করি নাই। স্ত্রী তো স্বামীর প্রভু, যা খুশি করিতে পারে, অপবাধের অপেক্ষা তাব নাই।

এ কি? কথা কইতে কইতে আপনার কাজে মন দিলে? পরের দুঃখ যতই বড় হউক, সেটা ঠাণ্ডা। নহিলে আমি এই এত দুঃখ জানাইতেছি, আমার কথায় কান না দিয়া কোকিলটা জামের ডাঁশ ফল চুষিতে লাগিল—মনে করিয়াছে বুঝি ওর প্রিয়ার অধর।

যা হোক, ওর স্বরটি বেশ মিষ্ট—যেন উর্বশীর কণ্ঠস্বর। ওর উপর রাগ করিয়া আর কি করিব? যাই, অন্য দিকে দেখি গে।

ডান দিকে যে নূপুরের শব্দ শুনিতেছি। প্রিয়া কি এই দিকে আসিয়াছেন? যাই, দেখি গিয়া। কিছু দূর গিয়া—ছি ছি! হাঁসের শব্দ, চারিদিক্ মেঘে কাল হইয়া গিয়াছে, হাঁসগুলা মানস-সরোবরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এ তাদেরই শব্দ, নূপুরের শব্দ নয়। যতক্ষণ ইহারা মানসে না চলিয়া যায়, তারি মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁব কোন খবর পাই কি না।

ওহে পক্ষিরাজ, মানস-সরোবরে এর পর যেয়ো। মুখে পথখরচের জন্য যে মৃণালখণ্ড লইয়াছ, তাহা একবার রাখ, আমায় উদ্ধার কর, আমায় তাঁর খবর দাও, তার পর যেয়ো। সাধুলোক আপনার কাজের চেয়ে পরের উপকাবকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন।

যখন মুখ উচা করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে, তখন বোধ হয় বলিতেছে—আমরা বড় ব্যস্ত, দেখিতে পাই নাই।

যদি তুমি পুকুরের পাড়ে তাঁহাকে নাই দেখিতে পাইয়াছ, তবে তুমি তাঁহার গতিটা সমস্তই চুবি করিলে কিরূপে? তা হবে না, তুমি আমার কান্তাকে ফিরাইয়া দাও, তুমি তাঁহার ঠমকটা ত চুবি করিয়াছ, তখন তাঁহাকেও চুরি করিয়াছ। কোনও অংশ পাওযা গেলে, চোরকে সমস্ত চোরাইমাল দিতে হয়, তা বুঝি জান না? বাঃ! পাছে আমি বাজা—চোরেব শাসন করি, তাই ভয়ে উড়িয়া গেল।

আবার খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা দেখিলেন, চক্রবাক ও চক্রবাকী বেড়াইতেছে। ভাবিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে, ইহার কাছে ঠিক খবর পাইব। ওহে চক্রবাক্, আমাব ভালবাসাব যে সামগ্রী ছিল, তাঁহার নিতম্বও চক্রের মত। সে আমায ছাড়িযা গিয়াছে। আমি বড় আশা কবিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কোথায গেল, বলিতে পাব কি?

এমন সময চক্রবাক্ কক্ কক্ করিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন, ও বোধ হয় আমায় চিনে না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে 'কঃ. কঃ'? সূর্য ও চন্দ্র আমার মাতামহ আব পিতামহ; দুই স্ত্রী আমায় আপনি বরণ কবিয়াছিল,—এক পৃথিবী, আব এক উর্বশী।

বাঃ! এ যে চুপ করিয়া রহিল। তুমি তো ভারি মজার লোক হে! যদি চকী পদ্মেব পাতাব আড়ালে থাকে, তা হলেও তুমি সে কোথায় গেল, ভাবিয়া চীৎকার করিয়া দেশ মাতাইযা তোল। গৃহিণীর উপর তোমার এতই টান যে, তুমি কিছুতেই তফাৎ থাকিতে পার না। আর আমি আমার ভালবাসাব সামগ্রী হারাইয়া কাতর হইয়াছি, তুমি আমায় তাঁহার খবরটাও দিতে পারিলে না, একে আর কি বলিব, আমার ভাগ্যই মন্দ।

যাই, এখানে ত হ'ল না, অন্য দিকে যাই। রাজা দু-এক পা গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। এই পদ্মফুলটা দেখিয়া আমি আর যাইতে পারিতেছি না। এটার ভিতর একটা ভ্রমর বন্ধ আছে, আর সেটা গুণ্ গুণ্ করিতেছে। আমি অধর দংশন করিলে সে যখন ফোঁস ফোঁস করিত, তখন তাঁহার মুখখানি ঠিক এই রকমই দেখাইত। আমি ঐ ভোমরাটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এখান থেকে চলে গেলে, এর পর হয়ত দুঃখ হবে, কেন তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই?

মধুকর! আমার গৃহিণীর চোখ দুটি মত্ত-চকোরের মত, তুমি আমায় তাঁর খবর দাও।

অথবা সে সুন্দরীকে তুমি একেবারেই দেখ নাই। তাঁর মুখের সুন্দর গন্ধ যদি পাইতে, তাহা হইলে কি আর এই পদ্মফুলটার উপর তোমার আস্থা থাকিত?

যা হোক, অন্য জায়গায় যাই। এই যে একটি হাতীর সঙ্গে হাতিনী কেলিকদম্ব গাছেব কাঁধে শুঁড লাগাইয়া দাঁডাইয়া আছে। আমি তাড়াতাডি কবিব না। হাতিনী শুঁড় দিয়া একটি টাট্কা কাঁচ শল্লকীর ডাল ভাঙ্গিয়া উহাকে দিতেছে। আটায় মদেব গন্ধ বাহির হইতেছে। ও ডালটা বেচাবা খইয়া লউক, তাহার পর উহাকে বিরক্ত করিব। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হাতীর আহাব শেষ হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে হাতী, তুমি আমার স্থির-যৌবনা প্রিয়তমাকে দূর হইতেও দেখিযাছ কি?" এমন সময় হাতী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। বাজা বড খুশি: মনে করিলেন, বুঝি খবর দিবে। না হবে কেন? ও হ'ল হাতীর রাজা, আমি হলেম মানুষেব রাজা, পরস্পর একটা টান ত আছেই। দেখ ভাই, আমি হলেম রাজাদেব রাজা, তুমি হাতীব রাজা, তোমার দান অনবরত মোটাধারে ঝবিতেছে, আমার দানেরও বিরাম নাই, উর্বশী আমাব স্ত্রীলোকের মধ্যে বত্ন, তোমার হাতিনীও তোমার যূথের মধ্যে বত্ন। তোমায আমায় তফাতেব মধ্যে এই যে, আমি বিরহে কাতর, আর এ দুঃখটা তোমায কখন সহিতে হয় নাই। তা ভাই, তোমরা সুখে থাক, আমি আমাব কাজে যাই।

এই যে সুরভিকন্দব নামক একটি পাহাড দেখা যাইতেছে, এটি বড রমণীয় স্থান, অপ্সরাবা ইহাকে বড ভালবাসে। সেও ত অপ্সবা, সে কি ইহাব কাছে কোথাও আছে? বলিযা রাজা চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কি কষ্ট! মেঘে যে সব ছাইযা আছে, কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে যদি এক একটা বিদ্যুৎ চমকায, তবুও কিছু দেখা যায, তাও ত হয় না। যা হোক, পাহাড়টাকে না জিজ্ঞাসা কবিযা যাইব না। ওহে গিবিবাজ! তোমাব নিতম্ব ত বড প্রকাণ্ড, তাহারও ত তাই। তাহার বুকে জায়গা নাই; দেহের যেখানে পাপ, তাহার সেইখানটাই নীচু। সে কি তোমার কোন বনে আশ্রয় লইয়াছে?

বাঃ! চুপ করিয়া বহিল যে? দূরে আছে বলিয়া বোধ হয় শুনিতে পায নাই। কাছে গিযা জিজ্ঞাসা কবি।

গিরিবাজ, একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী বামা এই বনান্তে কি তোমাব চোখে পড়েছে? খানিক কান খাডা করিযা বাজা বলিলেন, বাঃ কি বল্ছে। চোখে পডেছে। বেশ, তবে হয ত আবও ভাল খবব শুনিতে পাইব। তবে বল ত ভাই, সে কোথায?' কান খাডা করিয়া শুনিলেন, সে কোথায? ও সর্বনাশ! এ ত প্রতিধ্বনি মাত্র, গুহামুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে। রাজা হতাশ হইয়া বসিয়া পডিলেন,—বলিলেন বড ক্লান্ত হইযাছি, এই ঝরণার ধারে ব'সে একটু তরঙ্গের বাতাস খাই।

এই নদীটি দেখিয়া আমাব মন বড় প্রসন্ন হইতেছে। উর্বশীই বুঝি আমার অপবাধেব কথা মনে কবিযা মনেব ঝাল ঝাড়িবার জন্য নদী হইয়া গিযাছে, তাঁহাব ভ্রূভঙ্গই নদীর তবঙ্গ হইয়াছে। হাঁসগুলা পাব হইতে যাইতেছে, আব নদীব টানে তাহাদেব সারিগুলি বাঁকিযা যাইতেছে, বোধ হইতেছে যে চন্দ্রহার ঝুলিতেছে, পাখীগুলা ভয পাইয়া শব্দ কবিতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝন্ঝন্ কবিতেছে। ফেনা হইয়াছে আর নদীর বেগে সবিযা সরিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন সাদাকাপড় বাগেব চোটে খসিযা খসিয়া পড়িতেছে। পাথরের উপর জল আছডাইয়া পড়িতেছে ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে রাগে চলিয়া যাইতে যাইতে উছট খাইযা পড়িতেছে।

যাহা হউক, আমি উহাব নিকট আমাব প্রার্থনা জানাই। দেখ, আমি তোমার একান্ত অনুরক্ত। কখনও মিষ্ট ছাড়া কডা কথা কই না। তুমি যা চাও, কখনও না বলি না, না বলিতে চাহিও না, আমাব কি অপরাধ দেখিলে যে, আমায ত্যাগ করিযা চলিয়া যাইতেছ? আমি ত তোমার দাস।

হায় হায়! এটা দেখিতেছি সত্য সত্য নদী, নহিলে আমায় ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্রের দিকে যাইবে কেন? সমুদ্রের নিকট অভিসার করিবে কেন? যাই হউক, কষ্ট না করিলে মঙ্গললাভ হয় না। যাই, সেইখানেই যাই—যেখানে উর্বশী অদৃশ্য হইয়াছিলেন। যাইতে যাইতে রাজা বলিলেন, ভালই হইয়াছে, তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন পাওযা গিয়াছে। এই সেই লাল কদম ফুলের গাছ, গ্রীষ্মের শেষে যাহার একটি ফুল তিনি আপনার মস্তকের ভূষণ করিয়াছিলেন, তখনও সব কেসর ফুটে নাই, উচু-নীচু হইয়াছিল। বাঃ! এই যে একটা হরিণ বসিয়া আছে, উহাকে একবার খবরের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি ঃ—

উহার রঙ গাঢ় কাল। বনশোভা দেখিবার জন্য কাননশ্রী যেন আপনার কটাক্ষ ফেলিয়া রাখিয়াছেন। । কবিরা কটাক্ষকে কাল বলিয়া বর্ণনা করেন। মৃগের রঙ কাল, যেন কাননশ্রীর কটাক্ষ। ।

কি, আমায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিবাইয়া লইল! না না, মৃগী উহার নিকটে আসিতেছিল, মৃগশিশু স্তনপানের ইচ্ছায় উহাকে আসিতে দিতেছে না। তাই একদৃষ্টে গলা বাঁকাইয়া সেই দিকেই চাহিয়া আছে। অহে যূথপতি, আমার তাঁহাকে কি বনে দেখিয়াছ? তাঁহার লক্ষণ বলিয়া দিই, শোন। তোমার প্রিয়ার যেমন বড় বড় চোখ, তাঁহাবও তেমনি। ইহাকেও দেখিতে যেমন সুন্দর, তিনিও তেমনি সুন্দর।

এ কি, আমার কথা শুনিল না, স্ত্রীর দিকেই চাহিয়া রহিল। হ'বেই ত—অবস্থা খারাপ হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে। আমি এখান থেকে—আগ্রহ সহকারে দেখিয়া পাথরের ফাটলেব মধ্যে এ কি দেখা যাইতেছে? প্রভায় চারিদিক্ লেপিয়া ফেলিয়াছে। অথচ সিংহের মাবা হরিণের মাংস ত নয়। আগুনেব ফুলকি হইবে কি? তাহাও ত হইতে পারে না। কাবণ, আকাশ হইতে এইমাত্র বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। (ভাল করিয়া দেখিয়া) লাল অশোক-থোলোর মত একটি মণি। সূর্য যেন ইহাকে তুলিযা লইবাব জন্য হাত বাড়াইতেছেন।

মণি আমাব মন হরণ করিতেছে। তুলিয়া লই। অথবা তুলিয়া লইয়াই বা কি কবিব? কাহার মাথায় এ মণি দিব? মন্দারফুলের সুগন্ধি যাহাব মাথায় এই মণি দিব, তাঁহাকেই পাইতেছি না। কেন শুধু চোখের জলে এই এমন মণিটি মলিন করিব?

রাজা এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় কে নেপথ্য হইতে বলিয়া দিল,—'বৎস, এই মণি তোমাদের মিলন করাইয়া দিবে। পার্বতীর পায়ের আল্‌তায় এই মণির উদ্ভব। কাছে রাখিলে শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছিতকে পাইবে।'

রাজা কান খাড়া করিয়া এই সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন, "আমায় এই উপদেশ কে দিতেছেন, বোধ হয়, কোনও মুনি এ কথা বলিলেন, ভগবান্, আপনি উপদেশ দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন।" মণিটি তুলিয়া লইয়া রাজা বলিলেন—"হে মণি, তোমাব কল্যাণে যদি আমি তাঁহাকে পাই, তাহা হইলে, শিব যেমন চন্দ্রকলাকে আপনাব শিরোভূষণ করিযাছেন, আমিও তেমনই তোমাকে আমার শিবোভূষণ করিব।"

কিছু দূর গিয়া রাজা একটি লতা দেখিলেন, তাহাতে একটিও ফুল নাই, তথাপি দেখিযাই তাহার প্রতি তাঁহার বড়ই ভালবাসা হইল। বলিলেন, "লতাটি যেন উর্বশী। মধুকরেব শব্দ নাই, লতাটি নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। আমি পাযে ধরিলেও আমায় ত্যাগ করিয়া গেছেন বলিযা যেন উর্বশী পস্তাইতেছেন ও চিন্তায চুপ করিযা আছেন। ফুলেব সময় চলিয়া গিযাছে বলিয়া ইহার একটিও ফুল নাই। মানিনী উর্বশী যেন সমস্ত আভবণ ত্যাগ কবিয়া শূন্য হইযা বসিয়া আছেন। মেঘের জলে লতাব সব কচি পাতাগুলি ধুইযা গিয়াছে। চোখেব জলে প্রিয়ার যেন ঠোঁট দুটির লাল বঙ ধুইযা গিযাছে। এটি ত ঠিক আমাব প্রিয়ারই মত, আমি উহাকে আলিঙ্গন করিব।" বলিযা লতাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই লতাটি উর্বশী হইযা

গেল। রাজা তাঁহার স্পর্শসুখ লাভ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বলিলেন, "এ ঠিক যেন উর্বশীরই স্পর্শ। আমার শরীর জুড়াইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বাস নাই। কতবার 'এই উর্বশী' 'এই উর্বশী' বলিয়া মনে করিয়াছি, আবার তখনই তাহা অসম্ভব হইয়া গিয়াছে, অতএব সহসা চক্ষু খুলিব না।" অনেকক্ষণ থাকিয়া চক্ষু খুলিলেন,, দেখিলেন, তাঁহার আলিঙ্গনে উর্বশী।

উর্বশী রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "এটি কার্তিকের বাগান। তিনি চিরকুমার। সুতরাং স্ত্রীলোকের এ বাগানে প্রবেশ নিষেধ। যে প্রবেশ করিবে, তখনই সে বেড়ার লতা হইয়া যাইবে। আমি রাগে এ সব কথা ভুলিয়া বাগানে ঢুকিতে গিয়া লতা হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ই ঠিক ছিল; আপনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সবই দেখিয়াছি। গৌরীব আল্‌তায় যে মণি হইয়াছে, সেই মণি আপনার সঙ্গে ছিল, তাহাবই স্পর্শে আমি আবার যা ছিলাম, তাই হইয়াছি। নিয়ম এই যে, ঐ মণিই লতাকে ফের মানুষ করিতে পারে।" রাজা এই সকল কথা শুনিয়া মণির যথেষ্ট আদর করিলেন। উর্বশী মণিটি লইয়া মাথায় রাখিলেন। উর্বশীর মুখখানি প্রভাত-সূর্যের আলোয় নতুন ফোটা পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও উর্বশী মেঘে চড়িয়া রাজধানী প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিক্রমোর্বশীর চতুর্থ অঙ্কটা বোধ হয় মেঘদূতের উপর টেক্কা। কালিদাস আপনাবই উপর আপনি টেক্কা দিয়াছেন। যক্ষদের প্রণয়ই প্রাণ। যক্ষদের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিযাছেন ঃ—তাহাদের বয়স যৌবনেই শেষ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রৌঢ়-বৃদ্ধাবস্থা নাই, কুসুমায়ুধ ছাড়া তাহাদেব অন্তক নাই অর্থাৎ তাহারা যে জীবনে কষ্টটুকু পায়, সেটুকু বিরহেরই কষ্ট, তাহাদের চেতনা যায় কখন্—যখন তাহাবা স্ত্রীসম্ভোগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মেঘদূতেও কালিদাস বলিয়াছেন ঃ—আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনও কারণে তাহাদের চক্ষে জল পড়ে না, কুসুমশরের তাপ ভিন্ন তাহাদেব আর তাপ নাই—সে তাপও ভালবাসার জিনিস পেলেই মিটিয়া যায়; তাহাদের বিচ্ছেদও প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোনও কারণেই জন্মায় না; যৌবন ভিন্ন তাহাদের অন্য বয়সও নাই। কালিদাসের মেঘদূতের কবিতাটি কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন বলিয়াই কুমারসম্ভবের শ্লোকটিও উদ্ধার করিতে হইল। যক্ষ অপরাধ করিয়াছিল, রাজকাজে অবহেলা কবিয়াছিল, তাই রাজা তাহাকে বিরহ-সাজা দিয়াছিলেন। যে হেতু, বিরহ ভিন্ন তাহাদের অন্য সাজাই নাই। বিরহের মেয়াদ এক বৎসর। সেই মেয়াদেব মধ্যে মেঘ দেখিয়া যক্ষ পাগলপারা হইয়া যায়; মেঘকে মানুষ বলিয়া মনে করে ও তাহাকে দিয়া আপনার স্ত্রীব কাছে "আমি বাঁচিয়া আছি" এই খবর দিবার চেষ্টা করে। মেঘদূতে এই পর্যন্ত।

বিক্রমোর্বশীতে কালিদাস অতি প্রাচীন কালে গিযাছেন, সৃষ্টির এক রকম গোড়ায়। ব্রহ্মা প্রথম মন হইতেই সৃষ্টি কবিতেন। প্রজাপতিরা তাঁহার মনের সৃষ্টি। দুই তিন পুরুষ এইরূপ গেলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুরূরবা সেই সময়ের লোক, তাঁহার পিতামহ চন্দ্র ও মাতামহ সূর্য। বলিতে গেলে সৃষ্টির প্রথম মানুষই তিনি। কারণ, তাঁহার পিতা বুধ দেবতা। কালিদাসের বড় বুকের পাটা, তাই তিনি প্রথম মানুষের প্রণয় ও বিরহ দেখাইবাব চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য কবি হইলে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এ প্রণয়ের পাত্র পৃথিবীতে মিলিল না। স্বর্গ হইতে অপ্সবা ধরিয়া আনিতে হইল। সেও বোধ হয়, প্রথম অপ্সরা-সৃষ্টির প্রধান অপ্সরা। এই দুই জনেব প্রণয় ও বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস অদ্ভুত গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রণয়েব কথা এবার বলিব না, বিরহের কথাই বলিব। অদ্ভুত উপায়ে বিচ্ছেদ। এই দুটিতে এক হইযা আছে—হঠাৎ একজন অদৃশ্য হইযা গেল। যে রহিল, সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। স্বভাবের অনুপম শোভার মধ্যে যে তাহাব ভালবাসার সামগ্রী খুঁজিতে লাগিল। প্রথম মেঘেব কোলে সৌদামিনী দেখিয়া মনে করিল, এই উর্বশী, কাল প্রকাণ্ড বাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। মেঘ পাহাড়েব ডগা ছাড়াইয়া উঠিল, সে মনে করিল,

রাক্ষস পলাইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে ভাবিল, রাক্ষস শত শত বাণ বর্ষণ করিতেছে। ক্রমে মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল, মেঘ, বিদ্যুৎ, পাহাড় আব জলের ধারা।

তাহার পর একটি ভুইচাঁপা ফুল দেখিল। পাপড়িগুলি একটু লাল, উপব হইতে জল পড়িয়া ফুলটি ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন উর্বশীর চোখ, রাগে চোখের কোণ একটু লাল হইয়াছে, আর জলে চোখ ভরিয়া গিয়াছে। আবার একটি নদী দেখিল; মনে হইল, তাহার শবীর। ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাগে তাহাব ভ্রূ ভাঙিয়া গিয়াছে। হাঁসগুলা সারি বাঁধিয়া নদী পাব হইতেছে, নদীর তোড়ে সে সারি বাঁকিয়া যাইতেছে, আর হাঁসগুলা প্যাঁক্ প্যাঁক করিয়া শব্দ করিতেছে। বোধ হইল যে, তাহাব চন্দ্রহাব মাঝখানে বাঁকিযা ঝুলিযা পড়িয়াছে, আর তাহাতে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ফেনা উঠিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কাপড় টানিযা লইয়া যাইতেছে। পাথবে পথেব জল আছড়াইযা পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, রাগে চলিতে চলিতে পদস্খলন হইতেছে। কিন্তু শেষ জানা গেল, সেটা স্ত্রী-লোক নহে—নদী।

আবাব একটা লতার কাছে গেল। বৃষ্টির জলে তাহাব সব কচি কচি পাতাগুলি ধুইযা গিযাছে; বোধ হইল যেন, ঠোঁটের উপর লাল বঙ করা ছিল, চোখেব জলে তাহা ধুইযা গিযাছে। এ ফুল ফুটিবার সময় নহে, সুতরাং একটি ফুল নাই। বাজা মনে কবিলেন, যেন রাগ করিয়া সে গহনা ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল নাই, ভোমরা আব শব্দ কবে না; মনে হইল যেন, মানিনী মানভরে চুপ করিয়া আছে, যেন ভাবিতেছে কেন মান কবিলাম, এত সাধিল, কেন তাবে ফেলিয়া আসিলাম?

এই ত এক রকম পাগ্‌লামী, আর এক রকম পাগ্‌লামী যাকে তাকে জিজ্ঞাসা কবা—"ওগো, আমার তাকে তুমি দেখেছ কি?" একবার ময়ূবকে জিজ্ঞাসা কবিল,—কোন জবাব নাই। একবার হাঁসকে জিজ্ঞাসা কবিল,—জবাব নাই। জবাব না পাইলে বাগ হইতেছে, ক্ষোভ হইতেছে, আপনাকে ধিক্কাব দিতেছে, অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছে। একবাব কোকিলকে জিজ্ঞাসা করিল, সে মন দিযা রাঙা রাঙা জাম চুষিযা খাইতে লাগিল। এবার তাহাব উপব রাগ নাই—"আহা, তোমাব গলার স্বর আমার তাঁর মত, তোমাব উপব রাগ করিব না।" একবার চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল, সে "কঃ কঃ" কবিযা উঠিল। অমনি পাগল বলিল,—"কি, আমি কে, জান না তাহা? 'তুমি কে, তুমি কে' জিজ্ঞাসা করিলে? আমাব ঠাকুবদাদা চাঁদ, আর সূর্য আমার দাদামহাশয়।" এইরূপে কত যায়গায় কত বকম পাগ্‌লামী কবিল। হাঁসকে বলিল, "তুমি চোর, তুমি তাঁহার ঠমক চুরি করিয়াছ। চোরাই মালেব কোন অংশ পাওযা গেলে সবটাই চুরি করিযাছ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তুমি আমার তাঁকে আনিযা দাও।" আবার পাগ্‌লামী—বলিল, "আমি রাজা, আমার হুকুম, বর্ষাকাল তুমি আসিও না।" আবাব কি মন গেল, বলিল, "আহা, তুমি এস, এস, আমি রাজা, আমি এই বনে একা, তোমা হ'তে আমার রাজচিহ্ন সব পাওয়া যাইবে—চাঁদোযা, ছাতা, চামর তুমিই দিতেছ।"

এই সমস্ত পাগ্‌লামী—এটা একটা সৌন্দর্যেব খনি। পৃথিবীর মধ্যে সকলেব চেয়ে যে সুন্দব জাযগা, কালিদাস রাজাকে আব উর্বশীকে সেইখানে লইয়া গিয়াছেন। দুটিতে এক হইয়া থাকিলে তো পরস্পরেব সৌন্দর্যে দুজনেই ডুবিযা থাকে, তাই কিছুকালেব জন্য একটিকে সরাইয়া আব একটিকে দিয়া সেই সৌন্দর্যটুকু প্রকাশ কবিযা দিলেন। সমস্ত সৌন্দর্যের পিছনে একটা উৎকট দুঃখের ছায়া।

যক্ষ বিরহে পড়িয়া মেঘকে দূত কবিয়াছিল। রাজা বিরহে পড়িয়া মেঘকে রাক্ষস কবিলেন। আবার যখন মিলন হইল, তখন দুজনে সেই মেঘে চড়িয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে আপনাদেব রাজধানীতে গেলেন। কালিদাসেব হাতে মেঘবেচারার নানা অবস্থা হইল।

রায়-গৃহিণী

অমৃতলাল বসু

"আচ্ছা মেজবৌ, পরের কথা না হলে তুই থাকতে পারিস না—কার গহনা হ'ল কার কাপড় হ'ল সে নিয়ে তোর কাজ কি, তোকে কি তারা কেউ দুএক খানা দেবে?" বোনপো-বৌকে এই বলিয়া ধমক দিয়া রায়-গিন্নি আবার ধুতুল কুটিতে আরম্ভ করিলেন। রায়-গিন্নির স্থূল শরীর একটু থল্‌থলে, গৌর বর্ণে বয়স ও পৈত্তিকের গুণে একটু হলদে ছোপ ধরিয়াছে, মেজবৌয়ের মাথা দেখে দেওয়াতো নয়—ধান গুলো অপ্‌চ করা, তা না হলে গিন্নির সামনের দিকে এখনও সাত আট গাছা সাদা চুল দেখা যাচ্ছে কেন? তা যাক্ যে দাঁত চারটি ঠোঁটে ঢাকা পড়ে নাই, তামাক পোড়ার রঙে সে কয়টিই মিশ্‌মিশ্ কচ্ছে; কপালের মধ্যভাগে নাসামূল হতে সিঁথি পর্যন্ত লম্বালম্বি একটি সরু খাপ পড়াতে দুই পাশ উনুনের ঝিঁকের মত বেশ একটু উঁচু উঁচু দেখায়; ভ্রূদুটি অতি পরিষ্কার— যেন আঠা দিয়া দাগা হইয়াছিল, চুল বসান হয় নাই; চক্ষু দুটি গোল, কোলে অকৃত্রিম কাজল, উনুন-মাটির রঙের তারাদুটি ঠিকরে বেরুবে, কি ধরে খাবে স্থির করিতে না পারিয়া ঘুরপাক খাইতেছে; কান দুটিতে সারি দিয়া পনেরটি করে মাকড়ি মানিয়ে গিয়াও মধ্যে মধ্যে বাতাস খেলিবার স্থান আছে; নাকটি ঠিক টিয়া পাখির মত-ই; কিন্তু আগা টুকু নিচের দিকে না নামিয়া উপর পানে ঈষৎ ঘুরিয়া গিয়াছে, তার নিচে ওষ্ঠের উপর যেরূপ ঘন রেখা দিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে পাঁচ সাতবার নাপিতের হাতে পড়িলেই বেশ চুক্ চুকে কালো গোঁফ ঝেড়ে ওঠে, স্কন্ধ ও মস্তকের মধ্যে ব্যবধান অতি অল্প; গৃহিণীর গর্ভধারিণী একদিন অন্তঃসত্ত্বাবস্থায় পাউরুটি খাইয়াছিলেন বলিয়া কন্যার বয়স কালে বাঁ পায়ের উপরটি কতকটা পাউরুটির মত ফুলে উঠেছে বটে। কিন্তু বক্ষ ও উদর অন্তরাল থাকায় রায়-গিন্নি এ অঙ্গ বৈভবের শ্রীবৃদ্ধি স্বয়ং কখনও দেখিতে পাইতেন না, আর এই অসীম সৌন্দর্যের মর্যাদা রক্ষাকারী ভুজযুগ প্রকৃতই মর্মান্তিক প্রেমালিঙ্গনের উপযোগী। গৃহিণী দুলিতেছেন আর ধুতুল কুটিতেছেন, ডালে ফুল দোলে, কানে দুল দোলে, দাঁড়ে পাখি দোলে, দোলায় খুকি দোলে, কিন্তু গৃহিণীর দোলনে সে হালকা ভাব—সে ছেবলামোর ছায়া পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই। বাসুকীর শিরঃকম্পনে মেদিনী যেমন সময়ে সময়ে মন্দ আন্দোলনে দোলে, বঁটির বাঁট-বাহিনী রায়-গৃহিণীর মন্দার অঙ্গ তেমনি ধীরভাবে দুলিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাবিজের পুঁটে দুলছে, গলায় দানা দুলছে, কোমরে জিঞ্জির দুলছে, নাকে নথ দুলছে। মুক্তা চুনি খুলে নিয়ে নথটি ছোট নাতির গলার হাঁসুলি করিয়া দেবেন মনে করিয়াছিলেন কিন্তু তার অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত হইলে নাসিকার চিরসহচর শুভপরিণয়ের এই সুদর্শন চক্রটির মমতা ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

গৃহিণীর পশ্চাতে একটি কাঁসার রেকাবিতে পাঁচখানি চাকা চাকা বেগুন, খুব সরু সরু করে' কোটা চারটি আলু, মুটো খানেক কলাই শুঁটির দানা, ও সিকিটা ফুলকপি ছাড়ান রহিয়াছে; এগুলি সপুত্র দম্পতীর রাত্রের শীতলের আয়োজন। কেহ পাছে "দৃষ্টি" দেয় এই

ভয়ে তরকারিগুলির উপর অল্প মাত্রায় লবণ ছিটান আছে। বঁটির বাম ধারে একখানি কালো পাথরের খোরায় ডুমো ডুমো আলু, কাঁচা-কলা, বিলাতি কুমড়া, ফালি কতক বেগুন, চারটি খানি পালম শাক, ও পূজারীর নিকট চাহিয়া লওয়া গুটিকয়েক প্রসাদী ভিজা ছোলা সাজান আছে; বোনপো, বোনপো বৌ, ভাই, ও দুই একজন বিশেষ অনুগৃহীত পোষ্যের পরিতোষের জন্য এই বন্দোবস্ত। আর বঁটির দক্ষিণে একটা মেটে খোরায় পালমের গোড়া, ডেঙর ডাঁটা, থোড় কুচান, কুমড়ার বেক্‌লা, ঝিঙে, সবীজ বেগুন, ডুমুর স্থান পাইয়াছে, ধুতুল দুটো কোটা হইলেই হয়, ভাসুর পো, তার হেঁজল দাগা বৌটা, নিকামাইয়ে দেওর, হিঁসকুড়ি জা প্রভৃতি গাত্রখাদক পোড়া লোকদের ফাঁড় পোরাবার জন্য রাত্রের এই ব্যবস্থা। যেখানে বসিয়া গৃহিণী তরকারি কুটিতে ছিলেন, তাহার দক্ষিণের ঘরের কোণে কাল ও সবুজের মাঝামাঝি কি একটা রং মাখান একটি ছোট লোহার সিন্দুক অন্তর মাখান একটি কাঠেব ফ্রেমের উপর বসান রহিয়াছে, সিন্দুকের গায়ে সিন্দুর ও চন্দনের অলকা তিলকা ও গিন্নির জপের মালার থলি, একটি ছেঁড়া শালপাতে কালীঘাটের প্রসাদী ঘৃতসিক্ত সিন্দুর ও একটি ছোট চুপড়িতে দুইটা মুলা, কয়েকটা নারকলে কুল, পাব্ দুই তিন আক, একখানা শাঁক আলু ও আধখান কমলালেবু—তরকারির আঠা লাগিবার ভয়ে সোনার বালা জোড়াটি খুলিয়াও রায়-গিন্নি ঐ সিন্দুকের উপর রাখিয়া দিয়াছেন। সিন্দুকের একটু উপরেই একটি কুলঙ্গি, তাহার উপর একখানি কাচহীন আরসির ফ্রেম, গুটি কয়েক শুষ্ক বিল্বপত্র ও তারকেশ্বরের চরণামৃতের একটি শুন্য ভাণ্ড; রায়-গিন্নির যত্ন ও শ্রদ্ধা ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া একটি কৃতজ্ঞ মাকড়সা কুলঙ্গির মুখটি ঢাকিয়া একখানি সুন্দর নেতের পরদা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে; সিন্দুকের পাশে একখানি জলচৌকির উপর, গুটি দুই তিন মাটির হাঁড়ি ও গুটি চার পাঁচ ভাঁড় কতকগুলি ছোট ছোট পুটলিতে পরিপূর্ণ হইয়া দেয়াল ঠেস দিয়া আরাম করিতেছে, সামনে একটি কাঁসাব গেলাস, একজোড়া সেকেলে বাটা, ও একটি কাশীর লোটা, তিনটি তৈজসই সুনীল কলঙ্ক লেখায় শোভিত। চৌকির পাশেই ছাদে যাইবার ছোট দবজা, দরজার পাশে সর্বাঙ্গে হলুদ মাখা, ললাটে জিরা মরিচের চন্দন চর্চা একখানি শীল বক্ষ পাতিয়া শয়ন করিয়া আছে, উহার চরণতলে বসিয়া হেঁজল দাগা ভাসুর-পো-বৌছুঁড়ি দুই হাতে একটি নোড়া ধরিয়া শীলাবতীর হৃদয় পেষণ করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে দুই কানে খুড়-শাশুড়ির বকুনি খাইতেছেন, মরিচের হাতে চক্ষের জল মুছিতে গিয়া তথায় প্লাবন উপস্থিত করিতেছেন আর মনে মনে আপনাকে, স্বামীকে, ও বিধাতাকে গালি দিতেছেন। আবার যেমন অসাবধানতা প্রযুক্ত হলুদেব ছাপলাগা বক্ষের বসনের উপর দৃষ্টি পড়িতেছে, অমনি "এ জীবন তো কেবল একটানা কান্নার কারবারই নয়, একজনকে পায়ে ধরাইয়া তো সকল দাসীপনা শোধ করাইয়া লই"—স্মরণ হওয়াতে আফিম খাবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতেছেন। বৌটির দক্ষিণ বাহুতে মধ্যে মধ্যে যে দরজার কপাটের আঘাত লাগিতেছে, সেটি সম্মুখে বড় ঘরে যাইবার পথ, তাহার বাম পার্শ্বের কোণে একখানি মাদুর ও এক গাছা ঝাঁটা ঠেসান রহিয়াছে, তারপর একটি খোলা সেল্‌ফ; তাহার চারটি তাকে মাটির পুতুল ন্যাকড়ার পুতুল, কাঠের পুতুল, চিত্রকর, ভাঁড়, ইঁদুর কল, ঘটি তোলা কাঁটা, চাবির থোলো, ভাঙা বাক্সর কল, হরিতকী, আমলকী, সিঁদুর চুপড়ি, সমুদ্রের ফেনা, বড় কড়ি, পেতলের নাড়ুগোপাল; দুই চারিখান কাচের বাসন, গিন্নির চুলের দড়ি প্রভৃতি জগত সংসারের প্রায় সমস্ত দ্রব্যেরই নমুনা আছে। তাকের দুপাশে দুটি পেরেক মারা, একটাতে দাঁড়ে বসা সোলার কাকাতুয়া পাখি, অপরটি বাখারির তালমাড়া একটি। সেলফের পাশে একখানি টুলের উপর একটি কালো রংয়ের তেলের ভাঁড়।

সক্রেম অক্রেম কয়েকখানি-ছবিও ঐ গৃহের দেওয়ালের শোভা সম্পাদন করিতেছে। একখানি কালীঘাটের কালীর ছবি, একখানি আর্ট ইষ্টুডিওর লক্ষ্মী, আর একখানি নলদময়ন্তী।

একখানিতে একজন বিপুলনাসা হরিতালবর্ণ সুন্দরী, চেয়ারে উপবিষ্ট একটি জুলফিদার বাবুর চুল ধরিয়া সম্মার্জনী সম্ভাষণ করিতেছেন, অপর একখানিতে জামাজোড়া পরিধৃত দীর্ঘাকার এক গলদা চিংড়ি খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। দেয়ালে দুটি ব্র্যাকেটও আছে। একটি মাটির অপরটি কাষ্ঠের; মাটিরটির উপর একটি শুণ্ডশূন্য গণেশ, ও কাষ্ঠেরটির উপর একটি বিপুল বপু ঘড়ি, তাহার দুইটা কাঁটা ভ্রাতৃস্নেহে আবদ্ধ হইয়া এক সঙ্গেই চলে, এবং রায়গিন্নির দাদাশ্বশুর মহাশয় এক সময় আট আনা খরচ করিয়া তৈলের দ্বারা উহার ষটচক্রভেদ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে একবার বাজিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে ক্ষান্ত হয় না। অনেক সৌখিন বাবুর বৈঠকখানায়, অনেক ধনীর শয়ন কক্ষে রকম রকম অনেক ঘড়ি দেখা গেছে বটে, বাবু হ্যাণ্ডনোটে সই করিতেছেন ও ঘড়ি ঘুঘু ডাকিতেছে, তাহাও শুনিয়াছি, কৈ একবারে বারোটার অধিক বাদ্য কোনটিতেই শুনি নাই, কিন্তু গিন্নিব ঘড়ি আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া সময়ে সময়ে এক শত দেড়শত পর্যন্ত বাজিয়া যায়। আবার সে বাদ্যের বোল কি শ্রবণ-রঞ্জন! টুং টাং ঠিং ঠিং ডিং ডিং কি ঢং ঢং নয়, একেবারে পুবা খাম্বাজের গিটকিবি ভবা—ধন্ ধরর্ র্‌র্‌র্ র্। বাজনা আরম্ভ হইলেই গিন্নি দুই হাত তুলিয়া সকল কথাবার্ত্তা থামাইয়া দেন, আর সহাস্যে হাঁ করিযা ঘড়ির পানে চাহিয়া প্রতি ধন্ ধর্ র্ র্ র্ র্ তালে তালে ঘাড় নাড়িতে থাকেন, তাঁহার বিশ্বাস—এমন ঘড়ি লাট সাহেবের বাড়ি তো লাট সাহেবের বাড়ি মনুমেন্টেও নাই। রায়-গিন্নির প্র-দাদাশ্বশুর মহাশয় এক মার্কিন হাউসে মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, সাহেব বিলাত (আমেরিকা) যাইবার সময এই ঘড়িটা তাঁহাকে খেলাৎ দিয়া যান। কোন বৌ দেড়পোব বেলায় ঘুম থেকে উঠলো, কোন ঝি বাজারে গিয়া ৫ ঘণ্টা কাটিযে এল, কোন আবাগী রাত না পোয়াতেই ভাতের পাথর নিয়ে বসলো, কোন বেহায়া ছুঁড়ি সন্ধ্যা না হতেই দোরে খিল দিয়া শুলো, কোন গ্যদাবি গা ধুতে গিয়ে আড়াই ঘণ্টা কল্লে, ঠাকুরপো কবে দুপুর রাত করে বাড়ি এলো, এই সকলের বিচাব গৃহিণী ঐ ঘড়ির সাহায্যেই কবিতেন, এবং ঐ ঘডি দেখিয়াই তিনি চাবটে রাত্রে উঠিতেন, দু'ঘণ্টা একাসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা করিতেন, তিনটে বেলায় দুটি ভাতে বসিতেন আর ছ'টা থেকে ছ'টা পর্যন্ত জ্বালিবার জন্য প্রতি প্রদীপে এক পলার হিসাবে তৈল মাপিয়া দিতেন। এই যে গৃহ সজ্জা দেখিলেন ইহা হইতে রায়-গিন্নির পারিপাট্য পবিচ্ছন্নতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহার ধনৈশ্বর্যের যৎকিঞ্চিৎ আভাস পাইতে হইলে পশ্চাতে যে ক্ষুদ্র কুটুরিটি রহিযাছে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। গিন্নির আফিস ঘরে যে লোহার সিন্দুকটি রহিয়াছে সেটিতে হাত খরচার টাকা পযসা নিজের নিত্য ব্যবহারের গহনা ও দু একটা রূপার হালকা গেলাস বাটি মাত্র সর্বদা রক্ষিত হয়। যে ক্ষুদ্র গৃহটির কথা বলিলাম গৃহিণী যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার পশ্চাতেই তাহাতে প্রবেশের দরজা বন্ধ করা রহিয়াছে। কপাটের উপরে মধ্যে নিচে তিনটি জগন্নাথের তালা খুলিয়া তবে সে গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, দ্বার খুলিবা মাত্র কারারুদ্ধ পবনদেবের পলায়নের বেগে প্রদীপটি একেবারে নিভিয়া যায়, পুনরায় জ্বালিয়া প্রবেশ করিলে দেখা যায়, সে ক্ষুদ্র গৃহে একটি ক্ষুদ্রতম জানালা আছে বটে, কিন্তু তাহার কপাট খুলিলে এক পল্টন মশা ব্যাণ্ড বাজাইয়া বাহিরে যায় মাত্র, সূর্যের আলোক ভিতরে প্রবেশ করে না। কিন্তু যাক এ সব কথা বলিবার প্রয়োজনই নাই, কারণ গৃহিণী ভিন্ন সে গৃহে অন্য কেহ প্রবেশ করে নাই করিবার অনুমতিও নাই, জানলাটিও কস্মিনকালে খোলা হয় না, আর গৃহিণীর প্রদীপ জ্বালিবারও প্রয়োজন হয় না; পূর্বজন্মে মার্জারকে প্রভূত পরিমাণে মৎস্যের কাঁটা খাওয়াইবার পুণ্যে—লোভ, হিংসা, কলহপটুতা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি মেনির অন্যান্য গুণের সঙ্গে অন্ধকারে চক্ষু জ্বালিবার ক্ষমতাও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তবে গ্রন্থ লিখিলেই নাকি অনুভব শক্তির অমানুষিক প্রখরতা

জন্মে, তাই ঐ গুপ্তকক্ষ সম্বন্ধে এত কথা বলিতে পারিতেছি। গৃহমধ্যে একটি শালকাঠের সুবৃহৎ বাতাবন্দি সিন্দুক ছিল, সেই সিন্দুকে আরোহণ করিয়া রায়-গিন্নি শ্বশুরবাড়ি ঘর-বসত করিতে আসিয়াছিলেন, মোটা মোটা কাঠের ঢাকা লাগান ছিল; পুটলিতে টিকিট লাগান ঢাকাই, শান্তিপুরে, চেলি, তসর, গরদ, বেনারসি, বোম্বাই, ড্রেসপিস, পায়না-পোল প্রভৃতি কাপড়, আলোয়ান, জামিয়ার, শাল, রুমাল, কোর্ট, চোগা, গলাবন্দ, কোমরবন্দ, তাজ, টুপি, পাকড়ি ও নানাবিধ পরিধেয় উত্তরীয় বাস এবং অগণন আরশুলায় সিন্দুকটি পরিপূর্ণ ছিল; আরশুলা ব্যতীত অন্য সমস্ত দ্রব্যই বন্ধকী। ধর্মে মতি হওয়ায় ঐ আরশুলার দল জীবহিংসা মহাপাপ জ্ঞানে কীট পতঙ্গাদি আমিষ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনপূর্বক শাল, আলোয়ানাদি টুকিয়াই জীবন ধারণ করিত, অনেক ধর্মপ্রাণ মনুষ্যও এ সংসারে মৎস্য মাংস পরিত্যাগপূর্বক অন্ধকার গৃহে শাল, আলোয়ান কাটিয়া থাকেন। গিন্নির নিজের এবং বৌ ও ছেলেদের মূল্যবান কাপড় চোপড় একটি ছোট কর্পূরকাষ্ঠের সিন্দুক ও মাঝারি রকম সেগুন কাষ্ঠের দেরাজের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বন্ধকী পিতল কাঁসার তৈজস, পাথবের বাসন এবং অন্যান্য ইতর জাতীয় ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি ঐ গৃহস্থিত আর একটি বড় সিন্দুকের মধ্যে থাকিত। দক্ষিণ কোণে একটি বড় লোহার সিন্দুক—প্রতিবাসিনী কুলজা ও কুলটাগণের অশ্রু-জলসিক্ত সুবর্ণ, রৌপ্য এবং জহরতের অলঙ্কারে উহা পরিপূর্ণ, বন্ধকী রূপার বাসনগুলিও উহার মধ্যে থাকিত। পারিবারিক মূল্যবান অলঙ্কারাদি উত্তর কোণে লোহার সেল্‌ফের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত হইত। বেলওয়ারি চুড়িওয়ালাদিগকে প্রতিপালন করিয়াই বধূগণ বারমাস এযোত রক্ষা করিতেন, কেবল তেমন তেমন স্থানে নিমন্ত্রণে যাইবার সময় গৃহিণী দুই চারিখানা গহনা বাহিব করিয়া দিতেন এবং পাল্কী হইতে নামিবা মাত্র খুলিয়া লইয়া নখিন্দরের বাসব ঘরে আবদ্ধ করিতেন, এই তো গেল অন্ধকূপের ঐশ্বর্য ভাণ্ডারের কথা। অন্য অন্য বাড়িতে তত্ত্ব করিলেও কমবেশি এরূপ অনেক সামগ্রী দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা। কিন্তু ঐ অসূর্যম্পশ্যা কক্ষসুন্দরীর নিভৃত গর্ভে যে সমস্ত দুষ্প্রাপ্য অদ্ভুত ও আশ্চর্য সামগ্রী ছিল, তাহা সাধারণ লোকে প্রায় দেখিতে পায় না। হাঁড়ির উপর হাঁড়ি তার উপর হাঁড়ি তার উপর তার উপর তার উপর এইরূপ কোমর সমান, বুক সমান, গলা সমান হাঁডির সারিতে গৃহটির মেজেয় আর পা বাড়াইবার স্থান ছিল না, গৃহিণী ভিন্ন অপর কেহ সে গোলকধাঁধায় প্রবেশ করিলে হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া হাঁড়ির তলায় সমাধিলাভ করিত। দেয়ালে পেতেন তাহাতেও হাঁড়ি, কড়িকাঠ হইতে দোদুল্যমান সিকার সারি তাহাতেও হাঁড়ির উপব হাঁড়ি। এই হাঁড়ির কাঁড়ির মধ্যে কোনটিতে চাল-ভাজার নাড়ু— গৃহিণীব শ্বাশুড়ি জীবিতকালে স্বহস্তে উহা পাক করিয়াছিলেন; কোনটিতে দাদখানি চাউল—তাঁহার শ্বশুরের অতিশয় পীড়ার সময় ক্রয় করা হয়, কোনটিতে তাঁহার নিজের বিবাহান্তে মেলানি ভারের ফেণী বাতাসা, তাঁহার দিদিশ্বাশুড়ি কাশী হইতে নৌকা পথে পেঁড়া আনিয়াছিলেন, তাহার গুটি চার পাঁচ কোন হাঁড়িতে আছে; কোনটিতে কর্তার প্রথম ষষ্ঠীবাটার ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলি, বয়স পরিপক্ক হওয়ায় উভয়েরই বর্ণ গাঢ় হরিৎ ও গাত্রে শুভ্র লোমাবলি বাহির হইয়াছে; কোনটিতে পুত্রের ফুলশয্যার চিনির মুড়কি, ছাতুবাবুর পুত্রের বিবাহের সামাজিকের ওলা কোন হাঁড়িতে। বিবাহের জল গায়ে লাগিয়াই কর্তার একবার জ্বর হইয়াছিল। সে সময় সাবুদানা আসে, তাহার এক মুঠাও এক হাঁড়ির তলায় পড়িয়া আছে, এইরূপ রলার খিরপুলি, অভয়চরণ মিত্রের বাড়ির মেঠাই, রাধাকান্ত দেবের শ্রাদ্ধের খাজা, খেলাৎ ঘোষের জন্মতিথি, পূজার গজা, বিশ বছুরে খেজুর, পঁচিশ বছুরে নারিকেল নাড়ু, ঝড়ের বছরের বেদানা, ৬৮ সালের পেস্তা, ৭২ সনের খাস্তার কচুরি ইত্যাদি ইত্যাদি বহুবিধ দেবদুর্লভ দ্রব্যে হাঁড়িগুলি পরিপূর্ণ; একটি বড় হাঁড়ায় গুটিকয়েক কমলালেবু ও আম গৃহিণী একদিন যৌবন কালে তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, ইঁদুরমাটির সাহায্যে তাহা হইতে ২/৪টি গাছ বাহির হইয়াছে।

।। ২।।

কলিকাতার উপকণ্ঠ সুঁড়ায় গৃহিণীর মাতুলালয় ছিল, কুমারী কালে মধ্যে মধ্যে সেখানে অবস্থান কালে তিনি পুরুষের মত কাপড় পরিয়া বেণী দোলাইয়া সেখানকার রাজাদের বাড়ি খেলা করিতে যাইতেন; কেহ কেহ বলে, ঐ স্থান হইতেই রায়-গিন্নির রুচি প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় আকর্ষিত হয়, এবং ঘর বসত করিতে আসিয়াই তিনি গুপ্ত ও প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন; শাশুড়ি ঠাকুরাণীরও এ বিষয়ে স্বভাব-সিদ্ধ সখ থাকায় গৃহিণী এমন অমূল্য ভাণ্ডার প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একবার এক মূষিক-দম্পতি হঠাৎ ঐ গৃহে প্রবেশ করে, আর বাহির হইবার সুযোগ না পাওয়ায় ঐ স্থানেই উহাদিগের বংশ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এক্ষণে তাহাদের ভয়ে কোন বিড়াল ঐ গৃহে প্রবেশ করিতে সাহস করে না; গৃহিণী কয়েকবার কল পাতিয়াছিলেন, কিন্তু সাত আটটি কল ভগ্ন হইবাব পর হইতে তিনি মৃগয়ায় ক্ষান্ত দিযাছেন। এক সময় রায় মহাশয় তাঁহার ভাড়াটিয়া এক রাস্তাবন্দি সাহেবের নিকট বাকি ভাড়ার দরুন এককানি বেতেব কাজকরা বগি ও একটি হলদে চামড়া মোড়া হাটের ঘোড়া লইয়া তাহাকে ছাড় দেন, ঘোড়াটি প্রাতঃকালে বাড়ির ভিতর হইতে কতকগুলি তরকারির খোসা ও সাযংকালে গোশালার ভৃত্যের হস্তের একটি জাব পাইত, রাত্রিকালে অশ্বটিকে বাটীর নিকটবর্তী বাজারে চরিতে দিতেন, ঐ কৃষ্ণের জীবের প্রতি সুনজব রাখিবাব জন্য বাটীব পাহারাওযালার একটি করিয়া দোযানি মাসহারা ববাদ্দ ছিল; দিনের বেলা উচ্চৈঃশ্রবা আফিসের আস্তাবলে সাহেবের ঘোড়ার পাশে থাকিবাব স্থান পাইত।

একদিন সাহেব নিজেব ঘোড়াব টিফিন তদাবক কবিতে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাব বাবুর বাহন সকরুণ নযনে বালতিব পানে চাহিযা আছে এবং বিক্রযাবশিষ্ট যে কযেকটি পুচ্ছ আছে, তাহাব দুর্বল আঘাতে পৃষ্ঠস্থ একখানি ক্ষত হইতে মাছি তাড়াইতেছে। বেচারিব টিফিনের কোন বন্দবস্ত নাই জানিয়া সাহেবেব দযা হইল ও আপনার সহিসকে তাঁহার ঘোড়াব দানা হইতে কতক অংশ উহাকে দেওযাইতে অনুমতি কবিলেন, তোবড়া মুখেব কাছে ধরিবামাত্র হর্ষবিষাদ ও বিস্ময়ের আবেগে অস্থিচর্মসাব পীতাশ্ব একবাব তোবড়াস্থিত দানার প্রতি, একবাব সাহেবের মুখের প্রতি ও একবার সহিসের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিল, পরে আনত আননে বারেক মাতা বসুমতীকে দেখিয়া লইল, বিপুল উদব ভেদ কবিয়া একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছুটিল, নয়নদ্বয়ে এক এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তারপব কে জানে কি ভাবিয়া, পশ্চাতের পা দুখানিব উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল ও আকাশের দিকে মুখ করিযা সে হা হা হা হা শব্দে এক বিকট হাসি হাসিয়া একেবারে ধরাশায়ী হইল। সেই অবধি অশ্বরাজ আর চতুষ্পদে দাঁড়ায় নাই, বাখারির আঘাত সহ্য করে নাই, ছেঁড়া বেতের বগী টানে নাই, জাব খায় নাই, তাহার নশ্বব দেহ ধাপায় প্রেরিত হইল, অশ্ব কোন কেরাণী-জননীর জঠরে প্রবেশ করিবার জন্য লালদিঘি ঘুরিয়া বাঙ্গালি টোলাভিমুখে চলিল, স্নেহপরায়ণ প্রভু হিন্দু-কুল-রবি রায় মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দুর্বল দেহস্থ স্বল্পাবশিষ্ট চর্বি হিন্দুদিগের আহার্য ঘৃতে মিশ্রিত করিবার জন্য উইল করিয়া গেল। অশ্বের শোকে স্বামীকে পাগল প্রায় দেখিয়া বুদ্ধিমতী সতী আমাদের গৃহিণী প্রবোধ দিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি যে কোন প্রকারে হউক তাঁহার ভাণ্ডারস্থ একটি ইঁদুর ধরিয়া কর্তার বগী টানার কার্য চালাইয়া দিবেন।

এমন সোনার লক্ষ্মী এতগুলো হাড় জ্বালানে পর লইয়া ঘর করিতেন কি করিয়া, ইহা আপাততঃ আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু যখন দেখা যায় বাড়ির পাট্টাখানি রায় মহাশয়ের প্রপিতামহের নামে এবং কতকটা পৈত্রিক সম্পত্তির জের এখনও তাঁহার জমার খাতায় টানিতে হইতেছে, এবং ভ্রাতৃবংশে গ্রাসাচ্ছাদন এবং তাঁহাদিগের তরফের প্রত্যেক বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধ, সূতিকাগৃহ, আটকৌড়ে, ষষ্ঠীপূজা, অন্নপ্রাশন, বিদ্যার্জন,

লোকলৌকিকতা, চিকিৎসা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধে সপিণ্ডী করণের খরচ আপন ইচ্ছায় মুক্তহস্তে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিয়াও এখনও কিছু ফাজিল বাকি কাটিতে পারেন নাই, তখন আমার ন্যায় পাষণ্ডও গৃহিনীর দূরদৃষ্টি ও বিষয়-বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন না। কেননা গৃহিণীর মুখে শুনিয়াছেন যে "যত খরচ তো ওদেরই জন্য, আমাদের কটি পেটে আর কত পড়ে! এ সওয়ায় ঠাকুরের দুবেলা ও বার মাসে তের পার্বণ আছে, কর্তারা তো আর হাতি ঘোড়া রেখে যান নাই।" বাস্তবিক তাঁহারা হাতি ঘোড়া রেখে যান নাই, সেকেলে মানুষ নগদ টাকা আর সোনা রূপাই ভাল বুঝিতেন তাহাই রাখিয়া গিয়াছিলেন। রায় মহাশয় পরিবারের নিকট তাঁহার স্ত্রীধন কর্জ করিয়া মুচ্ছুদ্দিগিরি লইবার সময় আফিসে সিকিউরিটি জমা দেন, লোকজনে ৩/৪ বার তহবিল ভাঙ্গায়, ঝুঁকি রায় মহাশয়ের ঘাড়ে পড়ে; কাজেই সাহেবেরা ঐ জমার টাকা কাটিয়া কাটিয়া লয়েন, কর্তাও বার বার উক্ত রূপ কর্জ দ্বারা ডিপজিটের টাকা পূরণ করেন; আর একবার পাঁচ জনের কুপরামর্শে পাটের কাজ করিতে গিয়া একেবারে গৃহিণীকে ফতুর করিয়া ফেলেন। গরীব স্ত্রীলোকের যে সর্বনাশ করিয়াছেন, তাহার তো আর চারা নাই, এক্ষণে ধর্মের দিকে চাহিয়া আফিসে যে কয়টি টাকা পান মাসে মাসে তাহা অর্ধাঙ্গিনী উত্তমর্ণের হস্তে দিয়া থাকেন। গৃহিণীর পিতা সদাই ঘোষ কন্যার বিবাহের পর জামাতার অধীনে একটি ওজনসরকারি কর্মে ভর্তি হয়েন; সুতরাং কোন্ আলাদিনের প্রদীপ ঘসিয়া কোন্ দৈত্যের তমোময় ভাণ্ডার হইতে গৃহিণী স্ত্রীধন আনাইতেন তাহা কেহ বুঝিতে পারিত না; স্বামীকে কর্জ দিবার পূর্বে বা সময়ে সে ধনের কোন রূপ চিহ্নও কেহ দেখে নাই, কখনও তাহার উল্লেখও শুনে নাই; কিন্তু ঋণ পরিশোধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতে ভাড়াটিয়া বাটী কোম্পানির কাগজ তেজারতি ও অলঙ্কারাদিতে তাহা ফুটিয়া পড়িতে লাগিল। এই সমস্ত সম্পত্তির কেনা বেচা আদায় তাগাদার ম্যানেজারি রায় মহাশয়কেই করিতে হইত এবং সেই জন্য সতী হাত তুলিযা পতিকে নিজ খরচের জন্য কিছু কিছু মাসহারা দিতেন।

।।৩।।

পিতার বর্তমানে রায় মহাশয়ের জেষ্ঠ্যের মৃত্যু হয় এবং পিতাও পুত্রশোকে অল্পদিন পরেই গঙ্গা লাভ করেন সুতরাং জেষ্ঠ্যের পুত্র ও নিজের কনিষ্ঠ দুইটি নাবালকের ভারই রায় মহাশয়ের উপরেই পড়ে; প্রগাঢ় স্নেহের আধিক্যে তিনি নাবালক দুটিকে দ্বাদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত নিজের কাছে রাখিয়া অত্যন্ত আদর দেন, তাহাদিগকে স্কুল পাঠশালা দিয়া অধিক কষ্ট দেন নাই, কাজেই বয়ঃপ্রাপ্তে তাহারা কোন কার্যেরই উপযুক্ত হইল না এবং আপনার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে একটা ছোট কার্যে ভর্তি করিয়া তিনি তাহাদের বা বংশের মর্যাদা হানি করিতে পারেন না। শ্যালক শ্যালীপতি আদি হিসাবে কয়েকটি ভালরূপ লেখাপড়া না জানা লোক রায় মহাশয়ের অধীনে কোলিয়ারি গুদাম সরকারি প্রভৃতি কার্য করিয়া এক রকম দশ টাকা উপার্জন করিত বটে এবং তহবিল তছরুপাতের ব্যাপারটা তাহাদের দ্বারা সুবিধামত সমাধা হইত, কিন্তু তাহারা পর বৈত নয়; তাহাদিগের বেতনাদি তো আর রায় মহাশয়ের ঘরে আসিত না, কিন্তু ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্রের ন্যায় আত্মীয়গণকে আপন অধীনে কর্ম দিলে লোকে তাঁহাকে পক্ষপাতী ও অসৎ বলিতে পারে, এই ভয়ে তিনি তাহাদিগের উপার্জনের উপায় করিয়া দেন নাই; সুতরাং খাতায় তাহাদের নামে কোন রূপ জমা না পড়িয়া একান্নবর্তী পরিবার বলিয়া দাবী কাটিবার পথটি সুন্দররূপে পরিষ্কার হইয়াছিল। ধর্মপ্রাণা গৃহিণীর সৎপরামর্শে কন্যাভারগ্রস্ত স্ব-জাতির প্রতি কৃপা করিয়া নাবালক দুটির বিবাহ অতি দীন দরিদ্রের গৃহে দিয়াছিলেন, সুতরাং রুলি পরাইয়া কন্যা বিদায় করিয়াছে, এমন মুরুব্বি

শ্বশুরদিগের দ্বারা জামাতাদিগের কোনরূপ উপকার বা তাহাদিগের পক্ষ হইতে মামলা মকদ্দমার উৎপাত বাধাইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এই তো গেল গিন্নির শ্বশুর গোষ্ঠীর উপর করুণার কৈফিয়তী। বোনপো বোনপো বৌ প্রভৃতি পিতৃসম্পর্কীয় সম্বন্ধের যে তাঁহার কোন স্নেহের পক্ষপাত ছিল এ অপবাদও কেহ দিতে পারিত না।

বোনপোর পিতা দু হাজার টাকা রাখিয়া যান; ছেলেমানুষ পাইয়া কেউ ঠকাইয়া লইবে বলিয়াও বটে এবং কাগজের সুদের বাজার আজ কাল মাটি এই জন্যও ভারী সুদে খাটাইয়া মূলধন বৃদ্ধি করিয়া দিবার নিমিত্ত গিন্নি নিজের হাতে এ টাকা লয়েন। এই সময় একটা ভারি সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হয়; একটা মাগি প্রায় ৭/৮ হাজার টাকার জড়োয়া গহনা বাখিয়া টাকায় চার পয়সা সুদে দুই হাজার টাকা কর্জ করিতে আসে, গৃহিণীর সিন্দুকে টাকা পড়িয়া পচিতেছিল; কিন্তু পিতৃমাতৃহীন বোনপোর হিতৈষিণী মাসী নিজে অমন ভারী সুদ লাভের লোভ সম্বরণ করিয়া ঐ গচ্ছিত দুই হাজার টাকা দিয়া গহনাগুলি বন্ধক রাখেন। এক বৎসরের মেয়াদ ফুরাইল। কিন্তু সে মাগি নিরুদ্দেশ। সুদেব হিসাবে এক পয়সাও দিল না, গহনাও খালাস করিতে আসিল না। তখন মাসী একদিন সস্নেহে বোনপোকে ডাকিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া বলিলেন "নীলু তোর বড় বরাতরে বাবা দু হাজার টাকা দিয়ে আট হাজার টাকার উপর মেরে দিলি, আমিই ঠকে গেলুম; কর্তা পাকা লেখাপড়া করিয়ে নিয়েছেন, এখন সে মাগি টাকা দিতে এলেও আমরা নেব না, তা অত জড়োয়া রেখে তুই বা করবি কি যা ওগুলোকে নিয়ে ভাল জায়গা থেকে যাচিযে আন, বিক্রি করে নগদ টাকা হলে আবার এই রকম খাটাতে পারবি; এইবার দেখছি তোর বরাত খুললো।" এই বলিয়া মাসী একটি টিনেব বাক্স সুদ্ধ গহনাগুলি একখানি একখানি করিয়া নীলুকে বোঝাইয়া দিলেন। নীলু জিনিসগুলি বড়বাজারে তিনটি ভাল দোকানে দেখাইয়া অবশেষে একজন আলাপী লোকের সঙ্গে এক প্রসিদ্ধ জহুরির কুঠিতে গেল, কিন্তু যখন সে জহুরিও বলিল, গহনাগুলি কিছুই নয় সব ঝুঠা, গিল্টি করা পিতলের উপব কাচ ও বাজে পাথর বসান মাত্র, উহার দু দামড়িও দাম হইবে না, তখন একেবারে হতাশ হইয়া জলভরা চোখে উর্দ্ধশ্বাসে বাড়ি আসিয়া বাক্সটি মাসীর পায়ের কাছে দিয়া বসিয়া পড়িল। মাসী অবাক একেবারে অবাক—কলির লোকের ব্যবহার দেখিয়া ধর্ম একেবারে পৃথিবী ছাড়িয়া গিয়াছে বুঝিযা, জগতে এত জুয়াচুরি আছে অথচ তিনি ইহার বাষ্পও জানেন না, ভাবিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, "নীলে তোর কি সর্বনাশ করলুম, একেবারে পথে বসালুম" বলিয়া গগনভেদিস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন, দুই হাতে হাঁটু চাপড়াইতে লাগিলেন, মাথার পাকা পাকা চুল গুলি পড় পড় করিয়া ওপড়াইয়া ফেলিলেন, পাশে হাঁপানীরোগী বিমল মাসী বসিয়াছিল তাহার পৃষ্ঠে মাথা ঠুকিতে লাগিলেন, বেচারার ফুস্‌ফুস্ শোঁ শোঁ ডাকিয়া উঠিল, অবশেষে "এ প্রাণ আর রাখবোনা আজ রক্ত গঙ্গা হব" বলিয়া দুই হাতে বঁটি তুলিয়া আপনার গলায় হাত খানেক দূরে ঘন ঘন নাড়িতে লাগিলেন। গহনা তো গেছে এখন মাসী বাঁচিলে হয় এই ভাবিয়া হতভম্ব নীলু তখন সজোরে মাসীর হাত হইতে বঁটি কাড়িয়া লইল, টানাটানিতে বেচারার বুড়ো আঙ্গুলের খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল, সে জ্বালা উপেক্ষা করিয়া, টাকার শোকে হৃদয়ের জ্বালা ভুলিয়া গিয়া নীলু মাসীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু নীলুর দু হাজার টাকা গেছে বৈত নয়, পুরুষের দশ দশা কত আসে কত যায়, বেটাছেলে বেঁচে থাকলে অমন কত দুহাজার রোজগার করবে, মাসী এমন অপ্রস্তুত এ জীবনে কখন হন নি, তাঁর এ লজ্জা কিছুতেই যাবে না। মেয়ে মানুষ কোথায় কি পাবেন যে গিন্নী ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবেন, ধর্মতঃ তাঁরই তো দেওয়া উচিত; কিন্তু পোড়া বিধাতা মন দিয়াছেন ধন দিয়াছেন কৈ; সুতরাং গৃহিণী কোন্ সান্ত্বনাই শোনেন না, কিছুতেই প্রবোধ

মানেন না, তিনি পৃথিবীর সমস্ত মাগিকে গাল দিতে লাগিলেন, জড়োয়া গহনাগুলোকে অধঃপাতে দিলেন, জহুরির নিপাত করিলেন, মধুসূদনের মুখ পোড়াইলেন, ধর্মের মুখে ঝাঁটা মারিলেন, চন্দ্র সূর্যকে চুলোয় পাঠাইলেন, টাকা রাখিয়া গিয়াছিল বলিয়া নীলুর বাপকে গালি দিলেন, মরিয়া গিয়াছে বলিযা তাব মাকে সর্বনাশী বলিলেন এবং তাহার হাতে টাকা কেন দিয়াছিল বলিয়া নীলুকে অলপ্পেয়ে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া প্রভৃতি নানা বিশেষণে বিভূষিত কবিলেন; পরিশেষে, রাগে শোকে অপমানে অন্ধ হইয়া আপনার গালে মুখে চড়াইতে গিয়া নীলুর পিঠে চড় চড়াচড় চড়াইয়া দিলেন; মাসীমার চম্পকবম্ভাবিনিন্দিত অঙ্গুলী কল্লার চিহ্নে নীলমণির কৃষ্ণ পৃষ্ঠ তরুণ অরুণের শোভা ধারণ করিল।

ভাগ্যক্রমে রাতারাতি ফাঁপিয়া যাওয়ার আহ্লাদে নীলু ঐ দিন প্রাতে, অবশ্য গহনা যাচাইতে যাইবার পূর্বে, নিজের পয়সা দিয়া বাজার হইতে কযেকটা মোচা চিংড়ি কিনিয়া আনে, রাত্রি ৯টার পর উহার দুইটা বড় বড় মুড়া চিবাইয়া তবে গৃহিণীর প্রতারিত হইবাব শোক কতব শান্ত হয়।

যে স্ত্রীলোক গহনা বন্ধক দিয়া গিয়াছিল, সে কবে কখন 'কোন স্থান দিয়া আসিয়াছিল তাহা বাড়ির অপর কেহ দেখে নাই, কর্তা লেখা পড়া কবিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনিও কোন স্ত্রীলোককে দেখেন নাই, সুতরাং স্ত্রীলোকটিব কোন সন্ধান কস্মিনকালেও পাইবার সম্ভাবনা রহিল না।

কুলোকে কত কি কানাকানি করিত, বোনপোব টাকা গুলো গিন্নি একটা ফেরাবি কবে ফাঁকি দিলেন এই রকম নানান কথা বলিত, কিন্তু সে কেবল ভালখাগিরা ভাল লোকেব পিছনে লেগে মরে বলে।

নীলুর স্ত্রী একরাত্রি স্বামীকে সোহাগেব ভাবে পেযে বলেছিল, তুমিও যেমন বোকা মাসীমার কথায় বিশ্বাস করে ভুলে গেলে, ওঁকে আবার কেউ ঝুটো গহনা দিযে ঠকিযে যাবে! আব কত টাকার গহনা বাঁধা দিযে গেল অথচ আমরা এতগুলো লোক বাড়িব ভিতব আছি কে মানুষটা তা কেউ একদিনও দেখলুম না, মাসীমার ঘরে অমন আবো গিন্টিব গহনা জাওয়ান আছে আমি জানি। নীলু "চুপ চুপ ও কথা আর মুখে এনো না" বলিযা তাড়াতাড়ি আপনার হাত দিয়া স্ত্রীর মুখ চাপিয়া ধবিল, বৌ মনে মনে ভাবিল, ভাল বেবসিক স্বামীর হাতে পড়িয়াছি, কথাটাও তলিয়ে বুঝিল না আর যদি ঠোঁট দুখানি চেপে ধরিল— তাও কিনা হাত দিয়ে। আমরা কিন্তু ধর্মেব দিকে চাহিয়া কথা কহিব, গৃহিণী সেই ঝুটো জড়োয়া গুলি বোনপো বৌকে ব্যবহার করিতে দিয়া বলিয়াছিলেন যে, আমাদের বাড়ি থেকে যা পরে বেরুবে তাই লোকে সাচ্চা বলিবে।

।। ৪ ।।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ দুহাজার টাকা গচ্ছিত রাখা সূত্রেই বোনপোদম্পতি মাসীমার সংসারে প্রবেশাধিকার লাভ করে। তার পর নীলু স্ত্রীর নারিকেল তৈল, নিজের জল খাবার নাম করিয়া ত্রিশটি টাকা মাহিনার মধ্যে কুড়িটি টাকা মাসীমার হাতে লুকাইয়া দিত এবং আঁবের সময় আঁবটা, ইলিশ মাছের সময় ইলিশ মাছটা, শীতকালে নলেন গুড় খানা, এই রকম আজ এটা কাল সেটা নিজের পয়সায় কিনিয়া আনিয়া মাসীমার সংসারের সুসার করিত। এদিকে বন্ধ্যা বোনপো বৌটারও দুর্জয় গতর ছিল, সংসারের অর্ধেক কাজ সে আপন হাতে করিত, সে থাকাতে গৃহিণীকে আর রাঁধুনীর বেতন দিতে হইত না; বিশেষতঃ তিনি বাতাক্রান্ত স্থূল শরীর লইয়া নিজে দেওয়ানখানাই বল আর আফিস ঘরই বল সেইখানেই প্রায় বসিয়া থাকিতেন, উপর নিচে করিয়া বড় নড়িয়া চড়িযা বেড়াইতে

পারিতেন না; কে কি বললে, কে কি খেলে, কে কেমন চোখে চাইলে, কোন জিনিসটা পেয়ে কে মুখখানা কেমনতর করলে, কে কার সঙ্গে ফিসির ফিসির করেছে, কে স্বামী ভাত খেতে বস্‌লে বাতাস করেছে, কে স্ত্রীর পানে চেয়ে হেঁসেছে ইত্যাদি রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল সমস্ত সংবাদ ঐ ধর্মদূত বোনপো বৌটি গোপনে গৃহিণীর কানে তুলিয়া দিত। মাসশ্বাশুড়িব প্রতি বধূর হৃদয়ে ভক্তি যে উছলিযা পড়িত এমন নয়, তবে বেচারা সমস্ত দিন জল ঘাঁটিয়া আগুন তাতে বসিয়া খাটিয়া মরিত, তার উপর গর্ভে একটাও হয় নি যে তাকে নিয়ে খানিক অন্যমনস্ক হয়, বাডিব ভিতব খোসগল্প কি খেলাধূলাবও বড় একটা চল ছিল না, আর কেউ বামায়ণ মহাভারত খানা পডতো না যে, দু'দণ্ড বসে শুনে, সুতবাং বৌটির আমোদেব মধ্যে যা একটু লাগান ভাঙ্গান ছিল, এব কথা ওর কাছে ওর কথা এর কাছে বলিয়া প্রাণেব গবমিটুকু কাটাইয়া রাখিত, প্রাণেশ্বর শয়নকালে বেশ ফুব ফুরে হালকা প্রাণটি পাইতেন। এই বায় সংসাবরূপ নেপালে যদিও রাজমুকুট-খানি রায মহাশযের মস্তকে ছিল, তথাপি গৃহিণীই প্রকৃত জঙ্গবাহাদুর ছিলেন, সুতরাং একপ গোয়েন্দায় তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

বোনপো বৌটি বাডিব ভিতবের গোপন সংবাদাদি বহন করিয়া হোম ডিপার্টমেণ্টের ডিটেক্টিভের কার্য করিত, আব দুই চারিটি প্রৌঢা ও বৃদ্ধা আত্মীয়া প্রতিপালিতা হইতেন, তাঁহারা ফরেন ডিপার্টমেন্টেব ডিটেক্টিভ স্বরূপ প্রতিবাসী ও কুটুম্বাদিব বাড়িব তুচ্ছ কথা গুছাইযা আনিতেন।

।। ৫ ।।

পবেব গহনার কথা উত্থাপন করায় তিনি ধুতুল কুটিতে কুটিতে বোনপো বৌকে যে ধমকাইয়া উঠিযাছিলেন, সে তাহাব মুখ বন্ধ কবাইবাব জন্য নয়, বৌটিও তাহা বুঝিত, সে জানিত যে, ঐ সম্পর্কীয় কথার সমস্ত বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য উহা শ্বাশুড়ি ঠাকুবাণীব স্ববচিত একটি প্যাটেন্ট ইসাবা মাত্র। পাড়ায় এক ঘব কায়স্থ পবিবাব আসিয়া কয়েক বৎসবাবধি বাড়ি ভাড়া করিযা আছে; তাহাদের বাড়ির কর্ত্রী মধ্যে মধ্যে এক আধ খানি গহনা গড়াইতে আবম্ভ কবিয়াছেন, নীলুর স্ত্রী মাসশ্বাশুড়ির সম্মুখে তাহাবই কথা তুলিয়াছিল এবং ধমকেব উৎসাহ পাইয়া হাসিয়া বলিল "তা বাপু যুগী বৌকে গাঁথতে দিয়েছে সে দেখিযে নিযে গেল তাই আমি বল্লুম আমাব দোষ কি?" গিন্নি জিজ্ঞাসা কবিলেন, তাবিজ কি ডায়মন কাটা? বৌ একবার নিচেব ঠোঁট খানি উল্‌টাইল, আমি সেখানে থাকিলে তাঁহার মুখেব সম্মুখে একখানি আয়না ধরিতাম, যখনি কেহ ঠোঁট উল্‌টায়, নাসিকা কুঞ্চিত বা অপর কোন রূপ মুখ বিকৃত করে, তখনই আমাব ইচ্ছা হয় যে তাহার মুখেব উপব একখান আরসি ধরিয়া দেখাই যে, লোকে পরকে বিদ্রূপ করিতে গিয়া নিজের ভগবানদত্ত সুন্দব মুখগুলি কি কদর্যশ্রেণীতে অবনত করে, যাহা হউক সে স্থানে অনুপস্থিতি বিধায় যখন আয়না ধরা হয় নাই, তখন বধূ ঠাকুরাণী স্বচ্ছন্দে নিজের বেগুনিয়া ঠোঁটখানি উল্‌টাইয়া, তিলক সেবার উপযোগী নাসিকাটি সিঁটকাইয়া, সুচিত্র ভুরু দুটি কুঞ্চিত করিয়া, সুকোমল হস্ত দু'খানি বক্র করিযা আনুনাসিক স্বরে বলিল, "পোড়া দশা আর কি ডায়মন কাটা না হাতি কাটা, ভরি পাঁচ ছয়ের সাদা মাটা জুটেছে—এই ঢের।" গৃহিণীর সনথ বৃহদ্দন্তবিকশিত বদনখানি বিদ্যুৎ বেগে বাতাসে একটা পাক খাইয়া লইয়া বলিল "ওমা সাদা তাবিজ তাবি এত জারি।"

বিমল মাসী বসুমতীর উপর হাতের চাটু দুখানির ভব দিয়া বেলা দুইটা হইতে একটুখানি পুরাতন ঘৃতের উমেদারি করিতে বসিয়া বসিয়া ঠোঁট দুখানি বেটুয়া মুখের মত কুঞ্চিত করিয়া সজোরে পায়রা ডাকিতে ছিলেন, এক্ষণে একবার হামাগুড়ি দিয়া, ছাদের দিকে ঘাড় ফিরাইয়া অর্ধ প্রহরের সঞ্চিত ঘন মুখামৃত কতকটা নিক্ষেপ কবিলেন; পরে পূর্ববৎ আসন

পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন; "তা মা জারি হবে না কেন, এখন যে আধানি লোকেরই গুমরের দিন পড়েছে, কোলকেতায় এসে যত বেটি কাটকুড়ুনীর গায়ে সোনা উঠলো তা তারা অহঙ্কার রাখে কোথা বল।"

গিন্নি—মিথ্যে নয়, সোনাটা যেন ফেলনা হয়ে পড়েছে; সেকালে তো শুনেছি বড় বড় জমিদারের ঘরে রুপোর পৈঁছে রুপোর খাড়ু হাতে দিত।

বোন-পো-বৌ—সব বলে শুনেছি, মিন্‌স নাকি দুহাতে মুটো মুটো উপরি রোজগার করে, তা তার স্ত্রী সোনা পরবে না কেন বল।

গিন্নি—উপরের দিকে চোখ পড়েছে তো তাহলেই কোন্ দিন কোম্পানিতে হাতে দড়ি দিয়ে সোনা পরিয়ে দেয় দেখ না।

বৌ—না মাসীমা, মিন্‌সের নাকি সে রকম চরিত্রি নয়, ভারি ধর্মিষ্টি, চুরি করে উপরি রোজগার করে না, মহাজনেরা ওকে হাতে তুলে দেয়, সবার মালপত্র নাকি যত্ন করে তুলে নাবিয়ে দেয়, কাকেও হাঁটাহাঁটি করায় না, মুখও নাকি খুব মিষ্টি, তাই তারা খুশি হয়ে ওকে বেশ দুপয়সা দেয়, এ পাওনা নাকি সাহেবের জানা।

গিন্নি—মেজবৌ, চুপ করে থাক বলছি, গেরস্তর বৌ অত বাচাল কেন লা? মহাজনেরা তোর বাপ খুড়ো কিনা তাই রাজুদের পায়ে ধরে মুটো মুটো টাকা দিয়ে আসে।

বৌ—তা বাপু সব বলে সব শুনতে পাই আমি তো আর দেখতে যাইনি।

গিন্নি—যেতে পাবিস্‌নি পাকড়ি বেঁধে আপিসে দেখতে? বলে কে, নীলে বুঝি? অমন পোড়ার বুদ্ধি না হলে অমন দশা হবে কেন, একটা মেয়ে মানুষে তা না হলে গিল্টিব গযনা দিয়ে দু হাজার টাকা ঠকিয়ে নিয়ে যায়। (সেই গহনা, সম্বন্ধীয় প্রতারণাব সমস্ত অপরাধই ইদানীং গৃহিণী নীলুর পোড়া অদৃষ্ট ও বুদ্ধির উপর চাপাইতেন) আমার কথা দেখে নিও বিমল মাসী এই বলে বাখলুম—রাজুদের হাতে এই দড়ি পড়ে, পড়ে—ওর বৌয়ের শতেক খোয়ার হয়, হয়, হয়।

"উঁ হোঁঃ তা—তা—উঁ হোঁঃ উঁহোঁ—ভগ্—উঁহোঁঃ—উঁহোঃ—উঁহোঁ—ভাগবা—উঁহোঁঃ উঁহোঁঃ হোঁঃহোঁঃ হোঁঃ"—বিমল মাসীর বুকের ভিতরে শত কবুতর একেবারে ডাকিয়া উঠিল, মুখখানি পুঁই মিটুলীর রং ধারণ করিল, জল ভারাক্রান্ত চক্ষুর গোলক দুইটি খসিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিল, গৃহিণীর প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মাসী আর রাজুদের সর্বনাশের জন্য ভগবানকে আহ্বান করিতে সমর্থ হইলেন না। গৃহিণীর মজলিসে পাড়ার এই নূতন কায়েতদের কথা লইয়া প্রায়ই এই আলোচনা হইত। বধূরাও আপনাদিগকে কর্কশ আলোচনার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, কেহ কোনরূপ একটা ছুতা করিয়া ঐ দে পরিবারের সম্বন্ধে একটা কথা তুলিয়া দিত; একবার একটি সূত্র ধরাইয়া দিতে পাবিলে সে দিনকার মত নিশ্চিন্ত; অন্য সমস্ত কার্য স্থগিত রাখিয়া গৃহিণীর রসনাযন্ত্র গজ্ গজ্ বক্ বক্ শব্দে সেদিন এক দে পরিবারকে পেষণ করিতে থাকিবে। কাশী আসিয়া মাসীর ভগবদভক্তি স্রোতে বাধা দিল বটে কিন্তু গৃহিণীর কর্ণে ভগবানের নাম অর্ধ প্রবেশ করিবা মাত্র তাঁহার প্রেম একেবারে উথলিয়া উঠিল, "ভগবান মরেছে" এইরূপ মঙ্গলোচ্চারণ করিয়া সেই বৈকুণ্ঠবাসী চোখখেগোর যদি বিচার বোধ থাকে তাহা হইলে ঐ যে পরিবারের অহঙ্কার চূর্ণ, শতেক খোয়ার, সর্বনাশ তদ্বির সম্বন্ধে কতদূর তৎপর হওয়া উচিত, সেই বিষয়ে অনর্গল বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিলেন। দে দিগের উপর গৃহিণীর বিরক্তির অনেক কারণ ছিল, উহাদিগের প্রধান অপরাধ অহঙ্কার। প্রথমতঃ রাজু দে পাড়ায় প্রবেশ করিয়াই গৃহিণীর অমন ঠাণ্ডা একতালা বাড়িটি বাইশ টাকা ভাড়ায় না লইয়া মাসিক আঠার টাকা চুক্তিতে উপরে দুটি কুঠুরিওয়ালা একটি বাড়ি ভাড়া লইয়াছিল, একি কম অহঙ্কার। তুই কি এমন মেজিস্টরি

করিস, যে দোতলার উপর না হলে শোয়া হয় না; আর তুই বাড়ি ভাড়া নিবি এই প্রত্যাশায় কি রায়-গিন্নি হাত ধুয়ে বসেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ গৃহিণী একদিন রাজুর পরিবারকে দেখিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে আসিবার জন্য গয়লানী দিয়া বলিয়া পাঠান, তা উত্তর ক'রে পাঠালে কিনা, বাবুকে জিজ্ঞেস করি, তিনি বলেন তো যাবো, আ'মর, বাবুকে'রে—সরকারি চাকরি করে স্বামী তিনি বুঝি আবার বাবু, কলকেতার মাটিতে পা দিলে সবাই বাবু হয় গিন্নি ডেকেছেন আসবি তার আর বাবুকে জিজ্ঞাসা কি। তার পরদিন খবর এল আজ বৃহস্পতিবারের বারবেলা আজ আর যাব না কাল যাব—দেখ একবার অহঙ্কারটা, ভাড়া বাড়িতে থাকিস তোর আবার দিন ক্ষণ কিরে। তারপর অহঙ্কারের উপর অহঙ্কার, শুক্রবার দিন দুপুর বেলা মাগি কি না এক পাল্কী চড়ে দুম্ দুম্ করে এসে উপস্থিত—পাড়ার ভিতর দুটো বই গলি পার হ'তে হয় না, আর সদর রাস্তার উপব কত টুকুখানিই বা আসতে হয়, এ কিনা পায়ে হেঁটে আসতে পাল্লেন না, পাল্কী যেন কেউ কখন দেখেনি, তাই পাল্কী দেখাতে এলেন।

পাড়াগেঁয়ে মানুষ কখন পাল্কী চড়েনি, এই মনে করে গৃহিণী তাও ক্ষমা ঘৃণা কবেছিলেন, ভেবেছিলেন চড়ুক চড়ুক কতদিনই বা ভোগ হবে দুদিন চড়ে নিক্; আব শুধু কি তাই, ঠাট দেখে গিন্নি রাগ করবেন কি হাসিই চেপে রাখতে পাল্লেম না। মাসীব বযস যেমন করে হোক ছগণ্ডাব উপব হয়েছে, 'পাড়ার ভিতর একখানা যা'তা' পরে এলেই হতো, তানা তিন আঙুল চওড়া মতি পেড়ে শাড়ি পাট ভেঙে পরে আসা হয়েছে; আবার নিচে হাত বালা, চুড়ি, ওপর হাতে তাগা, গলায় চিক, কোমরে সোনাব গোট, কানে মাকড়ি, আ'মব কার বাড়ি তুই গয়না দেখাতে এসেছিস্, আবার লজ্জাব কথা বলবো কি ফিরিঙ্গি খোঁপা করে চুল বাঁধা হয়েছিল। এসেই গিন্নিকে টিপ করে এক প্রণাম কবা হলো, এটি জানান হলো, যে তিনি যেন ওর চেয়ে বযসে বড। বাড়িতে লোকটা এসেছে তাই গিন্নি আদব কবে জিজ্ঞেসা করেছিলেন যে দিদি তোমাব নামটি কি ভাই, তা বলা হ'ল ''ভবসুন্দবী'', শুধু ভব বললে কেউ যেন বুঝতে পাবতো না, আর অহঙ্কারেব কথা কত বলব বল, গোটছড়াটি দেখে গিন্নিব মনে ধরে ছিল, তাই সাড়ে সাত গণ্ডা টাকা আলাদা তুলে বেখে ছিলেন, তা মাগি কি বজ্জাত একদিনও সে ছড়া বাঁধা দিতে এলো না। ও যেমন মাগি তেমনি মিন্‌সে, মিন্‌সে বাজাব কবে দরজা দিয়ে দেখিযে দেখিয়ে নিযে যায়, একদিন একটা ভেটকি মাছ, একটা ইলিশ, একদিন একটা গর্ভমোচা, একদিন ডিমলো কাঁকড়া, একদিন কুড়ি খানেক লিচু এই বকম কতদিন কত কি নিযে নিয়ে গেছে, গৃহিণী বৈঠকখানাব খডখড়িব ভিতর দিযে এসব দেখেছেন। হায় হায এত অহঙ্কাব কবেও মানুষের এতদিন স্বচ্ছলে চলছে, এতদিন এসে বাড়ি ভাড়া করে আছে এব মধ্যে একদিনও জলেব কলসি আগুন রাখাতো হলো না, এতে যে কলিতে ধর্ম আছে, মুখ পোড়া মধুসূদনের বিচাব আছে, তা গৃহিণী কেমন করে বিশ্বাস কবেন বল দেখি। তিনি নিজেও তাঁহার স্বামী পুত্রাদি ভিন্ন অপব লোক যে এ পৃথিবীতে বেঁচে আছে, পিতৃপুণ্যে ও নিজ অমানুষিক ধৈর্য গুণে গৃহিণী ইহাও কোন মতে সহ্য কবে আছেন, কিন্তু তাহার উপর উহার খায়, পরে কোটাবাড়িতে বাস কবে, গহনা গড়ায়, ছেলে মেয়ের বিবাহ দেয়, বাড়িতে প্রতিমাটা আসটা আনে, চর্মচক্ষে এসব গৃহিণী কেমন করে দেখেন বল; গৃহিণীর সাংসাবিক সুখের মধ্যে এই গুলি কন্টক, লক্ষ্মীস্বরূপিণী অবলা এই সব দেখিয়া শুনিয়া দিবারাত্রি হাহুতাশ করেন, থাকিয়া থাকিযা ওহো হো হোহো হো মদূসূদন কতদিনে এ যন্ত্রণা যাবে, কবে নিস্তার পাব বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, এবং ত্রিসন্ধ্যা ঠাকুর ঘরের চৌকাটে মাথা কুটিয়া কুটিয়া ললাটের মধ্যস্থলে একটি আব প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছেন। একদিন পাড়ার বাবওয়ারি পূজা উপলক্ষে যাত্রা হইতেছিল, পল্লীর প্রায় সমস্ত লোক সেইখানে সমবেত

হইয়া যাত্রা শুনিতেছিল, বালক বৃদ্ধ যুবা সকলেই আমোদ করিতেছিল, অনেক স্ত্রীলোকও আটচালার অন্তরালে বা বারওয়ারি তলার চতুঃপার্শ্বস্থ ছাদ হইতে যাত্রা শুনিতেছিলেন। আজকাল দিনেরবেলাই যাত্রা হয়, বায় মহাশয় আফিসে গিয়া রক্ষা পাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সহধর্মিণীর যমযাতনা উপস্থিত হইল। তিনি গৃহের সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিলেন, তথাপি ঢোল মন্দিরার আওয়াজ গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিতে লাগিল, গানের সুব হাসির হররা, তাঁহার কানে বাজিতে লাগিল, গৃহিণীর প্রাণ একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, অবশেষে তিনি একপ্রকার উন্মাদের ন্যায় হইয়া আত্মহত্যার মানসে গলায় দড়ি দিবার উদ্যোগ করিলেন, এমন সময় তাঁহার পিতৃপুণ্যে পার্শ্বের গলির ভিতর হইতে অকস্মাৎ একেবাবে বহুকণ্ঠে হৃদয়বিদারক বোদন ধ্বনি উঠিল, গৃহিণীর হস্ত হইতে রজ্জু পড়িয়া গেল, তাঁহার কৃষ্ণ দন্তপাতি বিস্ফারিত হইল, বুঝিলেন যে ময়রাদের যে বৌটি সূতিকা পীড়ায় ভুগিতেছিল, তাহাব সকল দুঃখের অবসান হইয়া গেল, যেন যৌবনেব বলে বলীয়ান হইয়া তিনি সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিলেন; ঢোল, মন্দিরা, তানপুরা, বেহালা, হাসির হবরা, তুড়ি, বাহবা, বেশ, ছাপাইয়া সর্বনাশঘোষণাকারী আর্তনাদী রোদনরোল সেই ক্ষুদ্র গৃহখানি ছাইয়া ফেলিল। প্রফুল্লমুখী রায়গৃহিণী তখন লোহার সিন্দুক খুলিয়া একটি আদলা পয়সা বাহির কবিলেন এবং "বিধাতা তুমিই সত্য" এই বলিয়া আদলাটি নিজের কপাল স্পর্শ কবাইয়া হরিব লুটের বাতাসা কিনিবার জন্য তাকের উপর উঠাইয়া রাখিলেন।

সন্ন্যাসিনী

স্বর্ণকুমারী দেবী

(১)

নদীতীরে সুবিস্তৃত শ্মশানপ্রান্তে ভস্মাবশেষ চিতার সম্মুখে কে ঐ দীনবেশা আলুলায়িত কুন্তলা মলিনমুখী রমণী বসিয়া? ও বুঝি সন্ন্যাসিনী। ঐ নির্জীব নিষ্প্রাণ চিতাভস্মের মত তাহার হৃদয়ও বুঝি আজ সুখদুঃখ হীন? আপনার মর্মশোণিতে ঐ চিতাবহ্নি নির্বাসিত করিয়া জীবন্তে বুঝি আজও জীবনহীনা? হায়! সবে মাত্র যে কচি হৃদয় নবীন প্রেমে, নবীন আশায়, নবীন বাসনায় মুকুলিত হইয়া উঠিয়াছিল, কে জানিত, সূর্য না অস্ত যাইতেই শুষ্কপত্রের মত এইরূপ করিয়া পড়াই তাহার পরিণাম।

যখন নলিনী ফুলেব মত মুখটি লইয়া বাল্যসখা কুমাবেব হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে এই নদীতীরে বসিযা গল্প করিত, নদীর জলে ফুল ভাসাইযা ছোট ছোট পা দুখানি দিযা ঢেউগুলিব সংগে সংগে ফুলগুলি নাড়াইয়া দিত, নদীর জলে নামিয়া দুজনে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইত, তখন কে জানিত তাহার এই পবিণাম।

সেদিনও যখন এই নদীতীরে বসিয়া কুমার তাহাকে তাহাদেব ভবিষ্যৎ কাহিনী শুনাইতে ছিলেন, কল্পনাপটে সুখের ছবি আঁকিয়া দেখাইতেছিলেন, তখন নলিনী কি একবার স্বপ্নেও মনে করিয়াছিল যে, তাহাদের কল্পনা কেবল কল্পনাতেই অবসান হইবে।

সেদিন বসন্তের প্রভাত, নদীর চঞ্চল বুকে ববিকিরণ তবঙ্গভঙ্গে খেলা করিতেছে, নদীব ধাবে মুকুলিত আমের গাছে একটি পাপিয়া সুর ভাজিতেছে, তখন কুমার ও নলিনী বসিয়া আছেন। নলিনীর মুখখানিতে আজ হাসি নাই। তাহার চোখে জল। মিবার সেনাপতি অজয়সিংহ এই উপত্যকা-পথ দিয়া যখন সেনাপতি মহাবুব খাঁব গতিরোধ করিতে যাত্রা কবিবেন, কুমার সেই অবকাশে তাঁহার সেনাদলভুক্ত হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন, এই সংবাদে নলিনী কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একবৃন্তে দুইটি ফুলের মত তাহারা পাশাপাশি বাড়িয়াছে, কুমাব গেলে নলিনী একাকী কি করিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া নলিনীর নয়নে অশ্রুজল।

কুমার নলিনীর চোখ মুছাইয়া বলিলেন, 'নলিনী, কাঁদিতেছ কেন? আমি আবার শীঘ্রই আসিব।' নলিনী উত্তর করিল না, অশ্রুপূর্ণ-নেত্রে নীরবে কুমারের মুখের দিকে চাহিযা রহিল। কুমার আবার বলিতে লাগিলেন, 'যখন শত্রু নিপাত করিয়া মহারাজেব নিকট হইতে জয়মালা পুরস্কার আনিয়া তোর চুলে পরাইয়া দিব, তখন'—বলিতে বলিতে কুমাবের মুখ উদ্দীপ্ত, চক্ষু সজল অথচ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল, তাহার আজন্মের আশা, কল্পনার সফলতা যেন তাঁহার নয়নে মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর একবার কেবল আস্তে আস্তে বলিলেন, 'তখন নলিনী, তখন?' নলিনী সজল নেত্রে একটু হাসিল, কুমারের আর কোন কথা বলা হইল না। তাহার হাতখানি দুই হাতের মধ্যে রাখিয়া আনন্দ বিহ্বল নেত্রে মুগ্ধের মত তিনি কেবল তাহার চোখেব দিকে চাহিয়া রহিলেন। এইরূপে কত সময় বহিয়া গেল, তাঁহারা বুঝিতেও পারিলেন না। সহসা উপত্যকা-পথে সৈন্য-কোলাহল, অশ্বপদ শব্দ, বাদ্যধ্বনি

উত্থিত হইল। কুমার স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, 'ঐ বুঝি রাজধানী হইতে সৈন্য আসিতেছে। নলিনী, নলিনী, দেখবি আয়—'

(২)

আজ এই ক্ষুদ্র উপত্যকা-গ্রামের প্রাণে উত্তেজনা ও আনন্দের সীমা নাই। রাজধানী হইতে সৈন্য আসিয়াছে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী, সৈন্যগণ শ্রেণী বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহাদের বর্শাফলকে রৌদ্রকিবণ পড়িয়া ঝক্‌মক্ করিতেছে। ঔৎসুক্য-ব্যাকুল গ্রামের আবালবৃদ্ধবণিতা পথ প্রান্তর জনতাময় করিয়া তুলিয়াছে। গৃহের ছাদ, এমন কি, গাছের ডালও জনশূন্য নহে। মাতৃবক্ষস্থিত নিদ্রিত শিশু কোলাহলে জাগরিত হইয়া এই বিস্ময়দৃশ্য দর্শনে কাঁদিতে পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে। নলিনীও এই সৈন্য-সমারোহ দেখিযা এমনি মুগ্ধ হইযা গিয়াছে যে, জনস্রোত-তাড়নে কুমার কখন যে তাহার পার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পডিযাছেন—তাহা সে জানিতেও পারে নাই। সহসা বালিকাব মুগ্ধনেত্রে ভয-বিহ্বল চকিত কটাক্ষ প্রকটিত হইল, তাহার ক্ষীণদেহ লতিকার মত কম্পিত হইয়া উঠিল, সে দেখিল—একটি আবোহিহীন অশ্ব জনতা ছিন্নভিন্ন করিতে করিতে দ্রুতগতিতে এই দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ আর দু একটি উন্মত্ত লম্ফ আর দু একটি মুহূর্ত—তাহার পর এখনি সে অশ্বপদে দলিত হইয়া যাইবে। বালিকা সভয়ে চিৎকার করিযা উঠিযা সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইযা পডিল। পডিতে না পড়িতে একজন অশ্বাবোহী পুরুষ নিমিষেব মধ্যে অশ্ব হইতে অবতবণ কবিযা তাহাকে ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন।

বালিকা মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিল, সে তাহাব পিতৃগৃহে শযান, নিকটে অপবিচিত সুন্দব যুবাপুরুষ উৎসুক দৃষ্টিতে তাহাব মুখেব দিকে চাহিযা।

(৩)

কুমাব একাকী বসিয়া আছেন, নদীব ধাবে বকুলেব তলাটি ফুলে ফুলে ছাইযা গিযাছে। নলিনী এখনো মালা গাঁথিতে আসে নাই—কুমাব একাকী বসিযা আছেন। এখন আব নলিনী আগেকার মত প্রত্যহ এখানে খেলিতে আসে না, যদি কোনদিন আসে, তেমন কবিযা আব কুমাবের সংগে গল্প করে না, ফুল কুডাইয়া, মালা গাঁথিযা, আব কুমাবকে আগেব মত পবাইয়া দেয় না। কুমাব তাহাকে ফুল পবাইয়া দিবে, সে আব হাসিয়া উৎফুল্লমনে তাঁহাব দিকে তেমন করিয়া চাহে না, কুমাবেব সহস্র চেষ্টায তাহাব মুখে আর পূর্বেব সেই সবল অনুরাগেব হাসি ফুটিযা উঠে না—কিন্তু অজযসিংহকে দূব হইতে দেখিলে তাহাব এভাব পরিবর্তিত হয়, তাহার নযনের স্বাভাবিক জ্যোতি, অধবেব অনুবাগ-হাসি, আপনা হইতে আবার বিকশিত হইযা উঠে।

কুমার ও নলিনী ছেলেবেলা হইতে দুজনে একত্রে বাড়িয়াছেন, একত্র খেলিযাছেন, দুজনের জীবন অচ্ছেদ্য ডোরে গ্রথিত ভাবিয়াছেন। তাঁহাদের দুজনেব হৃদয় দুজনের নিকট অপ্রকাশিত ছিল না, কাহারও প্রেমে কাহারও অবিশ্বাস ছিল না, তবে যে এতদিন বিবাহ হয নাই, সে কেবল কুমার ভাবিয়াছিলেন, নলিনীর যোগ্য হইয়া তবে নলিনীর পিতাব নিকট তাঁহাকে ভিক্ষা চাইবেন, এইবার যখন তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কবিবাব দিন উপস্থিত, যুদ্ধশেষে বীবত্ব-গৌরব আনিয়া নলিনীব চরণে উপহাব দিয়া তাহার হাত হইতে ববমাল্য গ্রহণ করিবেন, এইরূপ যখন আশা করিতেছেন, তখন তাঁহার সে আশা সে স্বপ্ন বজ্রাঘাতে সহসা ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি জাগরিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, নলিনী আর তাঁহার নাই—নলিনী অজয়সিংহের।

কুমার একাকী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন—আর নলিনীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন—যুদ্ধে যাইবার আগে একবার তাহার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা। তাহার পর ভুলিতে পারেন দেশে ফিরিবেন, নইলে এই শেষ দেখা। কেনই বা ভুলিতে পারিবেন না? তাঁহার জীবনের একটি আশা আলো নিভিযাছে সত্য, কিন্তু তাহাই কি তাঁহাব জীবনের সর্বস্ব? সমরক্ষেত্রে যশস্বিতা লাভ কবা তাঁহার আর একটি আশৈশব প্রাণের আকাঙ্ক্ষা; বাল্যকালে মাতৃক্রোড়ে দুষ্ট যবনদিগের অত্যাচার কাহিনী শুনিতে শুনিতে তাঁহার শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিত, শত্রুশোণিত রঞ্জিত হইয়া পিতার ন্যায় 'বীর' নাম লাভ করিতে মর্মান্তিক আকাঙ্ক্ষা জন্মিত। নলিনীর প্রেমও তাহার এ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি করিতে পারে নাই, বরঞ্চ বর্ধিত করিয়া তুলিয়াছিল, কেননা যশ-গৌরবই তিনি নলিনী লাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। সুতরাং এতদিন যশেব আকাঙ্ক্ষা প্রেমাকাঙ্ক্ষায় মিলিত হইযা তাহাব হৃদয়ে এক অপূর্ব রাসায়নিক উপাদান সৃষ্টি কবিয়াছিল, সহসা অজয়সিংহ মধ্যে আসিয়া তাঁহাদের সে একত্বনাশ করিযা দিলেন, একমাত্র যশাকাঙ্ক্ষায় এখন কুমারের হৃদয়ের সর্বেসর্বা হইযা উঠিযাছে, কেননা, প্রেমাকাঙ্ক্ষা আব তাঁহার পূর্ণ হইবাব নহে। নলিনী এখন অজয়কে ভালবাসে। নলিনী এখন অজয়ের বাগ্‌দত্তা, যুদ্ধশেষে অজয়সিংহ এখানে ফিবিযা আসিযা তাহাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইবেন।

কুমাব একাকী বসিয়া আছেন, নদী পূর্বের মতই কুলকুল শব্দে বহিয়া যাইতেছে, আকাশ অপবাহ্লেব সুবর্ণ আলোকে পূর্বের মতই রঞ্জিত হইয়া নদী বক্ষে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, আর বটবৃক্ষেব একটি আনত প্রকাণ্ড শাখা প্রতিদিনেব মত আজও সেই সুবর্ণ স্রোতেব মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছায়া বিস্তাব কবিযাছে, কুমাব সেই তরঙ্গিত ছাযালোকেব দিকে চাহিয়া একাকী বসিয়া আছেন। অপবাহ্নে লোহিত আভা যখন মিলায় মিলায়—তখন সেই কৃষ্ণবর্ণ ছাযাব উপব আর একটি ছাযা প্রতিবিম্বিত হইল, কুমাবেব হৃদয সশব্দে উঠিতে পড়িতে লাগিল, তিনি কিছুক্ষণ সেই ছায়াব দিকে নিবীক্ষণ কবিযা দেখিযা বৃক্ষতল হইতে উঠিযা ধীরে ধীরে সেই বটবৃক্ষ তলে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন পশ্চিমাকাশের প্রশান্ত লোহিতাভা নলিনীর অশ্রুসিক্ত বিষণ্ন মুখ মধুর ভাবে উজ্জ্বল কবিযাছে। নলিনী আকাশের দিকে চাহিয়া কাঁদিতেছে। নলিনীব অশ্রুজল কুমারেব প্রাণে পূর্বে কখনও সহে নাই, আজও সহিল না, তিনি নিজেব দুঃখ ভুলিয়া কাতর প্রাণে জিজ্ঞাসা করিলেন—'নলিনী কাঁদিতেছ কেন?'

কুমার যে নলিনীকে ভালবাসেন একদিন যে নলিনীও তাহাকে ভালবাসিত তাহার অনুরাগ এখন ভিন্ন পাত্রে অর্পিত দেখিযা সে ব্যথিত হইতে পারেন, এ সকল তাহাব কিছু মনে আসিল না, সে কেবল আকুল হৃদয়ে পূর্বের ন্যায বিশ্বাসভরে তাহার বাল্যসখাব নিকট হৃদয় খুলিয়া কাঁদিয়া কহিল, 'কুমার, অজয় যুদ্ধে যাইতেছেন, আর বুঝি আমাদের দেখা হইবে না।'

কুমারের মর্মস্থল হইতে ধীরে ধীরে একটি রুদ্ধ নিশ্বাস নির্গত হইল, কুমার প্রাণপণে সংযত হইয়া সরলকণ্ঠে বলিলেন—'হইবে বই কি?'

(৪)

আর আশা নেই, অজয় সিংহ আর শত্রুর গতিরোধে অসমর্থ, পঙ্গপালেব মত শত্রু সৈন্য মিবাবসৈন্যকে ঘিরিযা ফেলিতেছে। হতবুদ্ধি, বিশৃঙ্খল সৈন্যগণ কেহ দাঁড়াইয়া বর্শার আঘাত সহ্য করিতেছে, কেহ শূন্য তরবারি চালনা করিতেছে, কেহ সেনাপতির অনুজ্ঞা অবহেলা কবিয়া পলায়নপব হইতেছে, হিন্দুসৈন্যের চাবিদিকে এমনি একটা আতঙ্ক, নৈরাশ্য হাহাকাব পড়িয়া গিয়াছে। অজয়সিংহ নিরুপায হইয়া অগত্যা সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। যবন-

সৈন্যের মধ্যে সগর্ব জয়ধ্বনি উঠিল। কুমারসিংহ এতক্ষণ তাহার সহস্র সৈন্য লইয়া অন্যদিকে শত্রুদমনের চেষ্টা করিতেছিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ তাহাদের পরাভব করিয়া তিনি এই সময় অজয়সিংহের সাহায্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার বিজয়ী সৈন্যের হুহুংকারে অজয়সিংহের পলাতক ভীত সৈন্যগণ পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল, কুমার জয়োন্মাদে সৈন্যদল হইতে সৈন্যদলের সম্মুখীন হইয়া তাহাদের অনুজ্ঞা করিতে লাগিলেন, উৎসাহে জয়ধ্বনি করিয়া প্রবলপ্রতাপে তাহারা অস্ত্রচালনা করিতে লাগিল। ভাগ্যস্রোত ফিরিল। যবন সেনাপতি মহবুব খাঁ পলাতক হইলেন। এবার তাঁহার সৈন্যদিগের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তাহারাও ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল। কুমারসিংহ পলাতক শত্রুসেনাপতির অনুবর্তী হইযা অশ্বচালনা করিলেন। মহবুব খাঁর আহত অশ্ব কিছুদূর গিয়া ভূপতিত হইল, কুমাবসিংহ নামিয়া যবন সেনপাতির নিকট দাঁড়াইলেন, দেখিলেন, সেনাপতি সংজ্ঞাহীন। অনুবর্তী সৈন্য কয়েকজনের প্রতি তাঁহাকে উঠাইয়া লইবার ভার দিয়া তিনি তখন শিবিবাভিমুখী হইলেন। অর্ধপথে এক বৃক্ষতলে অজয়সিংহকে দেখিয়া তিনি সেই দিকে অশ্ব চালিত কবিলেন, বুঝিলেন, তিনি আহত হইয়া এইখানে অসহায় পড়িয়া আছেন। কুমার অশ্ব হইতে সবে মাত্র নামিয়াছেন, অজয়সিংহও তাঁহাব মধ্যে দুই তিন হাত ভূমি মাত্র ব্যবধান, এই সময় দেখিলেন, দূর হইতে একজন যবনসেনা অজয়েব প্রতি বর্শা লক্ষ্য করিতেছে, তিনি নক্ষত্রবেগে ছুটিযা অজয়কে আড়াল কবিয়া দাঁড়াইলেন—মুহূর্তকালমধ্যে বর্শা তাঁহাব বক্ষে বিদ্ধ হইল, তিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। নলিনীর বিদায়-দিনের সেই অশ্রুমুখ তাঁহাব মনে জাগিযা উঠিল।

(৫)

যুদ্ধজয়ের পব অজযসিংহ সসৈন্যে রাজধানীতে আসিযাছেন। আহত কুমাব এখানে আনীত হইয়াছেন। বর্শাঘাতে তাঁহাব তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় নাই, তবে বাঁচিবাব আশা অতি অল্প।

সংসার ভোজবাজী, অদৃষ্ট বাজীকর, কি কৌশলে যে এই বাজী খেলিতেছেন তাহা বুঝা দেবতার অসাধ্য মানুষেব কি কথা! কুমারের জনাই যুদ্ধ জয় হইয়াছে, কিন্তু সেনাপতি অজয়সিংহের যশোগৌরবে রাজধানী ধ্বনিত। ক্ষমতার প্রভাব সর্বত্র, তাহাব বিপক্ষে ন্যাযও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে অক্ষম, সুতবাং কুমাবের সৈন্যগণও এই প্রশংসার বিরুদ্ধে কথা কহিতে সাহস কবে না; কি জানি, তাহা শুনিলে অজযসিংহ ক্রুদ্ধ হইযা যদি তাহাদের শাস্তি প্রদান করেন। প্রথম প্রথম তাহারা সত্য কথাটা বলিতে ত্রুটি কবে নাই, কিন্তু বাজধানীব লোক তাহা শুনিলে হাসে, সে কথা বিশ্বাস করে না আব অজযসিংহেব সৈন্যগণ তাহা শুনিয়া শাসাতে থাকে, সুতরাং তাহার পর হইতে তাহারা আপনাদেব মধ্যে কানাকানি কবে, কিন্তু প্রকাশ্যে অজয়সিংহের প্রশংসাবাদে জয়ধ্বনি তুলে। কুমাব শয্যাগত, ক্ষমতাব বাজ্য হইতে তিনি দূরে পডিযা, তাঁহার পক্ষ হইয়া কে এখন সম্ভাবিত দুঃখ স্কন্ধে লইতে প্রস্তুত।

আজ রাজধানীতে মহোৎসব, মহারাজ আজ সেনাপতিকে পুবস্কৃত করিবেন। দুর্গপ্রাঙ্গণে সভা বসিয়াছে, শত শত সৈন্য, নাগরিক সভা বেষ্টন করিযা উৎসুক-চিত্তে দণ্ডায়মান। বাজা যখন সিংহাসন হইতে দাঁড়াইয়া হীরকশীর্ষ তরবারি কোষমুক্ত করিয়া বলিলেন, 'সেনাপতি অজয়সিংহ, তোমার জন্যই আজ মেবার শত্রুমুক্ত, তুমি যে কার্য কবিয়াছ, তাহার যোগ্য পুরস্কার ইহা নহে, কেবল—'

রাজার কথা শেষ না হইতে দর্শকমণ্ডলীর জয়ধ্বনিতে দিকবিদিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, সেই জয়ধ্বনি শূন্যে বিলীন হইতে না হইতে একজন বৃদ্ধ সৈনিক দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—'মহারাণা, রাজাধিরাজ, আপনি যে কার্যেব জন্য যাহাকে পুরস্কার

দিতেছেন, তিনি তাঁহার যথার্থ অধিকারী নহেন। অজয়সিংহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া যখন সন্ধিস্থাপন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, তখন প্রভু কুমারসিংহ নিজ বাহুবলে যুদ্ধ জয় করিয়াছিলেন।'

চারিদিকে বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, অজয়সিংহের মুখ রক্ত বর্ণ হইয়া গেল, মহারাজ অজ্ঞাত ভাবেই যেন অসি কোষবদ্ধ করিয়া অজয়সিংহকে বলিলেন—'সেনাপতি, ইহার মধ্যে কিছু কি সত্য আছে?'

অজয়সিংহের রক্তবর্ণ মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া পড়িল, ক্ষত্রিয় হইয়া মিথ্যা বাক্য তাঁহার মুখ হইতে কিরূপে নির্গত হইবে? কিন্তু যে যশ, যে গৌরব নিজের বলিয়া ভোগ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার এতক্ষণ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যও অন্যের ধন বলিয়া মনে হয় নাই, হঠাৎ কি করিযা তাহা চোরের ন্যায় ত্যাগ কবিবেন? অজয়সিংহ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বলিলেন,—'মহারাজ যিনি আমাকে অপরাধী কবিতেছেন, তিনি আমার দোষের প্রমাণ দান করুন, নিজেব পক্ষে নিজে বলিলে তাহা প্রামাণ্য হইবে না।'

অজয়সিংহের এই মহত্ত্বে পরিচয় সভাসদ সকলেই সাধুবাদ করিল, মহারাজ বক্তা সৈনিককে বলিলেন,—সৈনিক, তোমার প্রভু যে যুদ্ধজয় কবিয়াছেন তাহাব প্রমাণ কি?

বণজিৎ সত্যেব বল কণ্ঠে ধারণ করিয়া বলিল,—'প্রমাণ আমার কথা, আমি ক্ষত্রিয।'

মহাসত্য, কিন্তু অজয়সিংহ ক্ষত্রিয় তোমার কথা সত্য হইলে তিনি চোর হইয়া পড়েন।

রণজিৎ ক্রোধ দমন করিতে পারিল না, বলিল,—অজয়সিংহ চোর হইতেও অধম, কুমারসিংহ তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

মহাবাজ ক্রুদ্ধস্ববে বলিলেন—'সৈনিক চুপ কর, ইহা রাজসভা, গালি দিবার স্থল নহে, প্রমাণ যদি কিছু দিবার থাকে বল, নহিলে চলিয়া যাও,'—

রণজিৎ বলিল,—'প্রমাণ কুমাবসিংহেব দুই সহস্র সৈনিক।'

মহা—দুই সহস্রের আবশ্যক নাই, দুই জনকে ডাক।

রণজিৎ সেনা দুইজনকে ডাকিতে যাইতেছে, রাজা বলিলেন—তোমায় ডাকিতে হইবে না, প্রহরি তুমি যাও, ডাক।

প্রহরী জনমণ্ডলীর মধ্যে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—'কুমারসিংহের সৈন্যগণ কোথায়? তাহাদের মধ্যে দুইজন এদিকে এস, সাক্ষী দিতে হইবে।'

কুমারসিংহের সৈন্যগণের ত্রাস উপস্থিত হইল, বুঝি বা অজয়সিংহের বিরুদ্ধে যাহা বলিয়াছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে, সেই সম্বন্ধে বিচাব হইবে—প্রথমে সাক্ষ্য, তাহাব পর প্রাণদণ্ড। প্রহরীর ডাকে কেহ কোন উত্তর করিল না, আবার প্রহরী ডাকিল, 'কুমাবসিংহের সৈন্য দুইজনকে মহাবাজ ডাকিতেছেন, অগ্রসর হও।' চৌদিক নিস্তব্ধ, কেহ একপদ অগ্রসর হইল না। প্রহরী ফিরিয়া গিয়া কহিল 'কুমারসিংহের কোন সেনা সম্ভবতঃ এখানে নাই, ডাকিয়া কোনই উত্তর পাওয়া গেল না।' রণজিৎ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু কোন কথা কহিল না। মহারাজ বলিলেন, 'সৈনিক তোমার অন্য কোন প্রমাণ আছে?'

সৈনিক বলিল,— 'প্রভু কুমারসিংহ স্বয়ং ইহার প্রমাণ, তাঁহার সাক্ষ্য লওয়া হউক।'

অজয়সিংহ বলিলেন,—কিন্তু তিনি এখন শয্যাগত, এখানে তাহাকে আনিলে তাহার মৃত্যু হইতে পারে।'

সৈনিক বলিল—'ক্ষত্রিয়ের জীবন অপেক্ষা তাহার নাম, বীরত্ব, যশ অধিক মূল্যবান, তাঁহার নাম রক্ষার জন্য তাঁহাকে এখানে আনা হউক—'

মহারাজ বলিলেন—'আচ্ছা তাঁহাকে শিবিকা করিয়া এখানে আনয়ন কর।'

রণজিৎসিংহ দুইজন প্রহরী সঙ্গে লইয়া কুমারকে আনিতে গমন করিল। প্রহরী দুইজনকে একখানি মুক্তশিবিকা আনয়নের ভার দিযা রণজিৎসিংহ যখন কুমার সিংহের কক্ষে আসিযা

দাঁড়াইল—তখন কুমার বলিলেন,—'রণজিৎসিংহ তুমি কোথায় গিয়াছিলে, আমি সেই অবধি ডাকিতেছি, কাহারো সাড়া নাই।' রণজিৎসিংহ বিষণ্ণ মুখে বলিল,—'প্রভু শুনিলাম, আজ অজয়সিংহ রাজহস্ত হইতে যুদ্ধজয়ের পুরস্কার পাইয়াছেন। যিনি যথার্থ বিজয়ী, তিনি শয্যাগত তাঁহার নাম কাহারও মুখে নাই, আর অজয়সিংহ ভীরু, পাষণ্ড আজ মিথ্যা গৌরবলাভ করিতেছে। তাহা শুনিয়া সহ্য হইল না, আপনাকে একাকী রাখিয়াও তাই সত্য প্রকাশ করিতে গিয়াছিলাম।'

কুমারসিংহ নিস্তব্ধ হইয়া পড়িলেন, কুমারের যশ অজয়সিংহ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেছেন।

রণজিৎসিংহ বলিল,—'প্রভু আমার কথা মহারাজ বিশ্বাস করিলেন না, আপনাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে।'

ক্রোধে কুমারসিংহের তখন সর্বাঙ্গ কম্পমান। তাঁহার নলিনীকে লইয়া অজয়সিংহ ক্ষান্ত নহেন, নিজের ক্ষমতায় নিজের পরিশ্রমে তিনি যে যশ, যে নাম লাভ করিয়াছেন, চোরের মত তাহা হইতেও তিনি তাহাকে বঞ্চিত করিতে উদ্যত। মনের অতিরিক্ত আবেগে তিনি সবলে শয্যায় উঠিয়া বলিলেন, বক্ষের আহত স্থান রক্ত প্লাবিত হইয়া উঠিল, আবার ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িয়া বলিলেন,—'রণসিংহ, শিবিকা এখন আন, আমি সভায় যাইব।'

রণসিংহের চক্ষে জল আসিল, সে বলিল,—'শিবিকা আনিতে পাঠাইয়াছি।'

কিছু পরে কুমারকে বহন করিয়া একখানি মুক্ত শিবিকা রাজসভায় আসিয়া পৌঁছিল। কুমারের সেই ক্ষীণ অথচ উদার বীরমূর্তির প্রতি সকলের চক্ষু পড়িল, কুমার কেবল অজয়সিংহের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন।

কুমারের শিবিকা মহারাজের অতি নিকটে আনীত হইলে মহারাজ বলিলেন,—'কুমারসিংহ, তুমি মৃত্যু শয্যায় শয়ান, তুমি যেখানে যাইতেছ সেখানে পৃথিবীর মান, যশ তোমার সঙ্গে যাইবে, না, সত্য মাত্র এখন তোমার সাথের সাথী, এই বুঝিয়া তুমি বল, অজয়সিংহ বিজয়ী, না—তুমি!'

কুমারসিংহ উত্তর দিবার পূর্বে আর একবার অজয়ের শুষ্ক মলিন মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহার মনে হইল, একবার ইহাকে প্রাণ দিয়াছেন, এইবার ইহাকে প্রতিশোধ দিবেন? কিন্তু প্রতিশোধ! ইহা কাহার প্রতি প্রতিশোধ হইবে? অজয়ের প্রতি, না নলিনীর? অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিলে কাহার জীবনের সুখ নষ্ট হইবে? নলিনীর পিতা, একথা শুনিবার পর যদি অজয়কে জামাতা না করেন কাহার জীবন চির-নৈরাশ্যে দগ্ধ হইবে? কিংবা বিবাহের পর নলিনী কখনও যদি অজয়ের এই অপমানের কথা শুনিতে পায়, যদি জানিতে পারে সে প্রতারক, চোর তাহা হইলে তাহার কি ভয়ংকর যন্ত্রণা। বিদায়দিনের নলিনীর সেই অশ্রুপূর্ণ বিষণ্ণ মুখ কুমারের মনে আবার জাগিয়া উঠিল, কুমারের আর সত্য বলা হইল না, তিনি বলিলেন,—মহারাজ আমাকে ওকথা জিজ্ঞাসা করিবে না, প্রলোভন সংবরণ করা মানুষের দুঃসাধ্য।'

মহারাজ বলিলেন—'এই মৃত্যুশয্যাতে শুইয়াও?'

কুমার। হ্যাঁ।

মহারাজ। তবে আর তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই, অজয়সিংহকে পুরস্কার প্রদান করা হউক।

কুমার। হউক।

মহারাজ তখন উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন,—'অজয়সিংহ বিজয়ী, আর কোন সন্দেহ নাই।'

অজয়সিংহের নামে চারদিকে জয়ধ্বনি উঠিল, কুমারসিংহ হৃদয়ে সমস্ত বল সংগ্রহ করিযা মৌন হইয়া তাহা শুনিলেন, তাঁহার বীরত্ব-গৌরব অন্যেব নামে ধ্বনিত হইল, তাঁহার প্রাণের বিফল আকাঙ্ক্ষা প্রাণকে আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি রণসিংহকে কহিলেন, 'শীঘ্র আমাকে এখান হইতে লইয়া চল।'

বাহক শিবিকা তুলিল, রণসিংহ অশ্রু পূর্ণনেত্রে তাঁহার অনুগামী হইল। তিনি অর্ধ-মূর্ছিত অবস্থায় মনে মনে নলিনীর নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।

মহারাজ অজয়সিংহের কটিদেশে উপহার তরবাবি বাঁধিয়া কহিলেন, 'অজয়সিংহ, তুমি যে মহাকার্য সাধিত করিয়াছ, সামান্য ধনরত্ন তাহাব যোগ্য পুরস্কার নহে, আমার গৃহের সর্বশ্রেষ্ঠ অসামান্য রত্ন যাহার জ্যোতিতে আমার হৃদয় পর্যন্ত আলোকিত, তাহা তোমাকে অর্পণ কবিয়া কৃতজ্ঞতাব পরিচয় দিব।'

সেই দিনই রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল।

(৬)

যুদ্ধ শেষ হইয়াছে, অজয়সিংহ মহাবিজয় লাভ করিযাছেন। একথা নগরে গ্রামে রাষ্ট্র। তাঁহার প্রশংসা শুনিয়া নলিনীর হৃদয়ও উৎফুল্ল হইযা উঠিয়াছে। গর্ববিস্ফারিত উৎসুক হৃদয়ে সে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু দিনের পব দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে চলিল, তাঁহার আসিবার কোন লক্ষণ নাই তাঁহার পত্রাদিও অনেকদিন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নলিনীর ফুল্লমুখ দিন দিন শুকাইয়া আসিতে লাগিল, তাহার বিস্মিত হৃদয়ের আশা দিন দিন ম্লান হইয়া পড়িতে লাগিল। যে উপত্যকা-ভূমিতে প্রথম সে অজয়কে দেখিয়াছিল, প্রতিদিন সে সেইখানে একটি নিভৃত তরুতলে গিয়া বসে, মুহূর্তে মুহূর্তে দূরোত্থিত অশ্বপদধ্বনি শুনিয়া চমকিয়া উঠে। অবশেষে সন্ধ্যাকালে হতাশ ক্লান্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসে। একদিন তাহার অনুমান সত্য হইল। তাহার কল্পিত অশ্বপদধ্বনি শূন্যে বিলীন না হইয়া ক্রমে নিকটবর্তী হইতে লাগিল। নলিনীর আনন্দপূর্ণ দৃষ্টির সম্মুখে অবশেষে একটি ক্ষুদ্র সমারোহ প্রতিভাত হইল। দেখিল, বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈনিক একখানি সুসজ্জিত শিবিকার অগ্রপশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। শিবিকা যে বরবেশী অজয়সিংহকেই বহন করিয়া আনিতেছে, তাহাতে বালিকার আর সন্দেহ রহিল না।

শিবিকা একটি বৃক্ষতলে নামিল, বালিকা আর স্থির থাকিতে পারিল না, বর শিবিকা হইতে বাহির হইয়া পর্যন্ত তাহার আর বিলম্ব সহিল না, সে দ্রুতপদে কম্পমান হৃদযে শিবিকার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, শিবিকার অর্ধরুদ্ধ দ্বার খুলিয়া রণসিংহ ধীবে ধীরে অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করতেছে। রণসিংহ কুমারেব ভৃত্য, তাহাকে বালিকা চিনিত। কুমারের ভৃত্য অজয়সিংহের ভৃত্য হইয়া কেন আসিয়াছে। ইহা তাহার তখন মনেই হইল না। মনেব আগ্রহে সে শিবিকার অন্য পার্শ্বে গিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল, ইহার পর সমস্ত মস্তক তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া শিবিকাশায়ীর মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। স্তম্ভিত হইয়া দেখিল, অজয় নহেন, শিবিকার মধ্যে কুমার শুইয়া আছেন, তাহার মুখে মৃত্যুর প্রশান্তি বিরাজমান।

নলিনী সব শুনিয়াছে, রণসিংহ তাহাকে কুমারের আমৃত্যু বিবরণ, অজয়সিংহের শঠতা সমস্ত খুলিয়া বলিয়াছে, নলিনী এখন সন্ন্যাসিনী। শ্মশান তাহার বাসস্থান, কুমারের চিতাভস্ম তাহার একমাত্র উপভোগ্য দর্শনীয় বস্তু।

মৃণালের কথা

বিপিনচন্দ্র পাল

ভগিনীর পত্র

মেজ দাদা,

তোমার চিঠি পাইলাম। মৃণালের পত্রখানাও পড়িলাম। তুমি ভাবিও না। আমি তাবে বেশই চিনি, তোমার চাইতে বোধহয় বেশিই চিনি। দিন কতক যদি তারে না ঘাঁটাও, সে আপনি ফিরে আসবে।

লেখার ঢংটা দেখেও কি বুঝনি ও চিঠি তার নিজের নয়। তুমি বাগ ক'রো না, তার বিদ্যা কত, আমরা ত জানি। দেখ্‌ছো না কি, যে সব বই এর কথা গেঁথে গেঁথে মেজ'বউ এই চিঠিটা সাজিয়েছে। আমি ভাব্‌ছি সে অমন চিঠিটা তোমায পাঠালে কেন? তা না কবে' কোন ভাল মাসিক কাগজে পাঠিয়ে দিলে তার লেখাব তাবিফ বেবোত', কালে জানি কি একজন বড় লিখিয়ে বলে লোকে তাকে জান্‌ত। আমার দুঃখু হয, আমবা দুই ভাই-বোন আর উনি ছাড়া অমন একটা বড লেখা বাংলার সমজদাব পাঠকেব কেউ পড়লে না।

আমার সন্দেহ হয়, এ চিঠিটা সত্যি সত্যি মেজ'বউব লেখা কি না। তার যে ভাইটার কথা লিখেছে, তাকে ত তুমি বেশ জান। শুনছি সে নাকি একজন ভারি লিখিযে হযে উঠ্‌ছে। শুঁড়ওয়ালা নাগরা জুতা পায় দেয়, চুড়িদার জামা পরে, আব কবিদেব মতন বাব্‌বী চুল রেখেছে। শুনেছি ববিঠাকুরের সঙ্গেও নাকি খুবই জানাশুনা আছে। তাঁর নাম সহি ছবি পর্যন্ত বাক্সে আছে, বন্ধু বান্ধবদেব দেখিযে বেড়ায। সে'ই হয়তো এ চিঠিটা লিখে দিযেছে। লেখার খুব বাহাদুরি আছে, উনি পড়ে বললেন যে ঠিক যেন ববি ঠাকুরেবই মতন। তুমি জান কি? মে'জ বউই আমায় লিখেছিল যে "সঞ্জীবনীতে" স্নেহলতা ছুঁড়িটার যে চিঠি বেরিয়েছিল, সেটা নাকি এই ছোঁড়াটাবই লেখা, স্নেহলতার নাম জাল কবে ছাপিয়েছে। আমাদেরো পড়েই তাই মনে হযেছিল। হিন্দুঘরের মেয়ে, যতই জ্যাঠা হোক না কেন, অমন চিঠি লিখ্‌তে পারে না।

দেখ্‌ছো না, মেজবউ এর চিঠিও এই ছাঁচেই ঢালা। আমরাও ত তোমাদের কল্যাণে একটু আধটু বাংলা শিখেছি, কিন্তু অত বড় বড় কথা ত কৈ জুটাতে পারি না। আর অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে লেখা। উনি বললেন আগাগোড়া যেন ইংরেজির তর্জমা। মৃণাল কবিতাই লিখুক আর যাই করুক, ইংরেজিও পড়েনি, বিলেত টিলেতও যায় নি। সে অমন ইংবেজি ঝাঁঝের বাংলা লিখ্‌তে শিখ্‌লো কেমন করে, উনি কিছুতেই ঠাওর করতে পারলেনা। আমি মুর্খু মানুষ, কি আর ব'লব?

তুমি বল্‌'বে, ইংরেজি হো'ক, বাংলা হো'ক, লেখাটা ত মৃণালের; ভাবটা যারই হো'ক না কেন, মনের ভাবটা ত তার নিজের। আমি বলি, তাও নয়। ভাষা ভাব, সব ধার করা,

নাটুকে জিনিষ। দেখছ না, ও কোথায়, কোন্ নাটকে, কি কোন্ গানে, মীরা বাই-এর কথা পড়েছে, আর অম্নি ভাবছে যে সে মীরা বাই হয়েছে। উনি বললেন, ভক্তমালের যখন আবার নতুন সংস্করণ হবে, তখন মেজ'বউ এর কোন কবি-ভক্ত নিশ্চয়ই, মীরা বাই এর কথার পরে, তার কথাটাও বসিয়ে দেবে। এ চিঠিতে তারই আয়োজন হচ্ছে। তামাসা করছেন না, সত্যি হতে পারে। তবে তুমি মাঝখানে পড়ে বাগড়া দেবে, ওঁর ঐ যা ভয়?

উনি বললেন, এ চিঠিটা আর কিছু নয়, কেবল হিস্টিরিয়া। ওঁদের ডাক্তারী কেতাবে না কি লেখে হিস্টিরিয়াতে এ সব হয়। এমন কি, অমন যে রক্তমাংসের মানুষের পিঠটা, তাও নাকি একেবারে কাচের হয়ে যায়। উনি বলেছিলেন যে ডাক্তারী বই এতে নাকি এ ধরণের একটা মেয়ের কথা আছে, তার বিশ্বাস হয়েছিল্ল যে, তার পিঠটা কাঁচের হয়ে গেছে। তামাসা করে একজন তার পিঠে একটা চাপড় মারাতে, "পিঠ গুঁড়ো হয়ে গেল" বলে চীৎকার করে সে মেয়েটা তখনি মারা যায়। হিস্টিরিয়াতে এতটা নাকি হয়। মেজ'বউ এর এও এক রকমের হিস্টিরিয়া। তার খেয়াল হয়েছে যে, সে কারার বন্দিনী, আমাদের বাড়িটা একটা জঘন্য জেলখানা, তোমরা সবাই কারারক্ষক। আমাদের বাড়ীর উঠানটা ত নেহাৎ ছোট নয়,—আমার শাশুড়ী তোমার বে'র সময় গিয়ে ঐ উঠান দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছলেন,—পাড়াগাঁয়েও অমন দৌড়দার উঠান কম, কলকাতার ত কথাই নাই। কিন্তু এত বড় উঠানটা মেজ বউ'এর চোখে কত ছোট ঠেক্‌ছে। আমাদের ঘরগুলো কেমন বড় বড়, উত্তর দক্ষিণ খোলা, সাহেবদের ঘরের মতন অমন সাজান না হলেও কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মেজেগুলো আয়নার মতন চক্‌চক করছে। আর বড় বৌ এর যে শুচি বাই, রাতদিনই তা কেবল জল ঢাল্‌ছেন, আর দুটো ঝির পেছুনে পেছুনে ঘুরে ঘষাচ্ছেন ও মাজাচ্ছেন, এমন সাফশুক্ষ ঘরদোর সকলের বাড়িতে দেখা যায় না। কিন্তু অমন ঘরেও মেজ'বউ এর মন উঠে না। কিন্তু মেজ'বউএর কোনও দোষ নাই। মেজ'বউ ত আর চোখ দিয়ে কোনও জিনিষ দেখে না। তার খেয়াল যখন যেটা যেমন ঠেকে সেটাকে তেমনি দেখে। উনি বলেছিলেন যে, সব কবি আর ঋষিদেরও নাকি ঐ রকম স্বভাব।

একদিনের কথা তোমায় বলি, এ কথাটা নিয়ে আমরা কতদিন হেসে হেসে গড়াগড়ি দিয়েছি। সে বারে আমি পূজার সময় তোমাদের ওখানে ছিলাম। তুমি ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলে। তখন বছর পাঁচ ছয় বোধহয় মেজ'বউ এর বে' হয়েছে। আমি মেজ'বউ এর ঘরে শুতাম। একদিন, ঘোর আঁধার রাত, আকাশে ঘন মেঘ, বাহিরে গিয়ে হাত বাড়ালে হাত দেখা যায় না। অনেক রাত অবধি আমি বড় বউ এর কাছে বসে গল্পগাছা করছিলাম। শু'তে গিয়ে দেখি, মেজ'বউ জানালার পাশ বসে অন্ধকার পানে তাকিয়ে আছে। বললাম, "রাত অনেক হয়েছে, মেজ'বউ শুতে এসো।" মেজ'বউ আমায় বললে কি জান?—"ঠাকুর ঝি, দেখ এসে কেমন সুন্দর চাঁদ উঠেছে। ঐ আমবাগানে যেন রূপো গালিয়ে ঢেলে দিয়েছে। আকাশে যেন রূপালী রং মাখিয়ে তার নীলবরণকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে। মরি, মরি, কি সুন্দর।'

আমি চম্‌কে উঠলাম, বললাম, "বলিস্ কি মেজ'বউ? এ যে ঘোর আঁধার রাত। কাল বাদে পরশু কালীপূজা। চাঁদ পেলি কোথায়? তোর অত রসের ঢেউ আজ উঠ্‌ল কিসে?"

মেজ বউ একেবারে চটে উঠে বললে, "ঠাকুর ঝি, তোমার আক্কেল কেমন? অমন ত্রিদিববন্দ্য চন্দ্রমাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করছো? না তোমার চোখের মাথা খেয়েছ?"

আলোটা একটু উষ্কিয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে দেখ্‌লাম মেজ'বউ এর চোখের ভাবটা সহজ মানুষের মতন নয়। প্রাণ শুকিয়ে গেল। তবে কি শেষে পাগল হ'লো। হঠাৎ তার বিছানার দিকে চেয়ে দেখি, মেজ'বউ এক নতুন কবিতা লিখেছে—

চাঁদনি রজনী, আও লো সজনি
চাহলো নয়ান মেলি
আম্র কানন মর্ম মন্থন
নর্ম্ম পরাণ কেলি।
শুভ্র উজ্জল, অভ্র কাজল
উছল ভুবন ভরি
মঞ্জীর মুকুরে, শিঞ্চিত নূপুবে
রঞ্জল কিবা মরি!

তখন আমার ঐ ডাক্তারী বই এর কথা মনে পড়লো। ভাব্‌লাম এ খেয়ালটা তাব যেমন আছে থা'ক। জোর করে ভাঙাতে গেলে হয় ত উল্টা উৎপত্তি হবে। তাই ভেবে বললাম—

"তাই ত মেজ'বউ, আমাব কি ভ্রমই হয়েছিল? সত্যই ত বড় সুন্দব চাঁদনি রাত। তবে জানই ত, উনি কালীপূজার সময় আমায় নিয়ে যেতে আস্‌বেন, তাই ভেবে ভেবে কালই বুঝি অমাবস্যা তাই মনে হচ্ছিল। আমি বিরহে অন্ধ হয়ে গেছিলুম, তাই অমন জোছনা রাতও চোখে আঁধার ঠেক্‌ছিল।

মেজ'বউ এর মুখখানি অমনি প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। জানালা থেকে লাফিয়ে উঠে এসে, আমায় একেবারে জড়িয়ে ধরে বললে—

"ঠাকুরঝি তুমি তবে প্রেম তা' কি জান? আমি ভাবতাম তুমি কেবল রান্নাবান্নাই কব, আর স্বামীপুত্রকে খাইয়ে দাইয়ে এ দাসীত্বেই অমন নারীজন্মটা খোয়াচ্ছো। বাঙ্গালীব মেয়ে খাঁচার পাখি, তারা কি বনের পাখির সুর কখনও ভাঁজতে পারে? কেবল বাঁধা বুলিই ত কপচায়, দেখি! বনের গান একেবারে ভুলে গেছে। হায়! বনেব পাখি হলাম না কেন?"

আমি কি আর বলব? তামাসা করে বললাম—

"তোর চকা তো এখন আকাশে উড়ছে, বাসায় ফিবে এলে বলিস্‌, তোরে উডিয়ে নিযে বনে যাবে।"

এই চিঠি পড়ে আমার সেই কথা মনে পড়ল। এও তার খেয়াল। কবিতাগুলো কি সে সঙ্গে নিয়ে গেছে, না সত্যিই পুড়িছে ফেলেছে? ও জিনিস পুড়ান যায় না। দেখ দেখি, কোথাও রেখে গেছে কি না? যদি রেখে গিয়ে থাকে, তবে খুঁজে দেখ, ঐ কৃষ্ণ পক্ষেব জোছনার বর্ণনার মতন বিন্দির সম্বন্ধেও অবশ্য দু-দশটা কবিতা পাবে।

তুমি ত তাকে জান। পনের বছর তাকে নিয়ে ঘব করছ। সে যে তোমায় ছেড়ে বেশি দিন ঐ নীল-সমুদ্র আর আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ নিয়ে থাক্‌তে পাববে তা ভেব' না। সত্যি জিনিষে তার মন উঠে না। ছেলেবেলা থেকে সে তাই ছোট যা তাকেই বড়, আর বড় যা তাকেই ছোট করে ভেবেছে। তোমার বাড়ি থেকে তোমার শ্বশুরবাড়ি কত দূব তুমি জান। শ্যামপুকুর আর টালা দু-দশ দিনের পথ নয়। সেকেন্ডক্লাস গাড়িতে আধঘণ্টা লাগে। কিন্তু বাপের বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ি এত কাছাকাছি এটা ভাব্‌তে মেজ'বউ এর ভালো লাগ্‌ত না। তোমারই মুখে শুনেছি, তাই সে কোনও দিন সোজাসুজি বাপের বাড়ি যাতায়াত করেনি। শিয়ালদ' এ রেলে চেপে দমদম গিয়ে নেমেছে; সেখান হ'তে ছ্যাকড়া গাড়িতে টালায় গিয়েছে। একবার— তোমার মনে আছে কি?— সেবার বর্ষাকালে আমি তোমাদের দেখ্‌তে যাই। মে'জ বউএর ভাইপোর ভাত। কিন্তু সে কিছুতেই গাড়িতে বাপের বাড়ি যাবে না। শিয়ালদ' এ রেলে চেপেও যাবে না। বলে—বর্ষাকালে বধূরা নৌকায় বাপের বাড়ি যায় সব কেতাবে লেখে। গাড়িতে বরষার অভিসার কোনও কালে কেউ লেখে নাই। যদি যাই ত নৌকায় যাব। এক রাত নৌকায় শোব। চড়ায় নৌকা লাগিয়ে ভাত রেঁধে খাব। মাঝিগুলো

ক্যাঁৎ ক্যাঁৎ করে দাঁড় টানবে আর ভাটিয়াল গাইবে। কোট করে বস্‌ল। কি কর, তুমিও তা'তেই রাজী হলে। শোভাবাজারে গিয়ে সন্ধ্যা বেলা নৌকায় উঠলে বাগবাজারে এসে রাত্রে রান্নাবান্না করলে পরের দিন প্রাতে শ্যামবাজারের পোলের কাছে নৌকা লাগিয়ে পাল্‌কী করে তাকে নিয়ে শ্বশুব বাড়ি গেলে। এ সকল জেনে শুনেও তুমি অমন অস্থির হয়েছ কেন?

আমাকে পুরী যেতে বলছ, আমি এক্ষুনি যেতাম। কটক থেকে পুরী তেমন দূরেও নয়। কিন্তু গেলে উল্টো ফল হবে। আমি আমার ঠাকুরপোকে পাঠাচ্ছি, সে মেজ'বউকে চোখে চোখে রাখ্‌বে আর প্রতিদিন আমাকে খবর দিবে। উনি তা'কে একটা খাতা করে দিয়েছেন। বললেন, "তুই সর্বদা সঙ্গে থাক্‌বি আর এই খাতায ডায়রী বাখ্‌বি। আর রাত্রে ডায়রীটার নকল পাঠাবি।"

মেজদা তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমবা থাক্‌তে মেজ'বউএব কোন বিপদ্ ঘট্‌বে না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঠাকুর পো'র পত্র

১

বউদিদি,

এই তিন দিন তোমাকে কোনও খবর দেই নাই, খবব দিবার কিছু ছিল না। তোমার মেজ'বউ যে বাড়িতে ছিলেন আমি এসে দেখ'লাম সেখানে নাই। সে এক পান্ডার বাড়ি। কোথায় যে উঠে গেছেন, তাও সে কথা বল্‌তে পারলে না।

তোমার যে খুড়িমাব সঙ্গে তোমার মেজ'বউ পুবী এসেছিলেন এখন তিনি দেশে ফিরে গেছেন। তোমাব মেজ'বউকে যাবার জন্য শুন্‌লাম অনেক পীড়াপীড়ি করেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই যেতে বাজি হননি। ওদিকে তাঁর পৌত্রটিব বড় অসুখ, খবর পেয়ে বেচাবী আর থাক্‌তে পারলেন না। তোমার মেজবউ তাঁর ভাইকে নিয়ে সেই পান্ডার বাড়িতেই রযে গেলেন, বললেন যখন জগন্নাথ এনেছেন, তখন রথযাত্রা না দেখে যাব না। তোমার খুড়িমা চলে গেলে পরেব দিনই তোমার মেজ'বউ সে পান্ডার বাড়ি থেকে কোথায় উঠে গেছেন, তারা কেউ জানে না। তবে বললে, স্বর্গদ্বারে নাকি একটা বাড়ি ভাড়া করেছেন।

তোমার মেজ'বউকে যদি আমি জান্‌তাম বা তাঁব ভাই-এর নামটাও যদি বলে দিতে, তা হলে স্বর্গদ্বারে গিয়ে খুঁজে বের করা কিছুতেই কঠিন হ'ত না। কিন্তু আমি ত তাঁকেও দেখিনি তাঁর ভাইএর নামও তুমি বল নাই। তোমার দাদার নাম করে খোঁজ করতে পারতাম। কিন্তু তাতে পুলিশের গোয়েন্দাগিরি হত। তোমরা আমাকে যে গোয়েন্দাগিরি কত্তে পাঠিয়েছ তাহা হ'ত না। কাজেই সেটা করি নাই। ঘটনাক্রমে কোনও সন্ধান করতে পারি কি না, তাই দেখে দেখে কেবল স্বর্গদ্বারের পথে ঘাটে এই কটা দিন ঘুরে বেড়িয়েছি। তোমার আশীর্বাদে সন্ধান পেয়েছি। আমার বাহাদুরী কিছুই নাই। কেবল ঘটনাচক্রেই এটা ঘটেছে।

আজ সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে একটি পরিচিত ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। কল্‌কাতায় যখন আমি Y.M C.A এর বোর্ডিং-এ ছিলাম, তখন আমরা দুজনে একই ঘরে থাক্‌তাম। সে আজ তিন চার বছরের কথা। হঠাৎ আজ তাকে এখানে দেখতে পেলাম। বললে সে তার দিদির সঙ্গে স্বর্গদ্বারে আছে। সে আমায় কিছুতেই ছাড়্‌লে না—তাদের বাড়ী নিয়ে গেল। তার ঘরে ঢুকে দেখি একটা বিলাতী ট্রাঙ্কের উপরে তোমার দাদার নাম লেখা। বুঝলাম বিধি আজ সুপ্রসন্ন হয়েছেন। যা খুঁজছিলাম, তাই আপনি মিলিয়ে দিয়েছেন। সে

আমায় কিছুতেই রাত্রে না খাইয়ে ছাড়লে না। তোমার মেজ'বউএর সঙ্গেও দেখা হল, সে'ই আলাপ করিয়ে দিয়েছে। তুমি যে আমার বউদিদি, এরা কেউ জানে না।

আজ এই পর্যন্ত। ক্রমে ক্রমে সব খবর পাবে এখন। তবে তোমরা যে প্রতিদিন একটা ডায়রী পাঠাতে বলেছ, তা কি দরকার? যে দিন কিছু বিশেষ বলবার থাকে সে দিনই চিঠি লিখ্‌ব। আর পুরীতে যারা হাওয়া খেতে আসে, তাদের ডায়েরী কিরূপ হবে তা তুমিই জান। প্রাতে চা' পান। তারপর সমুদ্রের ধারে ভ্রমণ। তারপর গৃহে প্রত্যাগমন। নয়টার সময় নুলিয়ার আগমন। সাড়ে ৯টা হইতে ১১টা সমুদ্রে স্নান ও নুলিয়ার হাত ধরিয়া ঢেউ খাওয়া ও সাঁতার কাটবার ভান করা। ১১।।০ টায় আহার। ৩টা পর্যন্ত নিদ্রা। ৪টায় চা পান বা জলখাবার। ৫টা হইতে ৮টা পর্যন্ত আবার সমুদ্রের ধারে বেড়ান। রাত্রে আহার ও তারপর শয়ন। তোমার মেজ'বউএর ডায়েরীও ঠিক এমনি। একটা আমি তাঁর ভাই এর কাছ থেকে ইতিমধ্যেই বে'র করে নিয়েছি। সুতরাং প্রতিদিন এইরূপেই কাটছে, জানিয়া রাখিও। প্রতি রাত্রে পুবাতন কথা লিখে বেহুদা কাগজ ও কালি খরচ করার কোনও প্রয়োজন আছে কি? যদি থাকে লিখিও হুকুম তামিল কবব। এখন ধর্মাবতারকে সেলাম করিয়া অধীনেব তবে শয্যাশায়ী হইতে আজ্ঞা হয়।

২

বউদিদি,

আজ একটা নতুন খবর আছে। শুনে তুমি খুসী হবে। তোমাদের খরচ বাঁচল। আমি ভিক্টোরিয়া হোটেল ছেড়ে চলে এসেছি। শরৎ (তোমার মেজবউএর ভাইএর নাম শরৎ।) ক'দিনই আমাকে তাদের সঙ্গে এসে থাকতে পীড়াপীড়ি কবছিল। আমি কিছুতেই বাজি হই নি। ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়, কিন্তু নিজেকে অত সস্তা করাটা কিছু নয়, তুমি দাদাকে সর্বদা এই কথা বল। তাই আমিও নিজেকে সস্তা কর্‌তে চাই নি। যা হউক কাল বাত্রে, তোমার মেজবউও বড় ধরে বস্‌লেন। তিনি আমাকে নরেন বলেই ডাকেন, আর আমিও তাঁকে দিদি বল্‌তে আরম্ভ করেছি। তাঁর অনুরোধ আর এড়াতে পাবলাম না। তোমাদেব কাজেব অনুরোধেও এ আতিথ্য গ্রহণ করাই ভাল মনে করলাম। তোমার মেজ'দাদাকে লিখ, আমি তাঁর গিন্নিকে পাহাবা দিচ্ছি। গোয়েন্দাগিরিটা জম্‌ছে ভাল।

আচ্ছা, বউদিদি, তোমবা তোমাদের মেজ'বউ এর উপরে অমন নারাজ কেন? আমার ত তাঁকে বেশ ভালই লাগে। ভাল'র চাইতেও ভাল লাগে,—সত্যি বড় মিষ্টি লাগে। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। চালচলন অতি শোভন, চোখ দুটো ভাবে ঢল ঢল, নিজেকে সাজাবার কোনও চেষ্টা নাই, অথচ সাজা জিনিষটা যেন আপনি জোর করে এসে তাঁর অঙ্গে অঙ্গে বসে যায়। কথা অতি মিষ্টি। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়ে এক একবার কেমন উদাস পারা হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন—দেখে আমার সেই কীর্তনের পদ মনে পড়ে—

যোগী যেন সদাই ধেয়ায়!

তোমাদের কত ভাগ্যি, অমন বউ পেয়েছ। দিন রাত কেবলই লিখ্‌ছেন আর পড়ছেন। আর তাঁর পড়বার ধরণটা বড় সুন্দর। সর্বদাই পেন্‌সিল ও খাতা নিয়ে পড়তে বসেন; আর যখন যেখানে মিষ্টি কথা পান, তাই টুকে রাখেন। আমায় বলেছিলেন এতে কবিতা লেখার নাকি খুব সুবিধা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি করে সুবিধা হয়, দিদি?'' বললেন, ''জান কি, বড় বড় কবিরা যেন এক এক জন ভারি রাজমিস্ত্রি। আর এই যে সুন্দর কথাগুলি, এগুলি তাদের পঙ্খিরকাজের মালমসলা। ঐ মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলো চুনে চুনে, ''মোর'' ''হায়'', ''সখি'' ''সখা'' ''বধূঁ'' প্রভৃতি মিষ্টি কথার বুকনী দিয়া সাজা'লেই অতি সুন্দর কবিতা হয়।''

আমিও এখন থেকে খাতা হাতে করে সব বই পড়ি। দেখ কি, তোমার মেজ'বউযেব কল্যাণে হয় ত তোমার এই ঠাকুবপোও ক্রমে একটা কবি হয়ে উঠ্বে। বাঙলা মাসিকে ছাপাবার মতন ভাবি ভারি দু-দশটা এরি মধ্যে পকেটে জড় হয়েছে। গোয়েন্দাগিরি কর্‌তে এসে একেবারে একটা ডাকসই কবি হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে ভাগ্যি জিনিসটাই নাকি অন্ধ, তার গমনে নাইক কোন ছন্দ, আমাব কপাল নহে নেহাৎ মন্দ, কব কি এখনও তুমি সন্ধ, তবে তোমার সঙ্গে আমাব দ্বন্দ্ব, কবিলা এখানেই চিঠি বন্ধ।

৩

বউদিদি!

তোমার শ্রীপাদপদ্মে কোটী কোটী প্রণাম কবি। তুমি যদি মেম সাহেব হ'তে, তা হ'লে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ তোমায় দিতাম। তোমার কল্যাণে এই গোযেন্দাগিরি কর্‌তে এসে কি সুখেই দিন কেটে যাচ্ছে। তোমাব ফবমাযেস খাট্‌তে হয না, ছেলেদের পড়া বল্‌তে হয় না, আপিসে কলম পিষতে হয় না, ঘবে গিন্নির মুখ ঝামটা খেতে হয় না, দিনে শুতে পাই, ঝিমুতে হয না, রেতে ঘুমুতে পাই, ছেলে বইতে হয না, আর দিন বাত কবিতা শুন্‌তে পাই, দুনিয়াশুদ্ধ লোকেব সঙ্গে বকাবকি কর্‌তে হয় না। আমার মনে হয়, স্বর্গে যাবা যায, তারা বুঝি এইভাবেই দিন কাটায়। বস্তু যত সব ছায়া হয়ে গেছে, ছাযা যত সবই কেবল কায়া নয, প্রাণী হয়ে উঠে, চাবিদিকে ছুটোছুটি কবছে। বিজ্ঞান পড়ে যা ভুল বুঝেছিলাম, সব এখন শুধ্‌বে যাচ্ছে। চোখ কানগুলোকে ফাঁকি দিযে এখন কেবল মন দিয়ে সব জ্ঞান আহরণ কর্‌তে শিখ্‌ছি। এ শিক্ষায় তোমার মেজ'বউ আমাব গুরু হযেছেন। সত্যি বলছি বউদিদি, মানুষেব মনটা যে কত বড জিনিষ, এতদিন বুঝি নি। এই মনই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বব, সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয কর্তা। তোমার মেজ'বউএব মন ঠিক তাই।

সে দিন আমরা নরেন্দ্র সবোববেব ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটি অতি সুন্দর মন্দিব হয়েছে। তোমবা দেখ নি। মন্দিরের বাগানে বিস্তর আমগাছ আছে। একটা আমগাছে এই অকালেও নতুন লালপাতা গজিয়েছে। তোমার মেজ'বউ আমায় গাছটা দেখিয়ে বললে, "দেখেছ নরেন, ঐ গাব গাছে কেমন লাল লাল পাতা বেরিয়েছে?"

আমি বললাম,—"গাব গাছ কৈ দিদি, ওটা যে আম গাছ!"

দিদি বললেন, 'আম গাছ কখনই নয় তুমিও এত বড় একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করছো? আমাদের বাড়ীর দেযালের আড়ালে এরই মতন একটা গাব গাছ আছে, তাব এই যৌবনের সাজ দেখে আমি বসন্তের সংবাদ পেতাম। আব তাকেই কি না তুমি বল্‌তে চাও, আমগাছ?"

আমি তো একেবাবে অবাক্ হয়ে গেলাম। ধীরে ধীরে বললাম, "একটু কাছে গিয়ে দেখুন, ওটা যে আমগাছ তা বুঝতে পার্‌বেন।

তোমার মেজ'বউ আবো গবম হয়ে উঠে বললেন—"কাছে গেলেই কি সত্য দেখা যায? অন্ধেবা তো হাতিটাকে গিযে হাতড়িয়েছিল, কিন্তু তাকে সত্যিই দেখতে পেয়েছিল কি? দেখে চোখ নয়—মন, আর মনের নিকটে আবার কাছে আব দূবে কি? তুমি কি দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌লে, আমি বুঝতেই পারছি না। ওটা যদি আমগাছ হবে তবে তাব ডালে ডালে কোকিল কৈ? ঘরে ঘরে উহু উহু কৈ? কেবল লাল পাতা দেখে ওটাকে আমগাছ ভাব্‌ছ, লাল পাতা যে গাবগাছেও হয।"

বেগতিক দেখে বললাম, "তুমি যখন বল্‌ছ, তখন গাবই বা হবে।"

গাবই বা হবে কেন, গাবই নিশ্চয়। ওটা যদি গাব না হয় তবে কবির দৃষ্টি কি মিথ্যা হবে?'

আমি বললাম—'কখনই হতে পারে না। বিধাতা যে কবির চোখেই তাঁর জগৎকে দেখেন তিনিও ত কবি।"

এতগুলি ধর্ম্মকথা বলে তবে প্রাণে বাঁচলাম। এবার থেকে তোমার মেজ'বউ যা বল্‌বে, তা'তেই হুঁ দিয়ে যাব।

৪

বউদিদি,

আমার ছুটি তো ফুরিয়ে আস্‌ছে, আর কত দিন তোমার মেজ'বউকে পাহারা দিতে হবে? তোমার মেজদাদাকেই না হয় পাঠিয়ে দাও, গতিক বড় ভাল বোধ হচ্ছে না। যে কবিতার ঢেউ উঠ্‌ছে তাতে তোমার মেজবউকে কোথায় নিযে যাবে বলা যায না। আর আমাকে পরের স্ত্রীর পাহারা দিতে পাঠিয়ে তোমার ঘরেও যে খুব শান্তি পাচ্ছ, তাও ত সম্ভব নয়। তবে একবার নাকি আমি আগুনেব ভিতর দিযে হেঁটে যাবাব ফন্দিটা শিখেছিলাম ঐ যা তোমাদের ভরসা।

সত্যি বলছি আমার ভাব্‌না হয়েছে। তোমাব মেজ'বউকে এই একমাস কাল দিনবাত দেখে দেখে, এই বই চিনেছি বলে মনে হয় যে, বাহিবে তাঁর যতই কবিতা গজাক না কেন, ভিতরটা ঠিক্ আছে। সে ভাবনা আমার হয় না। তবে জান কি, ভিতর শুদ্ধ থাকলেই যে বাহিরে কালির ছিটা পড়ে না বা পড়তে পারে না, তা নয। ঐ ভয়টাই আমার বড় বেশি হচ্ছে! অথচ কেমন করে যে বেচারীকে বাঁচাই, ভেবে পাচ্ছি না। তারই জন্য তোমাকে লিখ্‌ছি। নহিলে তোমাকেও লিখ্‌তাম না—এ সব কথা কাউকেই বলা ভাল নয। বলাবলিতেই যত গোল বাধে।

আমার আবো বেশি বিপদ হয়েছে এই জন্য যে, শবৎ হঠাৎ কল্‌কাতায চলে গেছে। বাড়িতে তোমার মেজ'বউ, একটি বুড়ি চাকরানী আর আমি, আমবা তিন প্রাণী মাত্র আছি। তার জন্যও আমি ভাব্‌তাম না। কিন্তু শবৎটা নাকি নেহাৎ গাধা, যাবার সপ্তাহ খানেক আগে একটা সাহিত্যিক বন্ধুকে এনে জুটিয়ে দিয়ে গেছে। এ ব্যক্তি নিতান্ত ছোকবা নয, বযস তোমার মেজদাদারই মতন। বল্‌ছে ত যে বিলেত টিলেত ঘুবে এসেছে, কিন্তু ইংবেজি শুনে কথাটা বিশ্বাস কর্‌তে মন উঠে না। তবে ইংরেজ কবিদের নাম হামেযাই মুখে লেগে আছে।

ইনি তোমার মেজ বউকে ব্রাউনীং বলে একজন খুব বড় ইংবেজ কবি আছেন, তাঁব কবিতা তর্জ্জমা করে পড়াচ্ছেন। এখন প্রতিদিন বিকেলবেলা সমুদ্রেব ধাবে গিয়ে দুজনে কবিতা পড়েন, আর এ গরিব পাহারাওয়ালা দায়ে পড়ে কাজেই সেখানে গিযে বসে বসে ঝিমোয়। আমি মুখ্‌খু লোক— কেরানীগিবি করে খাই, তার উপরে কোনও দিন জাহাজে চড়ি নি। কাজেই এই সাহিত্যিক বরের চক্ষে যে অতি নগণ্য হ'ব, ইহা আর আশ্চর্য কি? তবে তোমার মেজ'বউ এর একটা বড় বাহাদুরী দেখতে পেলাম। আমি যে তাঁর সোদর ভাই নই, তিনি ঘুণাক্ষরেও একথাটা এ ব্যক্তিকে জান্‌তে বা বুঝ্‌তে দেন নি। একদিনও জিজ্ঞেস করছিল—"শরৎবাবু আর নরেনবাবু এঁদের মধ্যে বড় কে?" তোমার মেজ'বউ বললো— "নরেন বড় বটে তবে পিঠোপিঠি বলে শরৎ ছেলেবেলা থেকেই কোনও দিন ওকে দাদা বলে ডাকে নি।" কথাটা শুনে অবধি তোমার মেজ'বউ এর উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। যতটা বোকা মনে হচ্ছিল, ততটা বোকা নন। কবিতাই লিখুন আব যাই করুন, ভিতরে ভিতরে বিষয়বুদ্ধিটুকু বেশ আছে।

৫

বউ দিদি

তুমি ও লোকটার পরিচয় জানতে চেয়েছ। এ সব লোকের পরিচয় পাওয়া বড় কঠিন। বাংলা সাহিত্যে আজ কাল বড় বড় সাহিত্যিক যে কি করে গজিয়ে উঠে, ভগবান্ও তাব ঠিক কর্‌তে পারেন কি না সন্দেহ। কবিতা যেমন এদের আকাশ থেকে ঝুর ঝুর করে পড়ে, এদেব জন্মকর্মটাও তেমনি দিব্য ব্যাপার বলে মনে হয। এঁকে আমরা কেবল মিষ্টাব মৈত্র বলেই জানি। শবৎকে জিজ্ঞেস কর্‌ছিলাম এঁর বাড়ী কোথায়, আছে কে, করেন কি, সে ওসব কথার কোনই উত্তর দিতে পাব্‌লে না। বললে—"ও সব খবর সংসাবেব লোকেই রাখে। সাহিত্য জগৎ, মনোজগৎ, ভাবরাজ্য; এখানে জন্মকর্মের পরিচয় যথেষ্ট। মিষ্টার মৈত্রের লেখাই তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয়।" এর উপরে ত আর কোনও কথা চলে না। কাজেই ইঁহার কোনও পবিচয এ পর্য্যন্ত পাই নাই, পাবার আশাও বাখি না।

তবে নামগোত্রেব পরিচয় না পেলেও, কাব্যরসপটুতাব পরিচয প্রতিদিনই পাচ্ছি। সে পরিচয়টা তোমাকে দিতে পারি। কাল বৈকালে বৃষ্টি হচ্ছিল। কাজেই সমুদ্রেব ধাবে আমবা বেড়াতে যেতে পাবি নাই। মিষ্টাব মৈত্র এখানে বসেই তোমার মেজ 'বউ এর সঙ্গে সাহিত্য চর্চা কবছিলেন। ইনি ব্রাউনীংএব একটা বাংলা অনুবাদ করছেন। তোমাব মেজ'বউকে তাই পড়িয়ে শুনাচ্ছিলেন। ভুলক্রমে এখানেই সে অনুবাদটা ফেলে গেছেন তার খানিকটা তোমায পাঠাচ্ছি।

ওগো সুন্দব মোব!
ও বযানে তব, এ নয়ান মম
পিয়ে পিয়ে হলো ভোর
ওগো সুন্দর মোব।
চোরেব মতন কতই চাতুবী,
গুপ্ত প্রেমের কিবা এ লহবী,
নাচত আঁখিতে উঠত শিহবী
সুখের নাহিক ওব।
ওগো সুন্দর মোব!
ঘরেব ভিতরে বসা যারা ঐ,
ভাবিছে কাতবে গেল ওরা কৈ,
কৌতুকে কপোল কবে থৈ থৈ,
বাহিয়া বাহিছে লোর।
ওগো সুন্দর মোব!
আমবা দুজনে, বিজনে বিপিনে,
নীপ মূলে এস, কিবা নিশি দিনে,
বাঁধা আছি, নতু আঁধোয়া তু বিনে
কে ভাঙ্গে মোদের জোড়?
ওগো সুন্দব মোর!
তিলে তিলে গড়ি কতেক ছলনা
পলে পলে পরি শতেক গহনা,
গাহি মূলতান, পুরবী সাহানা,

কাটিছে রজনী ঘোর,
ওগো সুন্দর মোর।
এ সুখ তেয়াগি, কোন্ সুখ লাগি,
কোন্ মন্ত্র পড়ি, কি সিন্দূর দাগি,
কিইবা সোহাগে, মিলিবে কি ভাগি,
কলা, মোচা, কিবা, থোড়!
ওগো সুন্দর মোর!

আষাঢ় মাসের গুপ্ত অভিসার
ভৈরব ঐ নৃত্য বরিষার,
মর্ম্ম বিদারি এ ঘরের ধাব,
চর্মে ঝুরিছে ঝোব।
ওগো সুন্দর মোব!
ছাড়িযা এ সব বিভব ছন্দে,
ঘুরিয়ে ফিরিয়া ভবের ধন্দে,
কোন্ রূপে রসে, গরাশে গন্ধে
আনিবে আনন্দে তোর?
ওগো সুন্দর মোর।
থাক্ তাবা নিজ জগৎ লইয়া
রান্ধিযা বাড়িয়া, খাইযা, শুইযা,
জীবনে মবিযা মরমে মাবিয়া
কেবলি ঘাঁটিয়া হোড়।
ওগো সুন্দব মোব!
জান নাকি তুমি উহাদেব বীতি
যশমান দিয়া কষয়ে পিবিতি
ঝগড়া ঝাটি হয় নিতি নিতি
ভাঙ্গাতে ভামিনী ভোর
ওগো সুন্দব মোর!
নাহি সুতা হাতে, হলো কিবা তায
ও রীতি দেখিলে পিরিতি পালায়?
দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পরাণ-ডোব
ওগো সুন্দর মোর!

দাদাকে বলো, এর মূলটা ব্রাউনীং-এর In a Balcony-তে কোথাও নাকি আছে। মূলের সঙ্গে মিলুক আর নাই মিলুক অনুবাদের বাহাদুরী আছে বটে। আর সব চাইতে এর বাহাদুরী এই যে তোমার মেজ'বউকে এ কবিতাটায একেবারে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তিনি বার বার এসে আমায় বলছেন, "দেখ নরেন, দেখ, দেখ, কি সুন্দর শুনাচ্ছে—

দীপ্ত হৃদের মুক্ত হাওয়ায়
যুক্ত পবাণ-ডোর—

লেখার কি ভঙ্গী, ভাবের কি গভীরতা। বাংলায় এক রবি ঠাকুব ছাড়া আর কেউ অমন লিখ্‌তে পাবে না। তুমি ত ব্রাউনীং পড়েছ, ব্রাউনীং সত্যি কি এত মিষ্টি?" এর উত্তর আমি কি আর দিব। আমার কেবল ইচ্ছা হলো বউদিদি, ঐ মিষ্টাব মৈত্রটাকে আমার এই জিমন্যাষ্টিক পটু মুষ্টিটা যে কত মিষ্টি তাই দেখিয়ে দি। সত্যি বল্‌ছি বউদিদি, এ লোকটা যদি শিগ্‌গিব সরে না পড়ে, তবে কোন্‌ দিন যে আমার সঙ্গে একটা ফৌজদাবী বেঁধে যাবে জানি না।

৬

বউদিদি!

যা ভয় করছিলাম, তাই হয়েছে। আজ সন্ধ্যাবেলা জুতিয়ে ঐ লোকটাব হাড় ভেঙ্গে দিয়েছি। বোধহয় সে আর এখানে মুখ দেখাতে সাহস পাবে না। আজকে এই জুতা-পেটাটা কেউ জানে না, কেবল আমাব হাত জানে, আর জুতা জানে আব ওর পিঠ জানে, আব কেউ জানে না, তোমার মেজ'বউও ভাল কবে জানেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, ফেব যদি পুবীব সমুদ্রেব ধারে দেখ্‌তে পাই, তবে সবাব সামনে জুতাপেটা করে ছাড়্‌ব। সে পায়ে ধরে দিব্যি কবে গেছে, আজ রাত্রেই পুবী থেকে চলে যাবে। আমার বিশ্বাস তাই কববে।

কেন হলো, কিসে হলো, আমার নিজের মনে মনেও তাব আলোচনা কব্‌তে ইচ্ছা হয না, ভয হয় বুঝিবা এ চিন্তাতেও তোমাব মেজ'বউ-এর অকৈতব শুদ্ধ চরিত্রেব মর্যাদা নষ্ট হয। কিন্তু তোমাকে না বললে নয। তোমাব মেজ'বউ-এব প্রাণে যে আঘাত লেগেছে, তাব ফল কি যে হবে. ভেবে পাচ্ছি না। এই আঁধাব বাতে সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ না দিলে বাঁচি। দিনবাত আমাব এখন তাঁকে খাড়া পাহাবা দিতে হ'চ্ছে দেখ্‌ছি।

ঘটনাটা তোমায লিখতেই হচ্ছে, কিন্তু আমাব আদৌ ইচ্ছা নয যে দাদাও এটা জানেন। আমরা পুরুষমানুষ, স্ত্রী-চবিত্র যে কিছুই বুঝি না বউদিদি! তাই ভয হয দাদাও তোমার মেজ'বউ সম্বন্ধে সুবিচার কবতে পাববেন না। যদি পাব, তবে তাঁকেও দেখিও না, তোমাব মেজদাদার ত কথাই নাই। এই পত্রখানা পড়িয়াই পুড়াইয়া ফেলিবে।

ঘটনাটা এই। কাল রাত্রে আমাব একটু সামান্য জ্বব হয়েছিল. তাই আজ সন্ধ্যাব সময় আব সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যাই নি। মিষ্টার মৈত্র অনেক অনুনয বিনয করাতে তোমাব মেজ'বউ তাঁব সঙ্গেই সমুদ্রেব ধারে বেড়াতে গেলেন। আমায় বলে গেলেন যে বেশি দূবে যাবেন না, বাড়ির সাম্‌নেই বেড়াবেন। তখন সবে রোদ পড়েছে। আমি দবজায বসে দুজনায় বেড়াচ্ছেন দেখ্‌তে লাগলাম। ক্রমে অন্ধকাব হয়ে এল। কাজেই আমি আব স্থির থাক্‌তে পারলাম না। তোমার মেজ'বউ এর খোঁজে বেরুলাম। সমুদ্রতীরে গিযা দেখ্‌লাম তিনি সেখানে নাই। ভারি মুস্কিলে পড়লাম। কোন্‌দিকে গেলেন ঠাওব করতে পার্‌লাম না। কা'কেই বা জিজ্ঞাসা করি? এমন সময় একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। তিনি বললেন,—"আপনি যে আজ বড় পিছিয়ে পড়েছেন, আপনার ভগিনী চক্রতীর্থের দিকে যাচ্ছে দেখলাম।" শুনে কি জানি কেন আমার বুকটা ধড়াশ করে উঠল। চক্রতীর্থ ত দোরেব কাছে নয়। স্বর্গদ্বার চক্রতীর্থ দেড় ক্রোশেব পথ। আব সন্ধ্যাবেলা সে অতি নিবালা স্থান। আমিও ঐ দিকেই বালি ভেঙ্গে ছুট্‌লাম। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করেছে। সমুদ্রতীর জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। সারকিট্‌ হাউস ছাড়িয়ে দেখ্‌লাম, আব কোথাও কেউ নাই। হঠাৎ যেন একটা অস্ফুট চীৎকার কানে গেল। সেই শব্দ লক্ষ্য করে দৌড়ে গিয়া দেখলাম, ঐ লোকটা তোমার মেজ'বউকে অপমান কর্‌বার চেষ্টা করছে। আমি এক লাফে তাব উপরে পড়ে তোমার মেজ'বউকে ছাডিযে নিয়ে, তার গলার চাদব কষে ধবে, পায়ের জুতা খুলে, গায়ে যত জোর

ছিল তাই দিয়ে বেটাকে পিটুতে আরম্ভ কর্‌লাম। যখন ও একেবারে মাটিতে পড়ে গোঁগাতে লাগ্‌ল তখন ছাড়লাম। তোমার মেজ'বউ একেবারে পাথরের মত নিশ্চল, অসাড় হয়ে এই ব্যাপার দেখ্‌ছিলেন। আমি কাছে যাবা মাত্র, মাটিতে পড়ে উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তোমার মেজ'বউ একটু সুস্থ হলে, তাঁকে নিয়ে বাড়ি এলাম। ক্রোধে, অপমানে, লজ্জায়, ভয়ে, অনুতাপে তাঁর দশা যে কি হয়েছে বল্‌তে পারি না। এই আধ ঘণ্টাকালের মধ্যে তাঁর মুখ একেবারে পাংশু হয়ে গেছে, চোখ বসে গেছে, মনে হয় যেন ছ মাসের রোগী। হঠাৎ মানুষের চেহারাব অমন পরিবর্তন হয়, ইহ জন্মে আর কখনও দেখি নাই। বাড়ি আসিযা তোমার মেজ'বউ ঘবে যাইয়া দোরে খিল দিয়া শুয়ে পড়েছেন। আমি কি করব, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। যে ঝিটি আছে, তাকে কোন কথা বল্‌তেও পারি না, ঘরে যাইযাও তাঁর সেবাশুশ্রূষা কর্‌তে পারছি না। হয়ত এই চিঠি পেতে না পেতেই তুমি এখানে আসবার জন্য আমার টেলিগ্রাম পাবে। কাল প্রাতঃকালের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

৭

বউ দিদি,

ভগবান্ বাঁচালেন। শরৎ আজ প্রাতে ফিরে এসেছে। তা'কে কালকাব ব্যাপারেব কথা কিছুই বলিনি। বলা যায় কি? সে ভাবছে তার দিদির অসুখ করেছে। অসুখও করেছে সত্যি। খুব জ্বব হয়েছে। মাথাব খুব যাতনা। বিকার না হলে বাঁচি। দেখি ঠাকুব কি কবেন। দাদাকে তোমাব মেজ'বউ-এব অসুখেব কথাটা বলে বেখো। বাড়াবাড়ি হলে আস্‌তেই হ'বে। তাবে খবর দিব।

৮

বউদিদি,

ঠাকুরেব প্রসাদে আজ সাতদিন পবে তোমাব মেজ'বউ এব জ্বব ছেড়েছে। চেহাবাটা একেবাবে ভেঙ্গে গেছে। সে বং নাই, সে কোনও কিছুই নাই। চোখেব ভিতবে কি যেন একটা কাতরতা জেগে উঠেছে। আজ বিকালবেলা আমায ডেকে জিজ্ঞাসা কব্‌লেন— 'শবং কোথায়? আমি বললাম—"কিছু আঙ্গুব আব ডালিমের জন্য বাজাবে গেছে, আব কলকাতা থেকে কিছু ফল আস্‌বার কথা, তাও এসেছে কিনা দেখ্‌তে স্টেশনে যাবে।" তখন আমাকে কাছে ডেকে, বিছানায বসিয়ে, আমাব হাতখানা ধরে বললেন—"নবেন তুমি আমাব সত্য ভাই-এর কাজ কবেছ, তুমি না থাক্‌লে সেদিন আমার কি হ'তো জানি না। প্রথম দিন থেকেই আমি যে চোখে শবৎকে দেখ্‌তাম সেইচক্ষে তোমায দেখেছি। তাই শবৎ যখন কলকাতায যেতে চাইলে, কোনও আপত্তি কবি না। শবৎ আমাব জন্য যা কব্‌তে পার্‌ত না, তুমি তাই করেছ, এ ঋণ জন্মে শোধ দিতে পাবব না।" বলিতে বলিতে চক্ষু দুটা জলে ভবিয়া উঠিল। ক্রমে নিজেকে একটু সামলে নিযে বললেন—"শবং সব শুনেছে?"

আমি বললাম "না। কিছুই শুনে নি। ওকি বলবাব কথা? শবৎ কেবল জানে যে আপনার অসুখ করেছে।"

"শরৎ তো আমায 'আপনি' বলে না, তুমি বল কেন?"

বউদিদি আমারও চক্ষে জল আসিল। একটু স্নেহেব জন্য এই প্রাণটা যে কতই তৃষিত হয়ে আছে, দেখে আমার প্রাণটাও কেমন করে উঠ্‌ল।

বললাম "আচ্ছা আমি এখন থেকে তুমিই বল্‌ব। আর তুমিও শরৎকে যেমন কখন 'তুমি' কখন 'তুই' বল, আমাকেও তেমনি বল্‌বে?"

"আমার অসুখ বাড়লে তোমরা কি কর্‌তে বল ত?"

"কর্‌ব আর কি, ভাল ডাক্তার ডেকে চিকিৎসা করাতাম।

"এখানে কি ভাল ডাক্তার আছে?"

"এখানে নাই, কটকে আছে।"

"সেখান থেকে কি এখানে ডাক্তার আসে?"

"আনালেই আসে।"

"আমার ত অত টাকা নাই?"

"যে ডাক্তার আস্‌ত সে টাকার জন্য আস্‌ত না।"

"তবে কিসের জন্য?"

"তুমি আমার দিদি, তাবই জন্য আস্‌ত।"

"সে ডাক্তার তোব কে হয় নরেন?"

"তিনি আমার দাদা, কটকেব সিভিল সার্জন।"

"তোমার দাদা কটকের সিভিল সার্জন। তোমার দাদার নাম কি?"

আমি দাদাব নাম বললাম। তোমার মেজ'বউ অমনি চম্‌কে উঠে বললে, 'উনি তোব দাদা!" এই বলে চোখ দুটো আবার কাঁদ কাঁদ হযে উঠ্‌ল। এবার আমার পালা, বললাম—"আমাব দাদাকে কি তবে তুমি চেন?"—একটু তামাসা কবে বললাম—"তোমাব ভাব দেখে মনে হচ্ছে বুঝি বা কোনও দিন আমার দাদাব সঙ্গে তোমাব সম্বন্ধ হয়েছিল।" তোমাব মেজ'বউ বড় বিষণ্ণ ভাবে বললে—'উনি আমাব নন্দাই ছিলেন।"

"ছিলেন মানে কি, দিদি? দাদাব ত দুটো বিযে হয়নি, আব আমাব বউদিদি তো এখনও বেঁচে আছেন।"

"তোব বউদিদিই আমাব ননদ।"

"তবে তুমি আমাব দাদাব শালাজ, আব এতদিন এ কথাটা লুকিয়ে বেখেছিলে।"

"তুই যে ওঁব ভাই, আমি জান্‌ব কি করে?"

"তা ত বটেই। যা হোক, এখন ত জানা শুনা হলো। আজই আমি বউদিদিকে আস্‌তে লিখব। কটক থেকে পুরী দু'তিন ঘণ্টাব পথ বই ত নয়।"

"না না তাকে লিখিস না। সে আস্‌বে না।"

"আস্‌বে না? তাঁব ভা'জ এখানে বেয়াবাম হয়ে পড়ে আছেন, আব উনি আস্‌বেন না অসম্ভব কথা। আমাব বউদিদি তেমন লোক নন। আর বউদিদিকে লিখ্‌ব, তাঁব দাদাকেও যেন তারে খবব দিযে আনিযে নেন্‌।"

তোমার মেজ'বউ আর ধৈর্য রাখ্‌তে পারলেন না। একেবাবে আমার দুহাত ধবে বললো—"না ভাই নরেন, তোর পায়ে পড়ি, অমন কর্ম করিস্‌ না। আমি রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিযে এসেছি, তাদেব আর এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।"

"শরৎ বলেছে তুমি তোমার খুড়শাশুড়ীর সঙ্গে জগন্নাথ দেখ্‌তে এসেছিলে, রাগ করে এসেছ কে বললে?"

"কেউ বলে নি, আমি ত জানি।"

"তোমাব মনের কথা ত আব কেউ জানে না। লোকে জানে তুমি জগন্নাথ দেখতে এসেছিলে। এখন বাড়ি ফিরে যাবে। তাতে হলো কি?"

"উনি জানেন।"

"তা হলে এতদিন উনি তোমায় নিতে আসেন নি, তার জন্য মিষ্টার মৈত্রেব যে ব্যবস্থা করেছিলাম, তাঁরও সেই ব্যবস্থাই কব্‌ব।"

"নরেন, তুই আমায় ভালবাসিস্ বলে ওসব বল্‌ছিস। তুই জানিস্ না, আমি কি করেছি। আমি তাঁকে ত্যাগ করেছি।"

আমি হোঃ হোঃ করে হেসে উঠ্‌লাম। "ত্যাগ করেছ কি করে? হিন্দুর শাস্ত্রে যে ডাইভোর্স নাই তা কি জান না?"

"ডাইভোর্স কি রে?"

"মুসলমানেরা যাকে তালাক বলে, ইংরেজরা তাকেই ডাইভোর্স বলে। হিন্দুর স্ত্রী যে স্বামীকে তালাক দিতে পারে না।"

"কিন্তু আমি ত করেছি তাই।"

"করেছি কি, খুলেই বল না, দেখি।"

"ওঁকে লিখেছি, আমি আর ওঁব স্ত্রী নই।"

"ঐ কথা। সব স্ত্রীই ত রাগ করে ওকথা বলে।"

"ঝগড়াব মুখে ওকথা বলিনি, কোনও দিন ওঁর সঙ্গে আমার ঝগডা হয় নি। তাই বুঝি ছিল ভাল।"

"তবে কি করেছ?"

"আমি তাঁকে, শান্তভাবে ঠান্ডা হয়ে, চিঠি লিখেছি যে আমি তাঁর স্ত্রী নই।"

"আবার একটা বে কর্‌তে বল নি ত?"

"তা বল্‌তে যাব কেন? তাঁর ইচ্ছা হয় তিনি কর্‌বেন। সে দায় আমার নয়।"

"ঐ দেখ তুমি তাঁকে ছাড়নি। ছাড়্‌লে তাঁব বিযেব কথায় অমন হযে ওঠ কেন?"

"না নবেন, সত্যি আমি তাঁকে ছেড়েছি।"

"তিনিও কি তোমায় ছেড়েছেন?"

"তাঁর ছাড়ার অপেক্ষা ত আমি বাখি নি।"

"তবে তিনি যদি না ছাড়েন?"

"তায় কি হয, আমি যে তাঁকে ছেড়েছি।"

"স্বামী স্ত্রীতে অত সহজে ছাডাছাড়ি হয় না, দিদি। যে দেশে মাজিষ্টবের কাছে রেজিষ্টাবী করে বিযে হয, সে দেশে আব্বব মাজিস্টবের কাছে গিযে রেজিষ্টাবী থেকে নিজেদের নাম খারিজ কবতেও বা পারে। হিন্দু তা পাবে না। জান না দিদি, সাত পাক ঘুরে যে বে হয, চৌদ্দ পাকেও তা খোলে না।"

"আমি যে তাঁকে ছাড়লাম বলে লিখেছি।"

"লিখেছ তাতে হলো কি? ছেলেটা বেশি বিবক্ত করলে, মা যে কতবাব বলে মর মব, তাতে কি আবার সেই ছেলেকে বুকে টেনে বাখে না। আমাদেব শাস্ত্রে বলে, বাগেব মাথায মানুষ যা বলে তাতে মিথ্যা বলার পাপ হয় না।"

"আমি যে কি করেছি তুই জানিস্ নে নরেন, নইলে অমন কথা ভাব্‌তে পারতিস্ না।"

"কি করেছ? ঝগড়াঝাটি করনি, মারধর করনি, একখানা চিঠি লিখেছ বই তা নয়?"

"সে চিঠি দেখলেও কথা কইতিস্ না। চিঠিখানা দেখ্‌বি? ঐ বাক্সেব ভিতরে তার নকল রেখেছি। বের করে নে।"

চিঠিখানা পড়ে বললাম, "এই ত, অমন চিঠি আমরাও কত পাই। তাতে হয়েছে কি?"

এমন সময় শরৎ এসে হাজির হলো।

বিকাল বেলা তোমার মেজ'বউ-এব আর জ্বর আসে নি। ডাক্তার বললেন, আর জ্বব হবে না। এখন ওঁকে বাড়ি পাঠাবাব ব্যবস্থা কর্‌তে হবে।

বউদিদি,

আজ একটা খুব নতুন খবর আছে। বিন্দু বলে যে মেয়েটা আত্মীয়স্বজনের অত্যাচারে আত্মহত্যা করেছে শুনে তোমার মেজ'বউ এব এই বিরাগ হয়েছিল, সে মরেনি। শরৎ কলকাতা থেকে সে খবর নিয়ে এসেছে। বিন্দু নিজেও তোমার মেজ'বউকে চিঠি দিয়েছে। কি সামান্য ভুল ভ্রান্তি ধরে কত বড় ট্রাজেডির (মাপ কর বউদিদি, ট্রাজেডির বাঙ্গালা আমি জানি না) সৃষ্টি হতে পারে, এই ঘটনায় তাই বুঝলাম। বিন্দু মরে নি। শরৎ বিন্দুব শ্বশুর বাড়ির নম্বরটা ভুলে গিয়েছিল। তাই সেই গলিতেই আর একটা বাড়িতে খোঁজ করতে গিযে জানে, সে বাড়ির নতুন বউ কাপড়ে আগুন লাগিয়ে স্নেহলতার মতন আত্মহত্যা করেছে। ঐ খবর নিয়ে এসেই ত যত গোল বাঁধিয়েছে। বিন্দু কেবল মরে নি তা' নয়, এখন অতি সুখে আছে। তোমার মেজ'বউকে সে যে চিঠি লিখেছে, সেখানা নকল করে দিলাম, পড়ে দে'খ। রাগ করো না, বউদিদি, বিন্দু যে প্রথমে অতটা গোল বাঁধিয়ে তুলেছিল, তা তোমার মেজ'বউ এর শিক্ষারই গুণে, তার নিজের স্বভাব-দোষে নয়। তোমার মেজ'বউ নিজে এটা বুঝেছেন, নইলে আমি ওকথা কইতাম না। বিন্দু সর্বদাই নিজেকে বড় নিষ্পীড়িত মনে করত। তোমার মেজ'বউই এভাবটা তার প্রাণে বেশি করে জাগিয়ে দেন। আর যে আপনাকে সর্বদাই নির্যাতিত ও নিপীড়িত ভাবে, তার দ্রোহিতা অবশ্যম্ভাবী। সব বিদ্রোহীব ভিতরকার কথাই এই। বিন্দুর কথাও তাই। তোমাব মেজ'বউএর কথাও তাই। বিন্দু এখন এ রোগ মুক্ত হয়েছে। তোমাব মেজ'বউও ঠাকুরের কৃপায আরোগ্যের পথে দাঁড়িয়েছেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বিন্দুর পত্র

শ্রীশ্রীচবণেষু

দিদি আমি মবি নাই। তোমরা যে খবব পেয়েছিলে সেটা মিছে কথা। আমি যে দিন আবার আমাব শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসি, তার দুদিন পবে, আমাদেব পাশের বাড়ির একটি বউ কাপড়ে কেরোসিন দিয়ে আগুন ধরিযে আত্মহত্যা কবে। তারও নাম বিন্দু ছিল। ওরা আমাদেবই জ্ঞাতি। তারও এই দু'তিন মাস আগে বে হয। এরই জন্য আমিই মরেছি বলে কথাটা রটে যায়। দিদি, আমি মরি নি। আব এমন সুখে আছি যে মর্‌বার কোন সাধ আমার আর নাই।

ঐ মেয়েটা যখন পুড়ে মরে, আমি দেখেছিলাম। আমার শোবাব ঘরের পাশেই ছাদ, আর তার পরেই ওদের ছাদ। তখন রাত দুপোব হবে। আমরা তার চীৎকারে জেগে উঠে, দৌড়ে বাহিরে গিয়ে দেখি মেযেটার চারদিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠেছে, আর সে "বাবা গো, আমি মরবো না, আমি মরবো না"—বলে বিকট চীৎকার করছে। তার মুখেব সে ছবি আমার প্রাণের ভিতবে কে যেন ঐ আগুন দিয়ে দেগে দিয়েছে। যখনই মনে হয় সর্বাঙ্গে ঘাম ছুটে, এত ভয় হয়। আমি ঐ দেখে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। উনি আমাকে কোলে করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে, সারা রাত বাতাস করে, কত রকমে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ঐ ভয়টা তাড়াতে চেষ্টা করেন। আমি শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। আর উনি, ছেলে ভয় পেলে মা যেমন তার গায়ে হাত দিয়ে ঘুমাতে দেয়, তেমনি করে সারারাত জেগে আমার গায়ে হাত রেখে, আমার মাথায় বাতাস করে, পাহাবা দেন। ভোরবেলা চোখ মেলে দেখি, এইভাবে বসে আছেন। দিদি, তোমার আশীর্বাদে আমি বড় সুখে আছি।

তুমি আমার দুঃখ অনেক দেখেছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কেঁদেছ, আমাকে মা'র পেটের বোনের মতন ভাল বেসেছ। জন্মে আমি তার আগে অমন আদর ও ভালবাসা পাই নাই। আর তুমি অমন করে ভালবাস্‌তে বলেই আমার বিয়ে কর্‌তে এত অনিচ্ছা ছিল। তোমার ঐ আদর ছেড়ে পরের বাড়ি যেতে একেবারেই মন চাইল না। তাই তোমার পায়ে ধরে কত কেঁদেছিলাম, বলেছিলাম আমার বিয়ে দিও না, দাসী করে নিজের কাছে রাখ। আমার রূপ নাই জান্‌তাম। সবাই বল্‌ত অমন কাল মেয়ের কি আবার ভাল বে হয়? আমার বাপ মা নাই। টাকা কড়ি নাই। শুন্‌তাম একরাশ টাকা নইলে কোনও মেয়ের বে হয না। তাই আমার যখন বিয়ের সম্বন্ধ এল, তখন ভাব্‌লাম যে এর ভিতরে অবশ্য একটা কিছু ভারি গলদ আছে; নইলে অমন কাল মেয়েকে, অমন মা-বাপ-খেগো গরিব মেয়েকে বিযে করতে চায় কে? তাই ভয় হচ্ছিল, কোথায় যাচ্ছি। মনে মনে ভাব্‌লাম অমন কাল মেয়েকে যে বিয়ে করতে রাজি হয়, না জানি সে কত কুৎসিত। আমার মনের কথা কেউ জানে না, দিদি, কেবল এই আজ তোমায় বল্‌ছি। তোমায়ও এসব কথা কোনওদিন কইতাম না, যদি ঠাকুর আমার ভাগ্যে এত সুখ না লিখতেন। সুখ পেয়েছি বলেই আজ দুঃখেব কথা কইতেও আমার সুখ হয়। কি বল্‌ছিলুম? হাঁ, ঐ আমার বের রাতের কথা। যনে মনে আমার স্বামী অতিশয় কুৎসিত হবে ভেবে রেখেছিলুম বলে, শুভদৃষ্টিব সময় আমি জোর করে চোখ দুটাকে চেপে রেখেছিলুম। ছেলেবেলা আঁধার বাতে ঘবের বাহিরে গেলে ভূতের ভযে যেমন চোখ বুজে থাকতাম, তেমনি করে চোখ বুজে বইলাম। তারপর বাসর ঘরে গিয়ে আমার ভয় আরও বেড়ে গেল। গল্প শুন্‌তাম বাসর ঘরে কত লোক থাকে, কত রং তামাসা হয়, আমার বাসরে সে রকম কিছুই হলো না। একজন বুড়ি আমাব হাত ধরে নিযে বিছানায বসিয়ে দিযে চলে গেল। তারপরে উনি উঠে দরজা বন্ধ কবে দিলেন। আমি ভযে আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মুখে কাপড় মুড়ি দিয়ে বিছানার এক পাশে কাঠ হয়ে পড়ে বইলাম। একবাব আমার হাতখানা এসে ধরলেন। তারপরেই ছুড়ে ফেলে গব্‌গর্ কব্‌তে কব্‌তে উঠে গেলেন, আর সারা রাত ঐরূপ গর্‌গর্ করে পাইচারি করে কাটালেন। মাঝে একবার মনে হল যেন অনেকগুলি কাচের বাসন ছাতে ছুড়ে ফেলে চুরমার কবে ফেললেন। আমি বুঝলাম এ ব্যক্তি পাগল। তার পর দিন যখন খেতে বসেছি, অমনি তেড়ে একেবারে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, আর ভাতের থালা ছুড়ে ফেলে, উনুনে জল ঢেলে, হেঁসেলের ভাতবেন্নুন সব জুতা শুদ্ধ পায় লাথি মেরে চারিদিকে ছড়িয়ে চলে গেলেন। আমি দেখে শুনে ভয়ে ভয়ে প্রাণের দায়ে তোমার কাছে পালিয়ে এলাম। তারপর কি হলো তুমি জান। তুমি আমায় রাখ্‌তে চেয়েছিলে। কিন্তু আমার ভাশুর যখন নিতে এলেন, তখন দেখ্‌লাম তোমাদের বিপদ হ'তে পারে, তাই তাঁর সঙ্গে ফিরে গেলাম। এবারে গিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি। আমি চলে এসেছি শুনে উনিও বাড়ি ছেড়ে চলে যান। তারপর যখন শুনলাম, আবার ফিরে এসেছেন তখন আমার পিত্তি শুকিয়ে গেল। তাই আবার পালিয়ে আমার খুড়তাত ভাইদের ওখানে যাই। ওরা যখন কিছুতেই স্থান দিল না, তখন কাজেই আমার ফিরে আস্‌তে হলো। আমার গাড়ি যখন দরজায় গিয়ে দাঁড়াল তখন দেখ্‌লাম একটি নতুন লোক আমাকে গাড়ির দরজা খুলে তুলে নিলেন। আমি ভাব্‌ছিলাম আমার শাশুড়ী বা বাড়ির ঝি-চাকরানী বুঝি কেউ এসে দরজা খুল্‌ল; তাই নিঃসঙ্কোচে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখ্‌লাম। দিদি, দেখলাম একজন অতি সুন্দর পুরুষ। যেমন মুখ, তেমনি রং, যেমন কোঁকড়া কাল চুল, তেমনি বড় বড় টানা চোখ, যেমন নাক তেমনি সব। পুরুষের অমন রূপ জন্মে দেখিনি। মিথ্যা বল্‌ব না, দিদি, দেখেই মনে হলো, হা রে কপাল! অমন স্বামী যদি আমার হ'ত। আমি তাঁর পিছু পিছু অন্দর মহলে ঢুক্‌লাম। তখন ইনি ডেকে বললেন—"মা, তোমার বউ এসেছে, আমার

ঘরেই নিয়ে যাচ্ছি।'' গলার স্বরে আমার সর্বাঙ্গ কেমন করিয়া উঠিল। পা যেন আর চলে না। শরীরটা যেন হঠাৎ ভারি হয়ে পড়্‌ল। মনে হলো যেন আমি ভেঙে পড়েছি। তখন তিনি আমার হাত ধরে একেবারে দুতালায় শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। যত্ন করে বিছানায় বসালেন। পাখা নিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাস কর্‌তে লাগলেন। তারপর বললেন—অমন মিষ্টিভাবে জন্মে আমার সঙ্গে আর কেউ কথা কয়নি, দিদি, অভিমান করো না, তুমিও কইতে পারনি—''একবার এদিকে এস।'' আমি যেন পুতুল বাজির পুতল সেজেছি। অমনি ধীরে ধীরে উঠে তাঁর সঙ্গে গেলাম। বারান্দায় একখানা কাঠের চৌকি ছিল, আমায় সেখানে বসালেন। তারপর নিজে এক ঘড়া জল এনে আমায় পা ধু'তে দিলেন। আমি লজ্জায় মরে যেতে লাগ্‌লাম, কিন্তু বাধা দিবার শক্তি ছিল না। আমাকে হাতে মুখে জল দিতে বললেন, নিজে দাঁড়িয়ে সে জল ঢেলে দিলেন। তারপরে আবার ঘরে এসে, নতুন বেনারসী শাড়ি বের করে বললেন, ''কাপড় ছাড, তোমার ফুলশয্যার জন্য এখানি এনেছিলাম, আজই তোমার ফুলশয্যা।'' এই বলে বাবান্দায গেলেন। আমি সেই শাড়িখানি কোনও মতে পরলাম। হাত পা কিছুই যেন আর আমার নিজের বশে নাই। আমার কাপড় ছাড়া হলে এক বাক্স গহনা বের করে— তোমার দেওয়া গহনাগুলি একে একে খুলে ফেলে, নিজের হাতে বালা, বাজু, অনন্ত, চিক, ইয়ারিং পর্যন্ত পরিয়ে দিলেন। কতক্ষণ সে এই গহনা পবাতে লাগ্‌ল বল্‌তে পারি না। এক এক খানি গহনা পরাচ্ছেন, আর অনিমেষে খানিকক্ষণ সে অঙ্গটাকে দেখ্‌ছেন। এক এক বাব মনে হতে লাগ্‌ল, বুঝি এ ব্যক্তি সত্যি সত্যি পাগল। আবার মনে হতে লাগ্‌ল, দুনিয়াব সব ভাল লোকের চাইতে আমার এ পাগলই ভাল, এ পাগলকে গলায় বেঁধেই আমি মব্‌ব। সব গহনা পরান শেষ হলে আমাব মুখখানি তুলে ধবলেন—আমাব তখন চোখ বুজে থাকাই উচিত ছিল, কিন্তু দিদি, পোড়া চোখ তা করলে না, চাব চক্ষে মিলন হলো। এই আমাদেব শুভদৃষ্টি। দিদি, আমার চোখ জলে ভরে আস্‌ছে, আমি যে কাল, আমি নাকি কুৎসিত তবু ওঁর চক্ষে বুঝি বা আমিও বড় সুন্দর। নইলে ও চোখ আমায় দেখে অমন হয় কেন?

দিদি ইনি পাগল নন। ছেলে বয়সে একবাব বড় মদ গাঁজা খেতে আবম্ভ করেন, তাবই জন্য মাঝে ক'দিন একটু ক্ষেপে উঠেছিলেন সত্য। কিন্তু সে প্রায় দশ বার বছরের কথা। এখন তামাক পর্যন্ত ছোঁন না। তবে বড় বদ্‌রাগী লোক। বাগলে জ্ঞান থাকে না। আব দিদি, যে রাগ্‌তে জানে না, সে ত পাথর, সে কি ভালবাসতেই জানে? জান কি, আমায় বে করলেন কেন? স্নেহলতা মেয়েটা যখন আত্মহত্যা করলে, ঐ কথা শুনে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যার কোনও রকমে বরপণ দিবার সম্বল নাই, তেমনি বাপের মেয়ে না পেলে বে করবেন না। তাই খুঁজে খুঁজে ঘটকী আমায় বের করলে। এ বিয়েতে তাঁর বাপ মায়ের আপত্তি ছিল। তাঁরা প্রথমে টাকা খুঁজছিলেন। যখন ছেলে পণ নিয়ে বে কর্‌বেই না কোট করে বস্‌লো, তখন আর কিছু না হউক যার দুপযসা আছে, বার মাসে তের পার্বণে তত্ত্ব পাঠাতে পারবে, এমন ঘরের মেয়ে বে করুন, তাঁরা তাই চাইছিলেন। কিন্তু উনি এতেও নারাজ হলেন। তাতেই বাপ বেটাতে ঝগড়া হয় ও বাপ ছেলের বিয়েতে থাকবেন না বলে কাশী চলে যান। আমার শাশুড়ি বাড়ি ছেড়ে গেলেন না বটে, কিন্তু আমি কুলীনের মেয়ে এ অপরাধটা ভুলতে পারলেন না। তারই জন্য আমাকে হাড়িবাগদীর মেয়ের মতন পিতলের থালাতে ভাত দিয়েছিলেন। হয় ত ভেবেছিলেন অতি গরীবের ঘরের মেয়ে, তাতে আবার বাপ মা নাই, এইরূপেই বুঝি আমি লালিত পালিত হয়েছি; তারই জন্য উনি অমন রেগে উঠেছিলেন। মাকে ত আর কিছু মুখে বল্‌তে পারেন না, তাই কতকটা আমার উপর দিয়ে, আর কতকটা থালাবাসন ও হাঁড়িকুড়ির উপর দিয়ে সে রাগটা চালিয়ে দিলেন। আর উনি

যে সব গহনা দিয়েছিলেন, ওঁর মা আমার সেগুলি পরিয়ে দেন নি বলে বিয়ের রাতে অমন করে রেগে গিয়েছিলেন।

দিদি, আমি ভাবি, তোমরা যদি আমায় সত্যি সত্যি রাখ্‌তে. আমার খুড়তুত ভাইয়েরা যদি আমার স্থান দিত, আর একমুঠা ভাত যেখানেই হউক আমার মিল্‌তই—তাতে আমার কি সর্বনাশই হতো। অমন দেবতাব মতন স্বামীকে পেতাম না। আর স্বামীকে পেয়েছি বলে, শ্বশুর, শাশুড়ি সবাইকে পেয়েছি। ভাশুব, জা, ভাশুর-পো, ভাশুব-ঝি সকলে আমার কতই আপনার হয়ে গেছে। দিদি আমি নিজেকে ওদের সেবায় নিযুক্ত করে ওদের মাঝে আপনাকে হাবিয়ে ফেলেছি। এখন আব আমাব নিজের কোনও দুঃখ নাই। সুখ আমার উপ্‌চে পড়ছে। দিদি. অনেক দিন তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আমার ছোট্ট দুঃখের কান্না কেঁদেছি, আজ বড় সাধ যায়, ঐ বুকে ছুটে গিয়ে এইবার আমার সুখের কান্না কাঁদি। আমার দুঃখে চিরদিন দুঃখ পেয়েছে, এবার আমার সুখ দেখে সুখী হও।

শুন্‌লাম আমি মরেছি শুনে তুমি বিবাগী হয়ে শ্রীক্ষেত্রে চলে গেছ। আমি যখন সত্যি সত্যি বেঁচে আছি, তখন তুমি আর ঘর বাড়ি ছেড়ে থাক্‌বে কেন? আব মরেই কি কখনও তোমার দুঃখে আমার সুখ হতো? স্বামীর কোলে মাথা রাখাতে যে কি সুখ, তা ত তুমি জান। তুমি আমার জন্য এই স্বর্গসুখও ছেড়েছ। শুনে অবধি আমার নিজের সুখ যেন আধখানা হয়ে গেছে। তুমি শিগ্‌গির ফিরে এসো। তোমায় বড় দেখ্‌তে ইচ্ছে কবে। লক্ষ্মী দিদি আমার, শিগ্‌গির ফিরে এস। আমার কোটি কোটি প্রণাম জানিবে।

তোমারই সেবিকা
বিন্দু।

চতুর্থ অধ্যায়

মেজ'বউ এর পত্র

ঠাকুর-ঝি,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার ঠাকুর-পোর কথা কি আর লিখ্‌ব, আমাব জন্য সে যা করেছে, শরৎ তা কব্‌তে পার্‌ত না। ভগবান্ তাকে এনে জুটিয়েছিলেন বলেই তোমার মেজ'বউ এখনও বেঁচে আছে।

আমাকে তোমার ওখানে যেতে বল্‌ছ। আমি কি করেছি তা জান্‌লে এ পোড়ারমুখীর মুখ আর দেখতে চাইতে না। অমন দেবতার মতন স্বামী, তাঁকে কতই না অনাদর, কতই অপমান করছি। শাস্ত্রমতে আমি পবিত্যক্তা। কারণ অপ্রিয়ভাষিণী স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ কর্‌বে, শাস্ত্রে এই কথাই বলে।

আমি তোমার দাদাকে পরিত্যাগ করেছি। তিনি আমায় ছাড়েননি, আমিই ছেড়ে এসেছি। আমি তীর্থ করতে আসি নি, ওটা একটা ছুতা মাত্র। আমি আর তোমাদের সম্পর্ক রাখ্‌ব না বলে এসেছি। স্ত্রীলোকের মনের যে অবস্থা হলে আজকাল তারা নিজের কাপড়ে আগুন লাগিয়ে পুড়ে মরে, আমি সেই মন নিয়ে বাড়ি ছেড়ে আসি। মর্‌তে সাহস হয়নি বলে মরি নি। সতী স্ত্রী আপনি মরে, আমি তা করি নি, স্বামীর ভালবাসাটাকে হত্যা কর্‌বার চেষ্টা করেছি।

ঠাকুব-ঝি তোমরা সতী সাধ্বী, আমি যে তোমাদের অস্পৃশ্যা। আমায় মাপ কর। আমি তোমাদের কাছে এ মুখ দেখাতে পার্‌ব না।

স্বামীপুত্র নিয়ে সুখে থাক, এই প্রার্থনা করি।

পঞ্চম অধ্যায়

ঠাকুর-পোর পত্র

বউদিদি

আমি ত কিছুতেই তোমাব মেজবউকে বাড়ি ফিরে যেতে রাজী কবাতে পারলাম না। তোমাকেই আস্‌তে হবে। তোমাব দাদা যদি আসেন, আরও ভাল হয়। তোমাদের প্রতীক্ষায বইলাম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঠাকুব-ঝিব পত্র

মেজ'বউ,

তুমি যখন এলে না, আমরাই তখন যাচ্ছি। মেজদাদাকেও লিখেছি, তিনি রবিবারে এখানে আস্‌বেন। উনিও শালাজকে দেখতে যাবেন। তিন দিনের ছুটি নিয়েছেন। আমরা তিন জনে সোমবার প্রাতে তোমার দোরে গিয়ে অতিথি হবো। জ্ঞাতার্থে নিবেদনমিতি।

সপ্তম অধ্যায়

আবার স্ত্রীর পত্র

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

ঠাকুব-ঝির পত্রে জান্‌লাম, এই সোমবারে তুমি এখানে আস্‌বে। তোমায় পায়ে পড়ি, এস না—আমিই যাচ্ছি—আমার জন্য এই কষ্ট স্বীকাব করে, এ হতভাগিনীকে আব নতুন করে অপরাধিনী করো না।

তুমি এস না বল্‌ছি, কিন্তু তোমাব কাছে কোনও কথা গোপন করব্‌ না। তুমি আসবে শুনে আমার প্রাণটা যে কি কবে উঠ্‌ল, তোমায় বুঝাতে পারব্‌ না। তুমি আস্‌বে বলেই আমি ফিরে যেতে সাহস পাচ্ছি। নইলে বাকি জীবন হয় ত এমনি করে এই তুঁষের আগুনে পুড়ে মর্‌তে হতো। তুমি আসছ শুনে বুঝ্‌লাম তুমি তোমাব এ কুলত্যাগিনী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করনি। আজ ঈশ্বরের দযাতে আমার সত্য বিশ্বাস জন্মাল। লোকে যতই পাপ করুক না কেন, তিনি যে কাউকে ছাড়েন না, তোমার এ ক্ষমা দেখে তাই বুঝ্‌লাম।

আর, সত্যি বল্‌ছি, ঈশ্বর কে, তা ত আমি জানি না। একজন মনগড়া ঠাকুরের পায়ে এতকাল জীবনের সুখদুঃখের কথা বলেছি, কিন্তু এত দিন পরে আমার সত্য ঠাকুরকে আমি দেখতে পেলাম।

তোমায় যতদিন আমি কেবল আমারি মতন একজন মানুষ বলে ভাবতাম, ততদিন আমি আমার সত্য ঠাকুরকে পাই নাই। আর মানুষ ভেবেইত তোমায এত অযত্ন, এত তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছি। পনের বছর কাল তোমার ঘর কবলাম, কিন্তু এক দিনও তোমার পানে তাকাই নাই, কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। নিজের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অহঙ্কারই করেছি, তোমার ঐ বিশাল জ্ঞানেব দিকে তাকাই নাই; আপনার ভোগটাকেই বড় ভেবেছি, তোমার ত্যাগকে লক্ষ্য করি নাই; কেবল পাবার জন্যই ছটফট করেছি, কোনও দিন তোমায় সত্যভাবে কিছু দিই নাই। এবার এই কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বুঝ্‌লাম, দিয়েই সুখ, পেয়ে নয়, ত্যাগেই শান্তি, ভোগে নয়। যে আপনাকে বড় করে, সেই ছোট হয়ে যায়, যে নিজেকে ছোট করে, সেই বড় হয়ে উঠে। আমি তোমার সঙ্গে টক্কর দিয়ে তোমার সমান হতে গিয়ে তোমাকেও ধর্‌তে পারলাম না, নিজেকেও রাখ্‌তে পারলাম না। আজ এই কলঙ্কের কালি মেখে তোমার চরণের ধূলি হয়ে তোমাকেও ধরেছি, নিজেকেও পেয়েছি।

আমি বার বছরের ছোট্ট বালিকা তোমাদের এত বড় পরিবারের মধ্যে এসে পড়্লাম। কিন্তু তোমাদের বিশালত্বের ভিতরে আপনার ক্ষুদ্রত্বকে হারাতে পারলাম না। লোকে বল্‌ত আমাব রূপের কথা, অমন রূপ বাঙ্গালীর ঘরে হয় না—আমি তারই গর্ব্বে ফেঁপে উঠ্‌লাম। মা বাবা বল্‌তেন আমার বুদ্ধির কথা, আমি সেই অহঙ্কারেই ঘট হয়ে বস্‌লাম। তুমি শিখালে আমার লেখাপড়া, আমি তাই নিজেকে বিদ্বান্ ভেবে একেবারে টঙ্গে চড়িলাম। অন্য লোক হলে কত ঝগড়াঝাটি হতো। কিন্তু তুমি একদিন একটা কড়া কথা পর্যন্ত বলনি। যখন বড় অন্যায় করেছি, মুখখানা কেবল একটু ভারি হতো। এত করে তোমায় কষ্ট দিয়েও আমি যখন যা চেয়েছি তুমি তাই দিয়েছ। কোনও দিন কিছুতে 'না' কবনি। 'না' কথাটা বিধাতা আমায় শিখান নি। বাড়ির যে যা ইচ্ছা তাই করে, তুমি কোনও দিন কারও ইচ্ছার প্রতিরোধ কর নি। আমি ভাবতাম তোমার পুরুষত্ব নাই। ভেবে দেখি নি যে, এই দুনিয়ার মালিক যিনি তিনিও ত অমনি ভাবেই চুপ করে বসে আছেন, তুমি ভাইদের মধ্যে সকলেব চাইতে বেশি রোজগার কর, তুমি যদি কোনও বিষয়ে কথা কও, পরিবারে শান্তি থাক্‌বে না। যার যত শক্তি বেশি, সে তত চুপ করে থাকে। এই মোটা কথাটা আমি তখন বুঝি নি। আমি নিজেকে তোমা থেকে কেবলই আলাদা করে দেখ্‌তাম বলে, তোমার মহত্ত্ব যে কত ও কোথায তা বুঝতে পারিনি। তাই আমার এ দুর্গতি। আমি সব ছোট জিনিষকে বড় করে তুল্‌তাম, তাই তুমি যে অত বড় তা বুঝিনি, তোমাকেও ছোট বলে ভেবেছি। এই করে জীবনের এই পনেব বছর খুইয়েছি। সব জীবনটাই খোয়াতে বসেছিলাম।

আমার সকল অপবাধের কথা ত শুন নি। তোমাকে ছেড়ে এসে আমায কি অপমান সহিতে হয়েছে তুমি জান না। সেদিন যদি তোমার বোনেব দেবব নবেন আমাব খোঁজে এসে ঐ অপমান থেকে আমায় না বাঁচাত, তাহলে এই সমুদ্রেই চিরদিনেব মতন মৃণাল ডুবে মরিত। অরক্ষিতা স্ত্রী অঙ্গ পরপুরুষে স্পর্শ করলে অনেক স্বামী শুনেছি তাকে আব গ্রহণ করে না। অপরেব কথা কি, স্বযং রামচন্দ্র পর্যন্ত কর্‌তে চান নি। আমায কি তুমি গ্রহণ করবে? এই কথাটা তোমায় না বলে আমি তোমার কাছে যেতে পারি না।

বড় সাধ হয়েছে এবার যদি তুমি এ কলঙ্কিনীকে আবার চরণাশ্রয় দাও তবে তোমাব মধ্যে ও তোমার পরিবার পরিজনের মধ্যে একবার ডুবে গিয়ে এ নারী-জন্মটা সার্থক করি। বিন্দি আমাকে এই শিক্ষা দিয়েছে। সে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিযা—সত্যকে পেয়েছে। আর আমি নিজেকে নষ্ট কর্‌তে বসে সত্যকে দেখেছি। তুমি আমায় রাখ বা ছাড়, যাই কর না কেন, আমি তোমারই চিরদিনের চরণাশ্রিতা।

মৃণাল

প্রায়শ্চিত্ত

জলধর সেন

(১)

আইন-ক্লাশের পড়া শেষ করিয়া বেলা এগারটার সময় অক্ষয় তাহার মির্জাপুর স্ট্রীটের মেসে আসিয়া দেখিল, তাহার টেবিলেব উপর একখানি ডাকের চিঠি রহিয়াছে। খামের উপর তাহাবই গ্রামের পোস্ট-আফিসের ছাপমারা , কিন্তু হাতের লেখাটা তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত। বাড়ীর চিঠি, অথচ লেখা অপরিচিত হাতের — অক্ষয়ের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। দুইমাস পূর্বেই টেলিগ্রাম পাইয়া তাড়াতাড়ি বাড়ীতে যাইয়াও সে তাহার মাতাকে জীবিতা দেখিতে পায নাই — মায়েব মৃতদেহ পুত্রেব অগ্নি-সংস্কারের অপেক্ষা করিয়াছিল। আবার আজ এ কি?

অক্ষয় কম্পিত-হস্তে পত্রখানি খুলিযা পড়িতে আরম্ভ করিল। একটু পড়িয়াই অক্ষয়ের মুখ লজ্জায়, ঘৃণায় ও ক্রোধে যেন কেমন হইযা গেল, সে পত্রখানি টেবিলের উপর রাখিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল।

মিনিট দুই-তিন স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া সে পুনরায পত্রখানি তুলিয়া লইল। পত্রখানিতে অল্প কয়েকটি কথাই লিখিত ছিল। যিনি পত্র লিখিয়াছেন, তিনি নাম প্রকাশ করেন নাই, — লিখিয়াছেন — "কোন আত্মীয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াও অক্ষয় হাতের লেখা চিনিতে পারিল না।

তাহার পর সে পকেট হইতে বাক্সেব চাবী বাহিব কবিয়া পত্রখানি রাখিবার জন্য বাক্স খুলিল, এবং বাক্স বোঝাই কাপড়-চোপড তুলিয়া তাহার নীচে পত্রখানি রাখিয়া দিয়া বাক্স বন্ধ করিল, এবং তৎক্ষণাৎ ছাত্রাবাস হইতে বাহির হইয়া গেল।

হ্যারিসন-রোডের ডাকঘরে উপস্থিত হইয়া অক্ষয় বাড়ীতে পিতার নিকট টেলিগ্রাম কবিল যে, সে বিশেষ কারণে অপরাহ্ণ ১টার লোকাল ট্রেনেই বাড়ী যাইতেছে, স্টেশনে যেন পালকী-বেহারা উপস্থিত থাকে।

অক্ষয়ের যে গ্রামে বাড়ী, তাহার নাম — ঠিক নামটা না হয় না-ই বলিলাম — এই ধরিয়া লউন, — সে গ্রামের নাম বহিমপুর ; ইস্টইন্ডিয়া রেলের শক্তিগড় স্টেশন হইতে এই গ্রাম তিন মাইল দূরে। অক্ষয়ের পিতা শ্রীযুক্ত রামকমল ঘোষ বর্ধমানরাজের একজন বড় পত্তনীদার। অবস্থা খুব ভাল। সন্তানের মধ্যে ঐ একই ছেলে অক্ষয়কুমার। অক্ষয় এম-এ পাশ করিয়া বি-এল পড়িতেছে। বড়মানুষের এম-এ পাশ, একমাত্র পুত্র — কিন্তু এখনও বিবাহ হয় নাই। লেখাপড়া একরকম শেষ না হইলে অক্ষয় বিবাহ করিবে না, —ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা। পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন কেহই সে প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিতে পারেন নাই। মায়ের অদৃষ্টে পুত্রবধূর মুখদর্শন ছিল না — তিনি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। অক্ষয় কলিকাতার মেসে

থাকিয়া আইন পড়িয়া জ্ঞান-সঞ্চয় করে, আর তাহার পিতা দেশে বসিয়া আইন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়া অর্থ ও অধর্ম সঞ্চয় করেন ; পুত্র পিতার অন্যায় অত্যাচারের কথা শুনিয়া নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে, আর পিতা সেই একমাত্র পুত্রের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য প্রজা-পীড়ন করিয়া কোম্পানীর কাগজে লোহার সিন্ধুক পূর্ণ করেন। অন্দব-মহলে ছেলে মায়ের কাছে কাঁদিত —মা ছেলের কাছে কাঁদিত, কিন্তু কর্তাকে কোন কথা বলিতে কাহারও সাহসে কুলাইত না ; — রামকমল ঘোষ তেমন বাপের বেটাই ন'ন যে, স্ত্রী-পুত্রের কথা শুনিয়া জমিদারী চালান। দুইমাস পূর্বে মাতা স্বর্গে গেলেন — ছেলের কাঁদিবাব স্থানও থাকিল না। মাতার শ্রাদ্ধাদির পর অক্ষয় যখন কলিকাতায় আসে, তখন সে মনে-মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল যে, শীঘ্র আর বাড়ীতে যাইবে না। কিন্তু এই বেনামী চিঠি পাইয়া সে বাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইল। চিঠিতে কি লেখা ছিল, তাহা যখন সে কাহাকেও বলিল না, তখন গল্প-লেখক সর্বজ্ঞ হইলেও সে কথা পাঠকগণের গোচব করা সঙ্গত মনে কবিতেছেন না।

(২)

শক্তিগড় স্টেশনে নামিয়া অক্ষয় দেখিল বাড়ী হইতে পালকী-বেহারা আসিযাছে , সঙ্গে আসিযাছে বাড়ীব বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস। কালিদাস অক্ষযকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদাভাই, হঠাৎ এলে যে? শরীর ভাল আছে ত?"

অক্ষয় শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "শরীব ভাল আছে কালীদা। মনটা কেমন খারাপ ঠেকল, তাই একবাব তোমাদেব দেখ্‌তে এলাম।"

কালিদাস অনেক কালের চাকর , অক্ষয়কে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ কবিয়াছে, অক্ষয়কে সে ভালরূপেই চেনে। সে বলিল, "না, দাদাভাই, তোমাব শবীব-মন দুই-ই খাবাপ হয়েছে। বুড়োর কাছে গোপন করো না। তা এখন থাক্‌, চল বাড়ী যাই, তার পর সব শুনব।" এই বলিয়া অক্ষয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে স্টেশনের বাহিরে আসিল।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে , বেহাবারা লণ্ঠন জ্বালাইয়া লইল। একজন বলিল, "কালীদা, তুমি একটা লণ্ঠন নিয়ে পিছনে এস, আমরা একটা আলো নিয়ে চলে যাই।"

কালিদাস বলিল, "আমাকে আর ফেলে যেতে পারবি নে , তোরা যত দৌড়েই যাস্‌, না কেন, কালিদাস তোদের সঙ্গে চলতে পারবে।" কালিদাস পালকীর সঙ্গে-সঙ্গেই চলিল। পাল্কী যখন গ্রাম পার হইয়া মাঠের মধ্যে পড়িল, তখন কালিদাস গলা ছাড়িয়া গান ধরিল —

"আমার মন কেন উদাসী হ'তে চায় ,
ওগো দরদী গো —।"

কালিদাসের এই করুণ সুর অক্ষয়ের হৃদয় স্পর্শ কবিল , — তাহার মনও যে আজ সত্য-সত্যই উদাসী হইতে চাহিতেছিল। কালিদাস কি তাহার মনের বেদনা বুঝিতে পারিয়াই এমন করুণ-সুরে ঐ গানটী গায়িতেছে। কালিদাস গায়িল —

"সে যে এমন করে দেয় গো মন্ত্রণা,
ও সে উড়ায়ে দেয় প্রাণের পাখী, মানা মানে না ;
সে যে উড়ে যায় বিমানেরি পথে,
শীতল বাতাস লাগে গায়।"

অক্ষয় পালকীর মধ্যে শয়ন করিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে কালিদাসের গান শুনিতেছিল ; তাহার প্রাণ-পাখী আজ শীতল বাতাসের জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিল। কিন্তু সে শীতল বাতাস ত

সে বাড়ী যাইয়া পাইবে না ; — আজ ত আর তাব স্নেহময়ী জননী তাহার পথের দিকে চাহিয়া বসিয়া নাই ; — আজ যে সে নরকের অগ্নিতে দগ্ধ হইবার জন্য বাড়ী যাইতেছে।

কালিদাস গান শেষ করিয়া নীরব হইতেই একজন বেহারা বলিল, "ও কালিদা, আর একটা ভাল গান ধর না।"

কালিদাস বলিল, "আর গান-টান ভাল লাগে না ভাই!"

এই বলিয়াই সে গান ধরিল —

"রবে না দিন চিরদিন, সুদিন কুদিন,
একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
এতকাল করে খেলা, গেছে বেলা,
এই সন্ধ্যাবেলা আর কি হবে ,
জগতের কারণ যিনি, দয়ার খনি,
তিনিই মশায় ভবসা ভবে।"

অন্ধকার রাত্রি, মাঠ নির্জন , তাহার পর কালিদাসেব মধুর কণ্ঠস্বর , — অক্ষয় আর পালকীর মধ্যে থাকিতে পাবিল না , — তাহাব প্রাণেব মধ্যে কেবলই ধ্বনিত হইতে লাগিল —

"ওরে, একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।"

সে তখন বেহাবাদিগকে পালকী থামাইতে বলিল। বাহকেবা পালকী নামাইলে সে বাহির হইয়া বলিল, "তোবা পালকীর নিয়ে চল্, আমি কালীদাব সঙ্গে একটু হাঁটি। ঐ ত গ্রাম দেখা যাচ্ছে, আমি এ পথটুকু হেঁটেই যেতে পাবব।"

কালিদাস আপত্তি কবল , বাহকেরা বলিল, "কর্তা শুনলে রাগ করবেন।" অক্ষয সে কথায কর্ণপাত কবিল না। বাহকেরা পালকী লইযা অগ্রসব হইল।

তখন কালিদাস বলিল, "দাদাভাই, এখন বল ত, তুমি পড়া কামাই করে কেন হঠাৎ বাড়ী এলে। নিশ্চয়ই তোমাব মনে কিছু আছে।"

অক্ষয় বলিল, "কালীদা, তোমার কাছে গোপন করব না, আমি বাবার একটা ব্যবস্থা কববার জন্য এসেছি।"

"বাবাব ব্যবস্থা! তুমি কি পাগল হয়েছ দাদাভাই!"

"না কালীদা, আমি পাগল হইনি এখনও, কিন্তু হবাবও দেরী নেই।"

"কেন, কি হয়েছে, আমাকে খুলেই বল না ভাই।"

অক্ষয বলিল, "কালীদা, সে কথা বল্‌তেও আমাব কষ্ট হচ্ছে। তুমি কি বাবাকে জান না যে আমাব মুখ দিয়ে পিতৃনিন্দা শুন্‌বে?"

কালিদাস বলিল, "তা হ'লে কথাটা তোমাব কাছেও গিয়েছে! কে তোমাকে এসব কথা লিখেছে?"

"কে লিখেছে, তা জানিনে , সে নাম প্রকাশ করে নাই। কি লজ্জা, কি ঘৃণার কথা কালীদা। কি আমাব দুরদৃষ্ট! ছেলেকে বাপে শাসন কবে এই ত এতদিন জানতাম , আমার অদৃষ্টে তার উলটো হলো।"

কালিদাস বলিল, "তা কি করবে মনে করেছ? কর্তাকে ত জান , আর তুমি কি-ই বা বল্‌বে তাঁকে? বল্‌তেই বা পারবে কেন? না দাদাভাই, ও-সব ব্যাপাবের মধ্যে তোমার গিয়ে কাজ নেই। যার যা ইচ্ছে, সে তাই করুক। তুমি কালই কলকাতায় ফিরে যাও। যে দিন মা লক্ষ্মী আমাদেব ছেড়ে গিয়েছেন, সেইদিনই — আব সেই দিন-ই বা কেন, আমি অনেক আগে থেকেই সব জানি।"

অক্ষয় বলিল, "সে কি আর আমিই জানতাম না, কালীদা! কিন্তু মায়ের ভয়ে, তাঁরই অনুরোধে আমি চুপ করেছিলাম। আর বাড়ীর মধ্যে যা হচ্ছিল, তা হচ্ছিল, এখন যে বাহিরে গেল। ছিঃ ছিঃ, কালীদা আমার যে মরতে ইচ্ছা করে।"

কালিদাস বলিল, "তা তুমি যে বাড়ী এলে, কি মতলব কোরে এসেছ বল দেখি। জান ত, কর্তার মেজাজ!"

"সব জানি কালীদা! কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, হয় বাবাকে কাশী যেতে হবে, আর না হয় ত আমার সঙ্গে চিরদিনের মত সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। এই দুইয়ের এক আমি করে যাবই।"

এই সময় তাহারা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কালিদাস অক্ষযকে বলিল, "দেখ দাদাভাই, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হঠাৎ কোন কাজ কবিও না। জান ত, তোমার বাবাকে। সাবধান।"

অক্ষয় কোন কথা না বলিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল।

(৩)

কর্তা রামকমল ঘোষ মহাশয় পুত্রেব প্রতীক্ষায বৈঠকখানার বারান্দায় বসিযা ছিলেন। অক্ষয় বারান্দায উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম কবিলে তিনি কহিলেন, "তোমাব কলেজ কি এরই মধ্যে বন্ধ হোলো অক্ষয়!"

অক্ষয় বলিল, "না, কলেজ বন্ধ হয নাই। মনটা ভাল ছিল না, তাই একবাব বাড়ীতে এলাম।"

"তা এসেছ, বেশ কবেছ। তবে কলেজ কামাই করাটা বোধ হয় ভাল নয় , পড়াশুনার বোধ হয় তাতে ক্ষতি হয়। তা হোক্ , যখন এসেছ, তখন, আজ হোলো বৃহস্পতিবার, কাল-পরশু দুটো দিন থেকে রবিবাব বোধ হয় কলকাতায় গেলেই ভাল হয।"

অক্ষয 'যে আজ্ঞা' বলিয়া বাড়ীব মধ্যে চলিযা গেল।

সারাবাত্রি অক্ষয কত কথা ভাবিল , সে মনে মনে যে পন্থা স্থির কবিয়া আসিযাছিল, বাড়ী আসিযা ভাবিয়া দেখিল, তাহার কোনটাই অবলম্বন করা তাহার পক্ষে সম্ভবপবও নহে, কর্তব্যও নহে। কিন্তু সে যে এ অবস্থায কি করিতে পাবে, পিতাকে কুপথ হইতে ফিবাইবার জন্য কি করা যাইতে পারে, তাহা সে মোটেই ভাবিযা পাইল না। শুধু নিজেব উপবই তাহার ধিক্কার জন্মিতে লাগিল। আর মনে হইতে লাগিল তাহাব সেই স্নেহমযী, সাক্ষাৎ দেবীরূপিণী জননীর কথা। আজ তাহাব মা বাঁচিযা থাকলে তাঁহাব কাছে সে মনের বেদনা জানাইতে পারিত। এখন তাহাব একমাত্র পরামর্শদাতা বৃদ্ধ ভৃত্য কালিদাস — তাহাব পরম সুহৃদ কালীদা!

প্রাতঃকালে উঠিযা অক্ষয়ের গৃহে মন টিকিল না। ইতিপূর্বে বাড়ী আসিযা সে প্রায়ই গ্রামের কোথাও যাইত না। আজ তাহার কাছে বাড়িতে বসিযা থাকা ভাল লাগিল না , সে রাস্তায় বাহির হইল।

অল্পদূর যাওয়ার পর সে দেখিল যে, অলক্ষিত ভাবে সে পীতাম্বব ভট্টাচার্যের বাড়ীব সম্মুখেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভট্টাচার্য মহাশয় তখন পূজাব ফুল তুলিবাব জন্য সাজিহস্তে বহির্বাটীর প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আছেন। অক্ষয় তাড়াতাড়ি বাড়ীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার চেষ্টা কবিল , কিন্তু সে ভট্টাচার্য মহাশয়ের দৃষ্টি অতিক্রম কবিতে পারিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এই যে অক্ষয, কবে বাড়ী এলে বাবা? শরীব ভাল আছে ত?"

অক্ষয় তখন কি করে, ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তাঁহাব পদধূলি গ্রহণ করিয়া বলিল, "আজ্ঞে কাল এসেছি।"

"হঠাৎ কি মনে করে বাড়ী এলে বাবা?"

অক্ষয় বলিল, "এমনি দুই-এক দিন ঘুরে যাবার জন্য এসেছি। রবিবারেই আবার কলিকাতায় ফিরে যাব।"

ভট্টাচার্য মহাশয় একটু চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "বাবা অক্ষয, তোমাব সঙ্গে—" কথাটা অর্ধপথেই বন্ধ হইল। ভট্টাচার্য মহাশয় অতি কাতরনয়নে অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিলেন। সে চাহনিতে বিষাদমাখা ; সে চাহনি যেন একটু সহানুভূতিলাভের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ।

ভট্টাচার্য মহাশয়কে এমন করিয়া কথাটা অসমাপ্ত রাখিতে দেখিয়া অক্ষয়ও কাতর হইল, বুঝিতে পারিল, ভট্টাচার্য মহাশয় কেন অমন কবিযা তাহার দিকে চাহিলেন, কেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন ! রামকমল ঘোষের ছেলের সঙ্গে যে তাঁহার কি দরকার, তাহাও অক্ষয়ের বুঝিতে বাকী রহিল না। তাহার মনে হইল, কেন সে মূর্খের মত তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়াছিল? কেন সে প্রাতর্ভ্রমণে বাহিব হইয়া এ পথে আসিযাছিল? অক্ষয় চুপ করিয়া রহিল। সে কি বলিবে? তাহার কি কিছু বলিবার মুখ আছে?

একটু চুপ করিয়া থাকিযা ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ অক্ষয়?"

অক্ষয বলিল, "বিশেষ কোথাও নয়, এই একটু বেডাতে বেবিযেছি।"

"তুমি রবিবারে কলকাতায যাবে বল্‌ছিলে না?"

"আজ্ঞা, ববিবাবেই যাব মনে কবেছি।"

ভট্টাচার্য মহাশয আবাব একটু চুপ কবিযা থাকিযা থামিয়া থামিযা বলিলেন — "তা — দেখ — এই যাবার আগে — নাঃ, — আব কাজ নেই। তুমি এখন যাও বাবা। আমাবও বেলা হোলো। মা জগদম্বা।"

অক্ষয এইবাব আর চুপ কবিযা থাকিতে পারিল না , অতি সঙ্কোচের সহিত বলিল, "যাবাব আগে কি আপনার সঙ্গে একবাব দেখা কববাব কথা বলছেন?"

ভট্টাচার্য মহাশয বলিলেন, "হ্যাঁ — , — না, তা আব কাজ নেই।"

ভট্টাচার্য মহাশয়েব মলিন মুখ ও তাঁহাব ব্যাকুলতা দেখিযা অক্ষযেব বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বলিয়া উঠিল, "আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, আমি সব জানি, আমি —"

ভট্টাচার্য মহাশয় অক্ষযের কথায বাধা দিয়া তাহার হাত চাপিযা ধরিয়া "বাবা —" বলিযা কাঁদিযা ফেলিলেন ; আব একটি কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহিব হইল না।

অক্ষয় তখন বলিল, "সে সব কথা আর আপনাব ব'লে কাজ নেই। এখন বলুন ত, এর উপায কি? আমি তারই জনাই বাড়ী এসেছি।"

ভট্টাচার্য মহাশয কাঁদিতে-কাঁদিতে বলিলেন, "আমি গবিব ব্রাহ্মণ, তোমবা বড়মানুষ, আমি কি বলব। কথাটা ত আব গোপন নেই , আমি যে আব মুখ দেখাতে পারিনে বাবা! উপায়ের কথা বল্‌ছ? একমাত্র উপায আছে। নিজেব হাতে মেয়েটার মুখে বিষ তুলে দেওয়া। তা ছাড়া আর কোন পথ নেই , তারপব সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমার আব ব্রাহ্মণীর আত্মহত্যা! বাবা, এ সংসারে ঐ বিধবা মেয়েটির মুখ চেয়েই আমরা বেঁচে ছিলাম। শেষে কি না এই হোলো। ব্রাহ্মণের মেয়ে — কি বলব বাবা! তোমরা গ্রামের জমিদার , তোমরা গরিবেব ধর্মবক্ষা কববে, না তোমরাই এমন কাজ করলে। অভিশাপ দেব না বাবা, কিন্তু বলতে পার, কি পাপে আমার এই শাস্তি।"

অক্ষয় বলিল, "তা বলতে পারিনে ; কিন্তু আপনারা উচিত প্রতিকার করলেন না কেন?"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "বাবা, তাতে কি হোতো ; — তাতে কি আমার এই জাতিনাশের প্রতিকার হোতো ; অপমান যে আরও বেড়ে যেত। না বাবা, সে দুর্মতি আমার হয় নাই।"

অক্ষয় বলিল, "বেশ। আমি কি করতে পারি, তাই বলুন। আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি তাই করব। এদেশে আর আমি মুখ দেখাব না , বিষয়-সম্পত্তি কিছু আমি চাই না। আপনাব জন্য কি করতে পারি, তাই বলুন ; সেই কাজ শেষ করে আমি জন্মের মত গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।"

ভট্টাচার্য মহাশয় কাতর কণ্ঠে বলিলেন, 'তোমার অপবাধ কি বাবা, তুমি যে সোনারচাঁদ ছেলে। তুমি আমাদেব জন্য তোমার পিতা — তোমাব জন্মদাতাকে অপমান কোরো না। না বাবা, এমন কাজও কোরো না। জান ত আমাদের শাস্ত্রে আছে পিতা ধর্ম, পিতা স্বর্গ।"

"ঠাকুর মশাই, আমার ধর্ম নাই, আমি স্বর্গও চাই না। সে দ্বার আমার কাছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এমন পিতাব পুত্র কিছুরই অধিকাবী নয়।"

"তা হ'লে তুমি কি কবতে চাও?"

"সেই কথাই ত আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

"আমি কি বল্‌ব বাবা!"

অক্ষয় একটু চুপ করিযা থাকিয়া বলিল, "দেখুন, আমি এক কথা বলি। আপনি সপরিবার কাশী চ'লে যান। যা খরচ লাগে, আমি আজই আপনাকে দিযে যাচ্ছি। তাবপব সেখানে আপনাদেব যা ব্যয় হবে, সে সব আমি দেব।"

"বাবা অক্ষয়, মনে কিছু কোরো না। আমার কন্যাকে যে ধর্মপথভ্রষ্ট কবেছে, তাবই অর্থে আমি কাশীবাস কবব , সে আমি পাবব না বাবা! সে কিছুতেই না।"

অক্ষয় বলিল, "তাব অর্থ নয় ঠাকুর মশাই! আমাব স্বোপার্জিত টাকা আছে। আমাব পরীক্ষার জলপানিব টাকা। তাই আমি আপনাকে দিতে চাচ্ছি। তবে আমি তাঁব পুত্র , এই ব'লে যদি আপনি আমাব সাহায্য না নিতে চান, তা হলে ত আর কোন উপায দেখি না। কিন্তু আপনাব পাযে ধ'বে বলছি, আমাব এই অনুবোধ বক্ষা করুন। পাপেব সামান্য প্রাযশ্চিত্ত — অতি সামান্য প্রায়শ্চিত্ত আমাকে কবতে দিন।" এই বলিয়া অক্ষয ভট্টাচার্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল।

অক্ষয় ও ভট্টাচার্য মহাশয যখন কথাবার্তা বলিতেছিলেন, তখন অন্দবে যাইবাব দ্বাবেব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর একজন তাঁহাদের কথা শুনিতেছিল। সে আর কেহই নহে — ভট্টাচার্য মহাশয়ের বিধবা কন্যা তারা। তাবা যে ঘবে ছিল, তাহাব পশ্চাতে বহির্বাটীর অঙ্গনে দাঁড়াইয়া এই সকল কথা হইতেছিল। তাবা প্রথমে দুইচাবিটি কথা অল্প শুনিতে পাইয়াছিল, তাহার পরই সে উঠিয়া আসিয়া দ্বারের পার্শ্বে দাঁড়াইযাছিল।

অক্ষয় যখন ভট্টাচার্য মহাশয়ের পা জড়াইয়া ধরিল, তখন তাবা উন্মাদিনীর মত বাহির হইয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "না, —না বাবা—না না, আমার পাপের প্রাযশ্চিত্ত আমিই করছি।" তাহার পরই সে মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল।

ভট্টাচার্য মহাশয় তাড়াতাড়ি যাইয়া কন্যাকে কোলে লইয়া বসিলেন , দেখিলেন তাহার সংজ্ঞা নাই। অক্ষয় দৌড়িয়া বাড়ীর মধ্যে যাইযা জল লইয়া আসিল এবং তারার মুখে জলের ছিটা দিতে লাগিল। কিন্তু সকলই বৃথা। তাবার ঘৃণিত, অভিশপ্ত প্রাণ বাহিব হইয়া

গিয়াছে। ভট্টাচার্য মহাশয় তারার মুখের দিকে চাহিয়া অবিচলিত স্বরে বলিলেন, "জীবনদানে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

তারার অকস্মাৎ দেহত্যাগে অক্ষয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে একদৃষ্টিতে তারার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভট্টাচার্য মহাশয় অক্ষয়কে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা অক্ষয়, আর কি দেখ্‌ছ, এখন বাড়ী যাও।"

অক্ষয় কাতরস্বরে বলিল "এ জীবনে আব নয়।"

"সে কি কথা অক্ষয়? তুমি বাড়ী যাবে না কেন?"

অক্ষয় বলিল, "আমার পাপেরও ত প্রায়শ্চিত্ত নেই।"

ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, "তোমার পাপ! তুমি ত কোন অপরাধই কর নাই বাবা।"

অক্ষয় তীব্র কঠোর স্বরে বলিল, "অপরাধ করি নাই? আপনি কি বলছেন ঠাকুর? আমি মহা অপবাধী। আমার অপরাধ — আমি বামকমল ঘোষের পুত্র। — এ অপরাধেরও প্রাযশ্চিত্ত নেই।" এই বলিযাই অক্ষয় উন্মাদের মত দ্রুতবেগে বাহির হইযা গেল।

*　　　*　　　*

তাহাব পবে অক্ষয যে কোথায গেল, কেহই এত কালের মধ্যে সে সন্ধান দিতে পাবিল না।

দেনাপাওনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপমায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন শৌখিন নাম ইতিপূর্বে কখনো শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল— গণেশ, কার্তিক, পার্বতী তাহার উদাহরণ।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ কবেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রাযবাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয়-আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। বামসুন্দব কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনোমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিছুতেই টাকার জোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া, বিক্রয় কবিয়া, অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয-সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিযাছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহসভায একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরেব হাতে-পায়ে ধরিয়া বলিলেন, 'শুভকার্য সম্পন্ন হইয়া যাক, আমি নিশ্চয়ই টাকাটা শোধ করিযা দিব।' বায়বাহাদুব বলিলেন, 'টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।'

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদেব যে মূল কাবণ সে চেলি পরিয়া, গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া, চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুরকুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে, তাহা বলা যায না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবের অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল, 'কেনাবেচা-দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি, বিবাহ করিয়া যাইব।'

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল, 'দেখেছেন মহাশয়, আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার।' দুই-একজন প্রবীণ লোক ছিল, তাহারা বলিল, 'শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।'

বর্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ একপ্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দ ভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ি যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল, 'তারা কি আর আমাকে আসতে দেবে না, বাবা।' রামসুন্দর বলিলেন, 'কেন আসতে দেবে না, মা। আমি তোমাকে নিয়ে আসব।'

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাইবাড়িতে তাঁর কোনো প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্যন্ত তাঁহাকে নিচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোনোদিন-বা মেয়েকে দেখিতে পান, কোনোদিন-বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া অপমান তো সহা যায় না। রামসুন্দর স্থির করিলেন, যেমন করিয়া হউক টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে, তাহারি ভার সামলানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুরবাড়ি উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা খাইতে হয়। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জন তাহার নিত্যক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষত শাশুড়ির আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে, 'আহা, কী শ্রী। বউয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়।' শাশুড়ি ঝংকার দিযা উঠিয়া বলে, 'শ্রী তো ভারি। যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী।'

এমন-কি, বউয়ের খাওয়াপরারও যত্ন হয় না। যদি কোনো দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোনো ক্রুটির উল্লেখ করে, শাশুড়ি বলে, 'ঐ ঢের হয়েছে।' অর্থাৎ বাপ যদি পুরা দাম দিত তো মেয়ে পুরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোনো অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

বোধ হয় কন্যার এই-সকল অনাদর এবং অপমানেব কথা বাপেব কানে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসতবাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থিব করিযাছিলেন, বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস কবিবেন, এমন কৌশলে চলিবেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষত বড়ো তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারও-বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল।

তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিলেন। এমন হইল যে, সংসারের খরচ আর চলে না।

নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পক্ককেশে শুষ্কমুখে এবং সদাসংকুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়। রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে, তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশ্যে দিনকতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল, 'বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।' রামসুন্দর বলিলেন, 'আচ্ছা।'

কিন্তু তাঁহার কোনো জোর নাই — নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে, তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন-কি, কন্যার দর্শন, সেও অতি সসংকোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে। তাই, বেহাইয়ের নিকট সে-সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভালো।

নোটকখানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব ও রাধামাধব দুই ভাইয়েব তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন, শহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে, সে-সম্বন্ধে অনেক আজগুবি আলোচনা করিলেন, অবশেষে হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, 'হাঁ হাঁ, বেহাই সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি, যাচ্ছি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি।' এমনি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিনখানি অস্থির মতো সেই তিনখানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবেমাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন, 'থাক্ বেহাই, ওতে আমার কাজ নেই।' একটা প্রচলিত বাংলা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, সামান্য কারণে হাতে দুর্গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারও মুখে আসে না — কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন, 'সে-সকল কুটুম্বিতার সংকোচ আমাকে আর শোভা পায় না।' মর্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায়বাহাদুর কোনো কারণমাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন, 'সে এখন হচ্ছে না।' এই বলিয়া কর্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসংকোচে কন্যার উপরে দাবি করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইবেন না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠানো বন্ধ করিল — তখন রামসুন্দরের মনে বড়ো আঘাত লাগিল, কিন্তু তবু গেলেন না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন, 'এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই, নহিলে আমি' — খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল, 'দাদা, আমার জন্যে গাড়ি কিনতে যাচ্ছিস?' বহুদিন হইতে তাহার ঠেলাগাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার শখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল, পূজার নিমন্ত্রণে যাইবার মতো তাহার একখানিও ভালো কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন, এবং সে-সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায়বাহাদুরের বাড়ি যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাঁহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলংকারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মতো যাইতে হইবে, এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর-কোনো ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কানে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাইবাড়িতে প্রবেশ করলেন। আজ তাঁহার সে সংকোচভাব নাই ; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনাব গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায়বাহাদুব ঘরে নাই, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সংবরণ করিতে না পারিয়া বামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে মেয়েও কাঁদে; দুইজনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তার পরে রামসুন্দর কহিলেন, 'এবার তোকে নিয়ে যাচ্ছি মা। আর কোনো গোল নাই।''

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তার দুটি ছোটো ছেলে সঙ্গে লইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন। পিতাকে বলিলেন, 'বাবা, আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?'

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্তি হইয়া বলিলেন, 'তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব। আমাকে তোরা আমার সত্য পালন করতে দিবি নে?' রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন ; ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায়, তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু তবু তাহারা জানিযাছে দেখিয়া তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল, 'দাদা, আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?'

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোনো উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল, 'পিসিমা, আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?'

নিরুপমা সমস্ত ব্যাপাব বুঝিতে পারিয়া কহিল, 'বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তা হলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বললুম।'

বামসুন্দব বলিলেন, 'ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। আর এ-টাকা যদি আমি না দিতে পাবি, তা হলে তোর বাপের অপমান। আর তোবও অপমান।'

নিরু কহিল, 'টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকাব থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ-টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না। তা ছাড়া আমার স্বামী তো এ-টাকা চান না।'

রামসুন্দর কহিলেন, 'তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না, মা।'

নিরুপমা কহিল, 'না দেয় তো কী কবব বলো। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেযো না।'

বামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোবের মতো সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই-যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোনো স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুব শাশুড়িকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয়, এই ওজরে সম্প্রতি বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত নিরুর সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়িকে সম্পূর্ণ দোষ দেওযা যায় না। শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম

নাই। দাসীরা যখন মাঝে-মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া, তাহাও সে করিত না। সে যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্তাগৃহিণীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে, এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ির সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোনো অবহেলা দেখিতেন, তবে শাশুড়ি বলিতেন, 'নবাবের বাড়ির মেয়ে কিনা। গরিবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না।' কখনো বা বলিতেন, 'দেখো-না, একবার ছিরি হচ্ছে দেখো-না, দিনে দিনে যেন পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্ছে।'

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়ি বলিলেন, 'ওঁর সমস্ত ন্যাকামি।' অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়িকে বলিল, 'বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখব, মা।' শাশুড়ি বলিলেন, 'কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।'

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না — যেদিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল, সেইদিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেইদিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়োবউ মরিয়াছে, খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমাবির্সজনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়োবউয়েব সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি বটিয়া গেল — এমন চন্দনকাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখনো দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায়বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায়, ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবাব সময় তাহার মেযের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে, সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি আসিল, 'আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত কবিয়া লইয়াছি, অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে।' রায়বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন, 'বাবা, তোমার জন্যে আর-একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।'

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

চিরকুমারী

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

তোমবা স্বামীপার্শ্ববর্তিনী, তোমরা আমার কথা বুঝিবে না। তোমাদের কৌমার্য সুখের ছিল, এখন বিবাহের সুখ ভোগ করিতেছ। স্বামীর বামার্ধভাগিনী, সন্তানপালিনী সুন্দরী আমার কথা বুঝিবেন না, হয়ত শুনিবেন না। আমি কুমারী। বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু বিবাহ হয় নাই। আমি দরিদ্রকন্যা, নিতান্ত শৈশবাবস্থায় পিতার মৃত্যু হয়। মাতা বিবাহের সম্বন্ধ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহাকেও কাল হরণ করিল। আত্মীয় কুটুম্ব কেহ নাই, দাঁড়াই কোথায়? গ্রামস্থ লোকে আশ্রয় দিল, আশ্রয় পাইলাম। দেখিতে দেখিতে বড় হইয়া উঠিলাম। কেহ কেহ বিবাহের সম্বন্ধ করিল, কেহ কহিল চাঁদা তুলিয়া বিবাহের ব্যয় নির্বাহ হইবে। দুই একজন দেখিতে আসিল — মস্ত ডাগর মেয়ে, মনস্থ হইল না। দুই একটা সম্বন্ধ আসিল, আমার মনস্থ হইল না। বিবাহ হইল না। কিছুদিন পরে বিবাহের আর কোন কথা উঠিত না। কুলীন কন্যার ফুল গাছের সঙ্গে যেমন বিবাহ হইত, আমার তাহাও হইল না। আমি জগতে একা আসিয়া একাই আছি। বিবাহের সুখ, বৈধব্যের দুঃখ, কিছু জানি না। আমি একাকিনী। পুরুষ যেমন একা থাকে তেমন নয়। আমি আপনাকে লইয়া আপনার প্রাণের মধ্যে একাকিনী আছি।

এমন করিয়া আর ভাল লাগে না। এমন করিয়া আপনাকে লইয়া আর থাকিতে পাবি না। আপনার কানে আপনার কাহিনী আর বলিতে পারি না। আমাব সুখ কি দুঃখ তাহা আমি জানি না — কেন না লোকে যাহাকে সুখ দুঃখ বলে, আমার কপালে তাহা কখন ঘটে নাই। এইমাত্র বুঝিতেছি যে এখন মন কেমন অস্থির হইয়াছে। এখন আর ঘরে বাঁধা, এ জগতে বাঁধা থাকিতে ইচ্ছা হয় না। ইচ্ছা হয় আকাশময় উড়িয়া বেড়াই, গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। এই অস্থির প্রাণের অস্থিব কথা তোমরা শুনিবে কি? তোমরা সংসারারণ্যে বিচিত্র উপবন রচিত করিয়া, জগতের সুখসৌন্দর্য, স্নেহপ্রণয় উপভোগ করিতেছ, তোমরা সব যুগল যুগল, যে একা সেও হৃদয়মধ্যে আর কাহার মূর্তি ধ্যান করে, তোমরা আমার এ কথায় মন দিবে কি? তোমাদের যে সুখ, সে সুখ আমার নাই, তোমাদের যে দুঃখ আমার সে দুঃখ নাই, তোমাদের যে আশা, আমার সে আশা নাই, তোমরা আমার কথা শুনিবে কি? আমার মন আমি বুঝি না, তোমরা যদি আমার কথা শুন, তবে আমি আপনার মন বুঝিতে পারি। তোমরা যদি আমার কথা শুনিয়া অশ্রুমোচন কর, তবে আমি বুঝিব যে আমি এই আজন্মকাল দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছি। আর যদি তোমরা হাস, তাহা হইলে আমি আমার এই অবস্থা সুখের বলিয়া জানিব। তোমরা কি আমার কথা শুনিবে না?

এ জগতে কেন আসিলাম? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি হইল? আমি মরিলে কি ক্ষতি ছিল? আমি মরিলে কেহ ত কাঁদিবে না। যাহার থাকিয়া কোন কাজ নাই, সে আর থাকে কেন? প্রকৃতির এই যে চিরন্তন নিয়ম, পরে পরের জন্য ভাবিবে, পরে পরের জন্য কাঁদিবে, সে নিয়ম ভঙ্গ করিবার আমার কি অধিকার? কালের যে স্রোতে সব ভাসিয়া যায়,

অনাদি কাল হইতে বহমান এই খরতর স্রোতে আমাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় না কেন? আমি ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড, কালের আবর্ত চক্র আমায় গ্রাস করে না কেন?

দেখ, আমারও এককালে রূপযৌবন ছিল — সৌন্দর্য, লাবণ্য সব ছিল। আমি মরুভূমে ফুটি নাই। আমাকে পরিগ্রহ করে, এমনও দুই চারিজন ছিল, কিন্তু আমার বিবাহে মন সরিল না। দেখিলাম, আমাকে বিবাহ করিয়া কেহ সুখী হইবে না। একবার কেবল চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল, একবার আমার সঙ্কল্প বিচলিত হইয়াছিল। যৌবন নদীব কূলে কূলে জল, সেই সময় একবার কেবল প্রণয়েব তরঙ্গে জীবনের মূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। তাহার পব, সে ভ্রমও ভাঙ্গিয়া গেল। আমি সব কথা বলিতে বসিযাছি, সে কথাও বলিব। তোমরা বুঝিয়া দেখ, আমাকে পাপ স্পর্শ করিয়াছে কি না।

একদিন প্রাতে আমি পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলাম। পথে একজন যুবাপুরুষ দাঁড়াইয়া ছিল। সে আমাকে চাহিয়া দেখিল, আমিও একবাব চাহিলাম। চারি চক্ষে মিলিল। তখনি চক্ষু নত করিলাম। তোমাদের প্রণয় কেমন আমি তাহা জানি না, আমি কখন প্রণয় সম্ভাষণ করি নাই, কেহ আমাকে প্রেমের কথা বলে নাই। কখন কোন পুরুষকে দেখিয়া আমার কোনরূপ চিত্তবৈকল্য হয় নাই। গঙ্গাস্নানেব পথে মজিলাম। আর কিছু নয়, একবার দেখামাত্র। তাহার পর সব ভুলিয়া গেলাম। অবশিষ্ট পথ যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল। সঙ্গিনীগণ কি বলাবলি করিতেছিল, কিছু শুনিতে পাইলাম না। সম্মুখে স্বর্গ হাসিতেছিল। প্রস্ফুটিত পারিজাত মন্দারেব সৌরভে প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। গঙ্গাজলে নামিতে বোধ হইল মন্দাকিনীর জলে অবগাহন করিতেছি। হবি! হরি! চক্ষেব মিলনে এত সুখ! না জানি হৃদয়ের মিলন কেমন! গৃহে ফিরিতে পথে আবাব সেই মূর্তি দেখিলাম। আবাব! এবাব চাহিতে চমক হইল, স্বর্গস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিলাম সেই দেবতুল্য চক্ষে ইন্দ্রিয়-লালসাব কটাক্ষ। গৃহে আসিয়া শুনিলাম সে পশুবৃত্ত পাপিষ্ঠ, যুবতীদিগের সর্বনাশের চেষ্টায় ভ্রমণ করে। স্বর্গ চুরমার হইয়া গেল। আব আমি পথে বাহিব হইতাম না।

প্রণয় কাহাকে বলে? তোমরা পতিব পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, পতিমুখ দেখিযা যখন আনন্দে ভাসিতে থাক, সেই সময় কি প্রণয় অনুভূত কব? আমি ত প্রণয় জানি না, তবে সেই চক্ষে চক্ষে সম্মিলন, সেই অননুভূতপূর্ব মোহের আবেশ, সেই স্বর্গচিত্র মনে পড়ে বটে। তাহাই কি প্রণয়? ধিক্ এমন প্রণয়ে! যাহাকে স্পর্শ করিতে হইলে ঘৃণা হয়, তাহাব সহিত আবার প্রণয কিসের? হয়ত প্রণয় তাহাকে বলে না। হয়ত যেটুকু চক্ষে চক্ষে মিলিত হয়, সেইটুকু প্রণয়। যে কয় মুহূর্ত চক্ষু মিলন হয়, সেই কয় মুহূর্ত উভয়ে উভয়ের উপযোগী। সেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, দুর্বৃত্ত পুরুষের হৃদয়ে যেটুকু দেবভাব ছিল, সেইটুকু আমার প্রাণের সহিত মিশিযা কয়েক মুহূর্ত নন্দনকাননে বিচরণ করিয়া থাকিবে। নহিলে, যাহার ছায়া মাড়াইতে নাই, সে আমার চিত্ত হরণ করে কি রূপে?

তোমরা কি মনে কর আমি বলিতে পারি না, কিন্তু আমি ভাবি যে রমণীর প্রণয়ের প্রতিদান পুরুষে সম্ভবে না। এ কথা বলাতে গৌরব কিছু নাই, বরঞ্চ অগৌরব আছে। আমাদের প্রকৃতি পুরুষের অনুরূপ হইলে কি ক্ষতি ছিল? পুরুষে যেমন ভালবাসে, আমরা সেইরূপ ভালবাসিলে কি ক্ষতি ছিল? আবার পুরুষেরা বলেন যে বমণী সহজে ভোলে। হায়! পুরুষে আপন মন বুঝিতে পারে না, আমাদের কি বুঝিবে!

এখন আর সে কাল নাই। যৌবনের ফুল ঝরিয়াছে, কোন দিন জীবন বৃক্ষের মূল শুকাইবে। এখন আর প্রণয়ের কথায় কাজ কি? যখন যৌবন ছিল, তখনই প্রেমের চিন্তাকে কখন মনে স্থান দিই নাই, এখন আর সে কথায় কাজ কি? লোকে মনে করে যাহার যৌবন নাই, তাহার প্রণয়ের কথায় কোন অধিকার নাই। কেহ কি বুঝে না যে অতৃপ্ত লালসা চিরকাল সমান থাকে, কালক্রমে

বাড়ে বই কমে না? আমি শুধু প্রণয়েব কথা বলি না, কেন না সে তৃষা আমাকে কখন দহন করে নাই, একবার স্পর্শ করিয়াছিল মাত্র। মানুষের আকাঙ্ক্ষা অপরিহার্য, বাসনা অতৃপ্য। যদি বয়সের সঙ্গে সব ফুরাইত, তবে কবির কল্পনা কোথায় থাকিত? কবি বার্ধক্যে বালকের অমৃতময় হাসি কিরূপে কল্পনা করিত? জগতে স্নেহ আছে, আশা আছে, ধর্ম আছে, সব কি বয়সের সঙ্গে যায়? আমি কিছু চাহি না, আমি কিছু পাই নাই। জগতে আমাব জন্য কিছু নাই, আর কোথাও কি আমার জন্য কিছু নাই? আছে কি না, তাহাও এতদিন জানিবার কোন ইচ্ছা ছিল না, ভাবিতাম কোথাও কিছু থাকিলে আপনি জানিতে পাইব। সে নিশ্চেষ্টতা এখন গিয়াছে। এখন জানিতে ইচ্ছা করে। আমি যদি কোথাও কোন সুখ দুঃখেব ভাগিনী না হইব, তবে আমি এই ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড পূরিয়া রাখিয়াছি কেন? আমি সরিলে তো অপরের স্থান হইত। ইচ্ছা হয় আকাশের জ্যোতিস্তরঙ্গে আরোহণ করিয়া অন্য কোন গ্রহে ভাসিয়া যাই, দেখি সেখানে আমার ভাগ্যে সুখ দুঃখ কিছু আছে কিনা। নিয়তির চক্র কাহাকেও পেষণ করে, কাহাকেও আকাশে তুলিয়া লইয়া যায়, আমাকে ফেলিয়া গেল কেন? আমার ভাগ্যে জীবলোকের নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিল কেন? ব্যতিক্রম মাত্রেই কি দুঃখময়? তাহাত জানি না। আমি ত বলিতেছি, আমার এ সুখ কি দুঃখ তাহা আমি জানি না।

ইচ্ছা করে একবার খুঁজিয়া দেখি, একবার আকাশ পাতাল তন্ন তন্ন করিয়া দেখি, কোথাও আমায় কেহ চিনিতে পাবে কি না। কে জানে, কোথায় কি আছে? আকাশের কক্ষায কত গ্রহ, কত উপগ্রহ, কত নক্ষত্র আছে, সেই বিশাল আলোক সমুদ্রের মধ্যে এ হৃদয় আলোকিত কবিবাব জন্য কি একটি কিবণ নাই? কোথাও কি কোন জ্যোতির্ময় দিব্যমূর্তি আমার অপেক্ষায় বসিযা নাই? তোমরা বিদ্রূপ করিও না। যে যাহাব পথ চাহিয়া থাকে, সে যৌবন চায় না। যৌবন এক দণ্ডেব জোযার, প্রণয় চিরবাহিনী স্রোতস্বিনী। আকাশে কোথাও কিছু না থাকে, পাতালেও কি নাই? অন্ধকারের কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিযা দেখি — কোথাও কোন নিভৃত স্থানে আমার জন্য অর্ধ হস্ত পরিমিত স্থান নির্দিষ্ট নাই কি? অন্ধকারে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেহ কি আমার নাম ধবিয়া ডাকে না? না ডাকে ক্ষতি কি? এতদিন ত কেহ ডাকে নাই, কেহ কখন না ডাকিলেই বা আমার কি ক্ষতি? তবু খুঁজিতে ইচ্ছা করে। মন কিছুতেই বুঝে না। জগতে কিছুই নিষ্প্রয়োজন নহে, কেবল কি আমি বিনা আবশ্যকে জন্মগ্রহণ করিয়াছি? যে নিয়মে বিশ্ব বদ্ধ, সে নিয়মের এমন ব্যভিচার কেন হইবে?

যুবতীর প্রণয, মাতার স্নেহ কেমন? প্রণয়ের সম্ভাষণ কেমন, সন্তানের জন্য অগাধ সাগব তুল্য স্নেহ কেমন? এক হৃদয়ের জন্য অন্য হৃদযের তৃষা কোথা হইতে আইসে? একে অপরের মুখ চাহিয়া থাকে কেন? আমি কাহারও মুখাপেক্ষা করি না, তাহাতে ত আমি সুখ দুঃখ কিছু বুঝিতে পারি না। না পারি, এ চিত্তচাঞ্চল্য ত দূর করিতে পারি না। মায়ার মোহময় বন্ধন হইতে কে আমায় অন্তরিত করিল? নিয়মের শৃঙ্খলে বিশ্ব চরাচর কে বাঁধিল? গ্রহগণ কেন সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে? বিশ্বের ভিতর কেহ স্বতন্ত্র থাকে না কেন? একে কেন অপরের উপর নির্ভর করে? কেহ কি আমায় স্পর্শ করিবে না, কেহ কি আমার মুখ চাহিবে না?

তোমরা একবার আমায় বল, আমি শ্রবণ ভরিয়া শুনি। বল, তোমরা প্রণয়ে কি সুখ পাও, স্নেহে কি সান্ত্বনা পাও? আমার এ দুরন্ত চিত্ত বশ করিতে পারিলাম না। মানুষের নিকট মন গোপন করিয়াছি, আপনার নিকট হইতে গোপন করিব কিরূপে? হয়ত এ হৃদয়ে প্রেমের উৎস অথবা স্নেহের প্রবাহ লুক্কায়িত ছিল, নিরুদ্ধ করিল কে? আমি নদী প্রবাহে জলবিন্দু, স্রোতে মিশিলাম না কেন?

বুঝি এখানে আমাকে আপনার বলে, এমন কেহ নাই। বোধ হয় আমি আর এক জগতের জীব, এখানে ভ্রমক্রমে নীত হইয়াছি। এখানে ত কেহ আমার কোন সংশয় ভঞ্জন করিল না। এ জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইব, দেখিব আমার জন্য কি কোথাও কিছু নাই। মেঘ হইতে দূরে, গ্রহ হইতে দূরে, আকাশ হইতে দূরে, নক্ষত্র হইতে দূরে গমন করিব। যেখানে স্থল, জল, আকাশ কিছুই নাই — কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না, চক্ষে দৃশ্য প্রতিভাত হয় না, নিঃশ্বাস বহে না, ত্বক স্পর্শ অনুভূত করে না, মন অচল হয়। সেই শব্দশূন্য, আলোকশূন্য, অন্ধকারশূন্য, বায়ুশূন্য, কালশূন্য প্রদেশে একেলা দাঁড়াইয়া রহিব, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিব সেখানে কোন জ্যোতির্ময় মূর্তি আগমন করে কি না, সেই চির নীরবে কোন শব্দ বাহিত হয় কি না। সেখানে চিত্তের অস্থৈর্য থাকিবে না, সেখানে অনন্তকাল আর কাহারও প্রতীক্ষা করিতে আপত্তি কি? এখন এই দুরন্ত চিন্তাস্থিরতা আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে, তখন একমাত্র চিন্তায় পরিণত হইবে। সুদীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে কষ্ট হইবে না, কারণ কাল পরিমাণের কোন উপায় রহিবে না। ধীর, শান্ত চিত্তে রজনী যেরূপ নীরবে দিবসের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ আপন অভিলষিতের পথ চাহিয়া থাকিব। প্রণয় অথবা স্নেহ, ধর্ম অথবা শান্তি কি আসিবে, কে আসিবে, তাহা জানি না, কিন্তু এ হৃদয়ের শূন্য পূরিবে। যে আমার জন্য নির্মিত, সে আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে। উভয়ের দীর্ঘস্থায়ী উদ্বেগ ঘুচিবে। সে দিন কি আসিবে?

তবে কি ইহজগতে আমার জন্য স্থান নাই?

দিদিমা

শরৎকুমারী চৌধুরানী

নামাবলীখানি গায়ে দিয়া আমাব দিদিশাশুড়ী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেন তখন বেলা ৮টা। আমি পানের বাক্স লইয়া পান সাজিতাম। তিনি গঙ্গাজলেব ঘটিটি ও নামাবলীখানি যথাস্থানে রাখিয়া একটা বড় পিতলের ঢাকা খুলিয়া আমাদের খাবার দিতেন। তাঁহার আদেশে পান সাজা রাখিয়া আমাকেও জলযোগ করিতে হইত। "আহা তাড়াতাড়ি করে আসছি, আহা তোদের কত ক্ষিদে পেয়েছে।" খাবার দিয়া তসব কাপড় ছাড়িয়া তিনি বাজারের হিসাব পত্র লইতেন ও তাড়াতাড়ি "ঝোলের আনাজ" লইয়া রান্নাঘরের উঠোনে যেখানে ঝি মাছ কুটিতেছে সেখানে গিয়া, "ও ঝি ঝোলের মাছটি আগে ধুয়ে দাও তো মা," বলিয়া ঝিকে তাড়া দিতেন।

গযলা বৌ-এব কাছে দুধ মাপিয়া লইয়া তাহার ঘরের কুশল সংবাদ লওয়া হইলে বলিতেন, বাচ্ছাকাচ্ছার দুধটুকু ভাল দিস্ মা — একটু, সকাল করে আসিস গো।" দুধের কড়া চড়াইয়া দিয়া "মাছের ঝোল নামালে গা?" বলিতে না বলিতে স্কুল আফিসের যাত্রীরা "দিদিমা, মা, ভাত," বলিয়া কেহ গামছা লইয়া চৌবাচ্ছায় ঝাঁপাইযা পড়িতেন কেহ বা পিঁড়িতে বসিয়া দিদিমাব কাছে তেল চাহিয়া লইয়া তেল মাখিতেন ও গল্প করিতেন। দিদিমা "এই যে ভাত হয়েছে" "বামন মেয়ে ভাত বাড় মা" — "এই নাও দাদা তেল" — বলিয়া তেলের বাটী দিতেন, পরে খোরায় খোবায় দুধ জুড়াইয়া আহারের স্থলে লইয়া রাখিতেন। বড় বড পিঁড়ি পাতিয়া একতলার দালানে আহারের ঠাঁই হইয়াছে — একে একে সকলে আহার করিতে আসিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের খবর কি দিদিমা?" কেহবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাঁড়ারের কিছু আনাতে হবে কি?" দিদিমা হাসিমাখা মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া স্কুল আপিসের তাড়নাব সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তভাবে হাসি গল্পের সহিত "বাবুদের" স্নানাহার সমাধা হইলে দিদিমা সকলের হাতে হাতে পান দিলে সকলে বাহির বাড়ী চলিযা গেলেন। তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া দিদিমা অবশিষ্ট দুধ জ্বাল দিতে লাগিলেন। কাহারও ঘন কাহারও বক্ষা বাটী বাটী রাখা হইল। দুধ জ্বাল দেওয়া শেষ হইলে নিরামিষ রান্নার বক্‌নোটী চড়াইয়া তরকারী কুটিয়া চাল ধুইয়া নিরামিষের সমস্ত যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইলেন। এক একদিন আমি 'তরকারি কুটিব' বলিয়া ধরিয়া বসিলে 'আচ্ছা তুমি এই আলু পটলগুলি ছাড়াও' বলিয়া বঁটী ছাড়িয়া দিতেন। ইতিমধ্যে বাহির বাড়ি হইতে ভৃত্যেরা বারম্বার আসিতেছে ও "বড় বাবুর জামাটা ছেঁড়া আর একটা দিন্, — মেজবাবু ও কাপড় পরবেন না — ধোয়া বার করে দিন, — ছোট বাবুর এ চাপকানের বোতাম নেই সেরে দিতে হবে, — পান কই, — জল দিয়ে যান;" এই প্রকার কত কি বাহানা লইয়া দিদিমাকে ব্যস্ত করিতেছে। দিদিমার বিরক্তি নাই, ধীরভাবে সকল ফরমাস সম্পন্ন করিতেছেন। তখন তিনি রন্ধনে নিযুক্ত, এজন্য বাক্স, পেঁটরা, ধোয়া কাপড় চোপড় কিছুই স্পর্শ করিবেন না, চাবি দিয়া আমাদের বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিতেন। আমরা

তাঁহার উপদেশ মত কাপড় চোপড় বাহির করিয়া দিতাম। ভৃত্যদের সম্মুখে আমরা বাহির হইতাম না, ভৃত্যেবা বাড়ীর ভিতর প্রায় আসিত না, যখন আসিত সাড়া পাইলেই ঘরে লুকাইতাম। ঘোমটা দিয়া শ্বশুর ভাশুরের সম্মুখে কখনো কখনো যাইয়া জল কি পান দিয়া আসিতে হইত ; কিন্তু ভৃত্যদের কিছু দিতে হইলে দাসী দ্বারা বা ছোট মেয়ের দ্বারা পাঠাইতাম। ভৃত্যেরা একতলার ভিতর বাড়ীতে আনাগোনা করিত, দোতালায় কদাচিৎ যাইত। আমরা সকালে আসিয়া একতলার ভাঁড়ারে ঢুকিতাম — বান্না ও ভাঁড়ার ঘর পাশাপাশি সুতরাং আমাদের গণ্ডী রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে। তার বাহিরে যাইতে হইলে দাসী হাঁকিত "সরে যাও বৌঠাকরুণ যাচ্ছেন।" সময়ের কি বিচিত্র গতি আজ — আমাদেরই বাড়ী একটিও দাসী নাই ভৃত্যেরাই সকল কার্য্য নির্বাহ করে। যা হোক্ বাবুবা স্কুল আপিস চলিযা গেলে আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

বাহির বাড়ীতে ভৃত্যেরা "রাম রাজত্ব" কবিত। দাসীরা কাজ সারিযা তেল মাখিতে বসিত। যেমন যেমন আহার হইয়া যাইত — অমনি বাসন ধুইয়া ফেলিতে হইত। "এঁটো চণ্ডী" দেবতাটী বড়ই "বিঘ্নকারিণী"। বাড়ীতে যে, বেলা ২টা পর্যন্ত "শকড়ি" পড়িয়া থাকিবে তার যো নাই — তা হলে "এঁটো দেবী" ত্বরিত গতিতে গিয়া স্কুল আপিসের যাত্রীদের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবে — সুতরাং বাসন কোসন পরিষ্কার না করিলে দাস দাসী কেহই অবসর পাইত না। বাড়ীর মধ্যে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও দাসীরা বাসন মাজিতে ও স্নান করিতে বাহির বাটীতে যাইত। সে সমযটা তাহারা নানা হাস্যালাপে বাড়ীটা মুখবিত করিয়া তুলিত।

ওদিকে যেমন ভৃত্যদের সমুখে আমাদেব বাহিব হইবার নিয়ম ছিল না দাসীবাও তেমনি বাবুদের সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহিত না ; এক হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কাজ কবিত। বাবুদেব সন্নিকটে জল কি পানটি পর্যান্ত লইয়া যাওয়ার তাহাদেব অধিকার ছিল না, তাই দিদিমার অনুপস্থিতিতে আমরা বৌয়েরা বাবুদের সম্মুখে যাইতাম। সেখানে কোন ভৃত্য উপস্থিত থাকিলে সে অমনি সরিয়া যাইত। ভৃত্যের সমুখে আবশ্যক হইলেও কোন বৌ ঘোমটা দিয়াও স্বামীকে জল বা পান কিছুই দিত না। তিনি যে কোন প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তখন আমাদের বাড়ীর অবিবাহিত মেয়েবা সবে মাত্র বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ৮টার সময় — হয়ত দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া আসার পূর্ব্বেই ডাল, আলু ভাতে, ডিমসিদ্ধ, মাছভাজা, মাখন, কাঁচা দুধ ও মিষ্ট দিয়া আহার সমাধা করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া সদর দরজায় গাড়ীর অপেক্ষায় বই সেলেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে — তাহারা ঘরের কোন কাজ করিতে অবসর পায় না।

দশটা সাড়ে দশটা বাজিলেই দিদিমা রান্নাঘরে আমাদের ভাত দেওয়াইতেন। রান্নাঘরটা খুব বড় ছিল ; একদিকে আমিষ রান্না ও আর এক দিকে নিরামিষ বান্না হইত। এ সকল হইয়াও যথেষ্ট স্থান ছিল। আমরা সেখানেই প্রায় আহার করিতাম। "আশ হেঁসেলে" প্রায় এইরূপ রান্না হইত। মুগ, খাঁড়ীমসুর — হয় পেঁয়াজ দিয়া না হয় টক দিয়া ও কখনো হাঁসের ডিম সিদ্ধ বা ভাজা বা ডালনা, লাউ কাঁকড়া বা লাউচিংড়ি, আলু পটল ভাজা, মাছভাজা, মাছের অম্বল, কখনো কখনো চিংড়ী মাছ দিয়া পুঁইশাক চচ্চড়ি, কুমড়ো চিংড়ী এই সব অদল বদল করিয়া হইত। অড়হর, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল দিদিমা রাঁধিয়া খানিকটা 'ওবেলার জন্য' রাখিতেন ; বাবুদের গরম করিয়া দেওয়া হইত।

দিদিমার রান্না খাবার জন্য বাড়ির সকলে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই প্রত্যহই দিদিমা কিছু কিছু ব্যঞ্জন স্বতন্ত্র পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেন। দিদিমাকে অনেক রাঁধিতে হইত — বাড়ীতে বিধবা ৩/৪ জন ছিলেন — দিদিমাই সকলের রাঁধিতেন — তাঁহারা

যোগাড় দিতেও বড় একটা অবসর পাইতেন না। তাঁহাদের আহ্নিক পূজা সারিতে ১১/১২ টা বাজিত। তাঁহারা নিজেদের ঘরের কাজকর্ম্ম, পুত্র পৌত্রাদির পরিচর্য্যা করিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন। আর সকল সময় তাঁহারা সবাই কলিকাতার "বাসায" থাকিতেনও না। দুজন বা দুমাস আছেন — আবার দেশে গেলেন — সেখানে বা দুমাস রহিলেন অন্যেরা আসিলেন এইরূপ চলিত। বধূরা কখনো কখনো দেশে বা পিত্রালয়ে যাইত — কেবল "বাবুরা" পূজাব সময় বা স্ত্রী দেশে থাকিলে কোন এক শনিবারে দেশে যাইতেন। বাবুদেব মা ছযমাস দেশে থাকিলেও কেহ দেশে যাইতেন না — কিন্তু স্ত্রীটি ছয় দিনেব জন্য গেলেও বাবুর অমনি মাছ ধরা বা আম খাওয়াব সখ্ পড়িয়া যাইত। শুনিযা দিদিমা মুচকি মুচকি হাসিতেন — পাছে কেহ লজ্জা বোধ করেন তাই নিজে উপযাচক হইযা বাড়ীর ছেলেদেব দেশে পাঠাইতেন। অনেক সময় বধূরা পিত্রালয়ে থাকিলেও যদি শ্বশুর শাশুড়ী জামাতাকে লইতে লোক না পাঠাইতেন — তবে দিদিমা গঙ্গা স্নানেব ফেবত হয় ত কুটুম বাড়ী গিয়া ইঙ্গিতে জামাই লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়া আসিতেন। বলিতেন, "আহা এই ওদের আমোদ প্রমোদের সময় — এবপর যখন সংসার ঘাড়ে পডবে তখন কি আর ধূলো খেলার অবসব পাবে।" কিন্তু শ্বশুর বাড়ী শনিবার গিয়া সোমবার ভোবেই ফিরিতে হইত — অথবা কখনো কখনো ববিবার সকালেই আসিবার আদেশ দেওয়া হইত — বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে — রবিবাব থাকিতে দেওয়া হইত না। ছেলেদের পরীক্ষার সময় এ বিষয়ে কর্ত্তা বড অধিক কড়াক্কড করিতেন — কিন্তু দিদিমা অত ভাল বাসিতেন না। তিনি বলিতেন "আহা বৌ এব মুখখানি মধ্যে মধ্যে না দেখলে ওদের পড়া শুনায় উৎসাহ হবে কেন।" দিদিমা যে ব্যবস্থা কবিতেন তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি কবিতেন না, সকল কার্য্য তাঁহার অনুমতি ও উপদেশ লইয়াই নিষ্পন্ন হইত। এমন কি প্রত্যেকে প্রত্যহ আপিস স্কুল যাত্রার সময "দিদিমা আসি —- পিসিমা আসি, জেঠাইমা আসি," ইত্যাদি বলিযা তবে যাইতেন। দিদিমা হাতের কাজ রাখিযা প্রত্যেকের সমুখে আসিয়া "এস দাদা, এস বাবা" বলিয়া শুভ কামনা করিতেন।

দিদিমা বাঁধিতেন — আমরা ভাত খাইতাম। বাড়ীর অনেক বধূ তাহাব শাশুড়ীর সহিত কথা কহিত না — কিন্তু দিদিমার সহিত কথা কহিত। দিদিমা বলিতেন আমার সহিত কথা কহিতে আছে। যদি কোন বধূব কাজে বা কথায কোন ক্রটি হইত —- দিদিমা একটু অল্প হাসিয়া বলিতেন "ছিঃ ও কথা বল্‌তে নাই — অথবা এমন কাজ আর কোর না।" দিদিমাব এইটুকু কথায় আমরা যেরূপ শাসিত হইতাম — অন্য গৃহিনীদেব সারাদিন বকুনির ঝড় বহিলেও সেরূপ হইত না — বরং বকুনির চোটে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিতাম। বেচারা দিদিমা এমন অবস্থায় বড বিপদে পড়িতেন। গৃহিনীকে বলিতেন 'আহা, ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি, আহা আর কববে না।" বধূকে বলিতেন, "কাঁদতে নেই — আমরা না শেখালে তোমরা শিখবে কেন দিদি।" আমবা বলিতাম "আপনি বারণ করিলেই ত আমরা শুনি — তবে উনি অত বকেছেন কেন।" দিদিমা বুঝাতেন, 'আহা ওর শোক তাপেব শরীর" কখনো বলিতেন "আহা ও একটু বাগী মানুষ — সকলেব কি স্বভাব সমান হয় — তা বলে বৌমানুষকে কাঁদতে নেই সব সইতে হয।' আমাদের ভাত খাওয়ায় সময় দিদিমা নানা প্রকার গল্প করিতেন, যাহার যে ক্রটি সংশোধন করিতেন। যে বধূ যে নিরামিষ তরকারী ভালবাসে তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই তরকাবীটি রাঁধিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। "দিদি বসে খাও — এই ঝালেব ঝোল হল বলে"। প্রত্যেককে দিদিমা সমভাবে যত্ন করিতেন। প্রত্যেককেই মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমাদের আহার শেষ হইলে "বামন মেয়ে" লোকজনদের ভাত দিত — সে আমাদের স্বজাতি, তাই দিদিমার হাতে ব্যঞ্জনাদি খাইত। কিন্তু সিদ্ধ চাল খাইত বলিযা সে তাহার ভাত

নিজে স্বতন্ত্র রাঁধিত। দিদিমা ও অন্য গৃহিনীরা আতপ চাল খাইতেন — অন্য গৃহিনীরা রাত্রে লুচি ও আলুনি ভাজা খাইতেন, কিন্তু দিদিমা দুগ্ধ ফল ও সন্দেশ ছাড়া অন্য কোন জিনিষ খাইতেন না। যদি কোনদিন লুচি খাইতে সাধ হইত তবে দুপুর বেলা ভাতের সহিত খাইতেন। দিদিমার আহারাদি শেষ হইতে বেলা প্রায় ২।।০ টা বাজিয়া যাইত। ইতিমধ্যে আমরা পুতুল খেলিয়াছি — কেহ বা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি — এবং যে কেহ একজন নজর রাখিয়াছি দিদিমা কখন আহারে বসেন। দিদিমার আহারের সময় প্রায় আমি চেলির বা গরদের শাড়ী পরিয়া দুধটুকু জলটুকু দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম। সে সময়ে আমিই বাড়ির সর্ব কনিষ্ঠ বধূ। সুতরাং পাকাচুল তোলার ভার আমার ছিল। আহারান্তে দিদিমা যখন দোতলার দালানে আঁচল পাতিয়া একটু "গড়াইতেন", তখন পাকাচুল তুলিতাম। দিদিমা বলিতেন ; আহা নাতবৌয়ের হাত যে — মাথায় হাত দিলেই ঘুম পায়। বলিতে না বলিতেই দিদিমা নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিতেন। নাতবৌ এর হাতের গুণে যে এত শীঘ্র নিদ্রা কর্ষণ হইত তা ঠিক নয়। রাত্রি ১১/১২ টার সময় দিদিমা শয্যাগ্রহণ করিতেন; আর ২/৩ টায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। এক ঘুমের পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আর শয্যায় থাকিতেন না। তপ জপে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং নিদ্রার দোষ কি! আদেশ ছিল যে নিদ্রাকর্ষণ হইলেই যেন আমি উঠিয়া যাই। দিদিমা বলিতেন — "আহা ওরা ছেলে মানুষ খেলা করবে, ওরা কি চুপ করে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকতে পারে।" এক ঘন্টার মধ্যে দিদিমার নিদ্রাভঙ্গ হইত , দিদিমা একবাটী দুধ গরম করিয়া নিজের হাতে আমাকে খাওয়াইতেন। পরে চুল বাঁধিয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে পাঠাইয়া সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। এ সকল হইয়া গেলে নিজে কাপড় ছাড়িয়া মালা হাতে করিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে আমার রামায়ণ বা মহাভাবতের কোন স্থান হইতে পড়িয়া শুনাইতে হইত। কখনও বা কোন প্রতিবাসীর বা আত্মীয় স্বজনের বাড়ী কথকতা হইতেছে সন্ধান পাইলে তাঁহার দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। যে সময় দিদিমা চুলবাঁধা প্রভৃতির ভার অপর কোন গৃহিনীর উপর দিয়া মালা হাতে করিয়া তিনটাব পূর্ব্বেই "কথা" শুনিতে যাইতেন। সন্ধ্যার সময় দিদিমা সন্ধ্যা বন্দনা সারিয়া লুচি রুটি করিতেন। রাঁধুনি তরকারী রাঁধিত। গৃহিনীরা নিজেরা ময়দা মাখিতেন। লুচি ভাজা ও রুটি সেঁকার ভাব দিদিমাই গ্রহণ করিতেন , — দাস্ দাসী ব্যতীত রাত্রে প্রায় কেহই ভাত খাইত না।

সকলকে আহারাদি করাইয়া প্রাতঃকালের জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া এবং কিছু কিছু তরকারি কুটিয়া রাখিয়া নিজে যৎ-কিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার পর দিদিমা যখন বিছানায় যাইতেন প্রায় রাত্রি ১২টা বাজিত। আবার ৩টা বাজিলেই প্রায় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া যোড়হাত করিয়া ধ্যান করিতেন। ভোর ৪টার সময় হাত মুখ ধুইয়া গো-সেবা করিতেন। ৫টার সময় ঘটী, নামাবলী, তসর কাপড় ও পুষ্প পাত্র হাতে করিয়া "ওমা বামন মেয়ে ও দিদি নাতবৌ ওঠো দিদি — বৌমা ওঠো মা বেলা হয়েছে — আমি তবে এখন আসি," বলিয়া গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইতেন। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত — শুনিতাম বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছে —

হরি কোথা হে — তুমি কোথা হে
ও বিপদের কাণ্ডারি — তুমি কোথা হে —?

চাটুয্যে-সংবাদ

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

আশা করি আমার প্রিয় পাঠকেরা — আমার চীনযাত্রার জাহাজী সঙ্গী চাটুয্যেকে বোধ হয় ভুলে যান নি। পূজনীয় কবিও যখন একদিন তাঁর সম্বন্ধে কিছু শুনতে বা জানতে চেয়েছিলেন, তখন সে বস্তু যে ভোলবার নয় এমন অনুমান করা অন্যায় হবে না। সুতরাং এখানে আবার তাঁর পরিচয় রিপিট্ ক'রে তাঁকে খাটো করতে চাই না এবং তা অনাবশ্যকও।

তিনি আমাদের সেই চাটুয্যে যাঁকে আমরা সুদূর সমরাভিযানে যাত্রার অকূল সমুদ্রে অবলম্বনরূপে পাই। সেইদিনের সেই চিন্তা, শঙ্কা ও বিচ্ছেদ-বেদনা-মথিত অবস্থায় তিনি যেন ভগবৎ-প্রেরিত সঞ্জীবনীর মত উপস্থিত হন্।

লর্ড ক্লাইভ নামক রয়েল্ মেরিন্ ছিল আমাদের দুস্তর ভবপারের বাহক। সেখানি ক্রমে নোয়াজ্-আর্কে পরিণত। ভারতে ও ভারতের বাইবেব বাছাই করা বিবিধ মূর্তি তাতে যেন বীজ রক্ষার্থে সংগ্রহ করা হয়েছিল। আজব-ঘর বা মিউজিয়ম্ খোলবার মালও বলা চলে।

হেনকালে চাটুয্যের আবির্ভাব — সকলকে একাগ্র ক'বে দেয়। মস্তকে— বাঙালিব বাড়ির পরিচয়-লিপির মত — ডুরে শাড়ির খানিকটা ছিন্নাংশ জড়ানো। গায়ে আদময়লা গোল আস্তিনের আজানু জামা। বাম স্কন্ধে — পৃষ্ঠ ও বক্ষ চাপা, দুইটি পূর্ণগর্ভ চটেব থলি , দক্ষিণ কক্ষে টিনের একটি দড়ির সেফ গার্ড জড়ানো পুরাতন তোরঙ্গ। পাদুকার পরিচয় অনাবশ্যক — পৌঁছুতে পারলে সব কাজ ফেলে সর্বাগ্রে চীনেমুচী খুঁজতে হবে!

ঠাকুর বলতেন "কাজলের ঘরে যাতায়াত থাক্‌লে — বেদাগ্ কেউ বেরিয়ে আসতে পারে না। যতই সাবধান হও, দেহে একটু দাগ নিয়ে আসতেই হয়।" রংয়ের গাঢ়ত্বে আগন্তুক কিন্তু সে শঙ্কা হ'তে মুক্ত। বিপদ-সঙ্কুল সুদূর যাত্রায় সকলেই নিজেদের দলপুষ্টি চায়। এক্ষেত্রে কিন্তু সে আগ্রহ কারো জাগে নাই। অনেকেই অনেক অনুমান ক'রেছিলেন — সকলেরই ভাবটা ছিল — প্রত্যাখানের দিকে। মজুমদার ভায়া বলেন — "বোধ হয় কালিমাখা কাবুলী — মেওয়া বেচতে বা খোলা দেখাতে যাবে।"

শেষ আমাদেরই ভাগ্য প্রসন্ন হ'ল। তিনি বাঙালী। অর্ডার পেয়ে, বেঙ্গল থেকে ভায়া ক্যাল্‌কাটা চীনে চলেছেন। সঙ্গে থলিভরা ফ্রেশ্-ফ্রুট ; তার ডিটেল্ অনেকেরই স্মরণ থাকা সম্ভব — লঙ্কা হ'তে আধখানা কাঁটাল পর্যন্ত! শুনেছিলেন সমুদ্র সফরে সী সিক্‌নেস্ এড়াবার উহাই ব্রহ্মাস্ত্র বা মহৌষধ। যে কারণেই হউক — না যেতে, না আসতে সী সিক্‌নেস্ তাকে ছোঁয়নি।

২

চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পর — পনেরো-যোলো বৎসর কেটে গিয়েছে। যেখানে কোনো সুবিধাই হ'ল না — 'রণে মলে নাকি স্বর্গ হয়', আমরাও গেলুম, হত্যাকাণ্ডও থেমে গেল — স্বর্গপ্রাপ্তির পথও ঘুচে গেল। একটি মাত্র উপায় রইল — কাশী। সেই আশায় — অবসর গ্রহণান্তে কাশী এসে রইলুম। একটা কিছু নিয়ে থাকা চাই! অনভ্যস্ত পূজা, জপ, গঙ্গাস্নান নিয়ে অনির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করাও বড় 'বোরিং'।

এমন সময় একটি বন্ধু জুটলেন — তিনি ভাদুড়ী মশাই — জীবন্ত তিলভাণ্ডেশ্বর। তাঁর একখানি লিপি-ফটো বা জীবনী চাই। — ফিল্ম ফাঁদা গেল — বৎসর দুই সময় কাটাবার খোরাক জুটলো। তাই নিয়ে থাকি।

জয়নারায়ণ স্কুলের সামনে, রেউড়িতলায় বাসা — দ্বিতলেই থাকি। প্রীতিভাজন তরুণেরা আসেন — কেহ লেখক, কেহ সাহিত্যপ্রেমিক — বেশ একটি আনন্দ-বৈঠক্ নিত্যই বসে— সাময়িক-সাহিত্য-কথা চলে। তারা যেন নবযুগের বার্তাবাহক — চোখে মুখে আনন্দ, উত্তেজনা ও প্রাণশক্তির চাঞ্চল্য। কিছু সৃষ্টির জন্য উৎসুক। ভাবতুম — এই তো যৌবন, একেই বলে যৌবন! এরাই তো জগতকে নূতন রূপ দিতে আসে — জগতের যৌবন রক্ষক! ভারী আনন্দ পেতুম। তাদের তর্ক ও সমালোচনাদি নূতন ধারা ধ'রে চল্‌তো — আমি উপভোগ করতুম। নব যুগের আগমন বার্তার সাড়া পেতুম!

আমি বারাণ্ডায় বসে' পথের লোক-চলাচল দেখছি আর ভাদুড়ী মশায়েব কথা ভাবছি। সেটা ছিল মঙ্গলবার — দুর্গাবাড়ীতে দুর্গাদর্শনে যাবার দিন। বহু বহিস্, মহাজন ও জনসাধারণ গিয়ে থাকেন — যাচ্ছেনও। কেহ বা দর্শনান্তে ফিরছেন। ফিরতি জনতাব মধ্যে একজনকে দেখে চম্‌কে উঠলুম। চাটুয্যে না! সে মূর্তি — 'লাখে না মিলে এক্'! নাকে, কপালে, গালে— সিন্দুর। স্থির নিশ্চয় না হ'লেও না ডেকে পারলুম না — "চাটুয্যে নাকি?"

চাটুয্যে থম্‌কে দাঁড়িয়ে — বাবাণ্ডার দিকে চাইলে। যোল বৎসব পবে চারি চক্ষুব মিলন! একমুখ হাসি — সেই গজদন্ত বিকাশ। — "বাঁড়ুয্যে মশাই নাকি?"

"— দাঁড়াও, যাচ্ছি।"

পরিবার ছুটে এসেছিলেন — "কে — কে গা?" বললুম — "চট্ কোবে এক কেট্‌লি চায়েব জল চড়িয়ে দাও, আর চাকরটাকে আধসের গরম জিলিপি — দেবী না হয।"

"একজন না?"

"হ্যাঁ — হোল্‌কারের বড়কুমার — আমাব চীনেব চাটুয্যে।" বলতে বলতে নেবে গেলুম।

— "এসো, এসো ভায়া। অ্যাঃ — বেঁচে আছো? ভারী আনন্দ হচ্ছে ..."

"আগে বলুন তো —, হনুমানের বিষ আছে?"

চাটুয্যের প্রশ্নাদি ওইরূপই। তাই বললুম — "আগে খুবই ছিল রে ভাই, কিন্তু বাবণ বংশ ধ্বংস করতে — সবটুকু ঝ'রে গিযেছে — এখন সব ঢোঁড়া হনুমান! এ প্রশ্ন কেন বলো দিকি?"

ম্লান মুখে কাতর কণ্ঠে বললে — "বড় বিপদ বাঁড়ুয্যে মশাই! এই দেখুন হাতে হনুমানে কামড় দিয়েছে।"

কি সর্বনাশ! তখনও রক্ত ঝরছে। তাকে সাহস দিয়ে বললুম — "কিছু ভেব না ভাই, হত্যার পাপ থেকে মুক্ত রাখবার জন্যেই মহর্ষি গৌতম বলে' গিযেছেন — গো ব্রাহ্মণ আর হনুমানের বিষ থাকবে না। এবা তিনই চিরদিন এক পর্যায়ভুক্ত থাকবে। খবরদার, ঋষিবাক্যে বিশ্বাস হারিয়ো না ভাই।"

তিন বৎসর চীনে অবস্থানকালে প্রায়ই চাটুয্যের একটা না একটা অদ্ভুত সন্দেহের, শোকের বা স্বপ্ন-সমাধানের বড় প্রব্লেম্ আমাকে মেটাতে হ'ত। আমার শাস্ত্রজ্ঞানে তাব অসীম বিশ্বাস ছিল। তার ভয় ভাংলো। হাতটা ভাল কোরে ধুয়ে, 'আয়োডিন্' লাগিযে বেঁধে দিলুম। সাবান দিয়ে মুখ ধোবার পর পাকা রং বেরিয়ে এলো — বে-ভেজাল্ চাটুয্যেকে পেলুম। তারপর একথাল জিলিপি আর এক পট্ চা — অতল স্পর্শে চল্‌লো।

খান সাতেক পেটে পড়বার পর বললুম — "তিনি কোথা? —সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ হচ্ছে শাস্ত্র বাক্য — "

"সবই তো কবেছিলুম মশাই," বলেই চাটুয্যে একদম বিমর্ষ—অভ্যাসবশে কেবল জিলিপি খাওয়া বন্ধ হয়নি। আমি ভীত হয়ে বললুম —"কেনো, কি হোলো —ভিড়ে হাবিয়ে ফেলেছ নাকি?" — তার দ্বাবা কিছুই অসম্ভব নয়।

"সবই নয় — আধখানা গিয়েছে মশাই।" —

"বলো কি? সে কি বকম! তিনি কোথায়?"

"বেশ হয়েছে মশাই -- ভালই হয়েছে। যেমন তীর্থ-তীর্থ ক'বে মরছিলেন —"

"ব্যাপাবটা খুলে বলো ভাই।"

"আর মশাই — শাস্ত্র মানতে তো কসুর কবি না — পঞ্জিকা না দেখে শ্বশুরবাড়ী পর্যন্ত যাই না। পঞ্জিকা বলেন — আপনাবাও ডিটো দেন — ত্রয়োদশীর মত যাত্রাব ভালো দিন আর নেই— সর্ব কর্ম সিদ্ধি। শ্রীবামপুর, 'গুপ্ত প্রেস্, বাগচি — সবারই এক রা। পবিবাব পা বাড়িয়েই ছিলেন, ত্রযোদশীতেই বেরিয়ে পড়া গেল — সোজা একেবাবে বৃন্দাবন। সাঁটেই বলিই -- যমুনা স্নানান্তে গোবিন্দজী দর্শনে যাবো। যমুনাকে নিবেদন কববার তবে একছড়া পাকা কলা কোঁচায বেঁধে ছিলুম। কিন্তু জল কোথায়, থাকলেও তাতে নাবে কাব সাদ্দি — কচ্ছপেব মোচ্ছপ লেগে আছে। সন্তর্পণে জলস্পর্শ করছি, একটানে কোমব থেকে কাপডখানা খসিযে নিযে একটা বাঁদব ছুটে পালালো, থপ্ কোবে বসে পডলুম। ভাগ্যে গামছাখানা ছিল — তাই কোনো প্রকাবে গোবিন্দজী দর্শন সেবে বাসায ফিবি। পাণ্ডাজী বললেন — 'আপ্ বডা ভাগ্ বান হায়, লালাজী (শ্রীকৃষ্ণ) লীলা কিযা।' ভাবতে লাগলুম — আচার্য শঙ্কবের নিশ্চযই এই দশা ঘটেছিল — তাই বাববাব - কৌপীন বন্ত খলু ভাগ্যবন্ত - ব'লে গিয়েছেন।—"

"তিন দিনে হাড়িব হাল্ করে ছাড়লে — কাপড় গেলো, চটি গেলো, দুদিন কটিও গেলো। পবিবাবকে পাণ্ডাব জিম্মে কোবে নিশ্চিন্ত হযেছিলুম। তীর্থ নয — বাঁদবেব একটি বিশিষ্ট আড্ডা, মুহূর্তেব শান্তি নেই মশাই। ডাঙ্গায বাঁদব, জলে কচ্ছপ! হ্যাঁ — মিথ্যে কথা বলব না — বৃন্দাবনের সেরা চিজ বটে — বার্বাড়ি।—"

— "তাবপর প্রযাগে পলাযন। সেখানে বামের পল্টনেব নম্বর কিছু কম। মুণ্ডনেব মাহাত্ম্যই ধর্মের সেরা। বক্তাবক্তি চল্‌ছে! কেশেব কনট্রাক্টাব কড়া পাহাডা দিচ্ছেন — এক কাঁচ্চা চুল না কেউ সবায। — আমি সঙ্গমে স্নান কবতে সবে পডলুম।"

"ফিরে এসে তাঁকে খুঁজছি — একটি স্ত্রীলোক কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে হাজিব। বললুম — এখন কিছু হবে না, আগে আমাদেব কাজ সাবা হোক্, — পয়সাকডি সব তাঁব কাছে।— স্ত্রীলোকটি ঝঙ্কাব দিয়ে বলে উঠলো — তুমি কি মরেছ', চিনতে পারছ না! — আমি গো।—"

— "সর্ব্বনাশ — কে চিনবে মশাই —যমকেও ফাঁকি দেওযা যায! ছলিয়া হার মানে!— আপনাকে বলি — ভাগ্যে এক চোখ ট্যাবা ছিল, না হ'লে আমাব বাবারও চেনবাব সাদ্দি ছিল না , তায় শুনেছি — তীর্থস্থান প্রবঞ্চকেব প্রফিট্ হাউস্। — আমাব কান্না পেলে। — এই স্ত্রী মানুষ হ'য়ে এ তুমি কবলে কি — আমি না ম'লে তুমি দেশে ফিববে কোন্ মুখে?"

"ঘাটে মড়াকান্না পড়ে গেল — মাঝে মাঝে ঝঙ্কাব — তুমি ছিলে কোথায, তুমি তো মবেই ছিলে। তুমি থাকলে (পাণ্ডাকে দেখিযে) এ পোড়াবমুখো মিন্‌সে, শ্লোক আউড়ে, ভজন সাধন দিয়ে — মায়ি অসংখ্ পুন্ হোবে — অহল্লযা মাযি ভি — আরো কত কি বললে।"

"পাণ্ডার দিকে চাইতে সে উত্তেজিত ভাবে বললে — বাবু, তীরথ্ মে ঝুটমুঠ্ গোলমাল্ না কিজিয়ে, হামলোগ্ গণক্ নেহি, হাত গিণনে নেহি জানতে। আপলোগকা বিধ্বা সধ্বা কোন্ পয়চানে? সবকোই কিনারাদার শাড়ি আউড গলেমে হাতমে জোর বাখতে, কেশমে কুণ্ডলিনী (কুন্তলীন) লাগাতে। প্রয়াগজীমে মুণ্ডন্ প্রধান কর্তব্য হ্যায় — উন্‌কা ভালেকে ওয়াস্তেই করাযা গিযা। আওর পাঁচ্‌কো পুছিয়ে — বোলে — হাঁক্ দেওযায, যে পাঁচ পশ্টনীমূর্তি এলো আব কক্ষ স্বরে বললে — ক্যা, — ক্যা ঝুটমুঠ্ 'বল্‌বা' হায। যো হুযা, সো ভালাকে ওযাস্তে হুযা , — আব দচ্ছিনাকে দো রূপেয়া বাখকে, যাঁহা যানা হায চুপ্‌চাপ্ চলে যাইযে — ইত্যাদি। —"

"তাদের মারমূর্তি দেখে — তা ভিন্ন উপায় ছিল না। এদের চেয়ে বাঁদব ভালো ছিল মশাই। খাওয়া দাওয়া শিবস্থ হযেছিল — প্রথম ট্রেনেই কাশী। তাঁর এক পিসি কাশীবাস করেন — সোনাবপুরায়। সেখানে উপস্থিত হযে মুখে পেটে কিছু দিযে বাঁচি।"

"তিনি এখন বাসায বদ্ধ — অসুখ অস্বস্তিব সীমা নেই। আমি তাঁর পানে চাইতে পাবি না, চাইলেও চিনতে পারি না। পিসি পণ্ডিতদেব বাড়ী কাটান্‌ছিড়েনেব জন্যে ছুটোছুটি করছেন — কারো সুখ নেই।"

'আবার গ্রামে তা-বড় তা-বড মহামহোপাধ্যাযবা আছেন। তাঁদেব কাছে উদ্ধাবেব ছাডপত্র এ জন্মে মিলবে না। সুতরাং তাঁকে এখন তিন-চাব মাস এখানে থেকে, অন্তত বব্‌ড় হেযাব বানিযে যেতে হবে।—"

—"আমি বাইরে বাইরে পাগলের মত ঘুবছি। তাব ওপব এই বাঁদুবে কামড। আপনাদেব ত্রয়োদশীকে শতকোটী নমস্কাব মশাই! সস্ত্রীক তীর্থে আসাব মত মুক্ষুমি আব নেই — এব চেযে সোঁদব বনে গেলে ঢুকে যেতো! প্রযাগকে আপনাবা তীর্থবাজ বলেন — সব ঝুট্‌বাৎ মশাই — আমি স্বচক্ষে দেখে এলুম — পাণ্ডাবাজ বা গুণ্ডাবাজ।"

এই অদ্ভুত কথা শুন্‌তে শুন্‌তে আমি সত্যিই সম্বিৎহাবা, স্তম্ভিত ও নির্বাক মেবে গিযেছিলুম। বলবাব কিছু পাচ্ছিলুম না — ফাঁকও নয। চাটুয্যে তখন পাপড়ি ভাংচে — আস্তো আব চলছে না।

বললে — "আপনাকে পেয়ে আমি আব ভাবছি না চীনে তিন বছব আপনি আমাব ভয়ত্রাতা ছিলেন, মানুয — বানিয়ে দিয়েছেন —মহা মহা বিপদে বক্ষা পেয়েছি — এইবার বাঁচান — যা কববাব হয — করুন। দু-তিন দিনেব বেশী তো আমার থাকা চলবে না — ওঁর একটা ব্যবস্থা, পাঁচ মেযেব বিবাহ, জ্যাঠতুতো ভায়ের সাত বিঘে লাখবাজের দখল লওয়া, সবই কবতে হবে। তা ছাড়া চীনেব চোদ্দো হাজাব প্রসিদ্ধ সলিসিটাব-প্লাণ্ডাবাব ব্রাদার্সের পাল্লায় পড়ে বয়েছে! উঃ—আজই স্টার্ট করলে ভাল হয় , ত্রযোদশী নয় তো !.

বললুম — "কি সব পাগলের মত বকচো, এতো তাড়া কিসের? এখনো তো তোমার ছুটি রয়েছে। যা বললে, ওসব তো দু-চার দিনের কাজও নয..."

"আজ্ঞে, ব্যাপাবটি যে খাঁটি শাস্ত্রীয়, ক্যাপ্টেন্ বার্কে ছুটি দিয়েছেন বটে, কিন্তু কর্নেল শমনের তো দিনক্ষণ নেই! কন্ট্রাক্টারের কড়া কটাক্ষে যে নাপতে বেটা ভুলেও একগাছি চুল্ রাখে নি। ভগবানেবও ভুল হয় মশাই — টাকের মাঝে মাঝেও দু-এক গাছা থেকে যায়, এ বেটা একদম্ মাইক্রস্‌কোপিক্ চাঁচন্ দিয়েছে যে! — সিঁদুর পরাবার পথও রাখে নি — আমি আর ক'দিন।"

"ওঃ তুমি বুঝি ওই ভণ্ডদের ভুয়ো কথাটা নিয়ে এখনো ভাবচো! আমার তো কোনো শাস্ত্র জানতে বাকি নেই — ও কথা কোথাও পাবে না। সামুদ্রিকের চেয়ে সেবা শাস্ত্র তো

আর নেই! — চীনে যাকে যা বলেছি কোনটা নিষ্ফল হয়েছে কি? — দাও ডান্ হাতটা দাও দেখি। নিরেট্‌দের কথায় মিছে ভেবে মরচো!"

"সত্যিই তো — বিপদে পড়ে সে কথা ভুলে গেছি মশাই।" বলে, হাত বাড়িয়ে দিলে। নিবিষ্ট ভাবে দু'পিঠ নেড়ে চেড়ে পনেরো মিনিট নিষ্পলক নিরীক্ষণান্তে — রংয়েব কল্যাণে পেলুম — নিবিড় অন্ধকাব এবং দু'পিঠই সমান। বেশ গম্ভীবভাবে বললুম — "যাও, মিছে দুর্ভাবনা নিযে থেক না — সবাইকে জ্বালিও না। এই দেখছ না — তর্জনীব নিম্নে বৃহস্পতিব ক্ষেত্র হতে — আয়ুরেখা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিক্রমান্তে নেবে প্রাণনাড়ী স্পর্শ কবেছে — এ ভারি বিবল — দেখা যায় না — ভেবী ব্যায়াব্। একমাত্র ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ছিল। তোমাকে মাবে কে! তিবান্নব্বয়েব পূর্বে যমেবও সাধ্য নেই। পাঁচ-সাতদিন পরে দেশে গেলেও চলবে। গিয়ে বোলো — কয়দিন তার জ্বর হয়েছে, ছাড়ছে না — পেটটাও নবম। ডাক্তাবেরা 'টাইফয়েড্' বলে সন্দেহ করেছেন। তাব সব ব্যবস্থাদি কোবে, তাঁকে তাঁব পিসিব কাছে বেখে এলুম। থাকতে পারলুম না। — চাকবি যে টাইফযেডের চেযেও কঠিন অসুখ! — বাবা বিশ্বনাথ রক্ষা কবেন তো তিন মাস পবে তাঁকে আনবো।— টাইফযেডে অনেককেই নেড়া হ'তে হয়। তিন মাসে লোকেব সামনে বেববাব মত চুলও গজিযে যাবে।"

"আঃ — বাঁচালেন বাঁড়ুয্যে মশাই — এরূপ অকাট্য কথা — আব কার কাছে পেতুম — জয় বিশ্বনাথ। —"

চায়েব পট্ নিঃশেষ কবলেন। এতক্ষণে মেঘ ফুঁড়ে হাসি ফুট্‌লো। — "আমাকে তো চিন্তামুক্ত কবলেন, এখন তাঁব ভাবনাই ভাবছি মশাই — বাঙালীটোলার সেই স্যাঁৎসেতে সোনাবখনিব মধ্যে তিন-চাব মাস বন্দীব মত কাটাবে কি কোরে— সত্যিকাব টাইফযেড্ যে টেনে আনবে .'

"তাব উপায়ও ভেবেছি ভাই

"আপনি ছাড়া আমাব ভাবনা আব কে ভাববে। ভাবতো বটে এক সম্বন্ধী — সে ওই চোদ্দো হাজাব পাচাব কববার চেষ্টায়। এখন পবলোকে গিয়ে পস্তাচ্ছে"

"যাক্ ও কথা। — এখানে 'বান্ধব সমিতি' বোলে বেশ জমকালো থিযেটাব পার্টি আছে। তাঁদেব সঙ্গে আলাপ হয়েছে। এই সেদিন 'উর্ব্বশী'ব জন্যে তাঁবা ফার্স্ট ক্লাস্ পবচুলো আনিযেছেন। বন্ধুত্ব আব মূল্য — দুযে মিশিযে তা পাওযা যাবে। — পব্‌লে কাবো সাধ্য নেই যে পবচুলো বলে বোঝে। তাই পোবে সাবাদিন বেড়ান্ না, কেবল শোবাব সময খুলে বাখা চাই, আব স্নানেব সময। ইচ্ছা হয বাত্রে গিয়ে গঙ্গাস্নান করে' আসতে পাবেন — তখন আর কে কাব নেড়া মাথা দেখতে যাচ্ছে, আব তাঁকে চেনেই বা ক'জন।"

চাটুয্যে একদম চাঙ্গা হয়ে উঠলো। — "ভগবান আপনাকে কি মাথাই দিয়েছিলেন — আমাদেব কেবল মুণ্ডু বয়ে' বেড়ানো। আমিও তো থিয়েটাবে পার্ট নিযেছি তিন-তিন্‌বাব — অশ্বমেধের ঘোড়া সেজেছি, কই আমাব মাথায় তো ও কথা আসে নি। — বস্ — মাব্ দিযা, আর ভাবি না মশাই। উঃ — এমন সহজ উপায় বযেছে — আর আমি কি-না তবে দু-তিন দিনেব বেশী থাকা চলবে না মশাই, তো হ'লে আর ট্রেন্‌ভাড়া থাকবে না।—"

"কেনো?"

"মশাই সতেরোখানা সন্দেশের দোকান, সবই সেরা পাক্! দিন — দেড় টাকা কোবে খস্‌ছে! তীর্থস্থান বটে! আবার চম্‌চম্ বোলে কি চিজই বানিয়েছে! সে দিন চাখ্‌তে-চাখ্‌তে বার-আনা খসে গেলো! — আর নয় মশাই. . "

বললুম — "বাত্রে আজ এইখানেই একসঙ্গে আহার।" একগাল হেসে বললে — "আমি নিজেই বলতুম বাঁড়ুয্যে-মশাই, একটু ইতস্তত ছিল — কাশীবাস করেছেন, কটিন্ না

ফ্যাকাসে মেরে থাকে। ত্রয়োদশীতে যাত্রা কোরে এক প্রকাব উপোসই চলছে, পুরি আর হালুয়া মেরে জিভ্ অসাড় আর মুখ ঘৃতপক্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। সিগাবেটে শেষটান মারতে সাহস হয় না মশাই, আধখানা থাকতে ফেলে দি — মুখাগ্নি না হযে যায়!"

"ভয় নেই ভাই, কাশী ভোগের স্থান — ত্যাগের বালাই বড় দেখতে পাই না। চল না, একসঙ্গেই বাজারে যাওয়া যাক্।"

পথে — একটু নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে — "মটন্ মেলে না?"

"এসো না, সব মেলে — যেবা ইচ্ছা হয়।"

"ওঃ — তাই এত ভিড় আর বড় বড বিল্ডিং। বড বড সব টাকাব-মুটে সকাল থেকে মাছ-মাংসের বাজাব ঘুঁটে বেড়াচ্ছেন — সেরা মাল না উঠে যায়। মণিকর্ণিকা মনে পড়তে দেয় না — বেশ আছেন! — আব তিনটে বছর কাটাতে পাবলেই আসছি মশাই —"

তার পছন্দ মতই বাজার করা গেল। প্রায় দুসেবেব ওপর এক পিস্ মটন্ লওযা হ'ল। বর্ণনাবাহুল্যে আর কাজ নেই।

তাব পর তাব অন্যান্য ব্যবস্থাদি শেষ কোরে চতুর্থ দিনে তাকে বওনা ক'রে দিলুম। চোখ্ ছল্ ছল্ করছিল, বারবাব বললে — "আপনি দেখ্‌বেন," আব মধ্যে মধ্যে "আজ ত্রযোদশী নয় তো বাড়ুয্যে মশাই?"

"না হে না, কোনো দুর্ভাবনা বেখ না।"

ট্রেন্ ছাড়লো। মুখ বাড়িযে — "আসল কথা বলতে ভুলেছি মশাই — কি চিজ্‌ই দিয়েছেন — তাঁর মুখে হাসি দেখে যেতে পাবলুম। পবচুলো কি ফিট্‌ই কবেছে মশাই "

আব শোনা গেল না।

দুর্গা — দুর্গা।

ভূতের গল্প

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

আমি ভূতেব গল্প বড়ো ভালবাসি। তোমবা পাঁচ জন মিলিয়া ভূতেব গল্প কব, সেখানে পাঁচ ঘণ্টা বসিয়া থাকিতে পারি। ইহাতে যে কি মজা, একটা শুনিলে আর একটা শুনিতে ইচ্ছা করে। গল্প শেষ হইযা গেলে একাকী ঘরের বাহিবে যাইতে ইচ্ছা হয় না। তোমাদেব মধ্যে আমার মতন কেহ্ আছ কিনা জানি না, বোধ হয় আছ। তাই আজ তোমাদের কাছে একটা গল্প বলিব। গল্পটা একখানি ইংবাজি কাগজে পড়িযাছি। তোমাদেব সুবিধাব জন্য ইংবাজি নামগুলি বদল করিযা দিতে ইচ্ছা ছিল কিন্তু গল্পটি পড়িলেই বুঝিতে পাবিবে যে শুধু নাম বদলাইলে চলিবে না। সুতবাং ঠিক যেরূপ পড়িযাছি প্রায সেইরূপ অনুবাদ কবিযা দেওযাই ভাল বোধ হইতেছে।

স্কট্‌লনেব ম্যাপটাব দিকে একবাব চাহিয়া দেখিলে বাঁ ধাবে ছোট ছোট দ্বীপ দেখিতে পাইবে। তাহার উপরেরটির নাম নর্থ উইষ্ট্, নীচেবটির নাম সাউথ উইষ্ট্। এব মাঝামাঝি ছোট-ছোট আবও কতকগুলি দ্বীপ দেখা যায। এ সেকালের কথা, তখন স্টীম ইঞ্জিনও ছিল না, টেলিগ্রাফও ছিল না , আমার ঠাকুরদাদা তখন এব একটি দ্বীপে স্কুলে মাস্টাবি কবিতেন।

সেখানে লোক বড় বেশি ছিল না। তাদের কাজেব মধ্যে কেবল মাত্র মেষ চবান, আব কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলাব মত কিছু শস্য উৎপাদন কবা। সেখানকার মাটি বড় খাবাপ, তাবি একটু একটু সকলে ভাগ কবিয়া নেয় আর জমিদাবকে খাজনা দেয়। . এবা বেশ সাহসী লোক ছিল। আর ঐ বকম কষ্টে থাকিযা এবং সামান্য খাইযাও বেশ একপ্রকার সুখে স্বাচ্ছন্দে কাল কাটাইত।

এই দ্বীপে এল্যান ক্যামেবন নামে একজন লোক ছিলেন। তাঁহাব বাড়ি গাঁ থেকে প্রায একমাইল দূরে। এল্যানের সঙ্গে মাষ্টাবমশায়ের বড় ভাব. তাঁর কাছে তিনি কত বকমের মজার গল্প করিতেন। হঠাৎ একদিন ক্যামেরন বড় পীড়িত হইলেন. আব কিছুদিন পবে তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার কেউ আপনাব লোক ছিল না, সুতবাং তাঁহাব সমস্ত বিষয বিক্রয় হইযা গেল। তাঁহাব বাড়িটা কেহই কিনিতে চাহিল না বলিয়া তাহা অমনি খালি পড়িয়া বহিল।

এর কযেক মাস পরে একদিন জ্যোৎস্না রাত্রিতে ডনাল্ড ম্যাকলীন বলিয়া একটি বাখাল ঐ বাড়ির পাশ দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জানলাব দিকে তাহাব দৃষ্টি পড়িল, আর সে ঘরের ভিতবে এল্যান ক্যামেবানেব ছাযা দেখিতে পাইল। দেখিযাই তো তার চক্ষু স্থিব! সেখানেই সে হাঁ কবিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার চুলগুলি খ্যাংরা কাঠিব মত সোজা হইযা উঠিল, ভযে প্রাণ উড়িয়া গেল, গলা শুকাইয়া গেল।

শীঘ্রই তাহার চৈতন্য হইল। ঐ রকম ভয়ানক পদার্থের সঙ্গে কাহারই বা জানাশুনা করিবাব ইচ্ছা থাকে? সে তো মার দৌড়। একেবাবে মাষ্টারমহাশযের বাড়িতে! তাঁহাব কাছে সব কথা সে বলিল। মাষ্টাবমহাশয এ-সব মানেন না। তিনি তাহাকে প্রথম ঠাট্টা

করিলেন, তাবপরে বলিলেন, তাহার মাথায় কিঞ্চিৎ গোলযোগ ঘটিয়াছে। আরো অনেক কথা বলিলেন, বলিয়া যথাসাধ্য বুঝাইযা দিতে চেষ্টা করিলেন যে, ঐরূপ কিছুতে বিশ্বাস থাকা নিতান্ত মূর্খামি।

ডনাল্ড্ কিছুই বুঝিল না, সে অপেক্ষাকৃত সহজ বুদ্ধিবিশিষ্ট অন্যান্য লোকের কাছে তাহার গল্পটি বলিল। শীঘ্রই ঐ দ্বীপের সকলেই এই গল্প জানিতে পারিল। ঐ সব বিষয় মীমাংসা কবিতে বৃদ্ধবাই ওস্তাদ , তাঁহারা ভবিষাতের সম্বন্ধে ইহাতে কত কুলক্ষণই দেখিতে পাইলেন।

ঐ দ্বীপের মধ্যে কেবলমাত্র মাষ্টারমহাশয়েব কাছেই খববের কাগজ আসিত। মাসেব মধ্যে একবাব কবিযা কাগজ আসিত আর সেদিন সকলে মাষ্টারমহাশয়েব বাড়িতে গিযা নতুন খবব শুনিযা আসিত। সেদিন তাহাদেব পক্ষে একটা খুব আনন্দের দিন। রান্নাঘবে বড় আগুন কবিয়া দশ বারজন তাহাব চারিদিকে সন্ধ্যাব সময বসিযা কাগজেব বিজ্ঞাপন হইতে আরম্ভ কবিযা অমুক কর্তৃক অমুক যন্ত্রে মুদ্রিত হইল ইত্যাদি সমস্ত বিষযেব তদাবক ও তর্কবিতর্ক কবিত। শেষেব কথাগুলি সকলেবই একপ্রকাব মুখস্থ হইযাছিল, এবং পডা শেষ হইলে ঐ কথাটা প্রাযই সকলে একসঙ্গে একবাব বলিত।

এই সকল সভায বাখাল, কৃষক, গির্জাব ছোট পাদবি প্রভৃতি অনেকেই আসিতেন। গ্রামেব মুচি ববীও আসিত। ররী ভয়ানক নাছোড়বান্দা লোক. একটা কথা উঠিলে তাহাকে একবার আচ্ছা কবিয়া না ঘাঁটিযা সহজে ছাড়িবে না।

ডনাল্ড্ ম্যাকলীনেব ঐ ঘটনাব কয়েক সপ্তাহ পবে একদিন সকলে এইরূপ সভা কবিযা বসিয়াছে, মাষ্টারমহাশয় চেঁচাইযা তর্জমা করিতেছেন, এমন সময একজন আসিযা বলিল যে, এল্যান ক্যামেবনেব ছাযা আবার দেখা গিযাছে। এবাবে একজন স্ত্রীলোক দেখিযাছে। ঐ বাখাল যে স্থানে যেভাবে উহাকে দেখিযাছিল সেও ঠিক সেইবকম দেখিযাছে।

এবপব আর পডা চলে কি কবিযা। মাষ্টাবমহাশয চটিযা গেলেন এবং ঠাট্টা কবিতে লাগিলেন। ববী তৎক্ষণাৎ তাহাব প্রতিবাদ কবিল। ররী কোন কথাই ঠিক মানে না , এবাবেও মাষ্টাবমহাশযেব কথাগুলি মানিতে পাবিল না। প্রচণ্ড তর্ক উপস্থিত। ভূতেব কথা লইযা সাধাবণভাবে এবং ক্যামেবনেব ভূতেব বিষয বিশেষভাবে প্রচাব চলিতে লাগিল, আব সকলে বেশ মজা পাইতে লাগিলেন। কিন্তু ববীব মেজাজ গবম হইয়া উঠিল, সে বলিল —

‘দেখ মাষ্টাবেব পো, যতই কেন বলনা, আমি একজোড়া নতুন বুট হবাব, তোমাব সাধ্যি নেই আজ দুপুব-বাতে ওখানে গিযে দেখে এস।’

সকলে কবতালি দিয়া উঠিল। মাষ্টাবমহাশয হাসিযা উড়াইযা দিতে চাইলেন, কিন্তু ববী ছাড়িবে কেন? সে সকলেব উপর বিচাবেব ভাব দিল। তাহারা এই মত দিল যে, মাষ্টাবমহাশয যখন গল্পগুলি মানিতেছেন না, স্থলে তাঁহাব উচিত যে নিজের পক্ষে তিনি যে মানেন না তা প্রমাণ কবিযা দেওযা।

মাষ্টারমহাশয় দেখিলেন, অস্বীকাব কবিলে যশেব হানি হয়। তিনি বলিলেন, ‘যাব বইকি? কিন্তু আমি গিয়ে ফিবে এলেও এব চাইতে তোমাদেব আব জ্ঞান বাড়বে না।’

ববী বলিল, ‘আচ্ছা দেখা যাউক।’

মাষ্টারমহাশয় বলিলেন, ‘ভাল, ওখানে গিয়ে আমি কি করব?’

রবী বলিল ‘ওখানে গিয়ে দবজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনবার বলবে, এল্যান ক্যামেরন আছ গো? কোন জবাব না পাও ফিরে এস, আমি আর ভূত মানব না।’

মাষ্টারমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, ‘এটা ঠিক জেনো যে, এল্যান সেখানে থাকলে আমার কথাব উত্তর দিবেই। আমাদের বড় ভাব ছিল।’

একজন বলিল, 'তাকে যদি দেখতে পাও তা হলে মুচির কাছে ও যে টাকা পেত, সে কথাটা তুল না।' এ কথায় সকলে হাসিয়া উঠিলে ররী একটু অপ্রস্তুত হইল।

এইরূপে হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল, ক্রমে মাষ্টারমহাশয়েব যাবাব সময় হইয়া আসিল।

শেষে মুচি ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, 'বারটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকি, তুমি এখন গেলে ভাল হয়, তাহলেই ঠিক সময়মত পৌছতে পারবে।'

বেশ কবিয়া কাপড়-চোপড় জড়াইযা. মাষ্টারমহাশয় যষ্টি-হস্তে সেই বাড়িব দিকে চলিলেন। মাষ্টারের যাইবার সময় দু-একজন খোঁচা দিয়ে দিল এবং স্থির কবিল, ফলটা কি হয় দেখিয়া যাইবে।

বাত্রি অন্ধকার। এতক্ষণ বেশ জ্যোৎস্না ছিল কিন্তু এক্ষণে কাল কাল মেঘ আসিযা চাঁদকে ঢাকিযা ফেলিতেছে। মাষ্টাব চলিযা গেলে সকলে বলাবলি আবম্ভ কবিল যে সমস্ত রাস্তাটা সাহস করিয়া যাওয়া তাঁহাব পক্ষে সম্ভব কি না। ছোট পাদবি বলিল যে তিনি হযত অর্ধেক পথ গিযাই ফিরিয়া আসিযা যাহা ইচ্ছা বলিবেন, তখন আব কাহাবও কিছু বলিবাব থাকিবে না। ইহা শুনিয়া মুচির মনে ভয হইল, জুতা জোড়াটা নেহাত ফাঁকি দিয়া নেয, এটা তাহার ভাল লাগিল না। তখন একজন প্রস্তাব কবিল যে, ববী যাইযা দেখিযা আসুক।

প্রথমে ববী ইহাতে আপত্তি করিল। কিন্তু উহাব বক্তৃতাব পবে বাজি হইল। সকলে তাহাকে সাবধান কবিয়া দিল যেন মাষ্টাব তাহাকে দেখিতে না পায, তাবপর সে বাহিব হইল। খুব চলিতে পারিত, এই গুণে শীঘ্রই সে মাষ্টাবকে দেখিতে পাইল। ববী একটু দূবে দূবে থাকিত লাগিল — বাস্তাটা একটা জলা জাযগাব মধ্য দিযা গিযাছে, একটিও গাছ পালা নাই যে মাষ্টাব ফিবিযা চাহিলে তাহাব আড়ালে থাকিযা বাঁচিবে।

পবে মাস্টাবমহাশয যখন ঐ বাড়িতে পৌছিলেন তখন ররী একটু বুদ্ধি খাটাইযা খানিকটা ঘুবিযা বাড়িব সম্মুখে আসিযা সেখানে একটা নিচু বেড়া ছিল. তাহাব আড়ালে শুইযা পড়িল।

সে অবস্থায় দূতের কার্য করিতে যাইয়া তাহাব অন্তরটা গুব্ গুব্ কবিতে লাগিল। মাস্টারমহাশয ছিলেন বলিযা, নইলে সে এতক্ষণ চেঁচাইযা ফেলিত। কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে প্রাণটা হাতে কবিযা দেখিতেছেন কি হয়। মনে করিযাছে মাস্টারমহাশয যেরূপ ব্যবহার করেন তাহা দেখা হইযা গেলেই সে বাহিব হইবে।

গ্রামের গির্জাব ঘডিতে বাবটা বাজিল। সে বেড়ার ছিদ্র দিয়া চাহিযা দেখিল যে মাস্টাব মহাশয নির্ভযে দবজাব সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

মাস্টারমহাশয় গলা পরিষ্কার কবিলেন এবং একটু শুষ্ক স্ববে বলিলেন — 'এল্যান ক্যামেবন আছ গো?' — কোন উত্তর নেই।

দু-এক পা পশ্চাৎ সরিয়া একটু আস্তে আবার বলিলেন 'এল্যান ক্যামেরন আছ গো?' কোন উত্তর নেই।

তাবপব বাড়িতে আসিবার রাস্তাটির মাথা পর্যন্ত হাঁটিয়া গিয়া থতমত স্বরে অর্ধচিৎকার অর্ধ আহ্বানের মত বলিলেন 'এ্যালন — ক্যামেবন — আছ—।' তাবপব আর উত্তবের অপেক্ষা নাই —। সটান চম্পট।

কি সর্বনাশ। কোথায় মাস্টারের সঙ্গে বাড়ি যাইবে, মাস্টার এ কি কবিয়া ফেলিলেন। মুচি বেচারীর আর আতঙ্কের সীমা নাই। ওই বুঝি ভূত এল্যান। আর থাকিতে পারিল না। এই সময়ে তাহার মনে ভয় হইয়াছিল সেই ভয়ে গোঁ গোঁ শব্দ করিতে করিতে সে মাস্টারের পিছনে ছুটিতে লাগিল।

সেই ভয়ানক চিৎকারেব শব্দ মাস্টারমহাশয়েব কানে গেল। মুচি দৌড়াইতেছে আর ডাকিতেছে 'দাঁড়াও গো! মাস্টারমশাই! দাঁড়াও!' মাস্টারমহাশয় শুনিতে পাইলেন। পশ্চাতে একপ্রকার ফিরিযাও তাকাইলেন। আব কি? ঐ এল্যান ক্যামেরন! ভয়ে আরো দশগুণ দৌড়াইতে লাগিলেন। ররী বেচাবী দেখিল বড় বিপদ! মাস্টাব বুঝি তাকে ফেলিয়াই গেল। কি কবে, তাহারও প্রাণপণ চেষ্টা। মাস্টারমশাই দেখিলেন পিছনেব লোকটা আসিয়া তাহাকে প্রায় ধবিয়াই ফেলিল। তাঁহার গাযের বল চালিয়ে যাইতে লাগিলেন। অবশেষে মাস্টারমশাই যখন দেখিলেন যে আব রক্ষা নাই, তখন তিনি সাহসে ভর করিলেন এবং খুব শক্ত করিয়া লাঠি ধরিযা কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতেব দিকে ফিরিলেন এবং আব মুহূর্তকাল বিলম্ব না করিয়া গায়ে যত জোব ছিল তত জোরে ভূতের মস্তকে 'সপাট' করিয়া সাংঘাতিক এক ঘা বসাইয়া দিলেন। তাবপর সেটাও যেন কোথায় অন্ধকাবে অদৃশ্য হইল।

ভূতটা যাওয়াতে এখন একটু সাহস আসিল, কিন্তু তথাপি যতক্ষণ গ্রামেব আলো না দেখা গেল ততক্ষণ থামিলেন না। গ্রামে প্রবেশ কবিবার পূর্বে সাবধানে ঘাম মুছিযা ঠাণ্ডা হইয়া লইলেন। মনটা যখন নির্ভয় হইল তখন ঘবে গেলেন — যেন বিশেষ একটা কিছু হয নাই। অনেক কথা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল তিনি সবগুলিরই উত্তরে বলিলেন —

'ঐ আমি যা বলেছিলাম ভূত-টুত কিছুই তো দেখতে পেলাম না।'

এরপব মুচির জন্য সকলে অপেক্ষা করিতে লাগিল। মাস্টাবকে তাহাবা বলিল যে সে স্থানান্তরে গিয়াছে, শীঘ্রই ফিবিয়া আসিবে।

আধ ঘণ্টা হইয়া গেল তবু মুচি আসে না। সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। চিন্তা বাড়িতে লাগিল, ক্রমে একটা বাজিল। তারপব তাহারা আব থাকিতে পাবিল না, মুচির অনুপস্থিতিব কাবণ তাহাবা মাস্টারমহাশয়কে বলিযা ফেলিল। মাস্টাবমহাশয শুনিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি লাফাইয়া উঠিযা লণ্ঠন হাতে কবিযা দৌড়িয়া বাহিব হইলেন এবং সকলকে পশ্চাৎ আসিতে বলিলেন।

সকলের বিশ্বাস হইল মাস্টারেব বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইযাছে। হৈ-চৈ কাণ্ড। সকলেই জিজ্ঞাসা কবে ব্যাপাবটা কি? তাড়াতাড়ি ঘবেব বাহিবে আসিয়া তাহাবা মাস্টাবকে দাঁড়াইতে বলিতে লগিল। তাঁহাদের শব্দ শুনিযা কুকুবগুলি ঘেউ ঘেউ কবিযা উঠিল। কুকুবেব গোলমালে গ্রামের লোক জাগিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল ব্যাপারখানা কি?

এই সময়ে মাস্টারমহাশয় জলাব মধ্য দিযা দৌড়াইতেছে, আব মাথা ঘুরিযা যাইতেছে — কেবল পুলিশ — ম্যাজিস্ট্রেট — জুবী — ইত্যাদি ভযানক বিষয মনে হইতেছে। তাঁহাব লণ্ঠনের আলো দেখিয়া অন্যেবা তাঁহাব পশ্চাৎ আসিতেছে।

সকলে তাঁহার কাছে আসিযা তাঁহাকে ধরিল এবং ইহাব কাবণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মাস্টাবমহাশয়রে উত্তব দিবাব পূর্বেই সেই মাঠের মধ্য হইতে গালি এবং গোঁঙ্গানিমিশ্রিত শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। কিছুদূব গিযা দেখা গেল একটা লোক জলাব ধাবে বসিযা আছে। লণ্ঠনের সাহায্যে নির্ধারিত হইল যে এ আর কেহ নহে, আমাদের সেই মুচি! সেইখানে বেচারা দুই হাতে মাথা চাপিয়া বসিয়া আছে আর তাহাদের মাস্টাবেব উদ্দেশ্যে গালাগালি দিতেছে। তাহাব নিকট হইতে সকলে সমস্ত ঘটনা শুনিল।

*　　　*　　　*

শেষে অনুসন্ধানে জানা গেল যে ঐ বাড়ির জানালার ঠিক সম্মুখে একটা ছোট গাছ ছিল। তাহারই ছায়া চাঁদের আলোতে দেয়ালে পড়িত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই ছাযার আকৃতি দেখতে ঠিক ক্যামেরনের মুখের মত। সেদিন চাঁদের আলো ছিল না বলিয়াই মাস্টার মহাশয় সেই ছায়া দেখিতে পান নাই।

অদৃষ্ট চক্র

মানকুমারী বসু

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমাব গত জীবনেব ঘটনা শুনিলে লোকে আমাকে কি বলিবে জানি না, কিন্তু আমি প্রকৃত পক্ষেই বাঙ্গালীব ঘবেব একজন "নিবীহ মেয়ে"। — আমাব অদৃষ্ট-চক্রই আমাব অখ্যাতি বা সুখ্যাতিব প্রবর্তক। একথা যিনি না বুঝিবেন, এ ক্ষুদ্র জীবনেব কাহিনী শুনিযা তাঁহাব কাজ নাই। '

পশ্চিমে মধুপুবে, ছোট পাহাড়েব উপবে বেড়াইতে বালিকা আমি বড়ই ভাল বাসিতাম। সকলে বলিত, "সুকুমারী পাহাড়ে মেযে হযে গেল।" তাহা সত্য না হউক, কিন্তু পাহাড়েব উপবে গিয়া দেখিতে পাইতাম — পশ্চিমেব আকাশে সিন্দুব ঢালিযা দিযা, ববিটি ধীবে ধীবে ডুবিযা যাইত, মেঘেব গাযে সোনালী আলো ছড়াইযা পড়িত, নীচে সবুজ শস্যক্ষেত্রে বাযু ঢেউ খেলাইযা দিত, বড় বড় মহিষ, গরু এবং মানুষ সব ছোট ছোট দেখাইত, সেই বিচিত্র সৌন্দর্য দেখাব আনন্দ আমি এ জীবনে ভুলিতে পাবিব না। আব যে আমাকে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখাইত, তাহাকেও ভুলিতে পাবিব না। আমাব মনে হয়, অস্তমান সূর্যের সেই অপূর্ব শোভা পাহাড়েব উপবে বসিযা না দেখিলে, নবমানবেব চক্ষু সার্থক হয় না। কিন্তু সত্য বলিতেছি, সেই শোভাবাশি উপভোগ কবিবাব মত শক্তি তখনও আমাব জন্মে নাই , — যতীশ আমাকে দেখাইত, বুঝাইত আবও শিখাইত। তাই আমি প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে পাইতাম। যখনকাব কথা বলিতেছি, তখনকাব সমযে আমার বযস আট, নয়, দশ এবং এগার বৎসব। চাবি বৎসব পর্যন্ত এইরূপ হইতেছিল।

আমাব বাবা কলিকাতাব একজন বড় ডাক্তার। বাবা, মা, আমি, আমাব ছোট ভাই ললিত আর লোকজন, আমবা সকলেই পূজার সমযে মধুপুবে যাই। বাবা দুই এক মাস পবে কলিকাতায আসেন, আমবা, ফাল্গুন মাস পর্যন্ত সেখানে থাকি। ললিত ও আমি, মাতা পিতার এই দুইটি মাত্র সন্তান।

মধুপুবেই যতীশেব সহিত আমার প্রথম বন্ধুত্ব। যতীশের বাড়ী পল্লিগ্রামে, তাহার বাপ জমিদার। মধুপুবে তাঁহাদেবও এক বাড়ী আছে, তাঁহাবা শীতকালে সেইখানে থাকেন।

যতীশ আমাব অপেক্ষা আট নয় বৎসবেব বড়। যতীশ আমাকে পড়া বলিযা দেয়, আঁক কষিতে ও লিখিতে শেখায় , আমার সঙ্গে বেড়াইতে যায, গল্প কবে। তাঁহার সৌন্দর্যের কি এক অনির্বচনীয শক্তি দেখিযাছি, যে সকল ভুলিযা তাহার কাছে থাকিতে হয; অথবা তাহাব কাছে থাকিলে সকল ভুলিতে হয়! বলিতে গেলে গোলমাল হইযা যায়, কিন্তু সত্য সত্যই যতীশেব মুখে কি আছে! কলিকাতায় থাকিয়া সে পড়িত, কিন্তু তাহাদেব হোষ্টেলেব নিয়মানুসারে সে বিশেষ কারণ ব্যতীত বাহিরে যাইতে পারিত না , সেই জন্য কলিকাতায আমাদের বড় একটা সাক্ষাৎ হইত না। তাই যতীশ যখন পড়িতে যাইত, আমি সমস্ত বৎসর তাহার মুখখানি ভাবিযা কাটাইতাম। কলিকাতাব মাসগুলা যেন দুই হাতে সরাইয়া, মধুপুরে

যাইবার মাসকে টানিয়া আনিতে ইচ্ছা করিত। লোকে ইহাতে "পূর্ব্বরাগ" ভাবিবে কিনা জানি না , কিন্তু আমার বয়স তখন যাহা, তাহা বলিয়াছি। তবু আমার মনে একটা কথা আছে! সে কথা এই যে বাল্যকালের ভালবাসাই আমাদেব খাঁটি ভালবাসা। পণ্ডিতেরা মানবেব সর্ববিধ সুশিক্ষা বাল্যকালে আরম্ভ করিতে বলিয়াছেন; আমার বোধ হয়, ভালবাসার অনুশীলনও বাল্যকালে করিতে হয। কেননা প্রাপ্তবয়সে মানব-প্রাণ অমন গলিতে পারে না, পরেব ভিতর অমন আপনাকে হারাইতে পারে না, এবং হৃদয়ে পবের অমন সুন্দর ফটোটিও উঠিতে পারে না! যাহা হউক ইহার পবে আমাব অদৃষ্টে যাহা ঘটিল, তাহা পরে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাত্রি গভীর। মধুপুরের বাড়ীতে খাটেব উপবে আমি ঘুমাইতেছিলাম, সহসা ঘবেব মধ্যে কথাবার্তাব শব্দ শুনিযা আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শুনিলাম মা বাবার সহিত কথা কহিতেছেন, আমাবই বিবাহের কথা . আমি নিঃশব্দে আগ্রহপূর্ণ হৃদয়ে তাহা শুনিতে লাগিলাম। নিজের বিবাহেব কথা শুনিতে কোন্ বালিকার সাধ নাই?

শুনিলাম মা বলিতেছেন, "মেয়েব বিযেব ভাবনাযই তো আমাব মাথা ঘোবে। গেল আশ্বিনে আমার সুকুমাবী তের বছরে পড়েছে , আজ পর্যন্ত তুমি কোথাও সম্বন্ধ ঠিক কোল্লে না , হিন্দু ঘরেব মেয়ে কত দিন আইবুড়ো থাক্‌বে? আর তুমিই বা এর পরে তাড়াতাড়ি ওকে কার হাতে দেবে? বাবা উত্তব করিলেন, "মেযেব বিয়েব ভাবনা তোমাব আছে, আমাব কি নাই? পাত্র ত খুঁজচি, তা মনেব মত ঘব বব পাই কৈ? আমাদেব ত একটি মেযে, যাকে তাকে ধবে দিতে পারি কি?"

মাতা। কি বল্‌ছিলে তুমি? — যতীশেব সঙ্গে সুকুর বিযে হ'তে পাবে না কেন? ছেলেটি দেখ্‌তে যেমন সোণার চাঁদ, বিদ্যাবুদ্ধি তেমনি, আবার জমিদাবের ছেলে। অমন পাত্র আর কোথায় পাবে?

আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া শুনিতে লাগিলাম, বাবা উত্তব করিতেছেন, "যতীশেরা খুব বড় কুলীন কাযস্থ। কুলীনের প্রথম ছেলে যতীশ , পাল্‌টী ঘরে বিবাহ না করিলে কুল-রক্ষা হয না। আমরা বড় কুলীন নই, তাই যতীশের বাপ — তিনি গোঁড়া হিন্দু কি না, তাই তিনি এ বিবাহে সম্মত হন নাই। যতীশেব যেন মনে মনে খুবই ইচ্ছা যে সুকুমারীব সঙ্গে বিবাহ হয় কিন্তু বড়ই পিতৃভক্ত , বাপের কথার অন্যথা কত্তে পাবে না।" মা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! আমরা যতীশকে তবে পাব না! অমন ছেলে কিন্তু হবে না।"

ইহার পরে মা বাবা কি কথা বলিলেন, বলিতে পারি না। কারণ বাবার কথা শুনিয়া আমাকে যেন সহস্র বিছা একেবাবে দংশন কবিল! সে অসহ্য যাতনায় চীৎকাব কবিযা কাঁদিতে পাবিলে বাঁচিতাম! তাহা পারিলাম না! যতীশেব সঙ্গে বিবাহ হইবে না, এ নিদারুণ শব্দ, শত বজ্রশব্দ হইতেও আমার পক্ষে ভয়ানক।

তা যতীশের সঙ্গে বিবাহ হইবে, এমন কথা আমাকে কেহই বলে নাই , কেবল আমিই জানিতাম যতীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। কেমন করিয়া জানিতাম, তাহাও বলি। আমি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িতাম; তাহাতে পড়িয়াছিলাম, রাজকন্যারা যাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই সঙ্গে বিবাহ হইত। একদিন সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ও দময়ন্তীর মত একটা বর ঠিক করিতে আমার বড়ই ইচ্ছা করিতে লাগিল।

সে আজি এক বৎসর আগেকার কথা। আমরা তখন কলিকাতায়, সিম্‌লা ষ্ট্রীটের উপরে আমাদের বাড়ী। সদর বারাণ্ডার উপরে চিক ফেলা। চিকের আড়াল হইতে আমি রাজপথচারী অগণ্য লোক-শ্রেণী দেখিতে লাগিলাম , সেই গাড়ী, ঘোড়া, বাইসিকেল, পাল্কী ও পদব্রজে

কত লোক চলিতেছে দেখিলাম, কত সুন্দব মুখও দেখিলাম ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে একটিও বাম, সত্যবান, অর্জুন অথবা নলেব মত দেখিলাম না। কাহাকে দেখিযাও আমাব স্বযম্বরা হইবার সাধ হইল না। তখন ঘরে ফিরিযা আসিলাম।

ঘরে ফিরিযা শুনি, মা পিসীমার কাছে বলিতেছেন, ''যতীশের সঙ্গে যদি আমার সুকুব বিবাহ হয়, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হয় বটে!'' শুনিযা যেন ঘোব-আঁধারে বিজলী দেখিলাম! সেই নবোদিত তপনেব মত সুন্দর, তেজস্বী, সরল ও পবিত্র যতীশ-মূর্তি আমার মনে পড়িল! মধুপুরেব পাহাড়েব উপরে, গৈরিক প্রান্তরে, স্নিগ্ধ নির্ঝরের উপকূলে সেই মধুমাখা কথা, সেই মনোহর গান, সেই প্রাণভরা ভালবাসা মনে পড়িল! —আরও মনে পড়িল, সেই মূর্তি যেন বামের চেয়ে, সত্যবানের চেয়ে, অর্জুনেব চেযে এবং নলের চেয়ে সুন্দর! তখন মনে হইল, যতীশের সহিত যাহার বিবাহ হইবে, সে মেয়ে বুঝি বা সীতা, সাবিত্রী, সুভদ্রা ও দময়ন্তী অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবতী।

আমি দ্বাদশবর্ষীযা বালিকা, আমি সেই অবধি যেখানে দেব-মন্দিব দেখিয়াছি, সেইখানে প্রার্থনা কবিয়াছি, যেন যতীশেব সঙ্গে আমাব বিবাহ হয। যখন পরের বিবাহ দেখিতে গিযাছি, অমনি করিয়া যতীশের সঙ্গে আমাব বিবাহ হইতেছে, মানস-নেত্রে দেখিযাছি, কতদিন ফুলেব মালা গাঁথিয়া, তরুব শাখায় দোলাইয়া ''যতীশেব গলায় দিলাম'' ভাবিযাছি। সেই অবধি যতীশেব চরণে আপনাকে বিকাইয়াছি! এখন আমাব উপায কি?

আজি এই মুহূর্তে নিষ্ঠুর জাগ্রতি আমাব ঘুম ভাঙ্গিযা দিল! এখন আমার উপায কি? আমি নীরবে চক্ষেব জলে বালিস ভিজাইতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমবা কলিকাতায়। — আমাব মাথামুণ্ডু আর কি বলিব, বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে। —যতীশের সঙ্গে নহে, অন্য ব্যক্তিব সঙ্গে। পাত্র একজন হাইকোর্টেব উকিল ; তাঁহাব পিতা বা অন্য অভিভাবক কেহ নাই, নিজেই কর্তা। পাত্রের বিদ্যা, বুদ্ধি, খ্যাতি এবং ওকালতীতে পসার যথেষ্ট। পবের বিবেচনায় আমাব শুভাদৃষ্ট , আমাব বিবেচনায আমার সর্বনেশে অদৃষ্ট, আমাব জীবন্তে সমাধি। এখন বিবাহের আগেই যদি আমাব মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমাব ধর্ম বক্ষা হইতে পারে। প্রকৃত পাপ পুণ্য কিসে হয়, তাহা অবশ্য আমি জানি না , তবে আমি হিন্দুব মেয়ে, হিন্দুব ধর্মগ্রন্থ পড়িয়া উপদেশ শুনিয়াছি, যে মনে মনে পবপুরুষেব প্রতি পতিভাবে চাহিলেও মহাপাপ হয। আমি যদি এখন অন্যেব সহিত বিবাহিতা হই, তাহা হইলে আমাব পক্ষে যতীশ পরপুরুষ, অথচ আজি দেড বৎসর পর্যন্ত মনে মনে আমি তাঁহাকেই পতিভাবে উপাসনা করিতেছি। এখন যে আমাব ইহকালও যায়, পরকালও যায়, আমাব উপায কি? সামাজিক মঙ্গলের তুলনায একজনেব জীবন তুচ্ছ কথা, তাহা জানি। যতীশ ব্যতীত অন্য কোনও সুপাত্র আমার স্বামী হইলে আমি নিজেও মনস্তাপে দগ্ধ হইতে থাকিব, সেই নির্দোষ পুরুষকেও দগ্ধ করিতে থাকিব। তবে সামাজিক মঙ্গলের চবণে আত্ম-বলি দিয়া (বঙ্কিম বাবুর লবঙ্গলতার মত) অপ্রার্থিত স্বামীকে লইযা গৃহধর্ম নির্বাহ কবিতে পাবি। তাহাতে আত্মসংযম ও ত্যাগস্বীকারেব সম্পূর্ণ অনুশীলন হইলেও উপরে যে সর্বান্তঃযামী বিশ্বতশ্চক্ষু বহিযাছে, সে চক্ষু যে আমার পাপের চিত্র দেখিয়াছে। আমি মরিলেও যে ''মা'' বিশ্বজননী আমাকে তাঁহার স্নেহের কোলে স্থান দিবেন না। একজন জ্ঞানী সুবোধ ব্যক্তি এ অবস্থায় পড়িলে কি করিতেন জানি না; আমি বঙ্গীয় বালিকা, আমার মনে হইল, এ অবস্থায় আত্মহত্যাই আমার উপায়।

তা আত্মহত্যার কি পাপ নাই? কিন্তু আমি বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি করিব? যতীশের উপরে আমার যে ভালবাসা তাহা দুর্দমনীয়, তাহা অপরিহার্য্য। সেই সমুদ্রতুল্য অপ্রমেয় ভালবাসা লুকাইয়া রাখিয়া অন্যের পত্নীত্ব স্বীকার করিব! জীবন্তের রাবণের চিতা বুকে

বহিব? সে কাজ কখনও করিতে পাবিব না। — আমার এই কথা শুনিযা লোকে "সোশিয়া-লিষ্টিক" বলিবে ; কিন্তু আমি এত কপটতা, এত চালাকি খেলিযা, "সমাজের মঙ্গল" করিতে পারিব না, — "মা" পৃথিবী! ক্ষমা কবিও।

তা আমার বাবাকে মা'কে দারুণ শোক দিযা যাইব? আমার পায়ে কাঁটাটি ফুটিলে, তাঁহারা কত ব্যথা অনুভব করেন, আর সেই আদরেব মেয়ে আমি নিতান্ত হৃদযহীনের মত মৃত্যুকে সাধিয়া আলিঙ্গন করিলে, তাঁহারা কত ব্যথাই পাইবেন। আমার ছোট ভাই ললিত কত কান্নাই কাঁদিবে! মরিতে পারিব কি?

পাবিব বই কি। আমি আমার সতীত্ব লইয়া পলাইলে, মা বাপেব গৌবব ভিন্ন অগৌরব হয় না। আমি যে সদ্বংশে জন্মিয়াছি, সে বংশের অপমান করা হয না। ললিত বেঁচে থাকুক, উহার বিবাহ হইবে, বৌ আসিবে, তখন মা বাবাব শোকের অনেক শান্তি হইবে।

এইরূপ বহু তর্কবিতর্কেব পব অবশেষে আমি আত্মহত্যা করিতে স্থিবপ্রতিজ্ঞ হইলাম। ঠিক মুহূর্তে ঝি আমাব হাতে একখানা ডাকেব পত্র দিয়া গেল।

হাতের লেখা দেখিয়া চিনিলাম। হাত কাঁপিতে লাগিল , গা কাঁপিতে লাগিল , খামখানা ছিঁড়িয়া পত্র বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলাম ; পত্র এই —

"স্নেহেব সুকু! প্রায় দুই বৎসব তোমাদিগকে দেখি নাই , এ হতভাগাকে এতদিন একটু পত্র লিখিলে না। যাহা হউক আমার পিতৃদেব অতীব পীড়িত; তাহাব চিকিৎসাব জন্য আমবা স্বতন্ত্র বাসা কবিয়া কলিকাতায আছি। তোমবা কলিকাতায় আছ, তাহা জানি। সুকু! যদি বল, তাহা হইলে একদিন তোমাদিগকে দেখিয়া আসি। হযতো সেই দেখাই শেষ দেখা হইতে পারে। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী যতীশ।"

একি! বাবা বলিয়াছিলেন, আমাকে বিবাহ কবিতে ওঁব আন্তরিক ইচ্ছা , সে কথা সত্য বই কি! যতীশ আমাবই! যতীশ আমাবই উপাস্য দেবতা! আমি আনন্দে মবিতে পাবিব! পত্রেব উপরে বাসাব ঠিকানা লেখা ছিল, কিন্তু আমি আজি পত্রের উত্তব দিতে পাবিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইংরাজেবা বলেন, যে সকল দোষে বাঙ্গালী "মানুষ" হইতে পাবে না, দীর্ঘসূত্রিতাই তাহার মধ্যে প্রধান। প্রকৃতপক্ষে বঙ্গীয় পুরুষেরা দীর্ঘসূত্রিতা দোষে দূষিত কি না, সেকথা আমি অবশ্য জানি না, তবে আমি এইটুকু জানি, যে দীর্ঘসূত্রিতা দোষ আমাদেরই — বাঙ্গালীব মেয়েদেরই একচেটিয়া। খোকার দুদ ঠাণ্ডা হইযা যাইতেছে, আব খোকাব মা ঝিনুকটি হাতে করিয়া, দুই পা ছড়াইয়া সেজ পিসীব সঙ্গে গল্প কবিতেছেন, এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছ? আত্মীয়েরা কমলাকে তাড়া দিতেছেন, কমলা হযতো তখন তাডাতাডি বিমলাব নূতন গঠিত হার ছড়াটির সমালোচনা কবিয়া লইতেছেন, এমন দৃশ্য কে না দেখিয়াছ? তাই বলিতেছি, আত্মহত্যা কবিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেও আমাব মবিবার যে বিলম্ব হইতেছে, তাহার জন্য পুরুষেরা যাহাই বলুন, আমাব বঙ্গবাসিনী ভগিনীরা, আমাব অপবাধ গ্রহণ কবিবেন না, সে বিষয়ে আমাব যথেষ্ট ভরসা।

কিন্তু কেবল দীর্ঘসূত্রিতার জন্য নহে, একে বঙ্গবাসিনী, তাহাতে বালিকা , আত্মহত্যা কবিবার কথায় ভয়ও কবে, সুবিধাও পাই না, কাজে কাজেই আমাকে উপহাস করিতে করিতে হৃদয়হীন দিনরাত্রিগুলা মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

সুতরাং আমার গায়ে হলুদ হইল। আত্মীয়া কুটুম্বিনীতে গৃহ পূর্ণ হইল। বিবাহের সময়ে কিরূপ আলো, কিরূপ বাজনা, কিরূপ সমারোহ হইবে ; আমাব গহনা ও পোষাক কিরূপ হইবে, তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। আর বিলম্ব করা অসম্ভব, তাই আমি আত্মহত্যার উপায় স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

উদ্ভাবিত নানা উপায়ের মধ্যে একটি উপায় সহজেই হইল। মা'র পেটে বেদনা হইলে, সেখানে মালিস করিবার জন্য বাবা এক শিশি ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা "বিষ"। বাবা মা'কে বলিয়াছিলেন, "শিশিটা সাবধানে রেখ, ওটা ভয়ানক বিষ"। একটুখানি ঔষধ ব্যবহার করিয়াই মা আরাম হইলেন। মেয়ের বিবাহের ব্যস্ততাবশতঃ বাবা ও মা সেই বিষের কথা ভুলিয়া গেলেন। একটা তাকের উপরে শিশিটা পড়িয়াছিল, অগ্নি-শিখা দেখিয়া পতঙ্গ যেমন আনন্দ প্রাপ্ত হয়, আমিও সেই রকম আনন্দে বিষের শিশি চুরি করিলাম। বিষের শিশি হাতে করিয়া, আমার বুকে যেন ঢেঁকি পড়িতে লাগিল। খাইলে সব গোলমাল চুকিয়া যায়, তাহা জানি , তবু কেমন যেন খাইতে সাহস হইল না। বাক্সের মধ্যে শিশিটি রাখিয়া চাবি দিলাম। ঠিক করিলাম, বিবাহের রাত্রে সকলে যখন আমাকে একা এই ঘরে রাখিয়া জামাতা অর্চনা করিতে যাইবেন, তখনই আমি বিষ খাইব। তার পরে যখন বিবাহের জন্য আমাকে লোকে জাগাইতে আসিবে, তখন সেই উৎসাহপূর্ণ অসহিষ্ণু আহ্বানকে উপেক্ষা করিয়া নিস্পন্দ দেহখানি অনন্ত শান্তির কোলে ঘুমাইতে থাকিবে! নিন্দাশূন্য, প্রশংসাশূন্য, বিবাহশূন্য রাজ্যে তাহার প্রাণ জন্মের মত চলিয়া গিয়াছে।

সবতো ঠিক হইল, কিন্তু প্রাণাধিক যতীশকে একবার বলিয়া যাইতে হইবে। যে কথা এ জন্মে বলি নাই, সে কথাও তাঁহাকে শুনাইতে হইবে। যে মরণের পথে দাঁড়াইয়াছে, তাহার আর লজ্জাই বা কি, ভয়ই বা কি?

তখন নিভৃত কক্ষে, পত্র লিখিতে বসিলাম। কি পাঠ লিখিব, আপনি অথবা তুমি লিখিব, এই সব মীমাংসা করিতে করিতে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। অনেকক্ষণের পরে যাহা স্থির হইল, তাহাই লিখিলাম —

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পাইয়াছি। উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। এ জগতে আপনাতে আমাতে আর দেখা হইবে না। বোধ হয় আপনি আমার বিবাহের কথা শুনিয়াছেন, কিন্তু প্রিয়তম! বহু দিন আগে ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আপনার চরণে আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। আমি বিবাহের ঠিক পূর্বমুহূর্তে আত্মঘাতিনী হইব, ইহাতে লোকে আমাকে যাহা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু আপনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না। আপনার স্নেহের সুকু তাহার সতীত্ব লইয়া চলিয়া যাইবে, আপনি লোকের কথা শুনিয়া তাহাকে ঘৃণা করিবেন না। আর কি লিখিব! যদি জন্মান্তর থাকে তবে জন্মান্তরে যেন কায়মনোবাক্যে আমি আপনারই দাসী হইতে পারি। ঈশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা। ইতি।

অভাগিনী সুকু।"

উপরে নাম ও ঠিকানা লিখিয়া, ঝির হাতে দিয়া পত্র ডাকঘরে পাঠাইলাম। কিন্তু পত্র রওনা করিয়া আমার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! ছি! ছি! এ কি পত্র লিখিলাম? তিনি যে আমাকে "পাহাড়ে মেয়ে" ভাবিবেন। লজ্জায় আমি মরিতে লাগিলাম। কিন্তু আমার অদৃষ্টের নিয়ন্তা যাহা ঠাওরাইতেছেন, তাহা কেবলমাত্র তিনিই জানেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আজি আমার বিবাহ। লোকে জানিতেছে "বিবাহ", আমি জানিতেছি, আজি আমার শেষ দিন। আমাদের বাড়ীর পাশেই ফুলবাগান। আমার ছোট ভাই ললিত ও আমি সেখানে বেড়াইতেছিলাম, আমি মনে মনে মরিবার কথা ভাবিতেছিলাম, তাই ললিতের আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ মুখখানি দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছিল।

বাগানের চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর। প্রাচীরে জানালা। সহসা দেখি, রাস্তার দিকে জানালায় একজন অপরিচিতা রমণী। সে একটা ছোট ঝুড়ি হাতে করিয়া নিতান্ত অপরিচিতার মত

আমাকে বলিল, "চারি টাকার জিনিস চারি আনায় বেচিব, নাওনা গো দিদিমণি?" আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তুমি কে গা?" সে উত্তর করিল, "আমি সুখ'র মা। তোমারি যোগ্য জিনিস এনেছি, নাও গো নাও। পেটের জ্বালায় চারি টাকার মাল, চারি আনায দিব, দোহাই তোমার নাও। তা পয়সা কিছুক্ষণ বাদে দিলেও চলবে। লক্ষ্মীটি আমার নাও, নাও।" সুখ'র মা আমার চির অপরিচিতা হইলেও তাহাব কথাবার্তায় আমরা দুই ভাই বোনে বড়ই প্রীত হইলাম। বাগানে আমার অভিভাবকেরা থাকিলে হয়তো সেই স্ত্রীলোকের প্রতি কোনও রূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন, কিন্তু আমরা তাহাকে দয়ার চক্ষে দেখিলাম, সে নির্দোষ। বিশেষতঃ চারি টাকার কি জিনিস চারি আনায বেচিবে, ইহা দেখিবার জন্য আমবা বড়ই ব্যগ্র হইলাম; ললিতের পকেটে একটা সিকি ছিল, সে আমার সম্মতিক্রমে বাগানের দরজা খুলিযা সুখব মাকে ভিতরে আনিল।

প্রথমতঃ বিক্রেয় জিনিস না দেখাইয়া সুখর মা আমার ও ললিতের নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমরা উভয়ে নাম বলিলে সে নামের খুব সুখ্যাতি করিল। আমবা আগ্রহাতিশয়ে তাহাব বিক্রেয জিনিস দেখিতে চাহিলে, সে চুপড়ী নামাইযা, ছেঁড়া কাগজ, করাতের গুঁড়ি সরাইয়া দেখাইতে বসিল।

তাহার বিক্রেয বস্তু, প্রথম একশিশি "কুন্তলীন" তৈল, মূল্য এক টাকা ; দ্বিতীয় একশিশি "গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন" তৈল, মূল্য দুই টাকা , তৃতীয একশিশি "এসেন্স দেল্‌খোস্‌" মূল্য এক টাকা। আমবা কুন্তলীনের ছিপি খুলিয়া সুন্দর, নির্মল তৈলের মনোমোহন সৌবভে মুগ্ধ হইলাম।

কুন্তলীন তৈলেব বিজ্ঞাপন পড়িযাছিলাম, কিন্তু তৈলটি অদ্যাপি দেখি নাই, তাই আমাব কাছে তৈলের গন্ধ বডই মিষ্ট লাগিল। সহসা ললিত একটুকু গোলাপ গন্ধ কুন্তলীন আমাব নাসিকাগ্রে ধবিল , নবস্ফুট গোলাপের সৌরভে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল! দেখিয়া সুখ'ব মা বলিল "ঐ চেপ্‌টা শিশিতে যে তেল আছে ওতেও খোস্‌বয খুব" , সেটা বাস্তবিক তৈল নহে — এসেন্স দেল্‌খোস্‌। আমবা চতুষ্কোণ শিশি খুলিয়া তাহার আঘ্রাণ লইলাম ; মবি! মবি! কি অপূর্ব সৌবভ! আমাকে মুগ্ধ দেখিয়া ললিত বলিল, "অডি কলোন, ল্যাবেণ্ডাব চেয়ে এব সুগন্ধ মিষ্ট, মনোহব, কেমন নয দিদিমণি?"

এই চারি টাকার জিনিস চাবি আনায় বিক্রয় করিতেছে, ইহাতে অনেক সন্দেহ ঘটিতে পারে। কিন্তু আমরা বালক বালিকা, সন্দেহ করিতে পাবিলাম না। বরং এই চাবি টাকাব এমন বমণীয় সুগন্ধি দ্রব্য চাবি আনায় কিনিলে আমাদেব জুযাচুরি কবা হইবে, মনে হইতে লাগিল। গত আষাঢ মাসে, বাবা রথের বাজাবখবচ চারি টাকা দিযাছিলেন, ললিতকে সেই টাকা কয়টি আনিতে বলিলাম , আমি বাগানে রহিলাম।

আমাকে একা দেখিয়া সুখ'র মা বলিল, "ও সব জিনিসেব দাম দিতে হবে না, দিদি মণি। ও সবই তোমাব জন্য। এই চিঠিখানায় সব আছে। আমি তবে আসি।" আমার হাতে পত্র দিযা, এবং আমাকে কথা কহিবাব অবকাশ না দিযা, সুখ'র মা প্রস্থান করিল। বিস্ময়ে সোৎসুকে আমি পত্র খুলিলাম , লেখা চিনিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িলাম — পত্র এই —

"স্নেহের সুকু! তোমার পত্র পড়িয়া আমার হৃদয় মুগ্ধ হইল। তুমি বালিকা হইলেও দেবী। ভাবিয়াছিলাম, তোমার বিবাহ দেখিয়া তার পরে আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিযা যাইব। তাহা হইল না। আমি সত্য বলিতেছি তুমিও মরিবে, আমিও মরিব।

প্রিয়তমে! আমি আজি তোমার কাছে একমাত্র ভিক্ষা চাহিতেছি, আজ তুমি জীবন ত্যাগ করিও না। আমি আজি প্রাণ ভরিয়া জনমের মত তোমার পবিত্র সরল মুখখানি দেখিয়া লইব। তোমার সহিত যাঁহার বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে, সেই শ্রীশবাবু আমার পরম বন্ধু। তাঁহার সহিত আমি 'বরযাত্রী' হইয়া যাইব।

"কুন্তলীন" দুই শিশি এবং "এসেন্স" এক শিশি দিলাম, ইহার সৌরভ আমাব বড ভাল লাগে, আর মাথার অসুখে ইহা হইতে আমি বড়ই উপকার পাই, সেই জন্য ইহা তোমাকে দিলাম , হতভাগার শেষ উপহার বলিয়া গ্রহণ কবিও। ইতি।

হতভাগা যতীশ"

পত্র পড়িয়া বড় কান্না আসিল। আজ আর মবা হইবে না। উনি আমাকে ঘৃণা কবেন নাই, বাঁচিলাম!

উপসংহার।

"শুভস্য শীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্" কথাটি বহু পুবাতন হইলেও অমূল্য। আজিকার দিনে আত্মহত্যার বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছে, যাহারা ঐ ভযানক কাজ কবেন তাঁহারা যদি রাগের বা দুঃখের প্রথম আবেগটা একটু সম্বরণ করিতে পারেন, যদি "অশুভস্য কালহবণম্" মনে কবেন, তাহা হইলে হযতো আমার মত অনেককেই ঐ মহাপাপে পড়িতে হয না।

সন্ধ্যা হইয়াছে। আমাদেব বাড়ীতে বিবাহের ধূম পড়িয়াছে। আমি পলকে পলকে মৃত্যু পিপাসা সংযত কবিতেছি, আমাব উপাস্য দেবতার আদেশ লঙ্ঘন কবিতে পাবিব না। যখন বব আসিল, যখন আনন্দোচ্ছ্বাসে, বাদ্যহিল্লোলে আলোকতরঙ্গে জনসমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তখন আমি — বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা, চন্দন ও অলক্ত বাগ-রঞ্জিতা, আমি সঙ্গিনীদিগের কোলে মূর্ছিতা হইয়া পড়িলাম।

সংজ্ঞা পাইয়া দেখি, যে বাবা কত বকম ঔষধ আমাব মুখে ও নাকে দিতেছেন। মা কাঁদিয়া বলিতেছেন, "অমন হ'লে কেন মা? ঠাকুর যে মুখ তুলে চেয়েছেন। তোমার জন্য আমি যে সেই হাবাধন পাব মা!" সে কি?

যখন আমাকে বিবাহেব সভায় লইয়া গেল, তখন বাবা গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "বাপ যতীশ। আমার যে চিরদিনের কামনা, তাহা ভগবান আজি পূর্ণ কবিলেন। এখন তাঁব কৃপায তোমবা চিরজীবি হও।" যতীশ কে? বর? আমাব মাথা ঘুবিতে লাগিল। আমি কি বিষ খাইযাছি? বিষের মোহে কি স্বপ্ন দেখিতেছি? তখন অবস্থা, উপযোগিতা সবই ভুলিযা, ঘোমটা খাটো কবিয়া চাহিযা দেখি, আমাব সেই অভীষ্ট দেবতা বব সাজিযা আসনে বসিযাছেন। এ কি সেই আমার অদৃষ্ট চক্র?

বিবাহের সমস্ত আচার অনুষ্ঠান শেষ হইলে, কেবল উনি আব আমি বাসব ঘবে বহিলাম, মা আব কাহাকে সেখানে থাকিতে দিলেন না। উনি আমাব হাতখানি নিজেব কমল কবে লইয়া ডাকিলেন, "সুকু!" সেই চিব পবিচিত অথচ চিব নূতন কণ্ঠস্বব। আমি কথা কহিব কি, চোখেব জলে মুখ ভাসিতেছিল, মাথা ঘুবিতেছিল , জানিযা উনি আমাব মাথায একটু কুন্তলীন দিলেন, আব সেই দেলখোস্ মাখা সুবাসিত রুমালখানি দিযা, আমাব মুখ চোখ মুছাইযা দিলেন। আমার শরীব বেশ একটু স্নিগ্ধ হইল , তখন উনি বলিতে লাগিলেন, "এ সবই ঈশ্ববের কৃপা। তোমার পত্রখানি শ্রীশবাবুকে দেখাইয়া আমি সকল কথা তাঁহাকে বলি। শ্রীশবাবু অতি সদাশয় মহাত্মা। তিনি অনুতপ্ত হইয়া তখনই আমার বাবার কাছে যান। বাবাকে সবিশেষ বলিয়া, এ বিবাহ না হইলে আমাদেব দুজনেব জীবন যাইবে, তাহাও বলেন। ঈশ্ববের কৃপায় আর শ্রীশবাবুব বাক্যকৌশলে বাবা সবই বুঝিলেন , বলিলেন, 'কুলেব চেয়ে আমাব ছেলের জীবন বহুমূল্য।' তাব পরে আমাব শ্বশুর মহাশযকে ডাকিয়া বাবা সব বলিলেন ; আমার শ্বশুর মহাশয় সম্মত হইলেন। তাই শ্রীশবাবুর পরিবর্তে আমিই বর সাজিয়া তোমার বাসরে আসিলাম।"

আনন্দে আমার প্রাণ ভরিয়া গেল। কোথায় আত্মহত্যা, আর কোথায় প্রিয়তমের সহিত চির মিলন ! ওঁর কোলে মাথা রাখিয়া আমি শুইয়া পড়িলাম। শ্রীশবাবুর মহাপ্রাণতা আমার চিরস্মরণীয়।

বনভোজন

শ্রীনি দেবী

মে মাসের প্রারম্ভে আমাব ছুটি হইযাছে। কলেজ বন্দ হইলে বাড়ি যাবার চেষ্টা। আবার মেডিকেল কলেজে ফাষ্ট সেকেণ্ড ইয়ারে (১ম ও ২য় বার্ষিক শ্রেণীতে) এই সময ছুটি হয। একবারে আমাদের সহপাঠীরা সকলেই নিজ নিজ স্থানে গেলেন, আমি এলাহাবাদে যাত্রা করিলাম। আজ এক সপ্তাহ হইল বাড়ি আসিয়াছি, তবু প্রবাসেব গল্প আর ফুরায না। মাঝে মাঝে সেই সঙ্গে যতটুকু ডাক্তারী পাঠাদি, তাহাও বউদিদি ও আমাব ছোট বোন শেলিব কাছে বল্‌তে হচ্চে। শেলির সম্পূর্ণ নাম শেফালি, কিন্তু আমবা "শেলি' বলে ডাকি, অবশ্য তার ছোট মুখে একটি কবিত্বের ছায়া প্রতিভাসিত হইত। শেলি দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। এখনও তাহার বিবাহ হয নাই। আমাব পিতা কুলীন ব্রাহ্মণ, তাই আমাদেব মেয়ে বড় হলেও তত দোষ হয় না। কিন্তু এখানে তা নয, আমবা পশ্চিমে থাকি, তাই পাত্রেব অভাব আব গত বৎসর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী মাবা যাওযাতে আবও ব্যাঘাত ঘটিযাছে। মা আমাব দিদিব অভাবে বড কাতবা। এক বৎসব পরে বাডি আসিয়াছি, কিন্তু একদিনও পিতা মাতাব প্রফুল্ল মুখ দেখি নাই। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এ বৎসব বি, এল, পবীক্ষা দিয়াছেন, তাঁহাব ইচ্ছা বেনাবসে প্রাক্‌টিস কবেন ও পিতাকে কর্ম্ম হইতে অবসব লইবার সুযোগ দেন। কিন্তু কনিষ্ঠা শেফালিব বিবাহই প্রধান অন্তবায। ছোট ভাইটি মিড্‌ল ক্লাসে পড়ে। সেও আমাব বড় অনুগত। আমবা সকলে ভাই ভগ্নী মিলিযা শোকাতুবা মাতাকে সান্ত্বনা কবিতে দিবানিশি চেষ্টা কবি। মাকে অবসব পাইলেই মহাভাবত ও বামাযণের সুন্দর সুন্দব আখ্যায়িকাগুলি শুনাই, কখন কখন সকলে মিলিয়া বেড়াইতে যাই। এই প্রকাব আনন্দে ছুটিব দিনগুলি শীঘ্র শীঘ্র ফুবাইযা যাইতেছে। একদিন শেলি বললে, "এস, দাদা একদিন বনভোজনে যাই চল না।" বউ দিদি সৌৎসুক্যে তাহাতে উৎসাহ দিলেন। আমি বলিলাম "বেশত।" কিন্তু মাতাব অনুমতির অপেক্ষা, বিশেষ আমরা তাঁহাকে বাড়িতে বাখিযা যাইতে চাহি না। অথচ তিনি নির্জ্জনে থাকিতেই ভালোবাসেন। শেলির আগ্রহে মা বলিলেন 'আচ্ছা, তোমবা যেও, আমাব কাল যাওয়া হবে না যেহেতু শ্বশুর মহাশযের বাৎসবিক তিথি, তদুপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হইবে।" সকলে তাহাতেই আনন্দে সম্মত হইলেন। কিন্তু আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। শেলি বললে "কাল না গেলে আমার যাওয়া হবে না, কাল শনিবারে আমাব স্কুলের ছুটি আছে।" অগত্যা তাহাই স্থিব হইল এখন কথা কোথায যাওয়া হবে।

বউদিদি বললেন, "ভাই, আমি ঝুঁসি কখনও দেখি নাই, এইবাব চল ওপারে নৌকা কবে বেড়িয়ে আসি, দেশ থেকে এসে অবধি নৌকায় উঠি নাই।" সকলে তাহাতেই বাজি হইলেন। সেখানে গিয়ে বউ দিদি রাঁধবেন আমবা খাব, ইহাও তাঁহাব সঙ্গে ঠিক করা হইল, যেহেতু বউদিদি মহাশয়া হাঁড়ি হেঁশেলকে বড় ভয় করিতেন। রান্নাঘরে ধোঁয়া দেখলেই চোক লাল হয়ে মাথা ধরিত। কিন্তু আজ আব তিনি পিছপা নন। আমাব ছোট ভাই গুণনাথ সেও প্রস্তুত হইল। শেলির কথাই নাই, অধিকন্তু তাহাব সঙ্গিনী নলিও সেই সময় আমন্ত্রিত হইলেন।

নলিনী আমার পিতার বন্ধুর কন্যা, শেলির সমবয়স্কা ও সহপাঠিনী। আমরা পাঁচ জন বনভোজনের যাত্রী, ইহা ছাড়া একজন দাসী ও চাকরও সঙ্গে যাইবে মা বলিলেন। কোনমতে রাতটা পোহাইল। সর্ব্বাগ্রে শেলি উঠিয়া প্রাতঃ কৃত্য সারিয়া নলিকে আনাইয়া লইল। ক্রমে আমরা সকলেই প্রস্তুত হইলাম। মা আমাদের আহারের সামগ্রী সকল গুছাইয়া দিলেন। ঘোড়ার গাড়ি করিয়া দারাগঞ্জের ঘাট পর্য্যন্ত গেলাম। সেদিনকার প্রাতঃকাল তত পরিচ্ছন্ন ছিল না, আকাশ যেন ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন। মা একবার উপরদিকে চাহিযা বলিলেন, "যাচ্চ, তোমরা, মেঘ করেছে যেন।" আমাদের যাইবার উৎসাহ এত বেশি যে সে কথার প্রতি আর কাহারও মনোযোগ হইল না। মহানন্দে আমবা যাত্রা করিলাম ও দারাগঞ্জের ঘাট হইতে একখানি নৌকা করিয়া সকলে পারে চলিলাম। গুণা ঘড়ি খুলিয়া দেখিল বেলা ৯টা হইয়াছে, কিন্তু রবির নবীন ছবি গঙ্গাবক্ষে শোভিতেছে না। নৌকা তর তব বেগে বহিয়া যাইতেছে। প্রভাত পবন চপলমতি বালকের ন্যায় জাহ্নবীর মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত ধবিয়া নাচিতেছে, কখন ঘোমটা খুলিয়া দিতেছে, কখন আঁচলখানি লইযা দোলাইতেছে, গঙ্গাবধূর বীচিমালা যেন ব্যঙ্গ কামিনীব অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোছার মতন যেখানে সেখানে ছড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে। দুধারে সৈকত তীরে আজ আর বেশি লোকজনের সমাগম নাই। পক্ষিগণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিয়া নীড় ছাড়িয়া উঠিতেছে না। আমবা সকলে সূর্যদেবের অভাবে যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলাম। বউদিদির আর সে হর্ষোৎফুল্লতা দেখা যাইতেছে না। শেলি নলিও চুপ করিয়া বসিয়া কেবল নৌকার গতি, জলের তরঙ্গ, পবনের রঙ্গ ও মেঘের গম্ভীর বদন দেখিতেছে। মাঝিদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বায়ু প্রতিকূল নহে। ক্রমেই আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। নৌকা ঘাটে লাগিল, আমরা সদলে নামিলাম ও কিছুদূরে গিয়া একটি বাগানে বৃহৎ বকুল বৃক্ষতলে বসিলাম। দাসী ও চাকর আহারেব আযোজন করিতে লাগিল। শেলি নলি বউদিদির সঙ্গে গেল ফুল তুলিতে। আনবা দুই ভাই উদ্যানেব পার্শ্বস্থ একটি সন্ন্যাসীর আশ্রম দেখিতে গেলাম। গঙ্গাতীরের উচ্চ ভূমিখণ্ডের উপরে এক খানি বাড়ী, কিন্তু প্রকোষ্ঠ ভিন্ন ভিন্ন। একখানিতে যত ফকির সাধু আসিয়া আশ্রয় লয়, অপরটিতে সন্ন্যাসীর আশ্রম ও শিষ্যেরা বাস কবে ও তদুপরিস্থ ভূমিখণ্ডের উপরিভাগে একটি কূপ, শুনিলাম ইহা সমুদ্রের সঙ্গে যুক্ত আছে বলিয়া ইহাব জল বিখ্যাত। সেই কূপেব সন্নিকটে একটি ছোট খাট ফুল বাগান। ক্রমে সন্ন্যাসী ঠাকুরের চেলার সহিত ভাব করিয়া বাবাজির নিকটে গেলাম। বাবাজি একখানি মৃগচর্ম্মে উপবিষ্ট ও শীর্ণকায়, বয়স পঞ্চাশতেব কম নহে। প্রশান্ত মূর্ত্তি। আমাদিগকে ইঙ্গিতে বলিলেন, এ সময় কেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছ। পরে অন্যান্য অনেক প্রকাব উপদেশ পূর্ণ আখ্যান কহিলেন। বাবাজির গৃহে একটি সেতার ও কতকগুলি পুরাতন পুঁথি গেরুয়া বস্ত্রে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। শিষ্যজি কহিলেন, গুরু ইচ্ছামত গীতা আবৃত্তি করেন। ইহার পর প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম। ইচ্ছা হইল সহযাত্রীদিগকে ফিরিবার সময় দেখাইযা লইয়া যাইব। সেখান হইতে ফিবিয়া দেখি, বাগানে মহা ধুম, বউদিদির হাতে হাঁড়ি। শেলি নলি চাল ধুইতেছেন, কুটনা কুটিতেছেন, দাসী চাকরকে বাধা দিয়া জল আনিতেছেন। বড় আনন্দ। আমিও ইহাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতির বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আত্মার স্ফূর্ত্তি কমিয়া গিয়াছে। যা হোক খাওয়া দাওয়া হইলো, ক্রমেই আকাশ ঘনমেঘে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া ঘাটে আসিয়া মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম দেখিতেছ, এখন কি নৌকা ছাড়িবে?" তাহাবা কহিল "এখনও কোনও ভয় নাই, আমরা বাড়ি পৌঁছাইয়া যাইব, ঢের সময আছে।" সেই বিজ্ঞ কর্ণধারের জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া আমরা যাত্রা করিলাম। কিছু দূব যাইতে যাইতে বায়ুর বেগ প্রবল হইতে লাগিল, তখন মাঝ গঙ্গায় নৌকা আর কি হইবে? মাঝিরা পাল খুলিযা গুণ টানিযা লইযা

যাইতে লাগিল। ক্রমেই চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে পূরিয়া গেল, ঝড় দেখা দিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। গঙ্গার তরঙ্গের ধ্বনি বায়ুভরে কম্পমান। ঢেউগুলি গায়ে গড়াইয়া পড়িতেছে। ক্রমে নৌকার তলভাগে লাগিতেছে — কূলে কূলে গিয়া পাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, ঝড় সত্যসত্যই প্রবল বেগে গাছপালা ভাঙিয়া মাটি ধুলা বালি উড়াইয়া সবেগে নৌকা আক্রমণ করিল। গুণের দড়ি ছিঁড়িয়া গেল, মাঝিরা আছাড় খাইয়া পড়িল। বালিকা দুইটি এ উহাকে প্রাণপণে ধরিয়া আমার কোলে মাথা দিযা পড়িয়াছে। আমাদের বৌদিদি গুণনাথকে আশ্রয কবিয়া আছে। জলে যেমন তরঙ্গ, আমাদের প্রাণে তেমনি ভয়ের তরঙ্গ, হৃৎপিণ্ড ধক্‌ধক করিয়া আসন্ন মৃত্যু গণিতেছে। আমার ভাবনা — কি করিয়া এই বিপদ হইতে ভাই ভগিনীগুলির প্রাণ বাঁচাইব। কোনও উপায়ই ঠাওরাইতে পারিতেছি না। ঝড়ের জোবে নৌকা ঘুবিয়া ফিরিয়া জলে ভরিয়া গেল। তখন আমরা উহা হইতে লাফান স্থির করিলাম। কিন্তু হতভাগ্য বালিকারা যে সাঁতার জানে না। তবু আমি শেলি নলিকে বলিলাম "আমাব কোমর ধর।" বউদিদি ও গুণা সাঁতার জানিতেন। নৌকা ছাড়িয়া আমরা সেই অন্ধকাবে তরঙ্গ সঙ্কুল জাহ্নবীর কোলে ভাসিতে ভাসিতে স্রোতোভিমুখে চলিলাম। দুইটি বালিকাকে টানিযা টানিয়া ক্লান্ত হইযা পড়িলাম, আর পারি না, কূল-কিনারা বা কোথায? এক একবাব বিদ্যুদালোকে কেবল জলের তোলপাড চক্ষে পড়িতেছে। কিন্তু ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজাযা যে কোন্ দিকে গেলেন, তাহার ত চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। ক্রমে আবও বিপদে মগ্ন হইলাম। মেযে দুটির হাত আমাব কোমব হইতে ছাড়িয়া গিযাছে, তাই আমি নিজে হালকা হইযাছি। এদিকে ঝড়েব বেগও প্রশমিত হইয়া আসিল। আমি যথাসাধ্য বলে সাঁতাব কাটিযা তীবে উঠিলাম। তখনও বাতাস এক এক বাব সোঁ সোঁ রবে ক্রোধাহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জিযা উঠিতেছিল। কূলে গিয়া সেই বালু ভূমিতে আর্দ্রবস্ত্রে পড়িয়া থাকিলাম। তখন সন্ধ্যা অতীত। নির্জ্জন নীবব তটদেশে জন মানবেব চিহ্ন নাই, কেবল দূরে একখানি কুটীবে ক্ষীণ আলোক জ্বলিযা উঠিল। অবসন্ন দেহ প্রাণ লইযা উঠিলাম। এ মুমূর্ষু প্রাণে কিসেব বল, কোথা হইতে আসিল, পাঠক পাঠিকাবা সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমাব জীবনেব জীবন ভাই ভগ্নীগুলিব উদ্দেশ এক্ষণে প্রাণে শত বল শত উদ্যম জোগাইতেছে। আমি সেই ক্ষীণালোক ধবিযা কুটীব অভিমুখে গমন করিলাম। বাহির হইতে দেখি কেহ কোথায নাই, একটি স্ত্রীলোক বসিযা কেবল জপ করিতেছেন। আমি যাইতেই জপ ভঙ্গ করিয়া, স্বয়ং জিজ্ঞাসিলেন "কে তুমি এমন দুর্যোগে?"

আমি, মনুষ্য কণ্ঠস্বরে যেন কত বল ভরসা পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। আর্দ্রস্বরে কহিলাম "মাগো! ঘোর বিপদাপন্ন জনকে একটু স্থান দেও।" তখন ভিতরে গিযা দেখি কুটীরখানির মধ্যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আছে। আমি নিজের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম ও কিঞ্চিৎ অগ্নিসেকে হাত পা সোজা করিয়া নদীর কূলে কূলে ভ্রাতা ভগ্নীর নাম করিযা গতি চিৎকাব স্বরে ডাকিতে লাগিলাম। কুটীর বাসিনী বৃদ্ধার নিকট জানিলাম আমি বেণীঘাটে আসিয়া পড়িয়াছি। পরে গঙ্গাতীরে তীরে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে দেখি কতকগুলি লোক সন্ধ্যার আঁধার ভেদ করিয়া বড় বড় মশাল লইয়া আমাব দিকে আসিতেছে। নিকটস্থ হইয়া দেখি নিদারুণ উদ্বিগ্নমনা পিতা স্বয়ং আমাদিগকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে দেখিয়া আর ক্লিষ্ট, প্রাণের আবেগ সামলাইতে পারিলাম না, দুই চক্ষুর জলে অন্ধ হইয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া বলিলাম "বাবা! সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সব হারাইয়াছি।" পিতা হৃদয়েব গুরুভার হৃদয়ে চাপিয়া বলিলেন "আর এখন বিলম্ব করা উচিত নহে, চল খুঁজি গিয়া।"

মশাল লইয়া ডুবুরিরা অনুসন্ধান করিতে করিতে গুণা ও ভ্রাতৃজায়াকে পাইল, কিন্তু তাহারা অচেতন। পিতা শেলি নলির জন্য দারুণ ব্যাকুলিত হইয়া পড়িলেন। আমাকে কহিলেন

ইঁহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ চিকিৎসালয়ে গিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা কর, আমি মেয়ে দুটির অনুসন্ধান করিব। উহাদিগকে লইয়া চিকিৎসকের নিকটে গেলাম। সমস্ত রাত্রি অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা উভয়েরই চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা চক্ষু মেলিয়া কাতর দৃষ্টিতে চাহিলেন। আমাকে দেখিয়া তৃপ্তি হইল না, বালিকা দুটি কোথায় জানিতে চাহিলেন। চিকিৎসকের আজ্ঞামত আমি কহিলাম তাহারা অন্য ঘরে আছে। তাহাদিগের জীবনের আশা দেখিয়া নিজে ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে কিছু ঔষধ লইয়া রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র পিতার কাছে গেলাম। নৈরাশ্যকাতর; পীড়িত ও সমস্ত রাত্রি জাগরণে অপরিসীম শ্রমে শ্রান্ত পিতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই সকল লোকজন লইয়া হতাশমনে গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। যত খুঁজিতেছেন, তত আরও গঙ্গার গভীরতর তলদেশ হইতে গভীরতম প্রদেশে যাইতে ইচ্ছে হইতেছে — কিছুতেই নয়ন মনকে বুঝাইতে পারিতেছেন না যে তাঁহার পরম স্নেহের শেলি আর নাই। তাঁহার এই অপ্রত্যক্ষ দারুণ ক্ষতির জন্য অবিশ্বাসী হৃদয়কে আর গঙ্গাতীর হইতে সরাইতে পারিতেছেন না। মানবচক্ষু পদে পদে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখিতে চায়, চক্ষুর অগোচর কার্যে বিশ্বাস কোথায়? তাই হাতে হাতে প্রমাণ না পাইলে নয়নের সাধ মিটে না। মনুষ্যের সকল সাধনা চক্ষুর তলে — মুদিয়াই থাকি, মেলিয়াই থাকি। যোগী, ভোগী, সাধু, অসাধু, সৎ, অসৎ সকল ব্যাপার না দেখিলে মনুষ্য জীবন পূর্ণ হয় না। তাই আজ পিতার নৈরাশ্যে আশা-মিশ্রিত সন্দিহান হৃদয় লইয়া পীড়া। আজ যদি শেলির মৃতদেহ খানি তিনি দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে এরূপ চিত্তের বৈকল্য থাকিত না — একেবারে শেষ সীমায় গিয়া দাঁড়াইতেন। অনেক অনুসন্ধানে পরাজিত হইলাম। আমি বহু কষ্টে সৃষ্টে একখানি গাড়ি করিয়া তাঁহাকে বাড়ী পাঠাইলাম ও নিজে হাঁসপাতাল হইতে ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়াকে লইয়া বাড়ি গেলাম। সকল শোক দুঃখের অপেক্ষা প্রধান আশঙ্কা, ভয় ও ভাবনা — মাতার নিকটে কি বলিয়া মুখ দেখাইব। অকালে তাঁহার লক্ষ্মী সরস্বতী বিসর্জন দিয়া আমার অশক্ত পদদ্বয় তাঁহার দিকে অগ্রসর হয় না। বাটী পৌঁছিয়া বহির্বাটীতে থাকিলাম। মাতা কনিষ্ঠ পুত্র ও বধূকে দেখিয়া দারুণ হৃদয়-বিদারক স্বরে তাঁহার প্রাণের শেলির অভাব জানাইলেন। সেই অশ্রুপ্রবাহে কত অশ্রু মিলিত হইয়া শোক-সিন্ধু প্রত্যেক অন্তরকে ভীষণ তরঙ্গায়িত করিতে লাগিল। অশান্তি, অনিদ্রা, অনাহার, অনুতাপ ও অবসন্ন দেহ মন লইয়া আমাদের পরিবারের দুঃসহ দিনগুলা কাটিতে লাগিল। প্রভাত হয়, সন্ধ্যায় ঢাকে। রজনীর গাঢ় তিমির সূর্যের উজ্জ্বল আলোকে ধুইয়া যায়, কিন্তু মানব প্রাণের ঘোর শোকাচ্ছন্নতা কিছুতেই দূর হয় না। কালের সৈকত রাশি স্তরে স্তরে নদীকে আবৃত ও রুদ্ধ করে, কিন্তু মরমের গূঢ়তম প্রদেশের অন্তঃসলিলা চির-প্রবাহিতা।

ইহার পর দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কত রূপান্তর। আমাদেরও তাই। আমি মেডিকেল কলেজ হইতে পাস হইয়া চাকরি পাইয়াছি। নানা স্থানে ঘুরিয়া অবশেষে শাহারণপুরে আসিষ্টান্ট সার্জনের পদাভিষিক্ত হইয়াছি। সাংসারিক সুখ দুঃখের বোঝা পৃষ্ঠে বহিয়া, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত নানা চিন্তা নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কনিষ্ঠা শেলির সেই সরল মুখখানির প্রতিবিম্ব হৃদয়-দর্পণ হইতে সরাইতে পারি না , কিন্তু পিতা মাতার নির্বাপিত আগুন জ্বলিয়া উঠিবার ভয়ে মুখে কিছু প্রকাশ করিবারও জো নাই।

বড়দিনের ছুটিতে দাদা সকল পরিবারকে লইয়া এখানে আসিয়াছেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় তিনি দেরাদুনে গিয়া কিছুদিন থাকিবেন। কেবল আমার পিতা এলাহাবাদের বাড়িতেই রহিলেন। তিনি এখনও শেলির বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত। তাঁহার প্রাণের কন্যার মমতা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। সকাল বিকাল প্রত্যহ সেই গঙ্গাতীরে গিয়া যতদূর দৃষ্টি যায়, চক্ষু প্রসারিত করত খুঁজিয়া লন, ও কল্পনার সাহায্যে এই দেখেন যেন জাহ্নবীর বিশাল বক্ষভেদ

করিয়া কোমল স্বর্ণবলয়-শোভিত হাত দুখানি বাড়াইয়া কে বলিতেছে "আমায় ধর, আমায় তোল, আমি ভাসিতেছি।" এইরূপে বিষম সন্দেহ দোলায় দুলিয়া দুলিয়া তাঁহার জীবন কাটিতেছে।

আমি মাতাকে হরিদ্বারে লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। তিন দিনের ছুটি পাইয়া তাঁহাকে লইয়া তথায় গেলাম। হরিদ্বার এখান হইতে নিকট, ৩/৪ ঘণ্টার পথ। আমরা ভোরে ৭টায় উঠিয়া, লুকসের স্টেশনে একবার গাড়ি বদলাইয়া বেলা ১১টার সময় তীর্থস্থানে পৌঁছিলাম কিন্তু পূর্ববর্ত্তী স্টেশন জ্বালাপুর হইতে মা গঙ্গার পেয়াদা আমাদিগকে পাকড়াও করিযাছিল। পরে হরিদ্বার স্টেশনে পৌঁছিবামাত্র মধুচক্রে মধুমক্ষিকাদল-প্রায় তাহারা চারিদিক্ ঘেরিয়া ফেলিল। আমরা যেন ব্যূহের ভিতর পড়িলাম। সকলেই পাণ্ডা হইতে চায়, তাহাদেব ঐ এক প্রশ্ন "মশা কোথা বাড়ি? চাটুর্জ্জি, মুখুর্জ্জি কি আছে?" সকলের হাতে এক এক খানি খাতা বহি। এখানকার রীতিই এই, গঙ্গাস্নান ও গঙ্গাপুত্রের খাতায় স্ব স্ব নাম ধাম লেখা। এমন কি পিতা পিতামহ ইত্যাদির নাম গোত্র লেখাইতে হয়, তাহা হইলে উহারা যজমান বাঁধিযা রাখেন। আমি অনেক কষ্টে উহাদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু একটি লোক নাছোড়বান্দা হইয়া আমাদেব সঙ্গ লইল। অবশেষে তাহার খাতায় পিসিমার নাম গোত্র প্রকাশিত হইল, এজন্য তাহার দাবী দাওয়া অধিক। যাহোক আমরা স্টেশন হইতে নামিয়া সোজা গঙ্গাতীরে যাইব কিম্বা বাসায় ফিরিব ইহাই বিবেচনা করিতেছি, তখন সেই হরিদ্বাব পথপ্রদর্শক পাণ্ডা মহারাজ কহিলেন "এখানে একটি বাঙ্গালি মাইর আশ্রম আছে, সেইখানে সকল বাঙ্গালি বাসা লয়, অতএব আপনারাও গিয়া সেইখানে বাসা লইবেন।" মাতাব মনে সেই পরামর্শ ভাল বোধ হইল। অতএব আমরা দুইখানি এক্কানামক মর্ত্তবথ ভাড়া কবিলাম। একখানিতে আমবা মাতাপুত্রে ও অপর খানিতে ভৃত্যরাজ জিনিস পত্র লইযা উঠিলেন। পাণ্ডাজি পিছু পিছু চলিলেন। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক বকমের লোক কেহ পদব্রজে কেহ রথে চলিলেন। সকলেই তীর্থযাত্রী। একই আশা — একই ভবসা কবিযা আসিয়াছি। আমাদের এক্কা বেগে যাইতে চেষ্টা করিয়া পারিতেছে না, পথ বড় অসরল — উঁচু নিচু, বাঁকা চোবা। কিন্তু কাহারও সে বিষয় গ্রাহ্য নাই। সকলেই সানন্দে সৌৎসুক্যে প্রকৃতির নবীন দৃশ্যময়ী মূর্তি দেখিতে ব্যগ্র। অদূরে শৈবালিক গিরিবর অলস ভাবে ভীমকায় বিস্তাব করিযা শুইয়া আছেন। তদুপরি কত তরু গুল্ম কোমল হরিৎ লতা পাতা ছড়াইয়া সাদবে শৈবালিকেব গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আছে, যেন সুকুমার শিশুগুলি মাযের বক্ষে থাকিযা গলা জড়াইয়া মধুর চুম্বন দানে ব্যস্ত। সর্ব্ব প্রাণ-তোষক পবন দুলিয়া দুলিয়া ক্রীড়া করিতেছেন। এই পার্ব্বতীয শোভাপূর্ণ নির্মল স্বচ্ছবায়ু সেবিত প্রকৃতির লীলা-ভূমি হরিদ্বার কিম্বা হরদ্বারকে স্বর্গদ্বাব বলিতে কাহার না ইচ্ছা করে? পূত ধারাময়ী জাহ্নবীব জন্মস্থান এখানে। এক কালে সগর বংশীয় ভগীরথ এই স্থান হইতে গঙ্গা প্রবাহেব সৃষ্টি করেন। হিমাদ্রি শিখর ভেদ করিয়া সে স্থান হইতে এই অমৃত ধারা নিঃসারিত হইতেছে, তাহাও ইহার সন্নিকটেই। সেই স্থান গঙ্গোত্রি নামে অভিহিত। যাহোক আমরা বাঙ্গালি মাইর আশ্রমে উপনীত হইলাম। আশ্রম একখানি ক্ষুদ্র একতালা বাড়ি, ভিতরে নারায়ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির গৃহ, তৎপার্শ্বে আব একখানি দালান ও উঠান, তার সম্মুখে একখানি রাঁধিবাব চালা ও অন্যান্য আবশ্যক স্থান। বাড়িটি ছোট কিন্তু অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। উঠানে পুঁইশাকের একটি মাচা, কয়েকটি ফুল গাছও আছে। গৃহস্বামিনী বাঙ্গালি স্ত্রীলোক, কিন্তু সুদীর্ঘ জটাধারিণী, বয়স অনুমান পঞ্চাশৎ। দেখিতে গৌরবর্ণা। ব্রাহ্মণ তনয়ার মত প্রকার বটে। অবস্থা সম্পূর্ণ গৃহীর মত হইলেও তিনি নিজ বৈধব্য-দগ্ধ জীবন এই পবিত্র স্থানে এইভাবে কাটাইতেছেন বলিয়া সাধু ফকির মধ্যে পরিগণিত। আমরা দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র সেই রমণী সাদরে আমাদিগকে গ্রহণ কবিলেন।

আমরা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে গঙ্গা স্নানে যাইবার উদ্যোগ করিলাম। গৃহ স্বামিনী কহিলেন "আপনারা কতক্ষণে ফিরিবেন? আমি আপনাদের জন্য পাক করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আজ আমার এক স্থানে যাইবার কথা আছে — " বলিয়াই আবার কহিলেন "আপনারাও কি যাইবেন? গতকল্য এখানে একজন মহাত্মা আসিয়াছেন, তিনি না কি ত্রিকালজ্ঞ অতি বৃদ্ধ প্রাচীন সন্ন্যাসী, সকলেই তাঁহার দর্শনে যাইতেছে, আমিও তাঁহাকেই দর্শন করিতে যাইব। তিনি চণ্ডীর পাহাড়ে চণ্ডীদেবীর মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন।" এই কথায় আমরাও তাঁহার সহযাত্রী হইবার ইচ্ছা করিলাম ও বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া পদব্রজে গঙ্গাস্নানে চলিলাম। আমাদের গন্তব্যস্থান বহুদূর নহে। অল্পক্ষণ পরে আমরা "হরকি পউড়িতে" পৌঁছিলাম। হরিদ্বারে এইখানেই সকল যাত্রী স্নান দানাদি করিয়া থাকেন ও অপর পার্শ্বে কুশাবর্ত্তঘাটে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি হয়। "হরকি পউড়ির" ঘাটের উপরেই প্রয়োজন উপযোগী দোকান পসার। ইহা ছাড়া ফুলতোলা মালী, দুগ্ধবিক্রেতা, ফলবিক্রেতাও মাঝে মাঝে বসিয়াছে। ঘাটের উপরেও অনেক দেব-দেবীর মন্দির। আমরা সম্মুখস্থ সোপানোপরি বস্ত্রাদি রাখিয়া জলে নামিলাম। পাণ্ডাজি সেইখানে তাঁহার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে লাগিলেন — "মা সঙ্কল্প কর, হাতে জল নাও, আমি মন্ত্রপাঠ করিতেছি। কিন্তু তুমি বল এইখানে পঞ্চমুদ্রা দিয়া হরির চরণ পূজা করিব।" আমি তাহার এই অযথা আদেশের অপ্রতিপাল্যতা তাহাকে বুঝাইয়া কহিলাম "তোমার যাহা প্রাপ্য, তাহা অবশ্যই পাইবে।" এই রূপে ক্রমে ক্রমে সকল দান অপ্রতিহত ভাবে প্রদত্ত হইল। যথা নিয়মে সেখানকার সকল কার্য সমাধা করিয়া বাটী অভিমুখে প্রত্যাগত হইলাম। ঘাটে ও পথে অনেকের মুখেই সেই প্রাচীন সাধুর আগমন বার্তা শুনিলাম ও অনেকেই যাইতেছে দেখা গেল। অতএব আমরাও আর বিলম্ব না করিয়া সাধু-সন্দর্শনে যাইবার জন্য উৎসুক হইলাম। বাসায় আসিয়া গৃহস্বামিনীর প্রদত্ত ভাত কলাইয়ের ডাল আর পুঁইশাক চড়চড়ি পরমানন্দে আহার করিয়া চণ্ডীর পাহাড়ে চলিলাম। আমার ত কোনও কষ্ট হইল না, কিন্তু মা আমার রোগে-শোকে কাতর ও ক্লিষ্ট, তিনি যে আরও শ্রান্ত হইবেন ইহাই আমার মনে হইতে লাগিল। অবশেষে নীলধারা অতিক্রম করিয়া আমরা সেই ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিলাম। শত শত যাত্রী অবাধে উঠিতেছে নামিতেছে। আজ অপেক্ষাকৃত লোকের ভিড় বেশী। সকলের মুখে সাধুর মাহাত্ম্য বর্ণিত, আমাদের পৌঁছিতে বিলম্ব হইয়া পড়িল। মা অতি ধীরে ধীরে হাঁটেন, তাহাতে বেলা অবসান প্রায়, অপরাহ্ণ ৫ টার সময় পর্বতেব উপরে গিযা উপনীত হইলাম। দর্শনার্থীগণ এ সময় আসিতে ভয় পায়, পাছে ফিরিয়া যাইতে অন্ধকার হয়। মন্দিরের পার্শ্বে মহাত্মার আসন শুনিলাম। আমরা মাতা পুত্রে যখন গেলাম, তখন চণ্ডীদেবীর পাণ্ডা ছাড়া আর কেহই তথায় ছিল না। মৃগচর্মোপরি উপবিষ্ট একটি অশীতিবর্ষীয় বৃদ্ধ যোগী। শ্বেত জটা ও শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফে মুখমণ্ডল শোভিত। গৈরিক বসনে দেহ আবৃত। ঋষিবর নয়নমুদ্রিত করিয়া একান্তচিত্তে ওঁকার ধ্যান করিতেছেন। কেমন পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি যেন স্বয়ং মহাদেব তপস্যায় রত। আর কি দেখিলাম সে অতি বিচিত্র অভাবনীয় দৃশ্য ; উহারা কি দেবতা কি মনুষ্য, তাহাও নয়নে মনে ঘোর ধাঁধা লাগিয়া গেলো। কি দেখিতেছি সত্য না স্বপ্ন আসিয়া এই ক্লান্ত দেহে কুহকাবৃত করিয়াছে কিছুই ত বোধগম্য হইতেছে না। যেন জয়া বিজয়া দক্ষিণে বামে মহাদেবের দুই পার্শ্বে অবস্থিতা, রমণী দুইটির সন্ন্যাসিনী বেশ। বয়ঃক্রম ২০/২২ বছরের অধিক নয়। এই কোমল প্রাণে কিসের বৈরাগ্য? কেন নবীন বয়সে তাপসী বেশ? এই সুন্দর মুখমণ্ডলে কেন প্রীতি-প্রফুল্লতার অভাব? পূর্ণিমার চন্দ্র যেন শ্যামল মেঘে আচ্ছাদিত। আমরা মাতা পুত্রে নির্বাক্ নিষ্পন্দ হইয়া অনিমেষে চাহিয়া আছি, প্রাণের ভিতর ঘোর সন্দেহ কম্পন হইতে লাগিল। এ যেন শত পরিচিত স্নেহসিক্ত মুখ। মায়ের মনে পুরাণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার চক্ষুদ্বয় জলে ভরিয়া গেল।

অতীতের কাহিনী যেন স্মৃতির ভিতর চমকিয়া উঠিল। তিনি আশার বিদ্যুদালোকে জগতেব স্থায়িত্ব দেখিতেছেন, তাঁহার স্নেহের তরু-লতাগুলি বাঁচিয়া আছে, কাননখানি পূর্ণ। কিন্তু সন্দেহের মেঘে ঘোর আচ্ছন্ন, তাই আবার অন্ধ। নয়ন মন সকলি অন্ধ। অবশেষে মা আমার গললগ্নীকৃতবাসে সেই নবীন যোগিনীদ্বয়কেই প্রথম প্রণাম করিতে উদ্যতা হইলেন। তাহারা আপত্তি করিয়া কহিল "ক্ষান্ত হইন, আমাদের গুরুদেবের সমক্ষে আমরা প্রণাম লইতে পারি না।" এই কথা শুনিবামাত্র মাতার ধৈর্য্যচ্যুতি হইল, তিনি সেই রমণীর হাত ধরিয়া নিজের বক্ষের ভিতর টানিয়া কহিলেন "ওগো মা! একবার ত মা বলিয়া ডাক, আমার তাপিত প্রাণ শীতল হউক। এ যে সেই কণ্ঠস্বর যাহা আজ দশ বৎসর শুনি নাই, যে মুখ দেখিবার জন্য নয়ন ব্যাকুল, যে বাক্য শুনিবার জন্য কর্ণ আকুল, একবার ডাক্ মা।" আমার মাতাব এই ভাব দেখিয়া নবীন সন্ন্যাসীনির চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িল। সে কহিল "মা কোথায়? আমি কোথায়?" এই বলিতে বলিতে মোহভাবাপন্ন হইয়া অচৈতন্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। দ্বিতীয়া রমণী আগন্তুকদ্বয়ের আগমনে এমন ঘটিল কেন ভাবিয়া গুরুদেবেব পদবন্দনা করিযা ধ্যান ভঙ্গ করাইল। তিনি কাহাকেও কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিজ কমণ্ডলুর জল সেচনে প্রথমা চৈতন্য জন্মাইয়া পুনরায় স্বস্থানে বসিলেন। আমি তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক কহিলাম "অদ্য সুপ্রভাত, সফল হইলাম চবণ দর্শনে।" সন্ন্যাসী ঈষদ্ হাস্যে চাহিলেন ও কহিলেন "দর্শন পাইলে, এখন প্রস্থান কর, নচেৎ রাত্রিকালে এখান হইতে নামা কষ্টকব হইবে।" মা শুনিবামাত্র কহিলেন "না ঠাকুর, আর যাইব না যে পর্যন্ত না আমার অন্ধ নয়ন খুলিবে। আমি যে সেই সকল দেখিতেছি। সেই মুখ, সেই কথা, সেই স্নেহেব টান আমাব অন্তরে উথলিয়া যাইতেছে। আমাকে দয়া করিয়া ঐ শিষ্যা দুইটি দান করুন। মানব যখন নিরাকাব ঈশ্ববের স্বরূপ ভাবিতে পাবে না, তখনই প্রতিমূর্তি গড়িযা পূজা করে। তাহাকে দেখিতে না পাই, তাহারই চিত্র আঁকিয়া চক্ষেব সম্মুখে বাখি। স্বরূপেব পরিবর্তে প্রতিরূপ কি মনুষ্যের চিত্ত শান্ত করে না?" সন্ন্যাসী কহিলেন "কেন মা ব্যাকুল হইতেছ? ইহাবা এখন সংসারের বন্ধন কাটাইযা পরম সুখেব পথ অবলম্বন করিতেছেন। অনেক শিক্ষাতে ইহাদেব মনের ময়লা কাটিয়াছে। তুমি, কে? ইহারাই বা কে? ইহাদেব জন্য এত ব্যাকুল কেন? সংসাবের সম্বন্ধ অতি অল্পক্ষণের জন্য। মা গৃহে যাও, ইহারা পবম তাপসী।" তখন আমি করপুটে বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম "আমাদের সন্দেহ অপনোদন যদি দয়া করিয়া করেন , কৃতার্থ হই।" তিনি কহিলেন "বল"। "আপনার আগমন কোথা হইতে?" "কাশীধাম হইতে সম্প্রতি আসিয়াছি, সেইখানে আমার মঠ। উত্তরাখণ্ডে যাইব। আর ত কিছু বলিবার নাই? আমি কহিলাম "আর একটি কথা জিজ্ঞাসিব ক্ষমা করিবেন, এই সন্নাসিনী দুটির পরিচয়।" সন্ন্যাসী কহিলেন 'ইহারা আমার শিষ্যা, এই পরিচয়। " আমার মনে তৃপ্তি হইল না, কিন্তু যুবতী স্ত্রীলোকের বিষয় বারংবার জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না, সুতরাং কিয়ৎক্ষণ নীববে রহিলাম। মা আমার সেই রমণীদ্বয়কে বারংবাব কহিতে লাগিলেন "আহা! কার বাছা, কে এমন সোনার অঙ্গে ছাই মাখাইয়াছে?" প্রথমা রমণী অতি সাবধান দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছে। সন্ন্যাসী রমণীদ্বয়ের পরিচয় দিতেছেন না, এদিকে সন্ধ্যার মলিন ছায়া আসিয়া পর্বতের উপরিভাগ ঢাকিয়া ফেলিল। আর বিলম্বে বিপদ সম্ভাবনা জানিয়া মাতাকে কহিলাম। তিনি যাইতে অসম্মতা, অবশেষে সন্ন্যাসীকে কহিলেন এই রমণীদ্বয়কে যদি দয়া করিয়া একবার আমার সঙ্গে চণ্ডীদেবীর মন্দিরের মধ্যে যাইতে আজ্ঞা দেন, তবে আমি বিদায় লই।' মায়ের এরূপ কাতর অনুরোধে সন্ন্যাসী সম্মত হইলেন। তখন উহারা তিনজনে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, আমরা বাহিরে রহিলাম। পরক্ষণেই মাতা আসিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে লুটাইয়া

কাঁদিতে লাগিলেন। বমণীদ্বয় আসিয়া আমার পায়ে লুটাইযা পড়িল। ক্রমে আমার সন্দেহ সবিয়া সত্যে পবিণত হইয়া পড়িতে লাগিল। প্রথমা রমণী "দাদা কি এই?" আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম চক্ষের উপর ভ্রূব মধ্য ভাগে সেই কাল তিলটি এখনও সাক্ষ্য দিতেছে। তখন আর থাকিতে পারিলাম না। কহিলাম "এই কি আমাব শেলি? হা ভগবান্। সত্য প্রকাশকর।" সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাদিগকে কহিলেন "শান্ত হও। আমি তোমাদের সন্দেহ ঘুচাইব।" মাতা কহিলেন "এযে আমার কন্যা ও তাহাব সঙ্গিনী, আমি সম্পূর্ণ নিদর্শন পাইয়াছি, পরিচয়ে হউক আর নাই হউক। এক্ষণে দয়া কবিযা প্রকাশ করুন কোথায় পাইলেন। আমি জানি আপনি ইহাদেব জীবনদাতা; আমি ত জাহ্নবীর কোলে ভাসাইয়া দিযাছিলাম।" সন্ন্যাসী পূর্ব কথা আরম্ভ করিলেন ঃ—

"তবে শুন। বহুদিন হইল অর্থাৎ প্রায় দশ বৎসব অতীতপ্রায়, আমি একদিন বাত্রে সমাধিস্থ ভাবে কাশীধামেব গঙ্গাতীর হইতে স্রোতে বহিযা বহু দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। সেই সময় এই দুইটি বালিকা উভয়ে উভয়কে ধরিয়া ভাসিযা যাইতেছিল। আমাব গাত্র স্পর্শে আমি দেখিলাম মনুষ্য দেহ, মৃতকল্প হইলেও জীবিত, সুতরাং আমি উহাদিগকে টানিযা কূলে তুলিলাম। নিজ মঠে আনিয়া সেবাযত্নে চৈতন্য লাভ হইল বটে, কিন্তু অত্যন্ত জ্বরভোগ কবিতে লাগিল। একমাস পরে চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ হইল, কিন্তু দুইটিরই একটু একটু শরীরের ক্ষতি হইল। আপনি যাহাকে কন্যা নির্দেশ করিতেছেন, তাহাব শ্রবণশক্তি কিছু নষ্ট হইযাছে ও দ্বিতীযটির দক্ষিণ চক্ষুব দৃষ্টিব ব্যাঘাত হইযাছে। যাহা হউক আমি উহাদের আকার-প্রকারে সম্ভ্রান্ত-বংশজা অনুভব করিলাম। প্রায় দুই বৎসর কাল অপেক্ষা কবিযা দীক্ষিত করিলাম ও বীতিমত শিক্ষা আবম্ভ হইল। পরে ইহাদেব বিদ্যাচর্চ্চাব সঙ্গে জ্ঞানের তৃষাও বাড়িল। শিষ্যত্ব গ্রহণেব উপযুক্তা জ্ঞান করিযা আমি ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিযা বেড়াইতেছি। এই সংক্ষেপে পবিচয়।" মাতা কহিলেন "যথেষ্ট হইযাছে, আব কি শুনিব। আমাব কন্যার বক্ষে যে দুর্গানাম অঙ্কিত রহিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট নিদর্শন।" এই বলিযা মাতা শেলিব বক্ষ স্থিত দুর্গানাম যাহা উল্কি দ্বাবা বাল্যকালে আমার ঠাকুরমাতা আদরের উপহার দিয়াছিলেন, খুলিয়া দেখাইলেন। সেই চিহ্নের নীচে আমার দাদাব ইচ্ছামত "মা" লেখা হয়।

নীল-লোহিতের সৌরাষ্ট্র-লীলা

প্রমথ চৌধুরী

১

পুজোর নম্বর 'বসুমতী'র জন্য একটি গল্প লিখে দিতে বহুদিন থেকে প্রতিশ্রুত আছি। নানা কার্যে ব্যস্ত থাকায় এতদিন লেখায় হাত দিতে পারিনি।

আজ ঘুম থেকে উঠেই সংকল্প করলুম যে, যা থাকে কপালে একটা গল্প সূর্য ডোববার আগেই লিখে শেষ করব।

তারপর কলম হাতে নিয়ে দেখি যে, আমার মাথার ভিতর এখন আর কিছুই নেই — এক কংগ্রেস ছাড়া। আর কংগ্রেসের গল্প আমি পারি শুধু পড়তে, লিখতে নয়। কেননা দিল্লীতে আমি যাইনি।

এ অবস্থায় নিজের মাথা থেকে গল্প বার করা অসম্ভব দেখে একটা অপরের জানা না হোক, আমার শোনা গল্প লেখাই স্থির করলুম।

এ গল্পটি আমি নীল-লোহিতের মুখে শুনেছিলুম। নীল-লোহিত লোকটি যে কে, তা অবশ্য আপনি জানেন। গত বৎসর এই সময়ে তাঁর সবিশেষ পরিচয় 'মাসিক বসুমতী'তে দিয়েছি। আর আপনার কাগজের পাঠক সম্প্রদায়েরও অনেকেরই বোধ হয় নীল-লোহিতের কথা স্মরণ আছে।

আমার জনৈক ব্রাত্য-ক্ষত্রিয় বন্ধু একদিন আমার কাছে প্রমাণ করতে চেষ্টা করছিলেন যে, বর্তমান বেদ জাল, আর এ জাল ব্রাহ্মণরা করেছে। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, মূল বেদ যখন প্রলয়পয়োধিজলে নিমগ্ন হয়েছিল তখন অবশ্য তাঁর বেবাক অক্ষর ধুয়ে গেছল। এ অকাট্য যুক্তি শুনে আমি হাস্য সংবরণ করতে পারিনি। ফলে বন্ধুবর একেবারে উগ্র-ক্ষত্রিয় হয়ে উঠে আমাকে সরোষে বলেন যে, তাঁর কথা আমি বুঝতে পারব না, যেহেতু, আমরা ব্রাহ্মণরা বাস করি ব্রহ্মার সৃষ্ট জগতে, আর তাঁরা বাস করেন বিশ্বামিত্রের জগতে। কথাটা শুনে আমি প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তারপর ভেবে দেখেছি যে, কথাটা সত্য। আমাদের সকলের দেহ শুধু একই মাটির পৃথিবীতে অবস্থান করে, কিন্তু প্রত্যেকের মন আলাদা আলাদা বিশ্বে বাস করে। আমি বাস করি মর্তলোকে, আর নীল-লোহিত বাস করতেন কল্পলোকে। সাদা কথায় আমি বাস করি ব্রিটিশ রাজ্যে, আর নীল-লোহিত বাস করতেন কল্পনারাজ্যে। সুতরাং আমার মুখে নীল-লোহিতের গল্প শুনে শ্রোতাদের দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে।

তখন সবে সুরাট কংগ্রেস ভেঙেছে। কলকাতায় আর কোনো কথা নেই। পাঁচজন একত্র হলেই — সে কংগ্রেস কেন ভাঙল, কি করে ভাঙল, যে জুতোটা উড়ে এসে প্রেসিডেন্টের পায়ে লুটিয়ে পড়ল সেটা বিলেতি পম্প্ কি পাঞ্জাবি নাগরা, মারহাট্টি চটি কি মাদ্রাজি চাপ্‌লি — এই-সব নিয়ে তখন আমাদের মধ্যে ঘোর গবেষণা ও মহা বাদানুবাদ চলছে।

একদিন আমরা সকলে আড্ডায় বসে উক্ত যুগপ্রবর্তক জুতোটির জাতিনির্ণয় করতে ব্যস্ত আছি, এমন সময় নীল-লোহিত হঠাৎ বলে উঠলেন যে, তিনি স্বয়ং সশরীরে সুরাটে উপস্থিত ছিলেন এবং ভিতরকার রহস্য একমাত্র তিনিই জানেন; দ্বিতীয় ব্যক্তি যে জানে, প্রাণ গেলেও সে-রহস্য সে ফাঁস করবে না।

এ কথা শুনে একজন eye-witness-এর কথা শোনবার জন্য আমরা সকলে ব্যগ্র হয়ে উঠলুম, যদিচ আমরা সবাই জানতুম যে, সে কথার সঙ্গে সত্যের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

নীল-লোহিত বললেন, "তোমরা যদি তর্ক থামাও তো গল্প বলি।"

অমনি আমরা সবাই মৌনব্রত অবলম্বন করলুম। তিনি তাঁর সুরাট অভিযানের বর্ণনা শুরু করলেন। তাঁর কথার অক্ষরে অক্ষরে পুনরাবৃত্তি করতে হলে গল্প একটা নভেল হয়ে উঠবে। সুতরাং যত সংক্ষেপে পারি তাঁর মোদ্দা কথা আপনাদের শোনাচ্ছি — অর্থাৎ মাছ বাদ দিয়ে তাঁর কাঁটাটুকু আপনাদের কাছে ধরে দিচ্ছি।

২

নীল-লোহিত সুরাট গেছলেন বি. এন. আর. দিয়ে একটি প্যাসেঞ্জার গাড়িতে, অর্থাৎ একেবারে একলা ; তাই তাঁর সঙ্গে অপর কোনো বাঙালি ডেলিগেটের সাক্ষাৎ হয়নি। গাড়ি টিকোতে টিকোতে ছ দিনের দিন সন্ধেবেলায় সুরাট গিয়ে পৌঁছল। নীল-লোহিত সুরাট স্টেশনে নেমে একখানি টঙ্গা ভাড়া করে কংগ্রেস-ক্যাম্পের দিকে রওনা হলেন। গুজরাটে টঙ্গা অবশ্য একরকম গোরুর গাড়ি, কিন্তু গুজরাটের গোরু বাংলার ঘোড়ার চাইতে ঢের মজবুত ও তেজি। তারা ঠিক তাজি-ঘোড়ার মতো কদমে চলে, আর তাদের গলার ঘণ্টা গির্জার ঘণ্টার মতো সা-ব-গ-ম সাধে, আর বাইজির পায়ের ঘুঙুরের মতো তালে বাজে। গাড়িতে ছ দিন নীল-লোহিতকে একরকম অনশনেই কাটাতে হয়েছিল। সকালবেলায় এক গেলাস কাঁচা দুধ ও রাত্তিরে এক মুঠো কাঁচা ছোলার বেশি তাঁর ভাগ্যে আর কিছু আহার জোটেনি। স্টেশনে স্টেশনে অবশ্য লাড্ডু পাওয়া যায়, কিন্তু সে লাড্ডু আকারে ভাটার মতো, আব সে চিজ দাঁতে ভাঙবার জো নেই, গিলে খেতে হয, আর তা গেলবার জন্য গলার নলী হওয়া চাই ড্রেন-পাইপের মতো মোটা। আর পুরি? — তার একখানা ছুঁড়ে মারলে নাকি প্রেসিডেন্টকে আর দেশে ফিরতে হত না। পৃথিবীতে নাকি এমন জুতো নেই, যার সুখতলা আকারে ও কাঠিন্যে তার কাছেও ঘেঁষতে পারে। এক-একখানি পুরি যেন এক-একখানা খড়ম। সুতরাং নীল-লোহিত যদিও অনশনে মৃতপ্রায় হয়েছিলেন, তবুও সুরাটের বড়ো রাস্তার দৃশ্য দেখে তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা একদম ভুলে গেলেন। যতদূর যাও, পথের দুপাশে সব জানালাতে যেন সব পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গুর্জরে অবরোধপ্রথা নেই, আর গুর্জররমণীদের তুল্য সুন্দরী সুরপুরীতেও মেলা ভার। এ দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মোহ উপস্থিত হল, যেমন প্রতি জানালায় একটি করে Juliet দাঁড়িয়ে আছে, আর তিনি হচ্ছেন স্বয়ং Romeo, কিন্তু টঙ্গা এমনি ছুটে চলেছে যে, তিনি কারো কারো কাছে 'kill the envious moon' এ কথাকটি বলবারও অবকাশ পেলেন না। তার পর এক সময়ে তাঁর মনে হল যে, টঙ্গা এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে, আর তাঁর দক্ষিণ ও বাম দুপাশ দিয়েই অসংখ্য সুন্দরীর শোভাযাত্রা চলেছে। নীল-লোহিত যে পথিমধ্যে কারো ভালোবাসায় পড়ে যান নি, তার একমাত্র কারণ — এই নাগরীর হাটে কাকে ছেড়ে কার ভালোবাসায় তিনি পড়বেন? বিবাহ অবশ্য একসঙ্গে দুশো তিনশো করা যায়, কিন্তু ভালোবাসায় পড়তে হয় মাত্র একজনের সঙ্গে —

অন্তত এক সময়ে তো তাই। এ দিকে পেট খালি, ও দিকে হৃদয় পূর্ণ , এই অবস্থায় নীল-লোহিত কংগ্রেস-ক্যাম্পে গিয়ে অবতরণ করলেন। সেখানে উপস্থিত হবামাত্র তাঁর রূপের নেশা ছুটে গেল। তিনি প্রথমে গিয়েই টিকিট কিনলেন, তাতেই তাঁব পকেট প্রায় খালি হয়ে এল। তারপর শোনেন যে, কংগ্রেস-ক্যাম্পে আর জায়গা নেই ; যার কাছেই যান, তিনিই বললেন, "ন স্থানং তিলধারণে"। ছ দিন পেটে ভাত নেই, ছ রাত্তিব চোখে ঘুম নেই, তাব উপর আবার যদি সুবাটের পথে পথে সমস্ত রাত ঘুরে বেড়াতে হয় তা হলেই তো নির্ঘাত মৃত্যু। নীল-লোহিত একেবারে জলে পড়লেন, আর ভেবে কোনো কূলকিনাবা করতে পারলেন না। তাঁর এই দুরবস্থা দেখে টঙ্গাওয়ালা দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে Extremist ক্যাম্পে নিয়ে যাবার প্রস্তাব করলে। নীল-লোহিতের নাড়ীতে আবাব রক্ত ফিবে এল। টাঙ্গা যে পথ দিয়ে এসেছিল, আবার সেই পথ দিয়েই ফিরে চলল। এবার কিন্তু কোনো বাড়ির কোনো গবাক্ষ আর তাঁর নয়ন আকর্ষণ করতে পারলে না — যদিচ প্রতি গবাক্ষেই একটি করে সন্ধ্যাতারা ফুটে ছিল। তিনি অকারণে সমস্ত সুরাট-সুন্দরীদের উপর মহা চটে গেলেন, যেন তাঁরাই তাঁব কংগ্রেসের প্রবেশ-দ্বার আটকে দাঁড়িয়েছে। শেষটায় রাত আটটায় তিনি কংগ্রেসেব মহারাষ্ট্র-শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন, এবং পৌঁছেই পকেটে যে-কটি টাকা অবশিষ্ট ছিল, সেই কটি টঙ্গাওয়ালাকে দিয়ে বিদায় করলেন। মহারাষ্ট্র-শিবিরে লোকের ভিড দেখে সেখানে রাত কাটাতে তার প্রবৃত্তি হল না। সে যেন একটা Black hole. এক-একটা ছোট্ট ঘরে পঞ্চাশ-ষাট জন করে জোয়ান। 'শুতে না পাই অন্তত খেতে পাব' এই আশায় তিনি সেখানে থাকাই স্থির কবলেন। কিন্তু খাবাব আয়োজন দেখে তাঁর চক্ষুস্থিব। চার দিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু লঙ্কা লঙ্কা আর লঙ্কা! সে লঙ্কা কেউ কুটছে, কেউ বাটছে, কেউ পিষছে, কেউ ছেঁচছে। তাব গন্ধতেই তাঁর মুখ জ্বালা করতে লাগল। তিনি ঢোক গিলে মনে মনে বললেন, 'এখন উপায় কি, নুন দিয়েই ভাত খাব।' কিন্তু ভাত সেদিন তাঁর আর কপালে লেখা ছিল না। সে ক্যাম্পেও তাঁর স্থান হল না। সকলে ধবে নিলে যে, তিনি একজন স্পাই। তাঁর যে এ কূল ও কূল দু কূল গেল, তার প্রথম কাবণ তিনি অজ্ঞাতকুলশীল, আব দ্বিতীয় কাবণ এই যে, তাঁর সঙ্গে ব্যাগ-বিছানা কিছুই ছিল না। তিনি ঘব থেকে একছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন, সুরাটের লোকের কাছে এই প্রম্যণ করবাব জন্য যে তিনি হচ্ছেন একজন স্বদেশ প্রেমে মাতোয়ারা সন্ন্যাসী।

নীল-লোহিত মহারাষ্ট্র-শিবির থেকে যখন বেরিয়ে এলেন তখন বাত দশটা বেজে গিয়েছে। আর তাঁর অবস্থা তখন এই যে, পেটে ভাত নেই, পকেটে পয়সা নেই, সুরাটে একটি পরিচিত লোক নেই। সভ্যসমাজেব মধ্যে তিনি পড়লেন দ্বিতীয় Robinson Crusoe-র অবস্থায়।

ঘোর বিপদের মধ্যে না পড়লে নীল-লোহিতের বলবুদ্ধি খুলত না। সহজ অবস্থায় নীল-লোহিত ছিলেন আর পাঁচজনের মতো ; কিন্তু বিপদে পড়লেই তিনি হয়ে উঠতেন একটি superman, সংস্কৃতে যাকে বলে অতিমানুষ। তাই পথে বেরিয়েই তাঁর শবীর-মনে কে জানে কোত্থেকে অলৌকিক শক্তি ও সাহস এসে জুটল। তিনি তাঁর মনকে বোঝালেন যে, তিনি hunger-strike করেছেন — সভ্যসমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে। অমনি তাঁর ক্ষুধা-তৃষ্ণা মুহূর্তের মধ্যে কোথায় উড়ে গেল। তিনি সংকল্প করলেন যে, এ বিপদ থেকে তিনি আত্মবলে উদ্ধার লাভ করবেন। কি করে যে তা করবেন, সে বিষয়ে অবশ্য তাঁর মনে কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না, কিন্তু তাঁর ছিল আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সঙ্গে সঙ্গে জাতিবর্ণনির্বিচারে সকল কংগ্রেসওয়ালার উপর তাঁর সমান অভক্তি জন্মাল, কারণ, তারা যা করতে যায় তা দল বেঁধে ও পরস্পরের হাত-ধরাধরি করে। একলা কিছু করবার সাহস ও

শক্তি তাদের কারো শরীরে নেই। নীল-লোহিত তাই 'একলা চলো রে' বলে সেই অমানিশার অন্ধকারেব ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এবার তিনি রাজপথ ছেড়ে সুরাটের গলিঘুঁজিতে ঢুকে পড়লেন। সে-সব গলিতে যেন অন্ধকারের বান ডেকেছে। বাস্তার দু পাশের বাড়িগুলোর দুয়োর জানলা সব জেলের ফটকের মতো কষে বন্ধ। চাবপাশে সব নির্জন, সব নীরব, নিঝুম, যেন সমগ্র সুরাট শহরটা রাত্তিরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। মধ্যে মধ্যে দু-একটা বাড়ির গবাক্ষ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যেখানেই আলো. সেইখানেই কান্নার সুর। সুরাটে তখন খুব প্লেগ হচ্ছিল।

নীল-লোহিত ছাড়া অপর কেউ এই শ্মশানপুরীর মধ্যে ঢুকলে ভয়ে অচৈতন্য হয়ে পড়ত। কিন্তু তিনি ঘণ্টা-দুই এই অন্ধকারেব ভিতর সাঁতরাতে সাঁতরাতে শেষটায় কূলে গিয়ে ঠেকলেন। হঠাৎ তিনি একটা বাড়ির সুমুখে গিয়ে উপস্থিত হলেন, যার দোতলাব ঘরে দেদার ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে, আর যার ভিতর দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছে স্ত্রীকণ্ঠের অতি সুমধুর সংগীত।

নীল-লোহিত তিলমাত্র দ্বিধা না করে নিজের মাথার পাগড়িটি খুলে সেই বাড়ির বারান্দার কাঠের রেলিংয়ে লাগিয়ে দিয়ে, সেই পাগড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন।

তাঁর পায়ের শব্দ শুনে ঘর থেকে একটি অপ্সরোপম রমণী বেরিয়ে এলেন। তারপর দুজনে পবস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে রইলেন। এমন সুন্দরী স্ত্রীলোক নীল-লোহিত জীবনে কিংবা কল্পনাতে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখেন নি। নীল-লোহিতের মনে হল যে, রমণীটি সুরাটের সকল সুন্দরীর সংক্ষিপ্তসার। তাঁব সর্বাঙ্গ একেবারে হীরামাণিকে ঝক্‌ঝক্ করছিল। নীল-লোহিতের চোখ সে রূপেব তেজে ঝলসে যাবার উপক্রম হল, তিনি মাটিব দিকে চোখ নামালেন।

প্রথম কথা কইলেন স্ত্রীলোকটি। তিনি হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কে?"

নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "বাঙালি।"

"সুবাটে কেন এসেছ?"

"কংগ্রেস-ডেলিগেট্ হয়ে।"

"কংগ্রেস-ক্যাম্পে না গিয়ে এখানে কেন এলে?"

"পথ ভুলে।"

'টঙ্গায় চড়লে টঙ্গাওয়ালা তো তোমাকে ঠিক জায়গায় নিতে যেত।"

"আমার ব্যাগ, বিছানা সব স্টেশনে হারিয়ে গিয়েছে। টাকাকড়ি সব ব্যাগের ভিতরে ছিল। তাই টাঙ্গা ভাড়া করবার পয়সা কাছে না থাকায় হেঁটে বেরিয়েছিলুম। তারপর তিন-চার ঘণ্টা ঘোরবার পর এখানে এসে পৌঁচেছি।"

"এ বাড়িতে ঢুকলে কিসের জন্য?"

"আলো দেখে ও সংগীত শুনে।"

"পরের বাড়িতে না বলা-কওয়া প্রবেশ করতে তোমার দ্বিধা হল না?"

"যে জলে ডোবে, সে বাঁচবার জন্য হাতের গোড়ায় যা পায় তাই চেপে ধরে। আমি উপবাসে মৃতপ্রায়। কিছু খেতে পাই কি না দেখবার জন্য এখানে প্রবেশ করেছি — বাড়ি কার তা ভাববার আমার সময় ছিল না। ঝাড়-লণ্ঠন দেখে বুঝলুম — এ বাড়িতে অন্নকষ্ট নেই ; আর গান শুনে বুঝলাম, এ বাড়িতে প্লেগ নেই।"

নীল-লোহিতের কথা শুনে স্ত্রীলোকটির মনে করুণার উদয় হল। তিনি তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। আর দাসীদের ডেকে বললেন নীল-লোহিতের জন্য খাবার আনতে। তাই শুনে নীল-লোহিতের ধড়ে আবার প্রাণ এল। তিনি এক-নজরে ঘরটি দেখে

নিলেন। নীচে কাশ্মীরি গালিচা পাতা, আর ঘর-পোরা বাদ্যযন্ত্র। তিনি গৃহকর্ত্রীকে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি হেসে উত্তর দিলেন, "তোমরা যা হতে চাচ্ছ, আমি তাই।"

"অর্থাৎ?"

"আমি স্বাধীন।"

এর পর বড়ো বড়ো রুপোর থালায় করে দাসীরা দেদার ফল-মিষ্টি নিয়ে এসে হাজির করলে। নীল-লোহিত আহারে বসে গেলেন। সে আহারের বর্ণনা করতে হলে দুখানি বড়ো বড়ো ক্যাটালগ তৈরি করতে হয়। একখানি ফলের, আরখানি মিষ্টান্নের। সংক্ষেপে ভারতবর্ষের সকল ঋতুর ফল আর সকল প্রদেশের মিষ্টান্ন নীল-লোহিতের সুমুখে স্তূপীকৃত করে রাখা হল। তিনিও তাঁর এক সপ্তাহের ক্ষুধা মেটাতে প্রবৃত্ত হলেন। তিনি সেদিন আহারে স্বয়ং কুম্ভকর্ণকেও হারিয়ে দিতে পারতেন।

তাঁর আহার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময়ে ফটকে কে অতি আস্তে ঘা দিলে। গৃহকর্ত্রী একটি দাসীকে নীচে গিয়ে দুয়োর খুলে দিতে আদেশ করলেন। মুহূর্তের মধ্যে একটি ভদ্রলোক এসে সেখানে উপস্থিত। নীল-লোহিত দেখেই বুঝতে পারলেন যে তিনি বম্বে অঞ্চলের একজন হোমরা-চোমরা ব্যক্তি। তিনি যে অগাধ ধনী, তা তাঁর উদরেই প্রকাশ। ভদ্রলোক নীল-লোহিতকে দেখেই আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে গৃহকর্ত্রীর অনেকক্ষণ ধরে গুজরাটিতে কি কথাবার্তা হল। তারপর সেই ভদ্রলোকটি নীল-লোহিতকে সম্বোধন করে অতি অভদ্র হিন্দিতে বললেন যে, আহারান্তে তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, নচেৎ তিনি তাঁকে পুলিসের হাতে সঁপে দেবেন। এ কথা শুনে স্ত্রীলোকটি বললেন যে, তা কখনোই হতে পারে না। সমস্ত রাত পথে পথে ঘুরে বেড়ালে বাঙালি ছোকরাটি প্লেগে মারা যাবে। আর ছোকরাটি যে চোর-ডাকাত নয় তার প্রমাণ তাব চেহারা — "এইসা খপ্‌সুরত" ছোকরা চোর-ডাকাত কখনোই হতে পারে না।

এ কথা শুনে ভদ্রলোকটি ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। আবার দুজনে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হল। শেষটায় উভয়ের মধ্যে এই আপস হল যে রাত্তিরে নীল-লোহিতকে চাকরদের সঙ্গে থাকতে হবে, কিন্তু সকালে উঠেই তাঁকে এ বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে।

ঘুমে নীল-লোহিতদের চোখ বুজে আসছিল, তাই তিনি দ্বিরুক্তি না কবে নীচে গিয়ে চাকরদের ঘরে শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন যে, ঐ বম্বেটেব অপমানের প্রতিশোধ না নিয়ে তিনি দেশে ফিরবেন না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে নীল-লোহিত চোখ তাকিয়ে দেখেন যে, বেলা দশটা বেজে গিয়েছে। তিনি মুখ-হাত ধুয়ে সবে গালে হাত দিয়ে বসেছেন, এমন সময় উপর থেকে হুকুম এল যে — "বাইজি বোলাতা।" উপরে গিয়ে দেখেন যে স্ত্রীলোকটি নূতন মূর্তি ধারণ করেছেন। সাজসজ্জা সব বাঙালি রমণীর ন্যায়। শরীরে জহরতের সম্পর্ক নেই, গহনা আগাগোড়া সোনার, আর তাঁর পরনে ঢাকাই শাড়ি, গায়ে একখানি বুটিদার ঢাকাই চাদর। তিনি নীল-লোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি এখন কোথায় যেতে চান। নীল-লোহিত উত্তর করলেন, কংগ্রেস-ক্যাম্পে। স্ত্রীলোকটি বললেন, সে হতেই পারে না। গত রাত্তিরের আগন্তুক ভদ্রলোকটি যদি তাঁর সাক্ষাৎ পান তা হলে তাঁর বিপদ ঘটবে — হয় গুণ্ডা, নয় পাহারাওয়ালার হাতে তাঁকে বিড়ম্বিত হতে হবে। অতএব পত্রপাঠ দেশে ফিরে যাওয়া তাঁর পক্ষে কর্তব্য। স্ত্রীলোকটি তাঁর জন্য ব্যাগ, বিছানা, দেশে ফেরবার রেল-ভাড়ার টাকা ইত্যাদি সব ঠিক করে রেখেছেন।

কিন্তু কংগ্রেসে যাওয়ায় বিপদ আছে, এ কথা শুনে নীল-লোহিত জেদ ধরে বসলেন যে, তিনি কংগ্রেসে যাবেনই যাবেন। সেই সুন্দরী তাঁকে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, কিন্তু

নীল-লোহিত কিছুতেই তাঁর গোঁ ছাড়লেন না। "ভয় পেয়েছি", এ কথা স্ত্রীলোকের কাছে স্বীকার পুরুষমানুষে সহজে করে না। আর উক্ত স্ত্রীলোকটি ছিলেন যেমন সুন্দরী, নীল-লোহিতও ছিলেন তেমনি বীরপুরুষ। অনেক বকাবকির পর শেষটায় স্থির হল উক্ত স্ত্রীলোকটি স্বয়ং নীল-লোহিতকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসে যাবেন — নিজের দাসী সাজিয়ে। তিনি বললেন যে, তিনি সঙ্গে থাকলে কেউ নীল-লোহিতের কেশাগ্রও স্পর্শ করবে না।

মধ্যাহ্নভোজনের পর নীল-লোহিতকে পাঞ্জাবী রমণীর বেশ ধারণ করতে হল। পরনে চুড়িদার পাজামা, পায়ে নাগরা, গায়ে কুর্তা ও মাথা-মুখ-ঢাকা ওড়না। এ-সব সাজসজ্জা গৃহকর্ত্রীর একটি পাঞ্জাবী দাসীর কাছ থেকেই পাওয়া গেল। আর সে-সব কাপড় নীল-লোহিতের গায়ে ঠিক বসে গেল। কেননা পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক ও বাঙালি পুরুষ মাপে প্রায় এক। তারপর দুজনে একটি আধ-বন্ধ ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে কংগ্রেসে গিয়ে মেয়েদের গ্যালারিতে বসলেন। কংগ্রেসের কাজ শুরু হল, এমন সময় হঠাৎ নীল-লোহিত দেখতে পেলেন যে, উক্ত ভদ্রলোক কংগ্রেসের হোমরা-চোমরাদের মধ্যে বসে আছেন। এ দেখে তিনি আর তাঁর রাগ সামলাতে পারলেন না, ডান পায়ের নাগরা খুলে তাঁকে ছুঁড়ে মারলেন। সেই নাগরাটাই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে প্রেসিডেন্টের পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়ল। মহা হৈ চৈ পড়ে গেল। নীল-লোহিতের কাণ্ড দেখে স্ত্রীলোকটি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে রইলেন। তারপরেই নিজেকে সামলে নিয়ে নীল-লোহিতের হাত ধরে তিনি কংগ্রেসের তাঁবুর বাইরে এসে গাড়িতে চড়ে বাড়ি ফিরলেন। আর, পাঁচ মিনিটের মধ্যে আবার নীল-লোহিতকে বাঙালি সাজিয়ে ব্যাগ-বিছানা সমেত সেই গাড়িতেই তাঁকে স্টেশনে পাঠিয়ে দিলেন। স্টেশনে নীল-লোহিত ব্যাগ খুলে দেখেন, তার ভিতর পাঁচশো টাকার নোট আর সেই স্ত্রীলোকটির একখানি ছবি রয়েছে। সেই টাকা দিয়ে টিকিট কিনে তিনি দেশে ফিরলেন।

সুরাট কংগ্রেসের যুগপ্রবর্তক জুতো যে নীল-লোহিতের পাদুকা, একথা শুনে আমরা সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

নীল-লোহিতের মুখে এই অপূর্ব কাহিনী শুনে আমরা সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলুম — কেননা তাঁর এই গল্প সম্বন্ধে কি বলব কেউ তা ঠাউরাতে পারলুম না। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর রামযাদব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি সেই সুরাট-সুন্দরীর পাঁচশত টাকা বেমালুম হজম করে ফেললেন? নীল-লোহিত উত্তর করলেন — "না। আমি কাশীতে গিয়ে সেই পাঁচশো টাকা দিয়ে অন্নপূর্ণার পূজা দিয়ে এসেছি।" আবার সকলেই চুপ করলেন। তারপর মোহিনীমোহন জিজ্ঞাসা করলেন, "সে ছবিখানা তোমার কাছে আছে?" নীল-লোহিত উত্তর করলেন, "হাঁ, আছে।" দ্বিতীয় প্রশ্ন হল — "সেখানি দেখাতে পার?" উত্তর — "দেখতে ইচ্ছে হয়, কিনে দেখতে পার।" প্রশ্ন — "সে ছবি বাজারে কিনতে পাওয়া যায়?" উত্তর — "দেদার।" প্রশ্ন — "কি রকম?" উত্তর — "নূরজাহানের ছবি দেখলেই সেই সুরাট-সুন্দরীকে দেখতে পাবে। এ দুটি স্ত্রীলোকই এক ছাঁচে ঢালাই।"

এরপর কিছু বলা বৃথা দেখে আমরা সভা ভঙ্গ করে চলে গেলুম।

গহনার বাক্স

জগদানন্দ রায়

আমি ডিটেকটিভ আফিসে প্রবেশ করিবার প্রায় ছয় মাস পরে, একদিন বড়বাবু আফিসের সেই নির্জন কক্ষে আমাকে ডাকিয়া, বর্ধমানের এক ভয়ানক খুনের আমূল পরিজ্ঞাত ঘটনা বিবৃত করিলেন, এবং এই হত্যা সম্বন্ধীয় সমস্ত কাগজপত্র আমার হাতে দিয়া তৎক্ষণাৎ বর্ধমান যাত্রা করিয়া তথায় গুপ্ত হত্যাকারীর অনুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

প্রায় তিন সপ্তাহ বর্ধমানে অবস্থান করিলাম, হত্যাস্থানের চাবিদিকের অধিবাসিগণেব সহিত তৎপ্রসঙ্গে অনেক আলাপাদিও করা গেল, কিন্তু হত্যাকারীর বিশেষ কোনও সন্ধান পাইলাম না। তবে স্থানীয় পুলিশ ভূষণ দাস নামক জনৈক হোটেলওয়ালাকে এই হত্যা ব্যাপারের সহিত জড়িত বলিযা যে সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট এবং স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তা' ছাড়া আমি ভূষণ দাসেব হোটেল ঘর অনুসন্ধান করিযা যে তিনখানি গোপনীয় পত্র আবিষ্কার করিয়াছিলাম, তাহাব মর্মে উক্ত ব্যক্তিই যে প্রকৃত হত্যাকারী তাহাতে আর আমাব সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বহু চেষ্টা কবিয়াও, ভূষণের আবাসস্থান স্থির করিতে পাবিলাম না, হত্যাকাণ্ডেব দিন হইতে সে নিরুদ্দেশ!

এই প্রকার অবস্থায় তথায় অবস্থান করা বৃথা এবং কষ্টকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, কিন্তু আর অধিককাল আমায় সেখানে থাকিতে হইল না, অবিলম্বে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবার আদেশসহ বড়বাবুর একখানি টেলিগ্রাম পাইলাম। বাঁচা গেল, সেইদিনই পূর্বাহ্নে আহারাদি সম্পন্ন করিয়া কলিকাতা যাত্রা কবিলাম, হত্যাকাবীর অনুসন্ধান এইখানেই শেষ হইয়া গেল।

চারিটার সময় কলিকাতায় পৌছিয়া, বাসায় না গিযাই আমার ত্রিসাপ্তাহিক অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফল, সেই ভূষণ দাসের জীর্ণ ও নীরস চিঠি কয়েকখানি সহ একেবারে আফিসে গিয়া উপস্থিত হইলাম এবং আমার অনুসন্ধানেব আমূল বিবরণ বিবৃত করিলাম।

আমার কথায় বাবু বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না, তিনি ধীরভাবে বলিলেন, —'বর্ধমানের হত্যা ব্যাপারের শেষ যে এই দাঁড়াইবে, তাহা প্রথমে পুলিশ রিপোর্ট হইতেই বুঝেছিলাম, তবুও একবার দেখা গেল। যাহা হউক তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে , কালই তোমাকে দেওঘবে যেতে হবে। আজ কয়েকদিন হ'ল সেখানে বনমালী চৌধুরী নামক জনৈক বড় লোকের বাড়িতে অনেক টাকার গহনা চুরি হয়ে গেছে , তার অনুসন্ধানের জন্য একটা লোক পাঠাইবার জন্য তিনি স্বয়ং আমাকে লিখেছেন। তোমাকেই যেতে হবে।"

অবিলম্বেই দেওঘরে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণের পূর্বে বড় বাবু আবার বলিলেন, — "দেখ এই চুরি ব্যাপারটা একটু নূতন রকমের। বাড়ির কর্তার বিশ্বাস, তাঁহার পরিবারস্থ কোনও এক ব্যক্তি ইহাতে লিপ্ত, এজন্য তাহাকে লইয়া একটা প্রকাশ্য গোলযোগ করা তাহার অভিপ্রেত নয়। যাহা হউক, তুমি সেখানে গেলেই সব শুনিতে পাইবে, কিন্তু খুব সাবধান।"

পরদিন কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেওঘরে পৌঁছিলাম। বনমালী চৌধুরীর বাড়ি অনুসন্ধান করিতে বিলম্ব হইল না, শহরে লোকটার বেশ মান প্রতিপত্তি আছে ; শুনিলাম বহুকাল সরকারী আমীনের কাজ করিয়া পেন্‌সন্‌ প্রাপ্তির পর তিন চারি বৎসর হইতে তিনি সপরিবারে বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন। নগদ টাকা যথেষ্ট, এবং উচ্চ সুদে কর্জ দিয়া তদ্দ্বারা প্রচুর আয়ের সংস্থান হয়। সন্ধ্যার পর বনমালী চৌধুরীর বাটীতে উপস্থিত হইলাম, কিন্তু তখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না , কর্তা তখনও আহ্নিকের ঘরে রহিয়াছেন, শুনিলাম বাহিরের ঘরে আসিতে অর্ধ ঘণ্টা বিলম্ব হইবে। দেখিলাম বাসায় লোকজনের সংখ্যা খুব অধিক নয়, একজন খানসামা, একজন বেহারা, একটি মুহুরী আর এক পাচক ব্রাহ্মণ। মুহুরীর নাম শ্রীশ্যামলাল রায়, লোকটা মিষ্টভাষী, আমাকে প্রথমে দেখিয়াই, অর্থকৃচ্ছতায় তাড়িত ঋণ গ্রহণেচ্ছু বিপন্ন ব্যক্তি ঠাহরাইয়াছিলেন, এবং অচিরাৎ ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া আমি কর্তার "মহামহিম" পদবীর প্রসর বৃদ্ধি করিব, আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণার ব্যবস্থা করিব, তাহাতে আর তাঁহাব সন্দেহ ছিল না। আমি আত্মগোপনের এই সুযোগ ছাড়িতে পারিলাম না, দুই সহস্র মুদ্রা ঋণগ্রহণ সম্বন্ধে কর্তার সাহায্য প্রার্থনা আমার আগমনের কাবণ বলিয়া প্রকাশ করিলাম। লোকটা আমার কথায় বেশ বিশ্বাস করিয়া ফেলিল, এবং আশু কার্য সিদ্ধির জন্য তিনি যে বিশেষ সচেষ্ট থাকিবেন, একথা বলিতেও ছাড়িল না।

কর্তা বাহিরে আসিলে, একাকী আমি তাঁহার নির্জন কক্ষে গিয়া, বড়বাবু প্রদত্ত আমাব নিয়োগ পত্রখানি দেখাইলাম। তিনি পত্রখানি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিযা ধীরে ধীরে চশমাখানি খুলিয়া বলিলেন, — 'সাহেব আপনাকে চুরির অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছেন, ভালোই। অনুসন্ধান আরম্ভেব পূর্বে আপনাকে একটা কথা বলিয়া দেওয়া ভাল বোধ করিতেছি। আজ চারি দিন হ'ল আমার প্রায পাঁচ হাজার টাকার গহনা চুরি গিয়াছে, কিন্তু এ পর্যন্ত একথা গৃহিণী ব্যতীত অপর কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই, কেবল গোপনে পুলিশে একটা সংবাদ দিয়া বাখিয়াছি। আপনি আমাব এই ব্যবহারের কথায় হয়ত বিস্মিত হইতেছেন, কিন্তু সব শুনিলে আমার সঙ্কট বুঝিতে পারিবেন। আমার বিশ্বাস অলঙ্কারগুলি আমার হতভাগা ভ্রাতুষ্পুত্র রজনী চুরি করিয়াছে। গৃহিণীরও এই মত। হতভাগাকে, পিতার মৃত্যুর পর হতে ছেলের মত পালন করে আসিতেছি, লেখাপড়া শিখিয়েছি,—

আমি এইখানে তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, — "মহাশয়, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা পরে শুনিলেই চলিবে, এখন চুরিটা কি প্রকারে হয়েছিল, আগে তাহাই বলুন।"

কর্তা তখন বলিতে লাগিলেন, — "ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই চুরির দিন কতকগুলি গহনা বন্ধক রাখিয়া, কয়লা খাদের এক ঠিকাদার আমার নিকট তিন হাজার টাকা কর্জ লইয়া গিয়াছিল, গহনাগুলা আমার এই বৈঠকখানা ঘরে একটা বড় হাত বাক্সে রাখিয়াছিলাম, তাড়াতাড়ি বশতঃ লোহার সিন্দুকে তুলিযা রাখা হয় নাই। এই ঘরে রাত্রিতে কেহই থাকে না, সেই হতভাগা, শুনিলাম সেদিন রাত্রে এখানে শুইয়াছিল। প্রাতঃকালে কি রাত্রে কখন সে উঠে গেছে, কেহ জানে না, আমি যথাসময়ে প্রভাতে উঠিয়া আর বাক্স দেখি নাই। চোর যে কে তাহা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না, তাই একটা ঘড়াও গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য, বাক্সটা আমি বাড়ির মধ্যে রাখিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলাম। এখন যাহাতে বিনা গোলযোগে পরের অলঙ্কারগুলি হস্তগত হয়, তাহাব উপায় করুন।"

বহুকষ্টে চুরির এই সামান্য ইতিহাস সংগ্রহ করিয়া আপাতত পরিতৃপ্ত থাকিতে হইল, কারণ কর্তার সহিত আর যাহা কথা হইল, তাহাতে ভ্রাতুষ্পুত্র রজনীনাথের উদ্দেশে অজস্র গালিবর্ষণ এবং নিজের আকস্মিক গ্রহবৈগুণ্যের জন্য অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ভিন্ন আমাব

ডিটেকটিভ বুদ্ধি প্রয়োগের উপযোগী কিছু পাওয়া গেল না। সে যাহা হউক কর্তার বিশেষ অনুরোধে, কার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তাহার বাসাতেই থাকার ব্যবস্থা হইল। আত্মগোপন মানসে আমি যে ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্রাহ্মণ সন্তান বলিয়া চাকরদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিলাম, সে কথাটা কর্তাকে বলিয়া দিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, আবার কর্তার সহিত চুরি সম্বন্ধে অনেক কথোপকথন হইল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ব্যতীত অপর কোনও ব্যক্তির উপর সন্দেহ হয় কি না জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন : — "আমার পরিবারস্থ মুহুরী, বেহারা, চাকর, ব্রাহ্মণ সকলই বিশ্বাসী পুরাতন ভৃত্য। যে ব্যক্তি এই সর্বনাশ করিয়াছে, আমি বহুপূর্বে তাহার আভাস দিয়াছি। আব কাহাবও উপর আমার সন্দেহ নাই।"

সেই দিনই, ঘটনার পরিজ্ঞাত বিবরণসহ, বড়বাবুকে একখানি পত্র লিখিলাম। লোকটা যখন ভ্রাতুষ্পুত্রের উপব এতটা সন্দেহ করিতেছে, একবার তাহাব অবস্থাটা অনুসন্ধান করা ভালো বলিয়া বোধ হইল ; শুনিলাম সে বৈদ্যনাথের নিকটেই মধুপুর স্টেশনে কি একটা চাকরি করে, কিন্তু হঠাৎ এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহস হইল না। পত্রোত্তরে বড়বাবুব পরামর্শের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে, স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া কর্তা যথাবীতি মহাদেব দর্শন কবিতে বহির্গত হইলেন এবং আমাকেও যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে সময়ে আমাব মন বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তা' ছাড়া বড় বাবুব চিঠিও পাইবাব সম্ভাবনা ছিল, এই সকল কারণে, কোন প্রকাবে কর্তাব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিযা, বাসাতেই থাকিয়া গেলাম।

সেদিন কর্তা বাহির হইয়া যাবার কিছুক্ষণ পরেই মুহুবী মহাশয়ও একটা কাজে চলিযা .গেলেন। আমি একলা বৈঠকখানায় বসিযা আছি, এমন সময় ডাকপিয়ন আসিয়া কতকগুলি পত্র আমার হাতে গিযা গেল। বড়বাবুর নিকট হইতে পত্র পাইবাব সম্ভাবনা ছিল, আমি তাড়াতাড়ি সেই পত্র খুঁজিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার নামীয় কোনও পত্রই পাইলাম না। তখন আমি একে একে সেই পত্রগুলির শিরোনাম পাঠ করিতে লাগিলাম, কোনও প্রকাবে সময় ক্ষেপণ করা ব্যতীত এই কার্যের অপর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না। পত্রগুলিব মধ্যে শ্যামলাল রায় মুহুরী মহাশযেব নামীয় একখানি চিঠি ছিল, তাহার শিরোনামা পডিবাব সময লেখাটা যেন আমার কোনও পবিচিত লোকের বলিযা বোধ হইল, ডাকঘবেব ছাপটা বড অপরিষ্কাব পড়িতে পাবিলাম না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বর্ধমানের হত্যাকারী ভূষণ দাসের লেখা কি এই প্রকাব নয়? অনেক নিদ্রাহীন স্তব্ধরাত্রি ভূষণের কযেকখানি পত্র নাড়াচাডা করিয়া অতিবাহিত করিয়াছি, তাহাব হস্তাক্ষরের প্রত্যেক টান তখনও আমার চক্ষে প্রত্যক্ষবৎ ছিল। মুহুরী মহাশয়ের পত্রখানি যে সেই ভূষণ দাস কর্তৃক লিখিত তাহাতে আব আমার সন্দেহ রহিল না। পত্রগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে বড়বাবুকে দিই নাই, সেগুলা আমাব পোর্টমান্টোস্থ একটা জামার পকেটে ছিল। তাড়াতাড়ি বাক্স হইতে পত্রগুলি বাহির করিয়া তাহার অক্ষরের সহিত, মুহুরী মহাশয়ের নামীয় পত্রের শিরোনামাব অক্ষরেব সহিত মিলাইযা দেখিলাম অবিকল একই হাতের লেখা! অপর চিঠিগুলা টেবিলের উপর রাখিয়া, একটা নির্জন স্থানে গিয়া, সেই পত্রখানি খুব সাবধানের সহিত পড়িলাম। চিঠিখানি যশোহর হইতে প্রেরিত, লেখা ছিল —

"কল্যাণবরেষু, — আমি কিছুদিন হ'তে তোমার পত্র না পাইয়া উদ্বিগ্ন আছি। পূজাব জিনিষ পত্র সঙ্গে লইয়া আসিবে, এবং ছুটিতে আসিবার সময় কলিকাতায় গিয়া, শ্রীমতী মৃণালিণীর জন্য সেই বহুবাজাবের এইচ্, বসুর এক শিশি কুন্তলীন, আর এক শিশি দেল খোস, অবশ্য করিয়া আনিবে। শীতকালে সাহেব বিবির নাচ দেখ্তে, সে কলিকাতায় যাবে

বল্ছে। সদর রাস্তায় এইচ্, বসুর খুব বড় দোকান। গোবর্ধন ভাল আছে, ঠাকুরের জ্বর হইয়াছে। কলিকাতার কাঠগোলায়, তোমার কাকার সহিত একবাব দেখা করিও। আমি ভাল আছি।

আশীর্বাদক
শ্রীকালীকান্ত বায।

পুঃ — মিনি শীঘ্র বেশ্ লিখ্তে শিখেছে, সে কিছুতেই ছাড়লে না, তার হিজিবিজি হাতের লেখা পত্রের সঙ্গে পাঠাইলাম, তুমি আসিলে ভাল লেখা দেখাইবে। কুন্তলীন ও দেলখোস না আনিলে, বড় গোলযোগ বাধাইয়া তুলিবে।''

তারপর পত্রের সহিত মোড়ক করা এক খণ্ড পৃথক কাগজে মোটা মোটা অক্ষরে লেখা —

''খ, চ, খ, ক, ক, গ, খ, জ, খ, ক, ঙ, খ, ন, ঙ, জ।''

পত্র পাঠ করিয়া প্রায় সকল আশাই নির্মূল হইতে চলিল। কিন্তু ভূষণদাসের সহিত চিঠিখানির প্রত্যেক অক্ষবের ঐক্যতা সহজে মন হইতে বিদূবিত হইল না, বিশেষতঃ বালিকাকন্যা মিনির যথেচ্ছা লিখিত আঁকা বাঁকা অক্ষবগুলিতেও যেন দুই একটা পাকা হাতেব টান দেখিতে পাইলাম।

সে যাহা হউক, চিঠিখানি আর সেই ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড আমাব নিকটেই থাকিল, মুহুবী মহাশযেব প্রতি একটু খবদৃষ্টি বাখিলাম, কিন্তু তাঁহাব ব্যবহাবে সন্দেহজনক কিছুই দেখা গেল না। আহাবাদিব পব কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আবাব চিঠিখানি লইযা নাড়াচাড়া কবিতে লাগিলাম, হঠাৎ মনে হইল টুক্‌বা কাগজে যে কযেকটি অক্ষর লেখা আছে, হয়ত তাহাব সাহায্যে পত্রখানি পড়িতে হইবে। আশ্চর্যেব বিষয় আমার অনুমান ঠিক হইল, এবং এই কয়েকটি কথা তখন পত্রেব মধ্যে স্পষ্ট পড়িতে পাবিলাম। ''আমি জিনিষ লইযা কলিকাতায় বহুবাজারেব দেলখোস বিবিব গোবর্ধন ঠাকুবের কাঠগোলায আছি, শীঘ্র না আসিলে গোলযোগ।''

বর্ধমানের হত্যাকারী ও দেওঘবের চুবিব সহাযক ভূষণ দাসকে উক্ত পত্রস্থ লুক্কাযিত বাক্যদ্বাবা ধৃত কবিবার সম্ভাবনা দেখিয়া, আমাব মানসিক অবস্থা কি প্রকাব হইযাছে, পাঠক-পাঠিকাগণ অনাযাসেই অনুমান কবিতে পাবেন। আমি পত্রখানি সাবধানে পকেটস্থ কবিযা, কর্তার নিকট গিযা বলিলাম, — ''আপনার চুরির বোধহয একটা কিনাবা হইবে, আমাকে এখনই একবাব মধুপুবে যাইতে হইবে। কথাটা যেন প্রকাশ না হয়।'' গোলযোগেব আশঙ্কায আমার প্রকৃত গন্তব্যস্থান যে কলিকাতা তাহা আব প্রকাশ কবিলাম না।

সাতটাব গাড়িতেই যাওযা স্থিব করিলাম, দেখিতে দেখিতে ছয়টা বাজিয়া গেল, আমি কিছু অগ্রেই স্টেশনে যাত্রা কবিলাম। যাইবাব সময মুহুবী মহাশয় আমাব হঠাৎ গমনেব কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বলিলাম যে সকল সম্পত্তি বন্ধক বাখিয়া কর্তা আমাকে টাকা কর্জ দিবেন, তৎসম্বন্ধীয় কাগজপত্র ভুলে বাড়িতে ফেলিযা আসিযাছি, কল্যই দলিলপত্র লইয়া আবার ফিরিতেছি।''

প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌছিযাই মুচীপাড়ার থানার ইনেস্পেক্টাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দশজন পুলিশ কনস্টেবল সঙ্গে লইযা দেলখোস বিবিব লেনে উপস্থিত হইলাম। গোবর্ধন ঠাকুরের কাঠগোলা বাহির করিতে বিলম্ব হইল না, ভূষণকে সনাক্ত করিযা গ্রেপ্তার করাও সহজে হইয়া গেল, কারণ বর্ধমানে অবস্থান কালীন তাহার আকারাবযবের বিশেষত্বগুলি পরিচিত লোকদিগের মুখে শুনিয়া লিখিয়া বাখিয়াছিলাম। প্রথমে দেওঘরের চুবির ব্যাপারের

সকল কথাই ভূষণ অস্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু তারপর হাজতে রাখিয়া দুই একটি তাড়া দিবার পর সে সকলই স্বীকার করিল এবং অপহৃত গহনাগুলিও কাঠগোলাতে পাওয়া গেল।

আমার এই অপরাধী ধরিবার আমূল ইতিহাস শুনিয়া বড়বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন এবং সেই রাত্রেই দেওঘরে যাত্রা করিয়া চৌর্য কার্যের সাহায্যকারী সেই মুহুরী শ্যামলাল রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এই প্রকার অসম্ভাবিত উপায়ে কৃতকার্যতা লাভ করিয়া, শ্রমক্লিষ্ট ক্ষীণ শরীরে যেন চতুর্গুণ বল প্রাপ্ত হইলাম এবং একজন সাহায্যকারী ইনেস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়া সেই রাত্রেই পুনরায় দেওঘরে যাত্রা কবিলাম।

পরদিন প্রাতে দশটার সময় দেওঘরে পৌঁছিয়া, স্থানীয় থানা হইতে কয়েকজন কনস্টেবল সঙ্গে লইয়া, বনমালী চৌধুরীর বাসায় উপস্থিত হইলাম। শ্যামলাল রায় মুহুরী মহাশয় তখন একজন দেন্দারের সুদের হিসাব করিতেছিলেন , আমি তাঁহাকে আইনমত অপরাধেব কথা বলিয়া গ্রেপ্তার করিলাম। এ কথা কর্তার কর্ণগোচর হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি কতকগুলা বাজে কথা বলিয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। আমি তাঁহাকে পার্শ্বের ঘরে লইয়া গিয়া, চুরির আমূল ইতিহাস বর্ণন করিলাম এবং মুহুরী মহাশযের নামীয সেই চিঠিখানিও দেখাইলাম। বলা বাহুল্য সেই পত্র হইতে কি প্রকারে আমি ভূষণ দাসের সন্ধান পাইয়াছিলাম তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। তারপর "খ চ খ ক ক ইত্যাদি" অক্ষরাঙ্কিত সেই কাগজখণ্ডের সাহায্যে যে পত্রখানি পড়িতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম ; বাঙ্গালা বর্ণমালার দ্বিতীয় অক্ষর "খ"-এর অর্থ প্রথম ছত্রস্থ দ্বিতীয় শব্দ "আমি" এবং তৎপরবর্তী বর্ণমালার ষষ্ঠ অক্ষর "চ" যে পত্রেব দ্বিতীয় ছত্রস্থ ষষ্ঠ শব্দ "জিনিষ" বুঝাইতেছে এবং এই প্রকারে যে পত্রপাঠ করিতে হইবে চৌধুরী মহাশয়কে বেশ বুঝাইয়া দিলাম। কর্তা তখন স্বয়ং পত্রের প্রত্যেক ছত্র হইতে পূর্বোক্ত প্রকারে নির্দিষ্ট শব্দগুলি বাহির করিয়া পত্রপাঠ করিয়া আমার বুদ্ধির যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন।

অপরাধী শ্যামলাল রায়কে হাজতে পাঠাইযা, আমবা সেদিন চৌধুরী মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে দেওঘরে অবস্থান করিলাম।

পরদিন কলিকাতায় গিয়া শুনিলাম, বর্ধমানের হত্যাকারী এবং দেওঘরের চোর ধৃত করার পুরস্কার.স্বরূপ, একটি সত্তর টাকা মাহিনার পদে আমার উন্নতি হইয়াছে।

অদৃষ্টের পরিহাস

দীনেন্দ্রকুমার রায়

হরিচরণ বাবুর অবস্থা পূর্ব্বে খুব ভাল ছিল, চাবি পুরুষ হইতে তাঁহারা বড লোক। হরিচরণের প্রপিতামহ বিশ্বরূপ মজুমদার প্রথম যৌবনে দাঁড়ী ধরিয়া নিজের মুদীখানাব দোকানে চাল ডাল লবণ তেল বিক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্রমশ উন্নতি হওয়ায কমলার কৃপায় মৃত্যুকালে তিনি নগদ পঁচিশ ত্রিশ হাজার টাকা রাখিয়া যান, এতদ্ভিন্ন উত্তর ও পূর্ব্ব বঙ্গের দুই তিন স্থানে তাঁহার 'মোকাম' ছিল। বিশ্বরূপের পুত্র বিশ্বম্ভর ব্যবসাযে অবস্থার আরও উন্নতি করিয়া দশ বারো হাজার টাকা আয়ের জমিদারী পর্য্যন্ত ক্রয করিয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন কলিকাতার মহাজনপটীতে তাঁহার বিস্তীর্ণ কারবার ছিল। বিশ্বম্ভরেব মাতৃশ্রাদ্ধের সমারোহ সনাতনপুর অঞ্চলে কিংবদন্তীর ন্যায় প্রসিদ্ধিলাভ করিযাছে। হরিচরণকে জমিদারী ও ব্যবসায় এই উভয় কর্ম্মে সনিপুণ দেখিযাই তাঁহার পিতা গুরুচরণ মজুমদার বৈকুণ্ঠলাভ করিয়াছিলেন। হবিচরণ যখন পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইলেন, তখন তাঁহাব সংসারে সুখ-সম্পদ উথলিয়া উঠিয়াছিল, সুবৃহৎ অট্টালিকায় নিরন্তর বহু পোষ্য প্রতিপালিত হইত, সকলে বলিত, "হরিচরণ বাবুর গৃহে মা লক্ষ্মী অচঞ্চলা।" কথাটা কাহারও অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হইত না। গ্রামের লোক হরিচবণের নিকট বিপদে পবামর্শ লইতে আসিত , সম্পদে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না কবিয়া কোন কার্যে হস্তক্ষেপণ করিত না। হরিচরণের একটা মুখের কথায় গ্রাম্য দলাদলির নিষ্পত্তি হইয়া যাইত। গ্রাম্য বারোযারী কাণ্ডে হরিচরণ সকলের নেতা ছিলেন। বারমাসে তাঁহার গৃহে তের পার্ব্বণ হইত। এক একটি উৎসব উপলক্ষে সমস্ত গ্রামবাসী তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আকণ্ঠপূর্ণ ভোজনে পরিতৃপ্ত হইত। 'হরি বাবুর বাড়ী যাইতেছি' — বলিলে ঘাটের মাঝিরা পর্যন্ত পথিকের নিকট পারপণ্য লইত না, — তাহাবা হরিচরণবাবুর নিকট প্রচুর বার্ষিক পাইত। কোন গবর্ণমেন্ট কর্ম্মচারী 'ট্যুরে' সনাতনপুবে আসিলে হরিচরণ বাবুর গৃহে তাঁহাকে আতিথ্যগ্রহণ করিতে হইত। হরিচরণ যাহার সহিত হাসিয়া কথা কহিতেন, সে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত।

কিন্তু দীর্ঘকাল এভাবে কাটিল না, একবার একটা বড় ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় তাঁহাব লক্ষাধিক টাকা নষ্ট হইয়া গেল; তাহার পর কয়েক বৎসর উপর্য্যুপরি ব্যবসায়ে অনেক টাকা লোকসান দিয়া তাঁহাকে বিস্তর টাকার জন্য দায়িক হইতে হইল। কিন্তু হরিচরণ ইহাতে দমিলেন না। তিনি অনেক অধিক সুদে তাঁহার প্রতিবেশী মহাজন দে মহাশয়ের নিকট দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ লইয়া সতেজে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, কিছুকাল বিশেষ সাবধানে কারবার চালাইতে পারিলেই পুনর্ব্বার তিনি কারবারের উন্নতিসাধন করিতে পারিবেন, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া পূর্ব্ব সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইবেন। দে মহাশয় সতর্ক মানুষ, তাঁহার অগাধ অর্থ, কিন্তু যক্ষের ধন বলিয়া তাঁহার অর্থের একটা খ্যাতি ছিল; সকলে বলিত, দে মহাশয় যক্ষের টাকা পাহারা দিতেছেন। দে মহাশয়ের গৃহে অসন-বসনের ব্যবস্থা দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না যে তাঁহার হাতে কিছু টাকা

আছে; তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র কখন জানুর নিম্নে অবতরণ করিবার অবসর পাইত না ; ভিখারীবা কোন দিন তাঁহার নিকট একমুষ্টি ভিক্ষা পায় নাই, সকালে উঠিয়া দৈবাৎ যদি কেহ তাঁহার নাম উচ্চাবণ করিয়া ফেলিত তাহা হইলে আসন্ন একাদশীর ভযে তাহাকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইতে হইত। এ হেন দে মহাশয় চক্রবৃদ্ধির হারে সুদ লইবার বন্দোবস্ত করিয়া হরিচরণের দেশস্থ ও কলিকাতার অট্টালিকা, এবং সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি বেহেন (বন্ধক) রাখিয়া দুই লক্ষ টাকা কর্জ্জ দিলেন।

সংসারের লাভ-লোকসান তাসের পড়তার মত। যখন হার আরম্ভ হয, তখন সর্ব্বপ্রকাব সতর্কতা নিষ্ফল হইয়া যায়। হরিচরণ অতি সাবধানে কাববার চালাইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সহস্র চেষ্টাতেও তিনি পড়তা ফিরাইতে পারিলেন না। মূলধন ক্রমে ক্ষয় হইতে হইতে শেষে অদৃশ্য হইল, তথাপি তিনি যে উচ্চ-চালে চলিতেছিলেন সে চাল ছাড়িতে পারিলেন না। লক্ষ্মীকে বিদায় দিযাও তিনি চাল বজায় রাখিলেন। ঋণলব্ধ টাকার সুদ চক্রবৃদ্ধিব হাবে বাড়িয়া ক্রমে আসলকে অতিক্রম করিল, দুই লক্ষ কিছু দিন পরে চারি লক্ষ ছাড়াইযা উঠিল। দে মহাশয এত দিন নীরব ছিলেন, তিনি যখন দেখিলেন হরিচরণ মহাপঙ্কে নিমজ্জিত, সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেও তাঁহাব ঋণ পবিশোধ হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি হিতোপদেশেব সেই সুবর্ণকঙ্কণাধিকাবী ব্যাঘ্রের ন্যায় হবিচরণকে গ্রাস কবিতে উদ্যত হইলেন। তিনি বলিলেন, ''ভায়া, সুদে আসলে তোমার কাছে অনেক টাকা পাওনা, আব ত এভাবে বসিয়া থাকিতে পাবি না, তোমার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে ছাডিযা দেও।'' হরিচবণ একটা কিস্তীবন্দীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন, কিন্তু বিষযজ্ঞ দে মহাশয় কি তাহাতে কর্ণপাত কবেন? কাহারও অনুরোধ তিনি গ্রাহ্য করিলেন না, মামলা আবম্ভ হইল। সেই মামলা জেলার সব-জজ আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াইল, উভয় পক্ষেব অর্থে অনেক উকীল-ব্যারিষ্টার বড লোক হইলেন , শেষে হরিচরণেব বিরুদ্ধে মামলা ডিক্রী হইল, হবিচবণ সর্ব্বস্বান্ত হইলেন, জলের দরে তাঁহাব সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয হইযা গেল, দে মহাশযই তাহা কিনিয়া লইলেন।

একদিন মধ্যাহ্নকালে দে মহাশয তাঁহার কাবপরদাজ (ভৃত্য) মারফৎ হবিপদ বাবুকে সংবাদ পাঠাইলেন, ''তোমার বসত-বাটীতে আজই আমি দখল লইব, যদি সহজে বাড়ি পবিত্যাগ না কর, আদালতের পেয়াদার সাহায্যে তোমাকে বাড়ি হইতে বাহিব কবিয়া দিব।'' — দে মহাশয যথাসময়ে ডিক্রীজারী করিযাছিলেন, গৃহত্যাগের জন্য হরিচবণকে নোটীশও দিয়াছিলেন। — হরিচরণেব মনে বড় ধিক্কার জন্মিল, তিনি এই অপমানেব প্রতিবাদমাত্র না করিয়া সেই মধ্যাহ্নে অর্দ্ধভুক্ত খাদ্যদ্রব্য পবিত্যাগ কবিযা, তাঁহার একমাত্র পুত্র মাণ্‌কেকে কোলে লইযা অনাবৃত পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাব সুখ-দুঃখেব সহচরী পত্নী নৃত্যকালীও অশ্রুসজল চক্ষু বস্ত্রাঞ্চলে আবৃত করিয়া স্বামীর অনুসরণ করিলেন।

গ্রামবাসীগণ দে মহাশয়ের উদারতায মুগ্ধ হইযা তাঁহার ও তাঁহার পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পুষ্প-চন্দন বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

(২)

হরিচরণের হাতে তখনও অল্প কিছু টাকা ছিল। সপরিবারে বৃক্ষমূলে বাস করা অসম্ভব, সুতরাং সেই টাকা ভাঙিয়া নগরের বাহিরে একটি ক্ষুদ্র খড়ো বাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া তিনি জীবন নাটকের নূতন অঙ্কে পদার্পণ করিলেন, কোন রকমে সেই বাড়িতে মুখ গুঁজিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যাহারা হরিচরণের কৃপাবিন্দু লাভের আশায় পূর্ব্বে তাঁহাব বাড়িতে আসিয়া, তাঁহার বৈঠকখানায় বসিয়া দিবারাত্রি তাঁহার গুণগান করিত, ছায়ার ন্যায় তাঁহাব

সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত, হরিচরণের মুখে একটি কথা শুনিলে বিজ্ঞের ন্যায় মাথা নাড়িয়া দশবার তাহাব প্রতিধ্বনি করিত, — সেই সকল রসগ্রাহী মধুমক্ষিকা হরিচরণের হস্তচ্যুত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার নূতন অধিস্বামী উত্তমর্ণ দে মহাশয়েবা মো-সাহেবীতে প্রবৃত্ত হইল। যাহাবা বিপদে পড়িলে হরিচরণের পরামর্শ ভিন্ন কোন কাজ করিত না তাহারা দে মহাশয়েব প্রসাদ — দুগ্ধ ও শর্করা মিশ্রিত সুপেয় চা (দে মহাশয়ের হৃদয়-মরুভূমিতে এই একটি মাত্র সখ কিরূপে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইযাছিল, সনাতনপুরেব বসোয়েলগণেব নিকট সে সংবাদ আমবা জানিতে পারি নাই ; — লেখক।) গলাধঃকরণ করিতে কবিতে বলিতে লাগিল, "বুঝেছেন দে মহাশয! এই হরিচরণ লোকটা কি বোকা! নিজেব বুদ্ধিব দোষেই সংসারটা রসাতলে দিলে!" দে মহাশয় পবম প্রীতি-প্রফুল্ল নেত্রে উপাসকবৃন্দের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া, থেলো হুঁকায় বারো পয়সা সেবের তাম্রকূট দগ্ধ করিতে করিতে বলিলেন, "কিন্তু দেশেব পাজী ব্যাটারা ত আমাকেই নিমিত্তেব ভাগী করে! হরিচবণেব হিতচেষ্টাতেই আমি টাকাগুলো কর্জ্জ দিয়াছিলাম, আমি যদি টাকা দিতে ইতস্তত কবিতাম, তা হইলে ও ব্যক্তি অনেক দিন আগেই ফেরার হইত। দোল করা, দুর্গোৎসব করা, বাড়িতে অতিথি সেবা দেওযার বড্ড বাড় বেড়েছিল। — মধুসূদন তেমনই দর্পচূর্ণ করেছেন।" পিতাম্বর পাল অনেক দিন হইতে দে মহাশয়ের নিকট কিছু প্রত্যাশা করিয়া আসিতেছিল, সে বলিল, "চূর্ণ বলে চূর্ণ! মধুসূদন একেবারে গুঁড়ো করে দিয়েছেন। তবু আপনি অনেক দযা দেখিয়েছেন, দেওযানী জেলে তাকে পোরেন নি, এ কলিতে কি কেউ কাবেও এত খানি অনুগ্রহ কবে?" দে মহাশয হর্ষগদগদ ভাবে বলিলেন, "না হে পিতেম! আমি খাঁটি মানুষ, বিবাদ বিসম্বাদে যেতে চাইনে, কিন্তু হরিচবণেব যে ভাবি জিদ্! আমি বলেছিলাম, নালিশ ফরিদের আবশ্যক নেই, কলিকাতাব বাড়ি আর জমীদাবীটুকু আমাকে লেখাপড়া কবে দাও, তাতেই অর্দ্ধেক সুদ ওযাসিল হয়ে যাবে। তা সে কিছুই কল্লে না, কাজেই আমাকে মামলায় বাধ্য হতে হ'ল। যাক্, বেচারার বসতবাড়িটি আমাব লইবার ইচ্ছা ছিল না, এখনও নাই, কিন্তু উহার তেজ দূব না হ'লে আর এ বাড়ি ফেরত দিচ্ছিনে। যদি সে কোনও দিন আমার কাছে এসে বাড়ি ভিক্ষা চায়, নিজের বেয়াদপিব জন্য দাঁতে কুটো নিযে আমাব কাছে মাপ চায়, তা হ'লে ভবিষ্যতে এ বাড়িটার এক অংশে তাকে বিনা ভাড়ায় বাস করতে দিলেও দিতে পারি, — কি বলহে জনমেজয়!" জনমেজয় নন্দী দে মহাশয়ের সেরেস্তায় একটি মুহুরীগিরির উমেদারীতে কালক্ষেপণ করিতেছিল, অবসর বুঝিয়া সে বলিল, "না হ'বে কেন? এ ত ঠিক আপনারই যোগ্য কথা। আপনাব হচ্ছে দযাব শরীর; তবু যত নিন্দুক ব্যাটারা আপনাব বদনাম রটায়! ভগবান অগাধ সম্পত্তি দান কবেছেন বলেই কি টাকাগুলো দবিয়ায় ফেলে দিয়ে বড়মান্সী দেখাতে হবে? পৃথিবীতে হিংসুকের অসাধ্য কর্ম্ম নাই! আপনি যে দয়ার সাগর তা এ অঞ্চলে কার অবিদিত আছে?" — এই স্তুতিবাদে দয়ার সাগর কোটালের জোয়ারের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিলেন! নিঃশেষিত ধূম নির্ব্বাপিতপ্রায় কলিকাটি এবার জনমেজয়ের হস্তগত হইল।

দে মহাশয়ের উদারতার কথা যথাসময়ে হরিচরণের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি ঘৃণার সহিত বলিলেন, "পিশাচের দয়ায় ধিক্! আমি যে বাড়ি ছাড়িয়া আসিয়াছি আর কখন তাহার ছায়াও মাড়াইব না। নিজের বাসগৃহ সুদের সুদে বিক্রয় হইয়া গেল, মহাজনের কাছে তাহা ভিক্ষা চাহিয়া পিতৃপুরুষের অপমান করিব? আমার এ কুঁড়ে ঘর অনেক ভাল!" — গ্রামের লোক নূতন করিয়া হরিচরণের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় পাইয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমানেরা একবাক্যে বলাবলি করিতে লাগিল, "টাকার শোকে লোকটার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।"

(৩)

হরিচরণের কয়েকটি পুত্র শৈশবেই মারা যায়, মাণিক তাঁহার শেষ সন্তান। মাণিক তাহার পিতা-মাতার নিকট সাত রাজার ধন এক মাণিকের মতই অমূল্য রত্ন ছিল। দুর্ভাগ্যের নিম্নতম সোপানে দণ্ডায়মান হইয়া হরিচরণ এই তিন বৎসরের শিশু পুত্রটির মুখের দিকে চাহিয়া চিত্ত সংযত করিতেন; মাণিককে তিনি এক দণ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্তরালে যাইতে দিতেন না। গ্রামের লোক হরিচরণের বর্ত্তমান দুরবস্থা দেখিয়া 'আহা' বলিয়া তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইবে না ভাবিয়াই তিনি লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক গ্রাম প্রান্তবর্ত্তী জনমানবহীন পদ্মাতীরে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পদ্মার জলকল্লোল দিবানিশি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিত। যখন একটু জোরে বাতাস বহিত, তখন পথপ্রান্তের দীর্ঘকায় ঝাউগাছগুলি শাখা কাঁপাইয়া শন্ শন্ শব্দ করিত, — তাহা হরিচরণের নিকট তাঁহারই ব্যথিত, মথিত আকুল বক্ষের অন্তস্তল হইতে সমুত্থিত দীর্ঘ নিশ্বাসেব মত শুনাইত। সলিলসিক্ত বর্ষার মধ্যাহ্নে শৃগালের দল জলভারপীড়িত লতাগুল্মের অন্তরাল হইতে বাহিব হইয়া আসিয়া তাঁহার বারান্দার নীচে দাঁড়াইত, এবং ক্ষণিকের সূর্য্যালোকে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া সমস্বরে চীৎকার করিত, তাহাদের সেই বিদীর্ণ কণ্ঠের আর্ত্তস্বরে তিনি তাঁহাব জীর্ণ হৃদয়েব নিত্যকালব্যাপী হাহাকারের প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতেন। বর্ষার আকাশে মেঘ ঘনাইয়া আসিত, উচ্ছৃঙ্খল বায়ু প্রবাহে নব বর্ষার সলিলপুষ্ট বৃক্ষপল্লবগুলি আন্দোলিত ও আলোড়িত হইত, এবং পদ্মা ভীষণ মূর্ত্তিতে তটরেখা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যেন তাঁহার সেই ক্ষুদ্র কুটীর গ্রাস কবিবার জন্য তরঙ্গ-বাহু প্রসারিত কবিয়া ছুটিযা আসিত। হরিচরণ তাঁহাব গৃহকক্ষে একাকী বসিয়া স্তব্ধ সন্ধ্যায় স্তম্ভিত হৃদযে নিজের ভাগ্যপরিবর্ত্তনের কথা চিন্তা করিতেন; এবং দৈবাৎ বাতায়ন পথে তাঁহার পিতামহ নির্ম্মিত, সুখদুঃখের ও শোকহর্ষেব সহস্র স্মৃতিবিমণ্ডিত পুরাতন অট্টালিকার দিকে তাঁহার দৃষ্টিপাত হইলে — তিনি দেখিতে পাইতেন, তাঁহাব শয়নকক্ষ হইতে কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইতেছে। দুঃখে ক্ষোভে মনস্তাপে হরিচরণের বুক ফাটিয়া যাইত; তাঁহার মনে হইত, ঐ দীপালোক যেন কোন এক নিষ্ঠুব স্বার্থপর পিশাচেব ন্যায় তাহার দিকে তাকিয়ে আছে। তখন তিনি বক্ষস্থল চাপিযা কহিলেন "ভগবান, এ আগুণ নিবাইয়া দেও, আর সহ্য করিতে পাবি না। সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছ, আমার সহ্য করিবার শক্তিটুকু কাড়িয়া লইও না; আমাকে দুর্ভাগ্য কবিযাছ, পাগল করিও না।"

কিন্তু এক একদিন তাঁহার আত্মসংযম কোথায় ভাসিয়া যাইত। একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি তাঁহার শয়নগৃহের বারান্দায় একখানি কম্বলের উপর বসিযা কাতর ভাবে ভগবানের নিকট ধৈর্য্য ও মনের বল প্রার্থনা করিতেছেন, এমন সময় মাণ্‌কে পাশের একটা ঘর হইতে ভিজিতে ভিজিতে ছুটিয়া আসিয়া ব্যগ্রভাবে বলিতে লাগিল, "বাবা, বাবা, দোর জানালা দিয়ে জলের ছাট্ এসে সব ভিজে গেল যে! এ বাড়ী কিচ্ছু ভাল নয়, চল, আমাদের ভাল বাড়ীতে যাই!" — হরিচরণ কোন উত্তর করিলেন না, তিনি নীরবে পুত্রকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন; শিশু পিতার ক্রোড়ে দাঁড়াইয়া মাথা একটু নত করিয়া তাহাব দু'খানি কোমল করপল্লবে পিতার মুখখানি উঁচু করিয়া ধরিল, এবং নির্নিমেষ চক্ষুতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, পিতার দুটি চক্ষু অশ্রুরাশিতে ভাসিতেছে। মাণ্‌কের চোখও শুষ্ক রহিল না; সে উভয় হস্তে পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছল ছল চক্ষে পিতার মুখের উপর দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল, "বাবা! তুমি কেঁদ না।" — শিশু পুত্রের এই সান্ত্বনাবাক্যে হরিচরণের চক্ষু হইতে অশ্রুরাশি নির্ঝর ধারার ন্যায় ঝরিয়া তাঁহার বক্ষস্থল প্লাবিত করিল। মাণ্‌কে পিতার ঘাড়ের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার কেশবিরল

মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে সস্নেহে বলিল, ''বাবা! কেঁদ না, এ বাড়ি ভাল, আমি এই বাড়িতেই থাক্‌বো।''

(৪)

ছয় মাস কাটিয়া গেল। হরিচরণের আর কোনই কাজ নাই, তাঁহার কারবার বন্ধ, বাহিরে যাতায়াত বন্ধ, সংসারের সকল কাজ তিনি বন্ধ করিয়া দিযাছেন, — কেবল জীবন প্রবাহটা বন্ধ করিতেই বাকি আছে।

তিনি মানসচক্ষে দেখিলেন পূর্ব্বেব ন্যায দিবারাত্রি হইতেছে। সব ঠিকভাবে প্রবাহিত হইতেছে। বাজাবে চাউলেব আমদানি, মহাজনদের গোলা তেমনই করিয়া ধান চাউলে পূর্ণ হইতে থাকে, গ্রামে তেমনই হাট বাজার বসে, হাট বাজারে পূর্ব্বের ন্যাযই জন সমাগম হয এবং হাটের মধ্যবর্ত্তী সুবৃহৎ বটবৃক্ষের ছাযায় বসিয়া মধ্যাহ্নে বাজারের লোক তেমনই করিযা পাশাব আড্ডা জমকাইয়া বসে। সকলই পূর্ব্বের ন্যায আছে, কেবল গ্রামে হরিচবণেব অস্তিত্বে কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। হাকিমেরা পূর্ব্বের ন্যায় এখনও সনাতনপুরে 'ট্যুরে' আসেন; পূর্ব্বে যাঁহাবা 'সফবে' আসিয়া হরিচরণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন, এখন আর তাঁহাদের কেহ নিমন্ত্রণ করেন না। তাঁহারা দুই এক সময় হরিচরণের সংবাদ কর্ম্মচারীগণকে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহার বর্ত্তমান দুরবস্থার কথা শুনিয়া তাঁহাকে 'পিটি' করেন। গ্রাম্য বারোয়াবী কাণ্ডে এখনও মহাসমারোহ হয়, কিন্তু বারোয়ারী তলায় এখন আর হবিচবণের উৎসাহপ্রদীপ্ত মুখ দেখা যায় না, বৈশাখ মাসের সায়ংকালে গ্রাম্য বিগ্রহ গোপীনাথ জিউর প্রাঙ্গণে সংকীর্ত্তনের দল নামগান করিবার জন্য সমবেত হয় কিন্তু সেখানে কেহ হবিচবণকে প্রেম গদগদ ভাবে নৃত্য করিতে দেখিতে পায় না। সমাজে থাকিয়াও হরিচবণ এখন আপনাকে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন। পূর্ব্বের ন্যায় দাস দাসী নাই, রসুযে ব্রাহ্মণ নাই, গণ্ডা গণ্ডা পাইক বেহারা বরকন্দাজ নাই, ঘুনসীতে আট দশটা চাবি ঝুলান ব্যস্তবাগীশ ভাণ্ডাবীর দল নাই। থাকিবার মধ্যে আছে এক মাত্র পুরাতন ভৃত্য বলরাম দাস, এতকাল প্রভুর অন্ন খাইয়া সে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারে নাই, প্রভুর কার্যে দেহপাত করাই তাহার একমাত্র ব্রত হইয়াছে। বলরাম সংসারের কাজ কর্ম্ম দেখে, হাট বাজার করে, লক্ষ্মীস্বরূপা গৃহিণী নৃত্যকালী দুই বেলা বন্ধন কবেন। একটা গাই গরু আছে, তাহাব দুগ্ধেই মাণ্‌কের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। মাণ্‌কে এখন ভাত খাইতে শিখিয়াছে। হরিচরণ মাণ্‌কেকে সঙ্গে লইযা চালাঘরে মাটীর দাওয়ায় আহার করিতে বসেন। মাণ্‌কের দুধের পরিমাণ কমিযা গিয়াছে তাই সে দিনে তিনবার ভাত খায়। কিন্তু মধ্যাহ্নে পিতার সহিত আহারে না বসিলে তাহার ক্ষুধা দূর হয় না। একদিন দুপুরবেলা মাণ্‌কে খেলা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পিতার সঙ্গে বসিয়া খাইতে পায় নাই; তাই সে দিন সমস্ত বৈকাল বেলাটা সে পিতার উপর অভিমান করিয়া কাটাইয়াছিল। ভাত বাড়া হইয়াছে এ সংবাদটি মাণ্‌কে ভিন্ন আর কেহ হরিচরণকে দিতে পারিত না। ঠিক সময়টিতে সে নাচিতে নাচিতে তাহার পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার পিঠের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিত, ''বাবা ভাত বেড়েছে উঠে এস।'' — হরিচরণের উঠিতে একটু বিলম্ব হইলে সে তাঁহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দু'খানি দিয়া তাঁহার চক্ষু আবৃত করিত। তাঁহার আশাহীন দুঃখময় ব্যর্থ মরু জীবনের একমাত্র সহচর — মাণ্‌কে!

(৫)

একদিন মধ্যাহ্ন কালে আহ্নিক শেষ করিয়া হরিচরণ তাঁহার কাশীদাসী মহাভারতখানি খুলিয়া শান্তি-পর্ব্ব পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের হাহাকার এই চিরদুঃখপূর্ণ, চিব

মধুর, চির নবীন অমৃতময়ী কবিতার স্রোতের মধ্যে নির্ব্বাপিত হইত, শান্তি ধারায় তাঁহার প্রাণের পিপাসা নিবৃত্ত হইত। মানব জীবনেব মহাদুঃখের সঙ্গীতময় কাহিনী তাঁহার ক্ষুব্ধ মর্ম্ম স্পর্শ করিয়া তাঁহাব হৃদয়ে একটি সুকোমল সহানুভূতি, একটি সুমধুর করুণার ভাব জাগাইয়া তুলিত। — হরিচরণ অখণ্ড মনোযোগের সহিত মহাভারত পাঠ করিতেছেন, এমন সময় স্বয়ং গৃহিণী আসিয়া সংবাদ দিলেন, আহার প্রস্তুত।

হরিচবণ মহাভারতখানি বন্ধ করিয়া উঠিলেন; খড়মে পা দিয়া একবার চারিদিকে চাহিলেন, যেন তাঁহা ব্যাকুল চক্ষু দুটি কাহারও সন্ধানে ফিরিতেছে, কিন্তু তাহাকে কোথাও দেখা গেল না। হরিচরণ বাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈ, মাণ্‌কে ত আজ আমাকে ডাকতে আসেনি; তোমার উপর সে রাগটাগ করেছে নাকি?"

নৃত্যকালী একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিলেন, "মাণ্‌কে নরম হয়ে শুয়েছে, তার গাটা একটু গরম হয়েছে বোধ হল।"

হরিচরণ রান্নাঘরে না গিয়া তাঁহার শয়নকক্ষে চলিলেন, দেখিলেন তক্তাপোশেব উপব শুইয়া মাণিক ঘুমাইতেছে। হরিচরণ ব্যাকুলভাবে ডাকিলেন, "মাণ্‌কে। বাবা মাণিক।" মাণিক একবার চক্ষু মেলিয়া পিতার দিকে চাহিল, তাহার পবমুহূর্তেই চক্ষু মুদ্রিত করিল। হবিচবণ তাহার উত্তপ্ত কপালে করতলস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মাণিক সোনা আমার, অসুখ কচ্ছে কি?" মাণিক কোন উত্তর দিল না, চক্ষুও মেলিল না।

হরিচরণ মুখের ভাত ফেলিয়া কবিরাজ বাড়ি ছুটিলেন। গ্রামে ভাল ডাক্তাবও ছিলেন, হরিচরণের ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন ছিল তখন তাঁহাবা ঘন ঘন তাঁহাব বাড়ি আসিতেন, হবিচরণেব পরিবারে কাহারও কোন পীড়া না থাকিলেও সাগ্রহে সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতেন, বিশেষতঃ ডাক্তার বাগচী মহাশয় বিদেশ হইতে আসিয়া হরিচরণের অনুগ্রহেই গ্রামে পসার করিতে পাবিযাছিলেন। এখন হরিচরণ গরীব, তাঁহাব সাহায্য গ্রহণেবও বাগচী মহাশযেব আর আবশ্যক ছিল না, তাঁহার এখন গ্রামে অখণ্ড পশার, গ্রামের দশজনেব মধ্যে তিনি একজন প্রধান ব্যক্তি। সুতরাং হরিচরণের গৃহে পদার্পণ কবিবার এখন তাঁহাব অবসব নাই।

তারানাথ কবিরাজ কবিরাজী চিকিৎসায় ধ্বন্বন্তরী তুল্য, তবে এ কালেব মত তাঁহার 'বিদ্যাবিনোদ' 'কবিভূষণ' প্রভৃতি উপাধি ছিল না, তিনি পরোপকারী দয়ালু লোক ছিলেন, হরিচরণের পিতার সহিত তাঁহার বন্ধুতা ছিল, হবিচরণ তাঁহাকে 'খুড়ো মশায়' বলিয়া ডাকিতেন। কবিরাজ মহাশয় অপরাহ্নে মাণ্‌কেকে দেখিতে আসিলেন। মাণিকেব তখন প্রবল জ্বর, সে বিছানার উপর ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এক এক বার 'জল জল' কবিয়া অস্ফুট স্ববে আর্তনাদ করিতেছে। মাণিকের মা তাহার মাথাব কাছে বসিয়া কখন বাতাস দিতেছেন, কখন তাহার মাথায় হাত বুলাইতেছেন।

কবিরাজ মহাশয় অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী পরীক্ষা কবিলেন, তাহার পর উপযুক্ত ঔষধাদি দিয়া পরদিন প্রভাতে আসিবেন বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলেন, হরিচরণ কিঞ্চিৎ দর্শনী লইয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন, তাহা দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, 'হরিচরণ এত দিন পরে আমাকে তুমি পর মনে করিতে আরম্ভ করেছ?" হরিচরণ টাকা লইয়া পলাইবার পথ পাইলেন না।

পরদিন সকালে কবিরাজ মহাশয় দেখিলেন, তখনও প্রবল জ্বর, ঔষধে ফল হয় নাই। তিনি গম্ভীরভাবে বাহিরে আসিলেন; হরিচরণ বলিলেন, "খুড়ো মশায়, মাণ্‌কেকে কেমন দেখলেন?"

কবিরাজ সহজ স্বরে বলিলেন, "জ্বর আজও ছাড়েনি, জ্বরটা কিছু জটিল রকমের হইতে পারে, তবে তুমি ব্যাকুল হইও না। রোগ কঠিন হইলেই তাহা দুঃসাধ্য হয় না।"

কিন্তু তৃতীয় দিন কবিরাজ মহাশয়েব মুখ আরও গম্ভীব হইল। তিনি দেখিলেন বিকারের পূর্ব্বলক্ষণ বর্ত্তমান! তিনি হরিচরণকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ হরিচরণ, ডাক্তারেরা অনেক সময় নিজের জেদ বজায় রাখিতে গিযা রোগী মারিয়া ফেলে, আমি তাহা মহাপাতক বলিয়া মনে করি। আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। আমার উপর তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকিতে পারে, আমি প্রাণপণ তোমাব পুত্রেব চিকিৎসা কবিব — সন্দেহ নাই। কিন্তু কবিরাজী চিকিৎসাব প্রতি তোমার শ্রদ্ধা না থাকে, তবে তুমি ডাক্তাব দিয়া দেখাও। বিপিন ডাক্তার ভাল, হাত যশও আছে, দোষের মধ্যে একটু অর্থপিশাচ, তা' তুমি যখন সর্ব্বস্বত্যাগ করিতে পারিয়াছ, তখন ছেলের জন্য আরও কিছু ব্যয় কর।"

হবিচবণ রুদ্ধনিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুড়ো মশায, তবে কি আমাব মাণিকের প্রাণেব আশা নাই?"

কবিরাজ মহাশয বলিলেন, "আঃ — কি পাগলেব মত কথা বল! ডাক্তারী চিকিৎসায় খুব শীঘ্র ফল পাওয়া যায়, সেইজন্যই তোমাকে এ কথা বলিলাম। ডাক্তার দিযা দেখাইতে হইলে, প্রথম হইতে দেখানই ভাল নয়? — আমিই যে নিজে কত সময় ডাক্তার ডাকি!"

বিপিন বাবুকেই ডাকান স্থিব হইল। বিপিন বাবু প্রথমটা ফুবসৎ নাই বলিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিলেন। ফুরসৎ বিলক্ষণ ছিল, তবে তিনি জানিতেন হরিচবণেব ন্যায় উপকারকের নিকট পয়সা লওয়া ভাল দেখাইবে না; বিনা পয়সায সময নষ্ট করিবার মত দুর্বদ্ধি তাঁহাব ছিল না। অবশেষে অর্থলোভ চক্ষুলজ্জাকে পরাজয করিতে সমর্থ হইল; কৃতজ্ঞতাব চিহ্নস্বরূপ তিনি প্রত্যহ দুই বার দেখিয়া একবাব মাত্র ভিজিট লইবেন এইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

বিপিন বাবু মাণিককে দেখিলেন, তাহার বুকে পিঠে টিথিস্‌কোপ লাগাইয়া অনেকক্ষণ ধরিযা বোগপরীক্ষা করিলেন, তাহার পর বিবক্তির সহিত বলিলেন, "কববেজটা বোধ করি জবাব দিয়া গিয়াছে! তা আপনারা ত প্রথমে ভাল ডাক্তার দিয়া দেখাইবেন না, যত সব Irresponsible Quacks – নিউমোনিযার টেন্ডেন্সী দেখিতেছি। এ বকম ভিজে স্যাঁতসেঁতে ঘবে এ বকম বোগীকে একদণ্ডও বাখা উচিত নহে, বেশ খটখটে শুকনো ঘরে রাখিবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হয।"

হবিচরণ এখন আব খটখটে শুকনো ঘর কোথায় পাইবেন? তাঁহাব অতীত জীবনের একটি দিন ফিরিযা পাইবাব জন্য তাঁহাব প্রাণ কাঁদিযা উঠিতে লাগিল; কোথায় সেই মর্ম্মর-শুভ্র প্রাসাদোপম অট্টালিকা, আব কোথায় এই বাসেব অযোগ্য ক্ষুদ্র মৃৎ কুটীর! পরহস্তগত গৃহে তাঁহার প্রবেশাধিকার কোথায়? তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে একটি অনতিবৃহৎ নিমগাছের ছায়ায় একখানি টুলের উপব বসিয়া দুই হাতে মুখ গুঁজিয়া বিদীর্ণ-হৃদযে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।

তিন দিন পবে মাণিকেব ডবল-নিউমোনিয়া ধরা পড়িল। হরিচবণ ও তাঁহার স্ত্রী দিবারাত্রি বোগীব শয্যাপ্রান্তে বসিযা তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, দুবন্ত বোগের সঙ্গে তাঁহাবা প্রাণপণে যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন , তাঁহারা উভয়ে পরিশ্রান্ত হইযা পড়িলেন, কিন্তু উপশম হইল না। ক্রমে বোগবৃদ্ধি হইযা মাণিকের মুখে মৃত্যুর ছাযা নিক্ষেপ করিল।

আটদিনের দিন মাণিকের আর জ্ঞান রহিল না, প্রলাপের ঘোরে সে ক্রমাগত বলিতে লাগিল, "বাবা বাড়ি চল, এ বাড়ি ভাল নয়, বাবা বাড়ি চল।" — অবশেষে সেই দিন শেষরাত্রে আর সে তাহার বাপের জন্য অপেক্ষা না করিয়া একাকী ভাল বাড়িতে চলিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে নদীতীরস্থ শ্মশানে মাণিকের সোনার অঙ্গ চিতায ভস্ম করিযা হরিচরণ তাঁহার গৃহে ফিরিলেন, এবং ধীরে ধীরে শয্যাগ্রহণ কর্বিলেন।

হরিচরণের বিপদের কথা উত্তমর্ণ দে মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, তিনি সৌখীন আক্ষেপ করিয়া পারিষদ্‌বর্গকে শুনাইয়া বলিলেন, "বুঝেছ ভবশঙ্কর, এই হরিচরণ লোকটা, নিজের জিদের জন্যেই ধনে প্রাণে মারা গেল, আমার কাছে যদি সে একবার এসে বল্‌তো, 'দে মশায়, ছেলেটা বাঁচে না, ডাক্তার একটা শুকনো খটখটে ঘরে তাকে রাখতে বলেছে, একটু আশ্রয় দেন; তা'হলে আমি নীচের তলার একটা কুঠুরী কি আর দিন কতকের জন্যে ভাড়া না নিয়ে ছেড়ে দিতে পারতাম না?"

পারিষদবর্গ পুনর্ব্বার কোলাহল পূর্ব্বক দে মহাশয়ের দয়ার মহিমাকীর্তন করিতে লাগিল। হে রজত চক্র, তুমি সহায় থাকিলে লোকে পিশাচকেও দেবতার আসনে বসাইয়া তাহার স্তুতিবাদ করে। তুমি ধন্য!

(৬)

হরিচরণের অল্প অল্প জ্বর হইতে লাগিল। কিন্তু চিকিৎসাব দিকে তাঁহার লক্ষ্য রহিল না, তিনি একস্থানে বসিয়া থাকিতেন, দিবারাত্রি কি চিন্তা করিতেন, এমন কি তাঁহার পত্নী যখন পুত্রশোকে আকুল হইয়া বিদীর্ণবক্ষা কপোতীর ন্যায় ধূলায় লুটাইতেন, তখনও তিনি তাঁহাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টা করিতেন না, কুটীরের বারান্দায় বসিযা সজলনেত্রে নদীর দিকে চাহিযা থাকিতেন। মাণিকের মৃত্যুর পব তিনি তাঁহাব মহাভাবত খানি একদিনও খুলেন নাই।

হরিচরণের বাড়ির পাশ দিয়া নদীতে যাইবার পথ। প্রভাতে ও সায়ংকালে পল্লীযুবতীগণ সেই পথ দিযা কলসীকক্ষে নদীতে স্নান করিতে বা গা ধুইতে যাইতেন। বাখালেবা গোরুর পাল লইয়া ধূলি উড়াইয়া সেই পথে গোচাবণেব মাঠে যাতাযাত কবিত। পল্লীবালকগণ পথের ধারে সুপক্ক ফলপূর্ণ নোনাগাছে চড়িয়া নোনা পাড়িত, ছুটাছুটি কবিয়া ঘুড়ি উড়াইত এবং স্বরচিত সুরে মেঠো গান করিযা বিরলবসতি পদ্মাতীর ধ্বনিত করিত। গ্রামের বিচিত্র মিশ্রকল্লোল দূরাগত অর্থহীন রহস্য ভাষেব ন্যায় হরিচরণের কর্ণে প্রবেশ করিত, তিনি এক একবার উৎকর্ণ হইয়া চাহিয়া থাকিতেন — যদি তাহারই মধ্যে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বব শুনিতে পান। কিন্তু নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিযা তখনই তিনি মুখ ফিরাইতেন। হরিচরণ যে দিকে চাহিতেন সেই দিকেই মাণিকের স্মৃতিচিহ্ন দেখিতে পাইতেন, মাণিকের ছোট নীলাম্ববী ধুতি ও লাল চাদরখানি আলনার উপব দেখা যাইত, তিনি দেখিতেন মাণিকেব লাল ছড়িখানা ও ছিন্নপ্রায় বিবর্ণ, জরীর জুতা-জোড়াটা ধূলিধূসরিত হইয়া এক কোণে পড়িয়া আছে, তাহাব টিয়ে পাখিটা খাঁচার মধ্যে বসিয়া ক্রমাগত চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে, "মাণিক, মাণিক, মাণ্‌কে রে!" মাণিকের পোষা বিড়ালটা এ ঘব হইতে ও ঘরে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এবং তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ব্যাকুলভাবে 'ম্যাও ম্যাও' করিয়া ডাকিতেছে। মাণিকের চাকাভাঙ্গা কাঠের গাড়িখানি লইয়া আর কেহ টানাটানি করে না, শিউলীগাছের তলায় বৃন্তচ্যুত ফুলগুলি অভিমানে শুকাইয়া যায় — সকালে উঠিয়া আর কেহ তাহা কুড়ায না। — সন্ধ্যার অন্ধকারে যখন ধরাতল আচ্ছন্ন হইত, কর্ম্মশ্রান্ত গ্রামবাসিগণ গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ব স্ব পুত্র-কন্যাগুলিকে আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইত, রৌদ্রদগ্ধ গ্রামের কর্ম্ম-কোলাহল ধীরে ধীরে নৈশ প্রশান্তির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাইত — তখনও কর্ম্মহীন, বৈচিত্র্য-বিহীন, সুখশান্তি-বিচ্যুত হরিচরণের ক্ষুব্ধবক্ষের অন্তরাল হইতে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্রমাগত ডাকিত, "মাণিক, মাণিক, মাণ্‌কে রে।"

(৭)

ডাক্তার বলিলেন, স্থান পরিবর্তন ভিন্ন হরিচরণের শরীর সুস্থ হইবার সম্ভাবনা নাই, কয়েক মাস রোগে ভুগিয়া তিনি একেবারে কঙ্কাল সার হইয়া পড়িলেন, ঔষধে কোন ফল

হইল না; তিনি বলিতেন, "আর কেন, আমার সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমি ত শীঘ্রই যাইব, তোমাকে পথের ভিখারিণী করিয়া রাখিয়া চলিলাম, এই দুঃখে আমি শান্তিতে মরিতে পারিতেছি না।" নৃত্যকালী বলিতেন, "আমাব সকল সুখ, সকল আশা ঘুচিযা গিয়াছে, ও কথা বলিযা আর তুমি আমার বুকে ছুরি বিঁধিও না।"

অবশেষে দুই চারি জন প্রতিবেশী উদ্যোগ করিযা হরিচবণকে বৈদ্যনাথে পাঠাইবার জন্য রেলের গাড়ি'তে তুলিয়া দিলেন। সঙ্গে তাঁহাব স্ত্রী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য বলরাম। বলবাম এখনও প্রভুর সেবায় দেহপাত করিতেছে।

স্থির হইল, হরিচরণ দুই চারি দিন কলিকাতায় অপেক্ষা কবিযা ভাল ডাক্তার দিযা একবার রোগ পরীক্ষা কবাইয়া তাহাব পর বৈদ্যনাথে যাত্রা কবিবেন। কলিকাতায একটা ছোট বাড়ি এক মাসের জন্য ভাড়া কবা হইয়াছিল, হরিচরণ সপরিবারে সেখানে উঠিলেন। কলিকাতার মহাজনপটীতে একদিন হবিচরণ বাবুর অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল, কারবাব উপলক্ষে যখন তিনি কলিকাতায় আসিতেন, তখন প্রতিদিন কত লোক তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাঁহার বিন্দুমাত্র অনুগ্রহলাভের জন্য কত লোক তাঁহার 'গদীতে' বসিয়া থাকিত। বন্ধু বান্ধবগণের হর্ষ কোলাহলে তাঁহার সুবৃহৎ গদী সর্ব্বক্ষণ মুখরিত হইত। আজ পাঁচ বৎসর পরে হরিচরণ তাঁহার পিতামহের সযত্ন-নির্ম্মিত গদীর অদূরে একটি পুরাতন জীর্ণ ক্ষুদ্র অট্টালিকাব অন্ধকারময় কক্ষে বোগশয্যা প্রসাবিত করিলেন। রাজধানী পূর্ব্বের ন্যায় তেমনই প্রমোদমত্ত, চতুর্দ্দিকে তেমনই উৎসাহ ও আনন্দের অবিরল কল্লোল, কিন্তু হবিচরণের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর দারুণ পরিবর্তন ঘটিযাছে, তাঁহার অনুগ্রহে মহাজনপটীতে যাহাবা মান্য গণ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিচিত, তাহাদেব কেহ কেহ হরিচরণেব কলিকাতায় আগমনেব সংবাদ শুনিতে পাইল. কিন্তু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবাব কাহারও অবসব হইল না।

কলিকাতায আসিযা হরিচবণ একদিন জোব কবিযা গঙ্গাস্নান করিলেন, সেই গঙ্গাস্নানই তাঁহাব কাল হইল, সেই বাত্রে তাঁহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। জ্বর 'রেমিটেন্ট টাইপে' দাঁড়াইল, নৃত্যকালী আত্মীয়স্বজনহীন অপরিচিত স্থানে আসিয়া নূতন বিপদে পড়িলেন। তিনি হাতেব নোযা গাছাটি মাত্র হাতে রাখিয়া সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া স্বামীর চিকিৎসার জন্য বড় ডাক্তার নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল; অবশেষে একদিন অমাবস্যার রাত্রে যখন আকাশে ভয়ানক মেঘ করিয়া মুষলধাবে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, দিগন্তব্যাপী নিকষ কৃষ্ণমেঘ ধরণীর বক্ষে নিবিড় ছায়া নিক্ষেপ কবিযা প্রতি মুহূর্তে প্রলয়ানুষ্ঠানের সম্ভাবনা জানাইতে লাগিল, এবং রাজপথেব সমস্ত গ্যাস নিবাইয়া দিয়া প্রমত্ত ঝটিকা তাঁহার একটি মাত্র ফুৎকারে রাজধানীর বক্ষে সুপ্তপ্রায় সমুন্নত অট্টালিকাগুলিকে কর্দ্দমরাশিতে বিলুণ্ঠিত করিবার জন্য উন্মত্তভাবে মুক্তপক্ষ দানবের মত হুঙ্কার ধ্বনি কবিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল, সেই সময়ে হবিচরণের বক্ষেব স্পন্দন ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আসিল, তাঁহার জীবন-বন্ধ প্রতিমুহূর্তে টুটিতে লাগিল, তিনি শ্বাসগ্রহণে কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন, অন্তিম হিক্কায় তাঁহার কণ্ঠনালি অবরুদ্ধ হইল।

নৃত্যকালী বুঝিলেন, স্বামীর আসন্নকাল সমুপস্থিত! তিনি মরণাহত স্বামীর বুকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাঁহার জ্যোতিঃহীন নির্ণিমেষ নেত্রের দিকে অশ্রুভারাবনত চক্ষে চাহিয়া বাষ্পগদগদ স্বরে ব্যাকুল ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে বলে এসে আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাচ্ছ গো!"

হরিচরণ কষ্টোচ্চারিত মৃদু স্বরে বলিলেন, "চুপ কর, এখন আমি মাণকের কাছে যাচ্ছি।"

মিতে

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইস্‌লামপুবের জমীদারপুত্র সুবোধকুমাব ভৈরব নদেব জলে কাগজের নৌকা ভাসাইতেছিল। নৌকা যখন খানিক দূর ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন সে একটি কঞ্চি দিয়া নৌকাখানি টানিয়া তীরের কাছে আনিতেছিল। এমন কবিয়া সে ও তাহাব নৌকা গ্রাম ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গেল।

গ্রামের বাহিরে আসিয়া বালকেব চমক ভাঙিল। তখন সন্ধ্যা হইযা আসিযাছে, পাখীরা কলরব কবিতে করিতে কুলায়ে ফিরিতেছে, কৃষকেরা মাঠের কাজ সাবিয়া লাঙ্গল কাঁধে বাড়ির দিকে চলিযাছে। অপরিচিত স্থানে বাত্রি আসিল দেখিয়া সুবোধকুমারেব প্রাণ যেন কেমন কবিযা উঠিল। তাহার মা তাহার কাছে নাই, — সে মা মা বলিয়া চীৎকাব কবিতে লাগিল।

সুবোধকুমারের সমবয়স্ক একটি বালক একগোছা ছোলাব শাক হাতে কবিযা সেইদিকে আসিতেছিল। সে সুবোধকুমাবকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাহাব নিকট ছুটিযা আসিযা জিজ্ঞাসা কবিল, 'তুমি কোত্থেকে এসেচ ভাই? কোথায যাবে?"

সুবোধ বলিল, "আমি পথ ভুলে গেছি — আমি বাড়ি যাব।"

বালক জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাব বাড়ি কোথায?"

সুবোধ বলিল "ইসলামপুব জমীদারদেব বাড়ি।"

বালক বলিল, 'তুমি ভয কোরো না, আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেব। এখন আমাদেব বাড়ি আমার মা'ব কাছে চল।"

অপরিচিত স্থানে বন্ধু লাভ কবিয়া সুবোধ চক্ষের জল মুছিল। বালক সুবোধকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি ভাই?"

সে বলিল, "আমার নাম সুবোধকুমার।"

বালক বলিল, "আমারও ভাই তাই নাম। ভারি মজা না! আজ থেকে তুমি আমাব মিতে।" সুবোধকুমারের মুখে হাসি ফুটিল।

সুবোধ তাহার মিতের হাত ধরিয়া তাহাদেব বাড়িতে আসিল। ছোট একতলা বাড়ি। বাড়ির বাহিরে খানিকটা জমি পরিষ্কার করিয়া বেগুনের ক্ষেত করা হইয়াছে, বাড়ির দেয়াল বাহিয়া কুমড়োর গাছ উঠিয়াছে, বাড়ির ভিতর উঠানের এক পাশে তুলসীমঞ্চে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। আর এক পাশে মাচার উপর শসা ঝুলিতেছে। ভিতরে দুইটি মাত্র ঘর — একটি ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, আর একটি ঘর অন্ধকার।

বালকদের গৃহপ্রবেশ-শব্দে একটি স্ত্রীলোক ত্রস্তপদে যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল, "আরে হাব্‌লা এসেছিস্! আমি সন্ধ্যে থেকে ঘর আর বা'র করছি। এত দেরি ক'রিল কেন! আমি ভেবে ভেবে মরছিলাম। সঙ্গে এ কে?"

হাব্‌লা বলিল, 'মা সেই কথাটাই আগে জিজ্ঞাসা কবতে হয়। বল দেখি কে?''

মা বলিল, ''আমি যদি তাই জানব, তবে জিজ্ঞাসা করব কেন!''

হাব্‌লা বলিল, ''একটা আন্দাজ করে' বল না।''

হাব্‌লাব মা বলিল, ''ক্ষ্যাপা ছেলে, এতে কি আন্দাজ কবব — তুই বলনা কে?''

''বল্‌ব, তবে বল্‌ব, এ আমার মিতে' এই বলিয়া হাব্‌লা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাব্‌লার মা হাব্‌লার মুখে সব শুনিয়া সুবোধকে আদর করিযা ঘরে লইয়া গেল। তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ''কোন ভয় নেই বাছা, আমরা তোমায় বাড়ি দিয়ে আসব।''

হাব্‌লা বলিল, ''মা, মিতে মা মা বলে কাঁদছিল।'' ''বাছা আমার, বাবা আমাব'' বলিযা হাব্‌লাব মা সুবোধকে কোলেব ভিতর টানিযা লইল এবং স্বহস্তে তাহাকে খাওয়াইল — খানকতক শসা, একটু ছানা, একটু মোহনভোগ — বিধবাব ঘবে আর কিছু ছিল না — খাওয়া হইলে হাব্‌লাব মা পুত্রেব হাত ধরিয়া এবং সুবোধকুমারের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে কোলে করিয়া জমিদার-বাড়ি চলিল।

জমিদাববাড়িতে হুলুস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। দবওযান, চাকরবাকব হাঁকডাকে গ্রামখানি সবগবম কবিয়া তুলিযাছে। গালপাট্টাধাবী আকালী সিং দীর্ঘ যষ্টী হস্তে ''খোকাবাবু কিধাব গিযা'' ''খোকাবাবু কিধাব গিযা'' বলিতে বলিতে একদিক দিযা চলিযাছে। চাকববাকব লণ্ঠন হাতে আর একদিক দিয়া ছুটিয়াছে।

এমন সময হাব্‌লাব মা সুবোধকে কোলে কবিয়া বাড়িব ভিতব হাজির। গৃহিণী এতক্ষণ সপ্তমে সুব চডাইযা কাঁদিতেছিলেন, সুবোধকে দেখিয়া সুব নামাইযা তাহাকে কোলেব কাছে টানিযা লইযা প্রশ্নেব পব প্রশ্নে হাব্‌লার মাকে বিব্রত কবিযা তুলিলেন। সমস্ত শুনিয়া গৃহিনী উঠিলেন, চাবিব গোছা ঝম্‌ ঝম্‌ কবিতে কবিতে উপরে গেলেন এবং খানিকক্ষণ পবে ফিবিযা আসিযা হাব্‌লাব মা'ব হাতে দুইটি টাকা দিতে গিয়া বলিলেন, — ''ওগো ভালমানুষেব মেয়ে, এই দু'টাকা দিযে তোমাব ছেলেকে নতুন কাপড় কিনে দিও।''

হাব্‌লাব মা অপমানিত বোধ কবিযা 'আমবা ভিখিবি নইগো আমবা গেবস্ত ঘবেব মেযে'' — এই বলিয়া হাব্‌লাব হাত ধবিযা চলিয়া যাইতেছিল। সুবোধ ছুটিয়া আসিযা হাব্‌লার গলা জড়াইযা ধবিযা বলিল, ''মা, এ আমার মিতে। একে আজ আমাদের বাড়ি থাক্‌তে বল।''

গৃহিণী হাব্‌লাব মা'ব উত্তব শুনিয়া রাগে গস্‌ গস্‌ করিতেছিলেন, ঠাস কবিযা সুবোধেব গালে চড় মারিযা বলিলেন, ''লক্ষ্মীছাড়া ছেলে, মিতে পাতাবাব আব লোক পাওনি? চল ওপরে চল্‌।'' সুবোধ হাব্‌লাব গলা ছাড়িযা দিযা কাঁদিতে লাগিল। হাব্‌লাব চোখ ছলছল করিতেছিল, সে আস্তে আস্তে মা'র সঙ্গে বাড়ির বাহির হইয়া গেল।

তারপব হাব্‌লার সঙ্গে সুবোধকুমারের অনেকবার দেখা হইয়াছে। মাঠে, ঘাটে সুবোধ হাবলার হাত ধরিয়া সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত সকাল বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে। চাষাদের ক্ষেতে চাষাদের সঙ্গে আলু তুলিয়াছে, বাগানে ফুল তুলিয়াছে, নদীতে নৌকা ভাসাইয়াছে, পুকুরে মাছ ধরিয়াছে, — সুবোধের মা অনেক মারিয়া ধরিয়াও সুবোধকে পারিয়া ওঠেন নাই। সুবোধ জলখাবারের যাহা পয়সা পাইত, খাবার কিনিয়া মিতেকে খাওয়াইত, —তাহার মিতেও তাহাকে বাড়ি লইয়া গিয়া মাকে দিয়া লুচি ভাজাইয়া মোহনভোগ তৈয়ারি করাইয়া খাওয়াইত। বিধবার এই হাব্‌লা ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। তাহার কিছু ভূসম্পত্তি ও নগদ টাকা ছিল, তাহাতেই সংসার চলিয়া যাইত।

এইরূপে যখন সুবোধের সঙ্গে হাব্‌লার বন্ধুত্ব গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে চলিয়াছে, তখন একদিন সুবোধ সন্ধ্যার সময় হাব্‌লাদের বাড়ি আসিয়া বৃষ্টির জন্য সকাল সকাল বাড়ি ফিরিতে পারিল না। সেদিন হাবলা জেদ ধরিল, "মা, আজ মিতে আমাদের বাড়ি থাক। তুমি আজ খিচুড়ি কর।" মা কিন্তু জমীদারগৃহিণীর স্বভাব জানিত, সেইজন্য একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। হাব্‌লাও কিছুতে ছাড়িবে না। তার মা বলিল, "আমরা গরীবলোক, সুবোধ যদি আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়ি থাকে, তাহ'লে সুবোধকে ওর বাপ মা দু'জনেই খুব বকবেন, হয় ত মারবেন। সেটা কি ভাল।"

হাব্‌লা তাই শুনিয়া সুবোধেব মুখের দিকে চাহিল। সুবোধ মারের ভয় কবিলেও মিতেব বাড়ি একদিন থাকিবার লোভ সংবরণ কবিতে পারিল না।

দুপুর রাতে হাব্‌লাদের বাড়িতে ডাকাত পড়ার মত গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। কেহ দবজা ভাঙে, কেহ পাঁচিল টপকাইয়া ওঠে। হাব্‌লার মা বাহির হইযা দেখিল, সকলেই জমিদার-বাড়ির লোক। তাহারা হাব্‌লার মাকে দেখিয়া গালি দিয়া বলিল, "খোকাবাবু কোথায় আছেন শিগগির বল!" সুবোধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে অনেক ব'কল, কিন্তু তাহারা সুবোধেব কথা মোটেই গ্রাহ্য না করিয়া বলিল, 'মাঠাকরুণ হুকুম দিয়েচেন মাগীর চুলেব মুঠি ধরে' নিয়ে যেতে।" হাব্‌লার মা তাই শুনিয়া বলিল, "চল আমি যাচ্চি।"

সেই রাত্রে সুবোধ তাহার পিতার নিকট এমন মার খাইল যাহা তাহার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। সে মার খাইয়া হতভম্ব হইয়া বসিয়া রহিল। গৃহিণী হাব্‌লাব মাকে বলিলেন, "ছোটলোক মাগী, তুই আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকিস — তোর এত বড আস্পদ্দা তুই জমিদারের ছেলেকে বাড়িতে বাখিস্।"

হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ছোটলোক নই আমবা গেরস্ত।"

জমিদার গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিলেন, "ওমা কি হবে! ছোটলোক নচ্ছার মাগী আমাকে বলে দিদি! আস্পদ্দা কম নয়। তুই নাকি আমার ছেলেকে খিচুড়ি খাইযেচিস। ওমা কি ঘেন্নার কথা!"

হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরাও ভাল জাতের মেয়ে — আমাদের বাড়ি খেতে দোষ কি!"

কথা শুনিয়া গিন্নি তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ফের যদি আমার ছেলেকে তোরা ডেকে নিয়ে যাস ত তোদের ভিটেমাটি উচ্ছন্ন করব।"

সুবোধ চোরের মত তাহার বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে তাহার ঘুম হইল না — সমস্ত রাত ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাব্‌লা আর সুবোধের দেখা পায় না। সে সুবোধদের বাড়ির আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায, নদীর ধারে গিয়া বসে, বাগানে গিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, — কিন্তু সুবোধ আর আসে না। সে তাহার মিতের জন্য চারিখানি ঘুড়ি তৈয়ারি করিয়াছে, দুইখানি ভেলা বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কঞ্চি কাটিয়া ভাল ছিপ্ তৈয়ারি করিয়াছে। নদীতে ছিপ্ ফেলিয়া ভাবে সুবোধ এখনি পিছন হইতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিবে, — সে কিন্তু প্রথমেই বলিবে না যে, মিতে তাহার চোখ টিপিয়া ধরিয়াছে। সে প্রথমে হরিদাস, গৌরসুন্দর, নিতাইচাঁদ আরও কত কি নাম করিবে। তাহার পর বলিবে মিতে। তখন উভয়ের মধ্যে মস্ত হাসাহাসি পড়িয়া যাইবে। ছিপে বড় মাছ উঠিলে হাব্‌লা ভাবে, এ মাছটা মিতেকে দেখাইতে হইবে। তিন চার দিন বাড়িতে রাখিয়া মাছটা যখন পচিয়া যায়, দুর্গন্ধ ছোটে, তখন সে মাছটাকে ফেলিয়া দিয়া

আসে। বাগানে গিয়া রাশি রাশি ফুল তোলে, টগর, বেল, মল্লিকা, জুঁই — বড় একটা মালা গাঁথে, ভাবে মিতের গলায় দেব। যখন ফুলগুলি শুকাইয়া যায় তখন হতাশ হইয়া মালাটি ফেলিয়া দেয়। আবার সন্ধ্যার সময় সুবোধেব বাড়ির কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, যদি একবার দেখা পায় তবে ডাকিবে।

একদিন যখন হাব্‌লা লুকাইয়া সুবোধদের বাড়ির কাছে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিল, সুবোধদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গিয়াছে। কেহ ডাক্তার আনিতে ছুটিয়াছে কেহ ঔষধ আনিতে চলিয়াছে, কেহ "বরফ আন" বলিয়া চীৎকার করিতেছে — লোকজন ব্যস্ত হইয়া এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। হাব্‌লা শুনিল, সুবোধের কলেরা হইযাছে। তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, — সে উর্দ্ধশ্বাসে তাহাব মা'র নিকট ছুটিযা গিয়া বলিল, "মা মিতের কলেবা হযেছে। চল মা দেখে আসি চল।"

সেদিন মা ও ছেলের কাহারও খাওয়া হইল না। দুজনে জমিদার-বাড়ি গিয়া জমিদার গৃহিণীর পায়ে ধরিল বলিল, 'আমরা সুবোধেব শুশ্রূষা করব।" জমীদার-গৃহিণী আজ তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। হাব্‌লা ও তাহার মা সুবোধের কাছে বসিয়া সমস্ত প্রাণ দিযা তাহাব সেবা কবিতে লাগিল। তাহাদেব শুশ্রূষার গুণেই সুবোধ যে এ যাত্রা বক্ষা পাইল সকলেই তাহা একবাক্যে বলিতে লাগিল। হাব্‌লা এক মুহূর্তের জন্যও সুবোধের কাছছাড়া হয নাই।

সুবোধ যখন আবোগ্যলাভ করিল, তখন ডাক্তাবকে পাঁচ শত টাকা পুবস্কাব দেওযা হইল, এক শত টাকা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ কবা হইল এবং প্রায় চাবি শত টাকা খরচ করিয়া সর্ব্বমঙ্গলাব পূজা দেওয়া হইল। তখন গৃহিণী ভাবিলেন, হাব্‌লা ও হাব্‌লাব মাকে কিছু দেওয়া হইল না। এই মনে করিয়া পাঁচটি টাকা হাবলার মাকে দিতে গেলেন। হাব্‌লার মা বলিল, "দিদি, আমরা ওজন্যে আসি নি।"

আবার সেই দিদি! গৃহিণী মুখ ভার কবিযা বলিলেন, "আমবা বাছা, ওর বেশি দিতে পারব না।" হাব্‌লা ও হাব্‌লার মা কোন কথা না কহিযা গৃহে ফিবিযা আসিল।

এবার হাব্‌লার পালা। সে এই সাত আট দিন নিজের শরীবের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টিপাত কবে নাই। সে স্নান করে নাই, পেট ভরিযা খায় নাই, বাত্রে ঘুমায নাই। কলেবা সুবোধকে অব্যাহতি দিল কিন্তু তাহাকে চাপিয়া ধরিল। হাব্‌লার মা হাব্‌লাব জন্য সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও কিছু করিতে পারিলেন না।

হাব্‌লা ঔষধ খাইতে চাহিত না, কেবল বলিত, "আমাব মিতেকে একবার এনে দাও, আমি তাকে দেখব।"

হাবলার মা তিন চারি বার জমিদার-বাড়ি গিয়া সুবোধের মা'ব নিকট অনুনয় বিনয় করিল, তাঁহার পায়ে ধরিল, কিন্তু কোন কিছুই খাটিল না। সুবোধের মা বলিলেন, "আমার সুবোধ তোমাদের বাড়ি যেতে পারবে না বাছা, কেন বিরক্ত করছ। আমি বলছি সে যেতে পারবে না।" হাব্‌লার মা কর্ত্তাকে গিয়া ধবিল, বলিল, "আমার ছেলে একটিবার সুবোধকে দেখতে চায়। সে একবার আমার সঙ্গে আসুক।" কর্ত্তা বলিলেন, "সুবোধের শরীর খারাপ, যেতে পারবে না।" হাব্‌লার মা হতাশ মনে ফিরিয়া চলিল।

সুবোধ ঘরে বসিয়া হাবলার মা'র সকল কথা শুনিয়াছিল। সে খিড়কির দবজা দিয়া .উর্দ্ধশ্বাসে হাব্‌লার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল। হাব্‌লার মা তখন অর্দ্ধেক পথে।

হাব্‌লা সুবোধকে দেখতে পাইয়া আনন্দে বিছানায় উঠিয়া বসিল। সুবোধ তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ডাকিল "মিতে।" হাব্‌লা ক্ষীণকণ্ঠে উত্তর দিল, "মিতে।"

হাব্‌লার মা যখন বাড়ি পৌঁছিল, তখন সুবোধ হাব্‌লার মৃতদেহ বুকে করিয়া বসিয়া আছে।

নীলাম

হিরণ্ময়ী দেবী

।। ১ ।।

অতুল হরিবাবুর স্ত্রীর দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিপুত্র। শৈশবে পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালককে হরিবাবুর স্ত্রী আপনাদের বাটীতে স্থান দিযাছিলেন। কেবল করুণাই যে তাঁহার এই আশ্রয় দানের কারণ তাহা নহে। আরও একটি কারণ ছিল। হরিবাবু কলিকাতায় ৫০্ টাকা মাহিয়ানায় কর্ম্ম করিতেন। গৃহিণী একমাত্র শিশুকন্যাকে লইযা হবিবাবুব পৈতৃক স্থান বৈদ্যবাটীতে থাকিতেন। হরিবাবু বাসা খবচ বাবদ বাটীতে যে টাকা পাঠাইতেন তাহাতে সংসার বেশ একরকম সচ্ছলে চলিত। তবে গৃহে পুরুষ না থাকায় অনেক ছোটখাট কাজে কর্মে অসুবিধা হইত। তাই কতকটা কৰুণা কতকটা সুবিধাব জন্য হবিবাবুব স্ত্রী অতুলকে নিজ গৃহে আশ্রয় দিলেন। অতুল গৃহিণীব আবশ্যক মত কাজকর্ম্ম কবিযা দেয। গৃহিণীও অতুলের আহাবাদিব প্রতি লক্ষ্য বাখেন। কিন্তু আহারাদি ভিন্নও যে দশম বর্ষীয় বালকেব আরও কিছু প্রয়োজন সেটা তাঁহাব মনে আসিত না। গৃহিণী যখন সুকুমাবীকে বুকে লইযা ছাইপাঁশ অর্থহীন কথায় আদব কবিতেন, সুকু যখন মাতার গলা জডাইয়া বুকেব মধ্যে লুকাইয়া তাহা হাসিমুখে শুনিতে শুনিতে তদনুরূপ উত্তব দিত, তখন পার্শ্বে দাঁড়াইযা মৃত জননীর কথা মনে করিয়া বালকেব চক্ষু যে জলে ভরিযা যাইত, সেইরূপ মাতৃ-স্নেহেব অভাব অনুভব কবিয়া সে যে আড়ালে গিযা কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহাব উচ্ছ্বসিত বাল্যহৃদয দমন করিত তাহা তিনি দেখিতেন না।

কোন কোন দিন বালিকা সুকু খেলিবার জন্য অতুলকে খুঁজিতে গিয়া দেখিত অতুল কাঁদিতেছে, বালিকা তখন সন্দেশেব আধখানা দিযা কি নূতন পুতুলেব ভাগিদাব কবিযা তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা কবিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাত দুটি দিযা চক্ষু মুছাইয়া বলিত দাদা কাঁদিস নে। অতুল সুকুকে কোলে লইয়া পাখির বাসা পাড়িয়া দিতে যাইতেন।

।। ২ ।।

অতুল অনেক কষ্টে এন্ট্রেন্স পাশ করিয়া ২০্ জলপানি পাইয়া এবার কলিকাতায় পড়িতে যাইতেছেন। হর্ষবিষাদে অতুলের হৃদয় আচ্ছন্ন। হরিবাবুর উপর আর নির্ভর করিবার আবশ্যক নাই তাই অতুল সুখী। কিন্তু সুকুকে ছাড়িয়া যাইবেন কিরূপে? সুকুর সন্দেশ বা পুতুলেব পরিবর্তে দরিদ্র অতুলের হৃদয় ভিন্ন আর দিবার কি ছিল? কিন্তু হরিবাবু ত আর তাহাব হৃদয়ের পরিবর্তে তাহাকে কন্যা দান করিবেন না। যদি ঈশ্বর দিন দেন তখন যাহা হয় হইবে। এখন নিরাশ প্রেম হৃদয়ে ঢাকিয়া সুপ্ত বালিকার মুখখানি সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া অতুল প্রাতঃকালের গাড়িতে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। দুই বৎসর চলিয়া গিয়াছে। ঈশ্বরেচ্ছায় অতুল এল. এ পাশ হইয়া জলপানি পাইয়া ডাক্তারি শিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন; তাঁহাব

মনের নির্বাপিত প্রায় আশাদীপ একটু জ্বলিয়া উঠিযাছে এমন সময় হবিবাবুর পত্র পাইলেন যে জমিদার পুত্র নবকান্তব সহিত সুকুমারীর আগামী মাসে বিবাহ। বৈবাহিকেরা ধনবান সুতরাং ধনীর কন্যা তাঁহারা চাহেন না; সুন্দরী বধূ চাহেন। সুকুমারীর ন্যায় সুন্দরী গ্রামে আব কেহ নাই।

অতুলের আশা যদিও বড় বেশি ছিল না তবুও এ কথা শুনিযা তাহার হৃদয যেন একবাবে ভাঙ্গিয়া গেল। নিজের জন্য শুধু নহে সুকুমারীব জন্য আবো। নবকান্তও কলিকাতায অতুলেব সহিত এক স্কুলে পড়িতেন। অতুল তাহাব স্বভাব জানিতেন । তাঁহাব স্বভাব নানা প্রকাবে কলুষিত হইয়া পডিযাছিল। সুকুমাবী তাহার হইবে না তিনি জানিতেন কিন্তু তাই বলিযা স্বর্ণপ্রতিমা কি ধূলিসাৎ হইবে। হরিবাবু যে জানিযা শুনিযা কন্যাকে এরূপ পাত্রে সমর্পণ কবিবেন তাহা অতুলেব বিশ্বাস হইল না। অতুল নিজে যাইযা হবিবাবুকে এ বিষয়ে বলিবেন স্থিব করিযা সেইদিনই বৈদ্যবাটী গমন কবিলেন। হবিবাবু ও গৃহিণী অতুলের কথা শুনিলেন, শুনিযা বলিলেন, "তুমিও যেমন বাবা! আপনার কপালে সুখ, বয়স ধর্মে অমন হয, বিযে হলেই জামাই শুধবেব। অমন ঘব কি ছাড়া যায।"

অতুলেব কথাব ফল হইল না। মহা আড়ম্ববে সুকুমাবীব বিবাহ হইযা গেল।

।। ৩ ।।

অতুলেব ডাক্তাবিতে এখন বেশ পসার হইযাছে। অতুল কলিকাতাব একজন গণ্যমান্য ধনী লোক। তবে অতুল এখনও অবিবাহিত। মাসে দুই এক বাব যখন অতুল বৈদ্যবাটীতে হবিবাবুব স্ত্রীর সহিত দেখা কবিতে যান গৃহিণী তখন তাহাকে বিবাহের জন্য চাপিয়া ধরেন কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজি কবাইতে পাবেন না। গৃহিণী যে কথাব কথা মাত্র তাহাকে এইরূপ অনুবোধ কবেন তাহা নহে, অতুল যথার্থই এখন তাঁহাব পুত্রস্থানীয। কন্যাব বিবাহ দিযা তাঁহাবা সুখী হইবেন আশা কবিযাছিলেন, সে আশা পূর্ণ হয নাই। ধনীব বধূ দবিদ্র পিতামাতাদেব সহিত বড সম্বন্ধ নাই। তবু মেযে সুখে থাকে ত তাহাতেই সুখ। কিন্তু বড মানুষেব ঘবেব কথা লুকান থাকে না, — গৃহিণী দাসীব মুখে খবব শুনিতেন জামাতা মেযেকে অনাদব করে, মদ খাইযা অপমান কবে, ইহাতে গৃহিণীব চক্ষেব জলে দিন কাটিযা যাইত। কিছুদিন পবে হবিবাবুব মৃত্যু হইল। গৃহিণীর আব আপনাব কেহ বহিল না। কিন্তু আপনাব কেহ থাকিলেও অতুল অপেক্ষা যে গৃহিণীকে বেশি যত্ন কবিতে পাবিত তাহা বোধ হয না। এই যত্নেব ফলে যে স্নেহ একদিন অতুল চাহিযা পায নাই তাহা পাইল। গৃহিণী তাহাকে নিতান্ত আপনাব কবিযা লইলেন। মাঝে মাঝে মনে কবিতেন যদি সুকুব সহিত অতুলেব বিবাহ দিতাম তবে কি ভালই হইত! কিন্তু সেরূপ ভাবিযা এখন আব ফল নাই, মনেব আগুন মনেই নির্বাণ কবিতেন। অতুলেব বিবাহ দিযা পুত্রবধূ লইযা ঘব সংসাব কবিতে পাবিলেই এখন তিনি সন্তুষ্ট হন। অন্য বিষযে কোন কথা তাঁহাব অতুলকে দুবাব বলিতে হয় না — কিন্তু এবিষযে অতুল বড একগুঁয়ে, কিছুতেই তাঁহাব কথা শুনেন না।

অতুল এবাব গৃহিণীব সহিত সাক্ষাৎ কবিতে আসিযা দেখিলেন গৃহে সুকুমাবী তাহাব পুত্র ও দুইটি কন্যা বহিয়াছে। বিবাহেব পর সুকুব সহিত তাঁহাব এই প্রথম দেখা, অতুল চমকিয়া উঠিলেন। সুকু বিবাহের পব এই প্রথম পিতৃগৃহে আসিয়াছে আব কোথাও স্থান নাই। তাই স্বামী এখানে পাঠাইয়াছেন।

নবকান্ত যথেচ্ছাচার খরচে অনেক টাকা নষ্ট কবিযাছিলেন। তাহাব পব কিছুদিন পূর্বে এক জমিদারেব সহিত খুনেব মকর্দমায অনেক অর্থব্যয হইযাছে। এমন কি, বিষয বন্ধক

দিয়া ঋণ করিয়া মকর্দ্দমা চালাইতে হইয়াছে। এখন খুনের অভিযোগ হইতে যদিও নিস্তার পাইয়াছেন কিন্তু মকর্দ্দমা খরচে সর্বস্বান্ত হইতে হইয়াছে, এমন টাকা নাই যে সুদ দিয়া পর্যন্ত এখন পাওনাদারকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারেন, পাওনাদার মকর্দ্দমা করিয়া বিষয় বিক্রয় করিয়া লইতেছে। সপ্তাহ পরে বিষয় নীলাম হইবে, কিছু পূর্ব হইতেই সর্বস্বান্ত গৃহহীন নবকান্ত স্ত্রীপুত্র শ্বশুরবাড়ি পাঠাইয়াছেন।

গৃহিণী অতুলকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন — বলিলেন "বাবা রক্ষা কর তুই, আর আমাদের কে আছে? আমার যেমন কপাল — নইলে কেন এমন হবে। এমন জামাইও করেছিলুম। তখন তুই বলেছিলি ওখানে বিয়ে দিও না, তা কর্তা ত তোর কথা শুনলেন না! আহা যদি তোর সঙ্গে বিয়ে দিতুম!"

সুকু এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল কিন্তু আর পারিল না। স্বামী সহস্র দোষ করুন স্বামীর নিন্দা অসহ্য। তবু যেন মা যা বলেন সহিতে হয় কিন্তু অতুল যে বিবাহের পূর্বে স্বামীব নিন্দা করিয়াছিল, মা যে অতুলের সহিত বিবাহ হয় নাই বলিয়া দুঃখ করিতেছেন — এতদূর সহিল না; — তবে ইহাতে মায়ের উপর যত না রাগ হউক অতুলের উপরই বেশি রাগ হইল। আর সুকু কি এমনি হতভাগিনী ভিখারিনী যে স্বামী-নিন্দুকের সাহায্য লইবে? সুকু বলিল "মা চুপ কর — অত গোল করা কেন? বাপের বাড়ি এসেছি বলে কি আমবা ভিক্ষে করতে বেরিয়েছি — আমাদের জন্য তোমার ভাবতে হবে না — সে যার ভাবনা তিনি ঠিক করবেন।"

অতুল সুকুর হৃদয় ভাব বুঝিলেন, বুঝিলেন, — অতুলের নিকট সাহায্য লইতে যদিবা সুকুমারী কিছু মনে না করিত কিন্তু গৃহিণীর ও কথার পর আর লইবে না। একটু পবে ব্যথিত হৃদয়ে অতুল সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

।। ৪ ।।

সন্ধ্যা হইয়াছে। এখনও ঘরে দীপ জ্বলে নাই। যে গৃহ প্রতিদিন শত দীপে আলোকিত, শতকণ্ঠ-কলরবে পূর্ণ হইত আজ তাহা অন্ধকার নীরব নির্জন। কেবল এক জন লোক এই গভীর নির্জন প্রাসাদের প্রেতাত্মার মত একাকী বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। বাহিরের অন্ধকার বেশি কি তাহার হৃদয়ের অন্ধকার বেশি তাহা তাঁহার মুখ হইতে বুঝিতে পারা কঠিন। পিতৃ পিতামহেব চিবন্তন আবাস তাঁহার দোষে কাল পরহস্তগত হইবে, স্ত্রী পুত্র লইয়া তাঁহাকে পথেব ভিখাবী হইতে হইবে, সেই জন্য কি নবকান্তের হৃদয়ে অনুতাপের অন্ধকার, মুখে যাতনার ছায়া? কিম্বা এখনও নবকান্ত নিজের দোষ বুঝেন নাই। যাহারা তাঁহার ধনসম্পদ কাড়িয়া লইতেছে তাহাদেব কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার হৃদয়ে বিজাতীয় বৈরীভাব জ্বলিয়া উঠিতেছে?

হঠাৎ পার্শ্বে পদশব্দ শুনিয়া ফিরিয়া চাহিলেন — কি বিপদ — এক দণ্ড কি সুস্থির থাকিতে পাবিবেন না — শ্যাম তাঁহাকে জ্বালাতন করিয়া তুলিল। আজ বিপদের দিনে নবকান্তকে সকলে ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। কেবল বৃদ্ধ শ্যাম অশ্রুপূর্ণ নেত্রে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। সে নবকান্তকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছে। যদি প্রাণ দিয়াও সে নবকান্তের পূর্ব সৌভাগ্য ফিরাইতে পারিত তবে অকাতরে তাহা করিত। তাহা পারে না, তাই মলিন ছায়াটির মত নবকান্তেব সঙ্গে সঙ্গে ফিরে। কিন্তু এ স্নেহের মূল্য নবকান্তের কাছে নাই। যদি অশ্রু মুক্তা হইত বা টাকা হইত তবে নবকান্ত তাহার মর্যাদা বুঝিতেন। ইহাতে তিনি কেবল বিরক্ত হন মাত্র। এই একটু আগে তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছেন আবার বুঝি আসিতেছে।

নবকান্ত ক্রোধভরে চাহিয়া দেখিলেন শ্যাম নহে, অতুল দাঁড়াইয়া আছেন। এ পবিবর্তনে নবকান্তের ক্রোধের যে সমতা হইল তাহা নহে বরং বাড়িয়া উঠিল। সেই ছেলেবেলাকার অতুল — যে তাঁহার শ্বশুরান্নে পালিত, সেই দরিদ্র অতুল আজ ধনবান আর তিনি আজ নিঃস্ব। দোষটা যেন অতুলেরই। কিছুক্ষণ উভয়েই নিস্তব্ধ রহিলেন। একটু পরে শ্যাম বাতিহাতে আসিয়া বলিল — "একবার ঘরে আসতে আজ্ঞা হোক, আমি সমস্ত ঠিক করে বেখে এসেছি।" নবকান্ত রাগিয়া বলিলেন — "দেখ, ফের যদি বিরক্ত করবি তাহলে তোকে চাবিবন্ধ করে রাখব।" শ্যাম বলিল — "আরে পিত্তি পড়ে গেল যে, সেই দুটো কখন মুখে পড়েছে না পড়েছে! ভগবান, তোমার মনে এই ছিল!" নবকান্ত বলিলেন — "তুই এখন যাবি কি না যাবি? যদি অমন করে বক্‌বি, তাহলে আমি আজ খাব না, যা বলছি।" শ্যাম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল — "তা আমি যাচ্ছি, আপনি একটু পরে আসুন।"

শ্যাম চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া অতুল বলিলেন — "বড় অন্ধকার, বাতিটা এখানে রাখিয়া যাও ত হে।" শ্যাম তাঁহার পানে চাহিয়া বলিল — "অতুল বাবু! আজ সব অন্ধকাব, মশায, সব অন্ধকার —" নবকান্তের তাড়া খাইয়া শ্যামের আবার কথা বন্ধ কবিতে হইল। অতুল তাহাব হাত হইতে বাতি লইলেন, সে বিষণ্ণ মুখে চলিয়া গেল। ভৃত্য চলিয়া যাইবার একটু পরে নবকান্ত রূঢ় স্বরে বলিলেন — "কোন দরকাব আছে? বিষযটা কিরূপ বোধ কবি খবর লইতে আসিয়াছ? কাল কিনিতে চাও বুঝি?" অতুল কোন উত্তব কবিলেন না, পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির কবিয়া নীববে তাঁহার হাতে দিলেন। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিয়া নবকান্ত তাহা পড়িতে আরম্ভ কবিলেন। পড়িযা বিস্মিত হইলেন, যাহা পড়িলেন বিশ্বাস হইল না। জিজ্ঞাসা কবিলেন আসল অভিপ্রাযটা কি বল দেখি?

অভিপ্রায় যে কাগজে অস্পষ্ট ভাবে লেখা ছিল এমন নহে, তবে নবকান্ত তাঁহার সূক্ষ্ম বুদ্ধি সেই নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়ের মধ্যে স্বার্থপূর্ণ লুক্কাযিত গূঢ় উদ্দেশ্য সন্দেহ করিযাই এইরূপ প্রশ্ন করিলেন। অবশ্য ইহাতে নবকান্তেব দোষ দেওযা যায় না। তাহাব অভিজ্ঞতায সংসাবেব প্রকৃতিই এই । ইহার পর দুই জনে কথোপকথন চলিতে লাগিল; একটু পরে অতুল চলিযা গেলেন। যাইবার পূর্বে অতুল বলিলেন, — "কিন্তু আমাব অনুরোধটি মনে রাখিবেন — একথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না"। নবকান্ত যে সব সময় সকলের অনুবোধ বক্ষা কবিতেন তাহা নহে, তবে অতুলের এ অনুরোধটি চিরকালই বক্ষা করিয়াছিলেন।

পরদিন চৌধুরীদেব বিষয় নীলাম হইবে, অনেক লোক জমা হইয়াছে — এমন সময় খবব আসিল, নীলাম বন্ধ। চৌধুরী মহাশয় ঋণ শোধ করিয়াছেন।

ডালিম

চিত্তরঞ্জন দাশ

তখন আমার চল্লিশ পার হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু আমোদ-প্রমোদ ছাড়ি নাই। ছাড়িও নাই, ছাড়িতে চেষ্টাও করি নাই। আমি কোন কালেই মানুষ বড় ভাল ছিলাম না। সংসারের আমোদ-আহ্লাদের সঙ্গে কেমন একটা প্রাণেব যোগ ছিল, আমার মনে হইত, কখনও যোগভ্রষ্ট হইব না। সমস্ত যৌবনটা একরজনীব উৎসবেব মত কাটাইয়া দিযাছি। কখন আবন্ত হইল, কখন শেষ হইল, বুঝিতেও পারিলাম না। কোনও সুখ হইতে আপনাকে কখনও বঞ্চিত কবি নাই, আব তার জন্য কোনও আপশোষও হয় নাই। প্রাণেব মাঝে যে একটা মুক্ত আকাশ, একটা গভীর পাতাল আছে, তাহা তখন বুঝিতাম না। জীবনটা সর্বদাই এক বিশাল সমতল ভূমিব মত মনে হইত, জীবনেব বাজপথে ফুল কুড়াইতে কুডাইতে আব হাসি ছডাইতে ছডাইতে চলিয়া যাইতাম। কখনও পায়ে কাঁটাব আঁচড লাগে নাই। কখনও প্রাণে দাগ বসে নাই। সমস্ত আমোদ-প্রমোদেব মধ্যে বিনা চেষ্টায সহজেই প্রাণটাকে আস্ত বাখিযাছিলাম। কিন্তু আজ প্রায বুড়ো হইতে চলিলাম, আজ তাব জন্য ভাবিযা জীবন অন্ধকাব হইযাছে। সে কতদিনকাব কথা। তাবপব কত বৎসব চলিযা গিযাছে, তাহাকে আব ভুলিতে পাবিলাম না। কত খুঁজিযাছি — কোথাও পাইলাম না। সে যে অদৃশ্যভাবে আমাব আশে-পাশে ঘুরিযা বেড়ায — ধরা দেয় না। তাহাব পদধ্বনি শুনিতে পাই, তাহাকে দেখিতে পাই না। চোখ বুজিলে তাহাকে বুকেব ভিতর পাই, চোখ মেলিলে কোথায় মিলাইযা যায। আজও তাহাকে খুঁজিতেছি, জীবনেব অবশিষ্ট কাল বুঝি খুঁজিতে খুঁজিতে কাটিযা যাইবে। তাহাকে পাইব না? আমি যে তাহার জন্য অপেক্ষা করিযা আছি।

তাহার নাম জানি না, সকলে তাহাকে "ডালিম" বলিযা ডাকিত। সে দেখিতে সুন্দব কি কুৎসিত আমি এখনও বলিতে পাবি না। কিন্তু তাব মুখখানি এখন পর্যন্ত আমাব প্রাণে প্রদীপেব মত জ্বলিতেছে। মাথায় অন্ধকারের মত এক বাশ চুল, মুখে একটা গভীব পাগল-কবা ভাব, আর তার চোখ দুটি? — চাহিবামাত্র আমাব চোখ ছল ছল করিযা উঠিযাছিল। আজ পর্যন্ত অনেক রমণীর সঙ্গে মিশিয়াছি, আমোদ-প্রমোদ কবিয়াছি, কিন্তু এমন বিষাদেব প্রতিমূর্ত্তি, চোখে এমন গদ্ গদ্ করুণভাব আর কখনও দেখি নাই। বোধ হয, আর কখনও দেখিবও না।

সে দিন সন্ধ্যাকালে কয়জন বন্ধু লইয়া বাগানে আমোদ-প্রমোদ কবিতে গিযাছিলাম। পূর্ণবাবুর বাগান চাহিলেই পাওয়া যাইত, আমরা চাহিয়া লইয়াছিলাম। বাগানটি খুব বড়, ফটক হইতে সরু একটা রাস্তা ধরিযা অনেক দূরে গেলে বাড়িটা পাওয়া যায়। বাড়ির সামনেই একটা ঘাট-বাঁধান পুকুব। ঘাটেব ঠিক উপবেই শাণ-বাঁধান লতামণ্ডপ। সেই সরু রাস্তা ধরিয়া, সেই লতামণ্ডপের ভিতর দিয়া, বাড়ির ভিতরে যাইতে হয়। সে দিন বন্দোবস্তের কোন অভাব ছিল না। নানা রকমের প্রচুর সুরা, নানা রকমের খাবার, আলোয আলোয প্রমোদ-মন্দিব দিনের মত জ্বলিতেছিল।

আমার পৌঁছিতে একটু দেরি হইয়াছিল। ফটকে নামিয়াই সেই সরু রাস্তা। চাঁদের আলো খুব ক্ষীণ হইয়া ছায়ার মত সব ঢাকিয়াছিল। নানা ফুলের গন্ধে, সেই ম্লানছায়ালোকে, লতাপল্লবের মর্ম্মরধ্বনিতে সেই সরু রাস্তাটিকে যেন জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছিল। আমার মনে কি হইতেছিল, আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু প্রত্যেক পদধ্বনিতে কে যেন আমাকে সাবধান করিয়া দিতেছিল, সে রাস্তায় অনেকবার গিয়াছি, সেই বাগানে অনেক প্রমোদ-রাত্রি কাটিয়াছে, কিন্তু সর্বদাই হালকা মনে ফুরতি করিতে গিয়াছি। সে দিন আমার প্রাণে কোথা হইতে একটা ভার চাপিয়াছিল। সে যে কেমন ভার, আমি কিছুতেই বুঝাইয়া বলিতে পারি না।

আমি আস্তে আস্তে সেই বাড়িতে ঢুকিলাম। সিঁড়ি দিয়া উঠিতে উঠিতে গান হইতেছে, শুনিলাম। পরিচিত গায়িকা গাহিতেছে — "চমকি চমকি যাও।" ঘুঙুরের শব্দ শুনিলাম। নৃত্যগীতে আমার মন নাচিয়া উঠিত। কিন্তু সে দিন কি জানি কিসের ভারে আমাকে চাপিয়া রাখিয়াছিল। আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত আস্তে আস্তে উঠিয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম।

তখনও নাচ হইতেছে। সেই গায়িকা হাত ঘুরাইয়া নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে — "চমকি চমকি যাও!" আমাকে দেখিয়াই আমার বন্ধুরা সব চেঁচাইয়া উঠিল — "কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, দাদা আ — গিয়া।" একজন বলিল, "দাদা, এই লাও এক পাত্র চড়াও, আনন্দ কর।" আর এক জন গান ধরিল, "এত গুণের বঁধু হে।" আমার এক বন্ধু উঠিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল — "কাঁটা বনে তুল্‌তে গিয়ে কলঙ্কেরি ফুল। ওগো সই কলঙ্কেরি ফুল।" আর একজন উঠিয়া আমার মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিল, "দেখ্‌লে তারে আপনহারা হই।" আমার আর একজন বন্ধু একটা গেলাসে মদ ঢালিয়া আমার হাতে দিয়া গাহিলেন, "দাদা, হেসে নাও, দু'দিন বইত নয়, কি জানি কখন্ সন্ধ্যা হয়।" সবার হাতে মদের গেলাস, মদের গন্ধ, ফুলের সৌরভ, সিগারেটের ধুঁয়া, গানের ধ্বনি, সারেঙ্গের সুর, ঘুঙুরের শব্দ, তবলার চাঁটি। কিন্তু আমি যেন একটা অপরিচিত লোকে আসিয়া পৌঁছিলাম। অনেকবার এই প্রমোদে মন ভাসাইয়া আনন্দ করিয়াছি। সে দিন কে যেন আমার মনের ভিতর থেকে আমায় ধরিয়া রাখিয়াছিল। মনে হইতেছিল, এ সবই আমার নূতন, অপরিচিত। আমাকে জোর করিয়া এই নূতন অপরিচিত লোকে টানিয়া আনিয়াছে। সেখানে আমার অনেক পরিচিত লোক ছিল — বিডন ষ্ট্রীটের সুশীলা, হাতিবাগানের নুরী, পুতুল কিরণ, বেড়াল হরি, এই রকম অনেক, — কিন্তু সে দিন হঠাৎ মনে হইতে লাগিল, ইহাদের কাহাকেও আমি চিনি না।

ইহাদের একটু তফাতে, এক কোণে বসিয়াছিল "ডালিম"। একজন বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ও মেয়েটিকে আগে কখনও দেখি নাই।" সে বলিল, "বাস্, ওকে জান না? ও যে ডালিম, সহর মাত করেছে, অনেক কাপ্তেন ভাসিয়েছে।" আমি বলিলাম, "কাপ্তেন ভাসানর মত চেহারা তো ওর নয়। ও যে এক কোণে স'রে ব'সে আছে।" বন্ধু বলিল, "ওই ত ওর ঢং, ও অমনি করে লোক ধরে।" আমার মন তাহা মানিতে চাহিল না। আমি কিছু না বলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। সে-ও আমায় দেখিতেছিল। বহুবার চোখে চোখে মিলিয়া গেল। আমি কি দেখিলাম — তাহার চাহনিতে কি ছিল — আমি কেমন করিয়া বলিব — আমি যে নিজেই ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছিলাম না। আমার মনে হইল, সেই আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে তার প্রাণের যোগ নাই। তার চোখ দু'টি যেন আর কিসের খোঁজ করিতেছে। আমার প্রাণে কি হইতেছিল, তাহা ত বুঝাইয়া বলিতে পারি না। আমার ভিতর থেকে কে যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, উহাকে বুকের ভিতর টানিয়া লই।

এমন সময় কে বলিল, "ডালিম একটা গাও।" আর একজন বলিল, "ডালিম ভাল গাইতে পারে না।" আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে বুঝিল, বলিল — "আমি ভাল গাইতে পারি না।" আমি বলিলাম, "গাও না?" সে একটু সরিয়া আমার সাম্‌নে আসিয়া গান ধরিল। আমি সে রকম গান কখনও শুনি নাই। সে গানে সুরের কেরামতি ছিল না, তালের বাহাদুরী ছিল না ; কিন্তু সে গানে যাহা ছিল, তাহা আর কখনও কোন গানে পাই নাই। মনে হইল, ওই গানের জন্য আমার সমস্ত মনটা অপেক্ষা করিয়া ছিল। চোখের জলে ভেজা ভেজা সেই সুর, সুরের মধ্যে গানের কথাগুলি যেন নয়নপল্লবে অশ্রুবিন্দুর মত জ্বলিতেছিল। সেই সুরের প্রত্যেক স্বর, সেই গানের প্রত্যেক কথা আজও আমার প্রাণপল্লবে বিন্দু বিন্দু অশ্রুর মতই জ্বলিতেছে। ডালিম গাহিতেছিল —

"কেমন ক'রে মনের কথা কইব কানে কানে।
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহাব কঠিন টানে॥
আজি আমি ঝরা ফুল, পড়ি তোমার পায়,
গন্ধটুকু রেখো বঁধু হিয়ায় হিয়ায়।
প্রাণের পাতে ফুলের মত
রাখব তোমায় অবিরত
তফাত্‌ থেকে দেখ্‌ব শুধু রাখব প্রাণে প্রাণে,
প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে॥"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি কখনও গান শিখেছিলে?" সে বলিল, "না, ওস্তাদের কাছে কখনও শিখি নাই।" আমি বলিলাম — "আমি এমন গান কখনও শুনি নাই। তুমি কোথায় থাক?" সে কোন কথা বলিল না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম — "এই গানটি আমাকে একলা এক দিন শুনাইবে?" সে কোন উত্তর দিল না। আমি বলিলাম — "এসব তোমার ভাল লাগে?" তাহার চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল, কোন কথা বলিল না।

আমার বন্ধুদের তখন প্রায় সকলেরই মত্ত অবস্থা। একজন উঠিযা টলিতে টলিতে ইলেকট্রিক্‌ বাতিগুলি সব নিবাইয়া দিল।

আমি সেই অন্ধকারে ডালিমকে বুকে টানিয়া লইলাম। সে কিছু বলিল না। তারপব, — তাব হাত ধবিয়া উঠাইলাম। আমিও দাঁড়াইলাম। তাহাকে আস্তে আস্তে বলিলাম — "আমার সঙ্গে চল।" সে আমার হাত ধরিল, আমার সঙ্গে চলিল।

কোথায় যাইব, মনে মনে কিছুই ঠিক করি নাই। সিঁড়ি দিয়া নামিলাম। তার পর একটা ঘরের ভিতর দিয়া সেই লতা-মণ্ডপে গেলাম। তখন চাঁদের আলো আরও ম্লান মনে হইতেছিল। পুকুরের উপর একটু উজ্জ্বল ছায়ামাত্র পড়িয়াছে। বাতাস বন্ধ। ফুলের গন্ধ থামিয়া গিয়াছে। মনে হইল, আকাশে যেন একটু মেঘ উঠিযাছে। সেই উজ্জ্বল অন্ধকারে একখানা বেঞ্চিব উপর তাহাকে বসাইলাম। আমাব সর্ব্বশরীর তখন অবশ হইয়া আসিতেছিল। বুকের ভিতর ধপ্‌ ধপ্‌ করিতেছিল। আমিও তাহার পাশে বসিলাম। আমি তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিলাম —"ডালিম, আমার তোমাকে বড় ভাল লাগে। আমার ত এমন কখনও হয় নাই।" সে বলিল — "ও কথা ত সবাই বলে, মনে করিয়াছিলাম, তুমি ও কথা বলিবে না।" আমি বলিলাম — "তুমি ত আমাকে চেন না।" তাহার একখানি হাত আমার বুকের উপর দিলাম। সে বলিল — "তোমার কি হইয়াছে?" আমি বলিলাম — "জানি না। ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া কোথাও পলাইয়া যাই! এত দিনের জীবনযাপন সবই মিথ্যা মনে হইতেছে।" সে আরও একটু আমার কাছে সরিয়া আসিল। আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিল। অনেকক্ষণ কাঁদিল। আমারও চোখে জল আসিযাছিল, কোন কথা বলিতে পারি নাই। সে

যতই কাঁদিতে লাগিল, ততই তাহাকে বুকে চাপিতে লাগিলাম। মনে হইল, ইহাকে কোথায় রাখি, কেমন করিয়া শান্ত করি। এক নিমেষে আমাব সংসারেব সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়া গেল। নিশীথের স্বপ্ন যেমন প্রভাতে এক নিমেষে মিলাইয়া যায়, আমার জীবনের সকল স্মৃতি, সংসারের সকল বন্ধন, সকল ঘটনা এক মুহূর্তে কোথায় মিলাইয়া গেল। এ কি সেই আমি? আমার মনে হইতে লাগিল, আমি যেন কোন অপবিচিত ব্যক্তি, এইমাত্র এক নূতন জগতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে অবস্থা সুখের কি দুঃখের, আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাকে কেবল বুকে চাপিতে লাগিলাম। কথা বলিবার শক্তি ছিল না। মনে মনে বলিতে লাগিলাম —'হে আমার ব্যথিত, পীড়িত। এস, তোমার চোখের জল মুছাইয়া দি, তোমাকে বুকের ভিতর রাখিয়া দি, তুমি আর বাহিরে থাকিও না — আমাব বুকের ভিতর ফুটিয়া ওঠ। আমি তোমাকে বুকে করিযা জীবন সার্থক করি।' কতক্ষণ পবে সে একটু শান্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল — "আমি মনে করিয়াছিলাম তোমার সঙ্গে আসিব না। কে যেন আমার বুকের ভিতর থেকে বলিল, যাও, তাই আমি আসিলাম। তুমি আমার কথা শুনিতে চাও? আমি মনে করিয়াছিলাম বলিব না, কিন্তু কে যেন আমার প্রাণের ভিতর হইতে বলাইতেছে। শুনিবে?" আমি বলিলাম — "শুনিব, শুনিবার জন্যই তোমাকে এখানে আড়াল করিয়া আনিয়াছি।" সে তাহার জীবন-কাহিনী বলিতে লাগিল, আমি শুনিতে লাগিলাম। সেই কণ্ঠস্বর আজও আমাব প্রাণে জাগিয়া আছে। তাহার প্রত্যেক কথা আমার প্রাণে ব্যথার মত বাজিতে লাগিল, — আজও বাজিতেছে।

সে বলিল ঃ— "আমি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে, মামার বাড়িতে প্রতিপালিত। মামা নেশা করিতেন। দিবানিশি সুরামত্ত, তাহার কাছে থেকে কখনও ভাল ব্যবহার পাই নাই। মামি আমাকে একটা বোঝা মনে করিত, তার মুখে কটূক্তি ছাড়া মিষ্টি কথা কখনও শুনি নাই। আমাব মামার মামাত ভাই আমাকে ভালবাসিতেন। তাঁহাব কাছে লেখাপড়া শিখিযাছিলাম। কিন্তু আমার যখন বারো বৎসর বযস, তখন তিনি মারা যান। তার পব চারি বৎসর পর্য্যন্ত সে বাড়ীতে যে কি যন্ত্রণা ভোগ কবিয়াছি, তাহা তোমাব না শুনাই ভাল। আমার ষোল বৎসর বযসে বিবাহ হইল। আমার স্বামীর বয়স তখন পঞ্চাশ বৎসবের উপর। তারপর চা'র বৎসর শ্বশুরবাড়িতে ছিলাম। এই চা'র বৎসরের মধ্যে আমাব স্বামীর সঙ্গে বোধ হয, ছয সাত দিনের বেশি দেখা হয় নাই। তিনি বিদেশে চাকুবী করিতেন। কখন কখন দু'এক দিনেব জন্য বাড়ি আসিতেন। বাড়িতে আসিলেও বাহির-বাড়িতেই থাকিতেন। আমার সঙ্গে দুই একবার দেখা হইযাছিল, কখনও কথাবার্ত্তা হয নাই। তাঁহাব আগে দুইবার বিবাহ হইয়াছিল, চা'র পাঁচটি ছেলে-মেয়ে ছিল। আমার শ্বাশুড়ি তাঁহার বিমাতা। আমার কথা কহিবার কেহ ছিল না। ছেলেপিলেগুলিকে দেখিতে হইত। কাঁদিলেই শ্বাশুড়ীব কাছ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি শুনিতাম। কখনও কখনও মারও খাইয়াছি। বাড়িতে ঝি ছিল না, সমস্ত কাজই আমাকে করিতে হইত। ঘরের মেঝে পবিষ্কার করা থেকে আরম্ভ করিয়া — রাঁধাবাড়া ছেলেপিলেদের দেখা ও দুইবার খাওয়াব পর বাসনগুলি — বাড়ির কাছে নদী, সেই নদীতে — মাজিয়া আনিতে হইত। আমার মনে হয় না যে, এই চা'র বৎসবের মধ্যে কখনও চোখের জল না ফেলিয়া ভাত খাইতে পারিয়াছি। যতই দিন যাইতে লাগিল, আমার যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। আমি পাগলের মত হইয়া গেলাম। আমার কাছে কয়েকখানি বাঙ্গলা বই ছিল, মাঝে মাঝে রাত্রে সবাই ঘুমাইলে একটি প্রদীপ জ্বালিয়া পড়িতাম। আমার শ্বাশুড়ির তাহা সহিল না। একদিন সেই বইগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। আমাবও আর সহ্য হইল না। সেই দিন মনে স্থির করিলাম, এ বাড়িতে আর থাকিব না। পাড়ার একটি ছেলে — আমি যখন ঘাটে বাসন মাজিতাম, আম্যর কাছে দাঁড়াইয়া থাকিত, আর আমার

দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিত, কিছু বলিত না, আমিও কিছু বলিতাম না। সে দিন সন্ধ্যাব সময় বাসন মাজিতে ঘাটে গেলাম, চাঁদের আলো ছিল, বাতি লইয়া যাই নাই। দেখিলাম, সে ঠিক সেইখানে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াই বাসনগুলি নদীতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাকে বলিলাম —'আমাকে মামার বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পার?' সে বলিল — 'কত দূর?' আমি গ্রামের নাম বলিলাম। সে বলিল — নৌকায় যাইতে তিন চার ঘণ্টা লাগিবে।' আমি বলিলাম — ' যতক্ষণই লাগে, আমাকে লইয়া যাও। এই বলিয়া তাহাব পায় আছডাইয়া পড়িলাম। সে বলিল — 'আচ্ছা, তুমি এইখানে ব'স, আমি নৌকা ঠিক করিয়া আসি।' সে নৌকা লইয়া আসিল, আমি নৌকায় উঠিলাম। ভাবিলাম, এইবার যমেব বাড়ি ছাড়িয়া মামাব বাড়ি যাইতেছি। যতক্ষণ নৌকায় ছিলাম, সে ঠিক সেই বকম কবিয়া আমার দিকে চাহিয়া ছিল, কোন কথা বলে নাই, শুধু চাহিয়া ছিল, আমার মনে হইতেছিল, তাহার চোখ দুটি যেন আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। আমি ভয়ে ভয়ে চুপ করিযা ছিলাম।

যখন মামার বাড়ি গিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেশ রাত্রি, মামা অজ্ঞান হইয়া ঘুমাইযা পড়িয়াছেন, আর সকলেই শুইয়াছে। অনেক ডাকাডাকির পব মামী উঠিয়া দবজা খুলিযা দিলেন। আমাকে দেখিয়া যেন একটু শিহরিয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাব পায় পড়িযা কাঁদিতে লাগিলাম, বলিলাম, 'আমি পলাইয়া আসিয়াছি, আমি সেখানে আব যাব না। আমি তোমাব দাসী হইয়া থাকিব, আমাকে বক্ষা কব, তোমার বাড়ীতে একটু স্থান দাও। মামী কর্কশস্ববে বলিলেন, 'পালিয়ে এসেছিস্ — কাব সঙ্গে?' আমি সে কথাব অর্থ তখন ভাল কবিযা বুঝিতে পারি নাই। আমি সেই ছেলেটিকে দেখাইযা বলিলাম, 'এব সঙ্গে।' মামী বলিলেন — 'এ কে?' আমি বলিলাম — 'জানি না'। মামী বলিলেন, 'আমার বাড়ীতে তোমাব স্থান হ'বে না।' 'আমি কোথায় যাব!' মামী বলেলেন — 'গোল্লায,' বলিয়াই দবজা বন্ধ কবিযা দিলেন। আমি পাগলের মত সেই দবজায় ধাক্কা মারিতে লাগিলাম। কেহ সাড়া দিল না। তখন সে আমার পিছনেই দাঁড়াইয়া ছিল, সরিয়া আসিয়া আমাব হাত ধরিয়া আমাকে ফিরাইয়া লইয়া চলিল।

আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিলাম। কোথা যাব? কোথা যাব? এই কথাই বারে বারে মনে উঠিতেছিল। কিন্তু এই প্রশ্নের কোন উত্তরই পাইলাম না। পুতুলের মত সে যে দিকে লইয়া গেল, সে দিকেই গেলাম।

আবার সেই নৌকা। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম — 'কোথা যাইবে?' সে বলিল— 'কল্‌কাতায়।' তখন সেই কথার অর্থ বুঝিতে পারিলাম। বিদ্যুতের মত আমার মনে চম্‌কাইয়া গেল। আমি চীৎকার করিয়া তাহার পায় পড়িলাম। কাঁদিয়া বলিলাম — 'আমাকে বক্ষা কর; আবার আমাকে শ্বশুরবাড়ী লইয়া চল।' সে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাবপব বলিল, 'আচ্ছা।' কিন্তু ফেব সেই চাহনি, আমি ভয়ে, অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় একেবারে মরিয়া গেলাম।

ভোর হইতে না হইতে নৌকা ঘাটে লাগিল। আমি দৌড়িয়া শ্বশুরবাড়ির দিকে চলিলাম। সে বাধা দিল না, কিন্তু আমার পিছনে পিছনে আসিল আমি কিছু না বলিয়া দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম। আমার শ্বাশুড়ী উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিল, আমাকে দেখিয়াই সজোরে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমি চীৎকার করিয়া 'মা, মা' বলিয়া ডাকিলাম, আর কোন সাড়াশব্দ পাইলাম না।

তখন আর কাঁদিতে পারিলাম না, চোখে আর জল ছিল না। মামীর কথা মনে পড়িল — 'গোল্লায় যাও।' আমি ফিরিলাম, সে দাঁড়াইয়া আছে, আর ঠিক তেম্‌নি করিয়া চাহিয়া

আছে। আমি হো হো কবিয়া হাসিয়া উঠিলাম, বলিলাম — 'আমি গোল্লায় যাব, যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাও।'

তখন নিশ্চয়ই সূর্য উঠিয়াছে, কিন্তু আমার চোখে ঘোর অন্ধকার — মনে হইল, যেন সেই ঘোর অন্ধকারে এক ভীষণাকৃতি কাপালিক আমার হাত ধরিয়া কোন অদৃশ্য বলিদান-মন্দিরেব দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

তাবপর?

তাবপর কলিকাতায় আসিলাম। ভাবিলাম, সে কোন জমিদারের ছেলে, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া দু'জনে থাকিলাম। সাত দিন সে আমাব গায গায় লাগিয়া ছিল। তাহার সেই চাহনির অর্থ সেই কয়দিনে বেশ ভাল করিয়া বুঝিলাম। আটদিনের দিন আব তাহাকে দেখিতে পাইলাম না।"

তারপর?

এখন আমি কল্‌কাতার ডালিম। আমার সুখের শেষ নাই। সহরেব বড় লোক আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়। আমার বাড়িতে সাজসজ্জার অভাব নাই, সোনার খাট হীরার গহনা। বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক বাতি, ইলেক্‌ট্রিক পাখা, দাস দাসীব অন্ত নাই, আলমারিভরা কাপড়, বাক্সভবা টাকা।

"আমি কল্‌কাতার ডালিম, কিন্তু" — কিন্তু বলিয়াই কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিল। দু'হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিল। তখন জ্যোৎস্নাব লেশমাত্র নাই। সেই লতামণ্ডপ গাঢ় অন্ধকারে ভবা। তাহার বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ করিতেছিল। আমি সেই অন্ধকারে তার শব্দ শুনিতে পাইতেছিলাম। আর আমার অন্তরে এক অসীম বেদনা অনুভব কবিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পবে সে বলিল — "কিন্তু আমি যেন অঙ্গারের মত জ্বলিতেছি, বুক যে জ্বলিয়া জ্বলিয়া পুড়িতেছে, তাহা কি কেহ দেখিতে পায়?"

আবার কিছুক্ষণ চুপ করিযা বহিল। বোধ হয় কাঁদিতেছিল। তাবপব বলিল, "তোমাব আমাকে ভাল লাগিয়াছে? তোমাব মত আর কারও সঙ্গে আমার এ জীবনে কখনও দেখা হয নাই। কেন তোমাকে আগে দেখিলাম না? আমি যখন নবক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে? এখন — এখন তোমাকে ত কিছু দিবাব নাই।"

এই বলিযা সে আমার বুকে ঢলিযা পড়িল, শিশুব মত কাঁদিতে লাগিল, আমি বলিলাম — "আমি আব কিছু চাই না, আমি তোমাকেই চাই।" এই বলিয়া দুজনেই কাঁদিতে লাগিলাম। সেই অন্ধকারে তাহাকে বুকে আঁকড়াইয়া ধরিযা কাঁদিতে লাগিলাম। পাগলের মত জ্ঞানহাবা হইযা কাঁদিতেছিলাম। কতক্ষণ কাঁদিয়াছিলাম, জানি না। আমি কি জাগিযাছিলাম? মনে হইতেছিল, আমি ডালিমকে লইযা এই সংসারের বাহিরে এক অপূর্ব্ব নন্দন-কাননে বাস করিতেছি। আমি আর ডালিম, — সে জগতে আর কেহ নাই। চিরদিন তাহাকেই বুকে করিয়া রাখিযাছি। প্রতি প্রভাতে তাহাকে নব নব ফুলে সাজাইয়াছি, প্রতি নিশাশেষে তাহাকে নব নব চুম্বনে জাগাইয়া দিয়াছি। প্রাণের যে একটা মুক্ত আকাশ আছে, আর একটা অতি গভীর পাতাল আছে, সে দিন প্রথম অনুভব করিলাম। আমার হৃদয়েব সেই স্বর্গ ও সেই পাতাল পূর্ণ করিয়াছিল ডালিম — ডালিম!

এমন সময় উপরে কোলাহল শুনিলাম, চমকিয়া দেখিলাম, ডালিম আমার কাছে নাই! 'আমি অস্থির হইয়া গেলাম, পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। দৌড়িয়া উপরে গেলাম, দেখিলাম সেখানে ডালিম নাই। আমাকে দেখিয়া একজন বলিল, "কি বাবা, একেবারে উধাও।" আমি তাহাকে গালি দিলাম। আবার ছুটিয়া নীচে আসিলাম। সেই বাগানে সকল স্থানে খুঁজিলাম। ডালিম ডালিম বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলাম। কোন সাড়া শব্দ পাইলাম

না। ফটকে গেলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, "কোই বিবি চলা গিয়া?" একজন গাড়োয়ান বলিল, "হ্ বাবু, এক বিবি অভি চলা গিয়া।" আবার দৌড়িয়া উপরে গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "ডালিম কোথায় থাকে?" এবার আর কেহ্ রসিকতা করিল না। ঠিকানা জানিয়া লইয়া আবার ফটকে দৌড়িয়া আসিলাম। একখানা মোটর-কাব করিয়া তাহার বাড়ি গেলাম। শুনিলাম, ডালিম আসে নাই। কতক্ষণ সেখানে ছিলাম, জানি না, ডালিমের দেখা পাইলাম না। আবার বাগানে গেলাম, আবার খুঁজিলাম, কিন্তু তাহাকে আর পাইলাম না।

সে রাত্রে ঘুমাই নাই। পাগলের মত ছুটাছুটি করিলাম। পরদিন প্রভাতে আবাব ডালিমেব বাড়ি গেলাম। ঝি বলিল, সে শেষ রাত্রে এসেছিল, আবাব ভোর না হ'তে হ'তেই চলে গেছে। একখানা চিঠি রেখে গেছে, তাহাকে বলে গেছে—সকালে একজন বাবু খোঁজ করতে আসবে, তাঁকে এই চিঠিখানা দিস্।

আমি সেই চিঠিখানা লইলাম। খুলিতে খুলিতে আমাব হাত কাঁপিতে লাগিল, চিঠিখানি পড়িলাম ঃ—

"তুমি আমাকে খুঁজতে আসিবে জানি, কিন্তু আমাকে আর খুঁজিও না। আমাকে আর কোথাও দেখিতে পাইবে না! মনে কবিও, আমি মবিয়া গিয়াছি। আমি মবি নাই — মরিতে পারিব না। তুমি আমাকে যাহা দিয়াছ, আমি এ জীবনে কখনও পাই নাই। তাহাবি গৌবব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাই। অনেক দুঃখ সহিয়াছি, সংসারে যাকে সুখ বলে, তাহাও পাইয়াছি, কিন্তু কাল রাত্রে যে সত্য প্রাণের পরশ পাইয়াছি তাহা কখনও পাই নাই। তাহাবি স্মৃতিটুকু প্রাণে প্রদীপের মত জ্বালাইয়া রাখিতে চাই। যাহা পাইযাছি, তাহা আর হারাইতে চাই না।

তুমি আমাকে খুঁজিও না। প্রাণসর্বস্ব! আমি বড দুঃখী, তুমি কাঁদিয়া আমাব দুঃখ বাডাইও না। এ জন্মে হইল না, জন্মান্তরে যেন তোমাব দেখা পাই।

— ডালিম।

সে

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সে ত আর নাই — তবে এ দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন? সে যখন হৃদয় পূর্ণ করিয়া ছিল, তখন একদিন এ দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখা দিলে জীবনের বন্ধন হয ত আরও দৃঢ় হইত — হৃদয়ের কত না তৃপ্তি হইত, অশ্রুরেখায় চুম্বন-সৌন্দর্যস্পর্শে হৃদযের স্নেহ-উপবন কুসুমিত হইযা উঠিত। কিন্তু আজ সে নাই — তবু এ দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন? এ নিশ্বাসে তাহার হৃদয়ের উত্থান পতন অনুভব হয়, তাহার মালা গাঁথার সৌরভ-স্মৃতিতে হৃদয আকুল হইয়া উঠে, চক্ষের সম্মুখে একে একে তাহার প্রণয়-যাতনার অস্ফুট ছবিগুলি ফুটিতে থাকে; এ যেন তাহারই হৃদয়ের ভাষা — তাহারই মর্মের কাতব ক্রন্দনধ্বনি। তাহার জীবনে এক দিনের জন্যও সুখ হয় নাই — তাহার জীবন দুঃখের তীর্থক্ষেত্র। সুখ স্পর্শ করিলে সে হৃদয় বুঝি ভাঙ্গিয়া যায়, সুখ সকলের কপালে সহে না। তাহাই বুঝি হইয়াছিল। শেষ দিনে তাহার অদৃষ্টে বিধাতা বুঝি কি সুখের স্পর্শ দিয়াছিলেন, সে তাহা সহিতে পারে নাই — হাসি অশ্রুর মিলনক্ষেত্রে জীবন বিসর্জন দিয়া সুখী হইয়াছে। কিন্তু তবে তাহাব পশ্চাতে এ নিঃশ্বাস আকুলতা কেন? যবনিকা ফেলিলে ত একেবাবেই ফেলিলে না কেন? এ চিববিবহের মধ্যেও যে স্মৃতির মিলন ঘুচে না —বিবহ-যন্ত্রণার মধ্যেও যেন মিলনের অভিশাপ। সে যখন ম্লানমুখে ছলছল নেত্রে নদীতীরে বসিযা আকাশের পানে চাহিয়া থাকিত — ঐ সুনীল অনন্ত ক্ষেত্রে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত তাবকাপুঞ্জেব ম্লান হাস্যময়ী শোভা দেখিতে দেখিতে আপনাকে কোথায় হারাইযা ফেলিত, তখন কেন এ দীর্ঘনিঃশ্বাস দেখা দিল না? জন্মেব মত একবাব — শুধু একবার — কেন সে এ গভীর বেদনা-উচ্ছ্বাস অনুভব করিতে পারিল না? তাহা হইলে ঐখানে — ঐ পুণ্যলোকে বসিযা আজ সে সেই ব্যাকুল স্মৃতিব আকুলি ব্যাকুলি অনুভব করিতে পারিত। সেই দীর্ঘনিঃশ্বাসেব মধ্যে এই দীর্ঘনিঃশ্বাস সুখস্বপ্নেব মত ফুটিযা উঠিত।

মৃত্যুযন্ত্রণায় সে একবার শুধু কাহার আলিঙ্গনপাশে মবিতে চাহিযাছিল — সেই আলিঙ্গনে তাহার সুখ, শান্তি, প্রেম, আনন্দ, সকলই. — অদৃষ্টেবই বশে সে বাসনা তৃপ্ত হয় নাই। মৃত্যুর করাল মূর্তির শিবায় শিরায় সেই অতৃপ্ত বাসনা জাগিয়া আছে। প্রেতাত্মার মত মৃত্যুর গৃহে সে বাসনা চিরদিন ঘুরিয়া বেড়াইবে। তাহার আব প্রলয নাই, বিনাশ নাই, অবসান নাই। এই দীর্ঘনিঃশ্বাসে সেই মৃত্যুর ছায়া যেন শিহবিয়া উঠে, সেই অতৃপ্ত বাসনা অতীত দুঃস্বপ্নের মত আরও জড়াইয়া ধবে, হৃদয়েব কোন্ শ্যামল ক্ষেত্রের উপরদিয়া নিরাশার হায়-হায়েব মত অন্ধকার অমাবস্যা কাঁদিয়া যায়। পশ্চাতে কালরাত্রির রহস্যময় পদচিহ্ন মাত্র পড়িয়া থাকে; পদচিহ্ন ধরিয়া বিভীষিকা হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করে। আহা! সেই আলিঙ্গনে সকল কষ্টের পর কি পবিত্র শান্তি জাগিয়াছিল, জীবন মরণ সন্ধ্যায় একবার সে স্বর্গসুখ তাহার কপালে ঘটিল না। হৃদয় মন্থন করিয়া যে দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিল, দুই দিন পূর্বে তাহা যদি উঠিত! কিন্তু তাহা উঠিবে কেন? তাহার অভাবেই না এ সমুদ্রমন্থন। তাহার আলিঙ্গন কাতরতার স্মৃতিই — হৃদয়ের সুগভীর বেদনা-উচ্ছ্বাস। সে আজ নাই — কিন্তু তাহার স্মৃতি যেন ঘনাইয়া

আসিতেছে। পূর্বে সে গৃহে আবদ্ধ ছিল, এখন সে জগতে বিস্তৃত। আকাশে সে, চন্দ্রালোকে সে, কুসম-সৌরভে সে ফুটিয়া উঠিতেছে। আগে ত সে এমন ছিল না — এখন যেন সর্বত্রই সে। কিন্তু সে আজ নাই — সে কোথায় কে জানে।

ওগো, সে কোথায় কাহারও জানিযা কাজ নাই ; সে গিয়াছে, বাঁচিয়াছে, তাহাকে লইয়া আব আলোচনা কেন? পরলোকেও কি তাহার একটু সুখ শান্তি নাই? জীবনে সে সহস্র জ্বালায় জ্বলিয়াছে, এখন জ্বালা অবসান হৌক্। জীবনের মরুভূমিব উপব তাহার স্মৃতি-পদচিহ্ন মুছিয়া যাক — হাহাকার উঠিয়া পরলোকে তাহাব মর্মের কাছে ঘুরিয়া না বেড়ায়। হৃদযে তবে এ দীর্ঘনিঃশ্বাস শিহবিয়া উঠে কেন? তবে সে কি এই নিঃশ্বাস-উচ্ছাস শুনিতে পায়? কে জানে কি, কিন্তু দুই দিন পূর্বে যদি এই দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিত! — শুধু দুই দিন পূর্বে!

তাহা হইলে কি হইত? কি হইত কেহ জানে না, কিন্তু যাহা হইয়াছে, তাহা বুঝি হইত না। জগৎ তাহা হইলে আব এক ভাবে চলিত বুঝি, এ জগৎ ছাড়া তাহাতে আর কিছু থাকিত। কে জানে গো, সে যেন আর একটা সম্পূর্ণ নূতন ব্যাপার, কিন্তু সেখানে সকলই পুবাতন। শুধু যদি এই দীর্ঘনিঃশ্বাস আজ না উঠিয়া আর এক দিন উঠিত! আজ এ শেলবিদ্ধ হৃদয়ের শান্তিনিকেতনে এ বিরহোচ্ছ্বসিত নিঃশ্বাস কাঁদিয়া বেড়ায় কাহার জন্য? সে কি আব আছে! ওগো, তোমরা কাহার মুখের পানে চাহিয়া চলিয়াছ, তাহাকে কেহ দেখিযাছ কি, বল ত। সে কি আর আছে?

সে আর নাই। যে যায়, সে কি আর থাকে? সে আর ফিরিবে না। যে লতাকুঞ্জে বসিয়া প্রতিদিন সে আনমনে মালা গাঁথিত, কিন্তু তাহাব মালাগাঁথা কখনও শেষ হইল না, ঊষা আসিয়া সেখানে এখন চঞ্চলনেত্রে চাহিয়া থাকে, শ্যামল নবীন কিশলয়গুলির মধ্যে কোন্ নিশ্বাসরুদ্ধ হৃদয়ের ভাষা শুনিতে গিয়া যেন চমকিয়া উঠে। বকুল ফুল ঝরিযা ঝবিয়া লতাকুঞ্জের সম্মুখে স্তূপাকার হইয়াছে, ঊষা সেই ঝরা-ফুলের উপর দিয়া নীববে পা টিপিযা টিপিয়া চলিয়া যায় , ঊষার মস্তকে, কেশগুচ্ছে, বাহুপোরি আবও বকুল ঝরিয়া পড়ে। সেখানে যে বসিত, সে আর এখন বসে না। সন্ধ্যা একবার আকুলহৃদয়ে লতাকুঞ্জে আসিয়া বসে, ঝরা ফুলগুলি মুগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখে; কিন্তু সন্ধ্যা আর থাকিতে পারে না, তাহার প্রাণ বুঝি কেমন করিয়া উঠে, সে ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। সাবাদিন সাবানিশি উন্মত্ত পবন শুধু সেখানে হাহাকার করিয়া বেড়ায়, লতাকুঞ্জ শিহবিযা উঠে, বকুল ঝরিতে থাকে, আর জনপ্রাণীর সেখানে সাড়া শব্দ নাই।

একদিন গিয়াছে, তখন ঐ লতাকুঞ্জে বিরলে বসিয়া মধ্যাহ্নের পাখি হৃদয় ঢালিয়া দিত। সে উদাস সুরে সে কি গান গাহিত কেহ জানে না, কিন্তু সে যাহা গাহিত মধ্যাহ্নেব হৃদয় হইতে। তখন ঐ লতাকুঞ্জে প্রতিদিন সেই কে একজন আসিয়া বসিত, সেখানে ঊষা আসিত, সন্ধ্যা আসিত, কুঞ্জ যেন পূর্ণ ছিল। আজ সেই একজন বুঝি আর নাই, তাই এ শ্মশাননিস্তব্ধতা।

সুখের সংসারে আসিয়া অবধি তাহার কপালে সুখ আর মিলিল না। কিন্তু তাহার দুঃখ কিসের জন্য? চিরদিন স্বামীর সাদর সম্ভাষণ সে ত পাইয়াছে, স্বামীর মুখ হইতে কখনও একটি তিরস্কারবাক্য বাহির হয় নাই, সে কখনও একটি রূঢ় কথা শুনে নাই। তবে তাহার যন্ত্রণা কিসের? কোন্ একটি সামান্য ঘটনায় মানবের হৃদয় চিরদিনের মত ছারখার হইয়া যায় — একটি কথা, একটি হাসি, এক ফোঁটা অশ্রু — তাহা কে বলিতে পারে? সহস্র সুখের মধ্যে সেই এক মুহূর্তের ঘটনা হয় ত জাগিয়া থাকে, তাহাতেই জীবন জ্বলিয়া স্মরা হয়। চিরদিন স্বামীর অত্যাচারের মধ্যে সে অনায়াসে জীবন অতিবাহিত করিতে পারিত, সে জন্য তাহার কোনও কষ্ট হইত না; কিন্তু স্বামীর সুধাময় বাক্যে তাহার জীবন শেলবিদ্ধ

হইয়াছিল। তাঁহার প্রতি কথায় তাহার কোন শুভদিনের কথা মনে পড়িত — বিবাহের বাঁশীর কথা মনে পড়িত — সেদিনকার দীপৌজ্জ্বল্যে সে যেন বিভীষিকার ঈষৎ ম্লান ছায়া দেখিয়াছিল, তাহাই মনে পড়িত।

বিবাহ-রজনীর আনন্দকোলাহলে বিভীষিকার ছায়া কি? সে দিন ত চারিদিকে আলোকমালা, মঙ্গল শঙ্খধ্বনি, আনন্দের লহরী। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, এক বিন্দু রক্তপাতে কত অমঙ্গলাশঙ্কা, এক ফোঁটা অশ্রুজলে কত হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়। আত্মীয় স্বজনেব আনন্দপূর্ণ হুলুধ্বনিতেও হৃদয় হয় ত শিহরিয়া উঠিতে পারে। কিসে কি হয়, বুঝা বড় সহজ নহে। সমস্ত দিন অনাহাবে উপবাসে ক্ষুদ্র বালিকা স্বামীব প্রসন্ন মুখ দেখিবাব আশা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু শুভদৃষ্টিব জন্য দুই জনেব মাথাব উপব দিয়া যখন রক্তবর্ণ আচ্ছাদন টানিয়া দেওয়া হইল, তখন — বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় — বালিকাব সমস্ত আশা ভবসা যেন নিমেষে ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীব অবনত মুখ একবাব উঠিল না, বালিকার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল।

সেইদিন অবধি তাহার জীবনে আর সুখলাভ ঘটে নাই। প্রতিদিন সে স্বামীর সাদব সম্ভাষণ শুনিত, কিন্তু তাহাব তাহাতে আশ মিটিত না। সে যেন দেখিত, তাঁহাব হৃদয়ের নিভৃত অন্ধকারে কি গভীব হাহাকাব কাঁদিয়া বেডাইতেছে — কৃপাপাত্রীব পানে না চাহিলে অন্যায হয, তাই তিনি কথা বলিতেন মাত্র। সে দেখিত, সে যেন তাঁহাব সহধর্মিণী নহে, তাঁহাব দযাবৃত্তি পুবাইবাব একটা যন্ত্রবিশেষ। সে চাহিত স্বামীব সাদব সম্ভাষণ একটু কমিয়া আসে, তাঁহাব হৃদয়ে সে যেন মিশাইয়া যাইতে পারে।

স্বামী কি তবে তাহাকে ভালবাসিতেন না? তবে আজ এ দীর্ঘনিঃশ্বাস কেন? তাঁহাব বুকে এতদিন বুঝি এই দীর্ঘনিঃশ্বাস বিঁধিয়াছিল, তাই তাঁহার হৃদয় উঠিতে পাবিত না। তিনি হাসিতেন — ম্লান, ক্ষীণ, অন্ধকাবে বিজলী। তিনি কথা বলিতেন — তাহাতে হৃদয় নিশ্বসিত হইত না, সে কথা কোন দূরদেশ হইতে তাঁহাব মুখে আসিয়া বসিযা যাইত। আজ বহুদিন পবে সেই রুদ্ধ নিশ্বাস বুঝি বাহির হইতে পারিযাছে। কিন্তু সে ত আজ নাই — এ দীর্ঘনিঃশ্বাসে যাহার হৃদয়েব সুখ শান্তি ছিল, সে ত আজ নাই।

এখন সে কোন্ মহাবহস্যে মিশিযাছে। অন্তিম শয্যায বিবর্ণ বিম্বাধবে একটি ম্লান হাসি ফুটিয়াছিল। সে বিবাহের বাঁশী অনেক দিন থামিয়া গিয়াছে, সে বাসবঘরের আনন্দকোলাহল অনেক দিন নিভিযাছে, পুরাতন সকল স্মৃতির পশ্চাতে আজ সেও চলিয়া গিয়াছে। গঙ্গাতীরে বিজন শ্মশানক্ষেত্রে তাহার চিতাভস্মের উপব বসিযা একজন সন্ন্যাসী ঊর্ধ্বমুখে ধ্যান করিতেছেন। সন্ন্যাসীর বিশাল ললাটে রজনীর অন্ধকাব ছায়া পড়িযাছে, রুক্ষ কেশমধ্যে বাতাস নিরাশাব গান গাহিতেছে, হৃদয়ে চিতাভস্ম। ধ্যানরত সন্ন্যাসীব ধ্যান ভঙ্গ করিয়া হৃদয়ের মধ্য হইতে দীর্ঘনিঃশ্বাস উথলিযা উঠিল। সেই শ্মশানক্ষেত্রে, ভাগীবথী-হিল্লোলে মলয় পবনে শুধু হাহাকার মাত্র অবশেষ রহিয়াছে। আব সকলই একে এক অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

বাপ্পাদিত্য

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুষের আগুন যেমন প্রথমে ধিক-ধিক, শেষে হঠাৎ ধূ-ধূ করে জ্বলে ওঠে, তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে-অল্পে বাড়তে-বাড়তে একদিন দাউ-দাউ করে পাহাড়ে-পাহাড়ে, বনে-বনে দাবানলের মতো জ্বলে উঠল।

গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা, আট-পুরুষ পর্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল। যদি কোন রাজপুত বাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোনো ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত করে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত — রাজা গোহ একদিন তাদেবই বংশেব একজনকে বাঘের মুখের থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন। যখন কোনো রাজকুমার, কোনো একদিন শখ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাশা দেখতেন তখন তাদেব মনে পড়ত — এক বছর — দুর্ভিক্ষের দিনে বাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড বাজবাড়ি, পরিপূর্ণ ধানেব গোলা আশ্রয়হীন দীনদুঃখী ভীল-প্রজাদের জন্য সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন। ভাগ্য-দোষে যুদ্ধে জয় না হলে যেদিন কোনো কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাসঘাতক বলে সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি হাতির পায়েব তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত — হায় রে হায়, মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মতো তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মতো তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মতো সকলেব আগে চলতেন!

এত অত্যাচার, এত অপমান, তবু সেই বিশ্বাসী ভীল-প্রজাদেব সবল প্রাণ আট-পুরুষ পর্যন্ত বিশ্বাসে, রাজভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু যখন বাপ্পাদিত্যের পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন; যখন গবীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে, খেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হল না, তিনি যখন হাজাব-হাজার ভীলেব মেয়ে দাসীর মতো রাজপুতের ঘরে-ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন, যখন প্রতিদিন নতুন-নতুন অত্যাচাব না হলে তাঁর ঘুম হত না, শেষে সমস্ত ভীলেব প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাঁদের একমাত্র আমোদ — বনে-বনে পশু শিকাব — যেদিন নাগাদিত্য নতুন আইন করে একেবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্যেব বাঁধ ভেঙে পড়ল।

নাগাদিত্য ভীল-প্রজাদের উপর এই নতুন আইন জাবি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোনোদিকে ধুলো নেই, শিকারের বেশ সুবিধা। নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতি সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত! দলের পর দল, বড়-বড় ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত। সামান্য ভীলেব একটি ছোট ছেলের পর্যন্ত যাবার হুকুম নেই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতরে চিতাবাঘ যেমন ছটফট করে আজ এমন শিকারের দিনে

ঘরের ভিতরে বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনই ছটফট করছে — এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল।

মহারাজ নাগাদিত্য দলবল নিয়ে ভেরি বাজিয়ে হৈ-হৈ শব্দে পর্বতের শিখরে চড়লেন, বজ্রের মতো ভয়ঙ্কর সেই ভেরির আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে পালাত, বনের পাখি বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার-হাজার হরিণ প্রাণ-ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে-ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানে এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত — শিকারীরা কেউ বল্লম-হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া-হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত, ; কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরি বাজালেন, বারবাব শিকারীর দল চীৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড বনে একটিও বাঘের গর্জন, একটিও পাখির ঝটাপট কিম্বা হরিণের খুরের খুটখাট শোনা গেল না — মনে হল, সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দলবলের দিকে ফিরে বললেন — "ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল-প্রজা এ-বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। চল, আজ গ্রামে-গ্রামে নগরে-নগরে পশুব সমান ভীলের দল শিকার করিগে।"

মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল — তার পিঠের উপর সোনার হাওদা, জরির বিছানা হীরের মতো জ্বলে উঠল, তার চারদিকে ঘোড়ায়-চড়া রাজপুতেব দুশো বল্লম সকালেব আলোয় ঝক্‌মক্ করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন — "চালাও!" তখন কোথা থেকে গভীর গর্জনে, সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ, যেন একজন ভীল সেনাপতির মতো, সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগলে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজহস্তীব সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতির পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল — বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজানো প্রকাণ্ড একটা তীব তাঁর বুকের একদিক থেকে আর-একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শন্ শন্ শব্দে বেরিয়ে গেল। অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তাবপর চাবিদিক থেকে হাজার-হাজার কালো বাঘের মতো কালো-কালো ভীল ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে বেবিযে বাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙা করে তুললে, একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না, কেবল সোনার সাজপরা মহাবাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকাব সমুদ্রের সমান ভীল-সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়েব মতো রাজবাড়িব দিকে বেরিয়ে গেল।

রাজমহিষী তখন ইদরপুবে কেল্লার ছাদে রাজকুমার বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সন্ধ্যার হাওয়ায় বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, আর এক-একবাব যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন, সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। এক সময হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটা গোলমাল উঠল, তার পর বানী দেখলেন সেই পাহাড়ে-রাস্তায়, বনের অন্ধকার থেকে, মহারাজার কালো ঘোড়াটি তীরের মতো ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মতো কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল — পিছনে তার শত শত ভীল— কারো হাতে বল্লম, কারো হাতে বা তীর-ধনুক! মহারানী দেখলেন কালো ঘোড়ার মুখ থেকে শাদা ফেনা চারিদিকে মুক্তোর মতো ঝরে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে; তারপর দেখলেন আগুনের মতো একটি তীর তার কালো-চুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মতো তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটিকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেললে; রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধুলোর উপরে ধড়পড় করতে লাগল। ঠিক সেই সময় মহারানীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শন্‌শন্ শব্দে কেল্লার ছাদের উপর এসে পড়ল। রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে

ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চীৎকার উঠল — সূর্যদেব মালিয়া-পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন।

সে রাত্রি কি ভয়ানক রাত্রি! সেই মালিয়া-পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, আর মাঝে গুটিকতক রাজপুত প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন; আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যেব বিধবা মহিষী পাঁচ বছরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জন ঘরে বসে রইলেন! তিনি কতবার কত দাসদাসীর নাম ধরে ডাকলেন — কারো সাড়া শব্দ নেই। মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চীৎকার করে ডাকলেন, কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারানীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল, তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও কবলে না। রানী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোট একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে অন্দরমহলের চন্দনকাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন — রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার, প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড পাথবের খিলান, তাব মাঝে গজদন্তেব কাজ করা বড়-বড় দবজা খোলা — হাঁ-হাঁ করছে, অত বড় রাজপুরী, যেন জনমানব নেই।

মহারানী অবাক হয়ে এক-হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনাব চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়েব শব্দ শোনা গেল , চামড়ার জুতো-পরা রাজপুত বীরের মচ্‌মচ্‌ পাযের শব্দ নয় , কপোব বাঁকি-পরা রাজদাসীব ঝিনিঝিনি পায়ের শব্দ নয়, কাঠের খড়ম-পরা পঁচাত্তর বৎসবের বুড়ো রাজপুরোহিতের খটাখট পায়ের শব্দ নয় — এ যেন চোরের মতো, সাপের মতো খুসখাস, খিটখাট পায়ের শব্দ! মহারানী ভয় পেলেন। দেখতে-দেখতে অসুরেব মতো একজন ভীল সর্দার তাঁব সম্মুখে উপস্থিত হল। মহারানী জিজ্ঞাসা করলেন — "কে তুই? কি চাস?" ভীল সর্দাব বাঘেব মতো গর্জন করে বললে — "জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল, যাব মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মতো চিতোরের বাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কী সুখেব দিন। এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েচি, আজ এই হাতে তাব ছেলেসুদ্ধ মহারানীকে দাসীব মতো বেঁধে নিয়ে যাব।" মহারানীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। "ভগবান রক্ষা কর।" বলে তিনি সেই নিরেট সোনার বড-বড চাবির গোছা সজোবে ভীল সর্দারেব কপালে ছুঁড়ে মারলেন। দুরন্ত ভীল "ম্মা-রে!" বলে চীৎকাব করে ঘুবে পড়ল। মহাবানী কচি বাপ্পাকে বুকে করে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন — তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল, আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবাব জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

বানী পথ চলতে লাগলেন — পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জমে গেল, অন্ধকারে বারবার পথ ভুল হতে লাগল — তবু রানী পথ চললেন। কত দূব! কত দূর! — পাহাড়েব পথ কত দূব? কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নেই! রানী কত পথ চললেন, তবু সে পথের শেষ নেই! ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তাব আশেপাশে বীবনগরেব দু-একটি ব্রাহ্মণেব বাড়ি দেখা দিতে লাগল। পাহাড়ী হাওয়া ববফেব মতো ঠাণ্ডা, পাখিরাও তখন জাগেনি, এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী বাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীবনগরেব ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দবজায় ঘা দিলেন। আট-পুরুষ আগে, একদিন শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরেব কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন; আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতেব হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট রাজকুমাব বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতাব আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন, আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোট-ছোট দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিল। এদের পূর্বপুরুষ সর্বপ্রথমে নিজেদের আঙুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজ-তিলক টেনে দিয়েছিল — আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্বনাশ হয়ে গেল, বিদ্রোহী ভীলেরা তাদের ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরেব কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছুদিন কাটালেন। কিন্তু সেখানেও ভীল রাজা , সেখানেও ভয় ছিল — কোন দিন কোন ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন করে! ব্রাহ্মণ যে মহারানীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, বিপদে-সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন। তিনি একেবারে ভীল রাজত্ব ছেড়ে তাদের ক'টিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মতো ত্রিকূট পাহাড় আর একদিকে মেঘের মতো অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্রনগব, কাছাকাছি শোলাঙ্কি-বংশের একজন রাজপুত বাজার বাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরের ব্রাহ্মণ-পাড়ার গা ঘেঁষে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁব ঘরের সমস্ত কাজ করতে লাগল, আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুই ভাই — ভীল বালিয ও দেবকে নিয়ে মাঠে-মাঠে বনে-বনে গরু চরিয়ে রাখাল-বালকদের সঙ্গে রাখালের মতো খেলে বেডাতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে, বাপ্পা রাজাব ছেলে , কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজেব হাতে লিখে বাপ্পার গলায বেঁধে দিলেন — তাঁর মনে বড় ভয় ছিল পাছে কোনো ভীল বাপ্পার সন্ধান পায।

ক্রমে বাপ্পা যখন বড হয়ে উঠলেন , যখন মাঠে-মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে-পাহাড়ে ওঠা-নামাতে বাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন-দিন লোহাব মতো শক্ত হয়ে উঠল , যখন তিনি ক্ষেপা মোষ একহাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন ; সমস্ত রাখাল-বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মতো বাপ্পাকে ভয়, ভক্তি, সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তখন তিনি বাপ্পার শবীবের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিযা-পাহাড়েব গল্প, সেই ভীল-বিদ্রোহের গল্প, সেই রানী পুষ্পবতী, মহারাজা শিলাদিত্য, বাজকুমাব গোহ, তাঁর প্রিযবন্ধু মাণ্ডলিকের কথা একে-একে বলতে লাগলেন। শুনতে-শুনতে কখনো বাপ্পাব চোখে জল আসত, কখনো বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত, কখনো ভয়ে প্রাণ কাঁপত। বাপ্পা সারা-বাত্রি কখনো সূর্যের মন্ত্র, কখনো পাহাড়ের ভীলের যুদ্ধ, স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন — আমিও কবে হয়তো বাজা হব, লড়াই করব।

এমনি ভাবে দিন কাটছিল। সেই সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন-নতুন ঘাসের উপব গরুগুলি চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা-একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সেদিন ঝুলন-পর্ব, বাজপুতদের বড় আনন্দের দিন, সকাল না হতে দলে-দলে রাখাল নতুন কাপড় পরে, কেউ ছোট ভাই বোনকে কোলে করে, কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিযে, একজন তামাশা দেখতে অন্যজন বা পয়সা করতে, নগেন্দ্রনগরের বাজপুত রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একলা রইলেন ; তাঁর প্রাণের বন্ধু, দুটি ভাই — ভীল বালিয় আর দেব, দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে — "ভাই, তুই কি রাজবাড়ি যাবি?" বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন — "না, যাব না।" হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল — আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দের মেলা দেখতে যাব? কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনীদিদির সঙ্গে

হাসতে-হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল; বাপ্পার একটিমাত্র গাই চরতে-চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই, কেবল মাঝে-মাঝে ঝিঁঝির ঝিনি-ঝিনি, পাতার ঝুরুঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা-একা ঠেকতে লাগল। তিনি উদাস প্রাণে ভীলনীদিদির মুখে শোনা ভীল-রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান ছোট একটি বাঁশের বাঁশিতে বাজাতে লাগলেন। সেই গানের কথা বোঝা গেল না, কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মতো তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলা হাওয়ায় মিশে স্বপনের মতো বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল। আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল — ঐ পশ্চিমের দিকে, যেখানে মেঘের কোলে সূর্যের আলো ঝিকিমিকি জ্বলছে, যেখানে কালো-কালো মেঘ পাথরের মতো জমাট বেঁধে রয়েছে, সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নিচে, তাদের যেন বাড়ি ছিল , সেই বাড়ির ছাদের চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন ; সে বাড়ি কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসিমুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণছানা চরে বেড়াত; গাছের উপরে টিয়ে পাখি উড়ে বসত ; পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত — তাদের কি সুন্দর রঙ, কি সুন্দর গলা ! বাপ্পা সজল নয়নে মেঘেব দিকে চেয়ে-চেয়ে বাঁশের বাঁশিতে ভীলের গান বাজাতে লাগলেন — বাঁশির করুণ সুর কেঁদে-কেঁদে, কেঁপে-কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে লাগল।

সেই বনের একধারে আজ ঝুলন-পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে, শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বললেন — "শুনেছিস ভাই, বনের ভিতর রাখাল-রাজা বাঁশি বাজাচ্ছে!"

সখীরা বললেন — "আয় ভাই, সকলে মিলে চাঁপা গাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলনো-খেলা খেলি আয়!" কিন্তু দোলা খাটাবাব দড়ি নেই যে। সেই বৃন্দাবনের মতো গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জন, সেই দূর বনে রাখালরাজেব মধুর বাঁশি, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবই আজ যুগযুগান্তরেব আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ-রাধার প্রথম ঝুলনের মতো। এমন দিন কি ঝুল্না বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন। আবাব বাঁশি, পাখির গানের মতো, বনের এপার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরে জড়ানো হাতেব বালা সখীব হাতে দিয়ে বললেন — "যা ভাই, এই বালাব বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে একগাছা দড়ি নিয়ে আয়।"

রাজকুমারীর সখী সেই বালা হাতে বাপ্পার কাছে এসে বললে—"এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?" হাসতে-হাসতে বাপ্পা বললেন — "পারি— যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করে।"

সেইদিন সেই নির্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুল্না বেঁধে নিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বর-কনেকে ঘিরে-ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল — "আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!" খেলা শেষ হল ; রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন ; আর বাপ্পা ফুলে-ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন-পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন — আজ কি আনন্দ! আজ কি আনন্দ!

হঠাৎ একটুখানি পুবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হু-হু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল। সেইসঙ্গে বড়-বড় দুটি বৃষ্টির ফোঁটা টুপটাপ করে চাঁপাগাছের সবুজ পাতার উপরে ঝরে পড়ল। বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন —পশ্চিমদিক

থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে — মাঝে-মাঝে গুরুগুরু গর্জ্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে। বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল, ঘরে ফিরতে হবে। দুধের মতো শাদা তাঁর ধবলী গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে। তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাদন খুলে নিয়ে ধবলী গাইটির সন্ধানে চললেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে-মাঝে গাছে-গাছে রাশি-রাশি জোনাকি-পোকা হীরের মতো ঝক্‌ঝক্ করছে, আর জায়গায়-জায়গায়, ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করছে। বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে-পথে ধবলীর সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায়, ঘন বেতের বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন — এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন ; ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দীর মতো তাঁর ধবলী গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই শাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মতো একটি শ্বেতপাথরের শিবের মাথায় আপনা-আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল-বেলায় পদ্মের পাপড়ির মতো ধীরে-ধীরে খুলে গেল। মহর্ষি মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধেব ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিবে বললেন — "শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত। তোমায় আশীর্বাদ করছি — তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীব রাজা হও। তোমার ধবলীর দুধের ধারায় আজ আমি বড়ই তুষ্ট হয়েছি! আজ আমার মহাপ্রস্থানেব দিন, এই শেষদিনে তোমায় আর কি দেব? এই ভগবতী ভবানীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর — এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশব পৃথিবী জয় করে দেয় — এই দুটি তুমি লও। আব বৎস, ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেতপাথরেব মূর্তিটি সঙ্গে রেখ, সর্বদা এঁর পূজা করবে। আজ হতে তোমার নাম হল —একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নামেই সিংহাসনে বসবে।" তারপব নিজেব হাতে বাপ্পাব গলায চামড়ার পৈতা জড়িযে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে-দেখতে তাঁব পবিত্র শরীর আগুনের মতো ধূ-ধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের মূর্তি ধরে ধবলী গাইয়ের পিছনে-পিছনে ফিরে চললেন — মেঘের গুরুগুরু, দেবতার দুন্দুভির মতো, সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল।

তখন ভোর হয়ে এসেছে, মেলা-শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদেব সঙ্গে ঘবে ফিবলেন।

কিছুদিন পবেই বাপ্পাকে নগেন্দ্রপুব ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন-পূর্ণিমায় খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবাব পর বিদেশ থেকে বাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্রনগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীব বিয়ে হয়ে গেছে। আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে — রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়-ভাবনায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক-পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বললেন — "পিতা, আমায় বিদায় দাও। আমি তো এখন বড় হয়েছি, আমার জন্যে তোমরা কেন বিপদে পড়?" ব্রাহ্মণ বললেন — "বৎস, তুমি জানো না তুমি কে ; তুমি রাজপুত্র, তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন ; আমি আজ এই অল্প-বযসে একা ভিখারীর মতো তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?" বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বললেন — "পিতা, বিদেশে এরাই আমাব সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।" ব্রাহ্মণ তখন আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন— "যাও বৎস, তুমি

রাজার ছেলে, রাজারই মত ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করছি — পৃথিবীর রাজা হও। যদি কেউ তোমার পরিচয় চায়, তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্বপুরুষেরা কোন রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস, সুখে থাক!"

ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীল্‌নীদিদির কাছে বিদায় নিতে চললেন কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হল না। অনেক কাঁদাকাটার পর ভীল্‌নীদিদি বললেন — "বাপ্পা রে, যদি যাবি তবে তোর দুই ভাই — বালিয় ও দেবকে সাথে নে। ওরে বাপ্পা, তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন করে যে!" তারপর তিনজনের হাতে তিন-তিনখানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীল্‌নীদিদি তিনটি ভাইকে বিদায় করলেন। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড়-বড় পাথরের থামের মতো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর-ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে; কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজগর স্থির হয়ে পড়ে আছে , কোথাও বাঘেব গর্জন, কোথাও বা পাখির গান ; এক জায়গায় সবুজ ঘাসে সোনার রোদ, আব-জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার। বালিয় ও দেবকে সঙ্গে নিয়ে বাপ্পা কখনো বনের মনোহর শোভা দেখতে-দেখতে, কখনো মহা-মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চললেন।

সেই প্রকাণ্ড পরাশর অবণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন, তিন রাত কেটে গেল , বাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিনখানি পোড়া রুটি খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপব গ্রামের পব গ্রাম, দেশের পর দেশ পার হয়ে, কত বর্ষা, কত শীত, পথে-পথে কাটিয়ে, বাপ্পা মেবারের মৌর্যবংশীয় রাজা মানেব রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদেব সঙ্গে যুদ্ধেব মহা আয়োজন হচ্ছে। হাতির পিঠে, উটের উপবে গোলাগুলি, চাল-ডাল, তাম্বু-কানাত , গরুর গাড়িতে অস্ত্র-শস্ত্র, খাবার-দাবাব , বড-বড জ্বালায় খাবাব জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে , বাস্তায়-বাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি, হাতে বল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে বাজার চর মুসলমানের সন্ধানে-সন্ধানে ফিবছে। মহারাজ মান নিজে সামন্ত রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চডে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন— চারিদিকে হৈ-হৈ পড়ে গেছে।

এত গোলমাল, এত লোকজন, এমন প্রকাণ্ড নগর, এত বড়-বড় পাথরেব বাডি বাপ্পা এ পর্যন্ত কখনো দেখেননি। নগেন্দ্রনগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তাব মাটিব দেওযাল। সেখানেও মন্দিব ছিল, কিন্তু সে কত ছোট! বাপ্পা আশ্চর্য হয়ে রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড়বড় হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত, হলেন , শাদা ঘোড়াব সোনাব সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে , মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর-পাখার চামর দোলাচ্ছে , বাপ্পা ভাবলেন — রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়। তিনি তৎক্ষণাৎ বালিয় ও দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ কবে মহারাজকে প্রণাম করলেন। রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন — "কে তুমি, কি চাও?" বাপ্পা বললেন— "আমি রাজপুত রাজার ছেলে, আপনার আশ্রয়ে রাজার মতো থাকতে চাই!" এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে! চারিদিকে বড়-বড় সর্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন — এ কোনো ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান যুদ্ধের সময় এই বীরপুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। মান-রাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরির শাল বাপ্পার

গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন। বাপ্পা বললেন— "মহারাজ, আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন।" তারপর, বালিয় ও দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন — সমস্ত সৈন্যসামন্ত ও সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মতো, প্রায় আধখানা জেগে রইল ; তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল — "হাঁ বীর বটে ; যেমন চেহারা, তেমনি শরীর।" চারিদিকে ধন্য-ধন্য পড়ে গেল ; কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান-রাজার উপর মনে-মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন-দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল।

ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল। সেইদিন রাজসভায় দেশ-বিদেশের যত সামন্ত-রাজা, যত বুড়ো-বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান-রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন —"মহারাজ, আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালোবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস করতে বলে ; যদি মহারাজ, আজ তুমি সেই ভালোবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারীকে আমাদের সবলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল — তবে আমাদের আর কাজ কি? বাপ্পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর ; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন দেখা যাক।" মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মতো স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় এই বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যস্থলে পনেরো বৎসরের বীর-বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "শুনুন মহারাজ! আজ রাজস্থানের প্রধান-প্রধান সর্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন —এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান ; তবে তাই হোক!" রাজা মান হতাশের মতো চারিদিকে চেয়ে দেখলেন ; তারপর ধীরে-ধীরে বললেন — "তবে তাই হোক।" তারপর একদিক দিয়ে মূর্ছিত প্রায় মান-রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন ; আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন।

বিদ্রোহী-সর্দারদের মাথা হেঁট হল। তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে, পনেরো বৎসরেব বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনই সাহস পাবে না — সভার মাঝে অপমান হবে ; কিন্তু যখন সেই বীর বালক নির্ভয়ে হাসিমুখে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে, তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা আরও আশ্চর্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা — যাকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন — পনেরো বৎসরের সেই বালক বাপ্পা — যুদ্ধ জয় করে কোটি-কোটি রাজপুত প্রজার আশীর্বাদ, জয়জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত রাজস্থানে রাজমুকুটের সমান রাজপুতের রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন। সেদিন সমস্ত রাজস্থান বেড়ে কি আনন্দ, কি উৎসাহ।

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন, সেদিন রাজা মানের বুড়ো-বুড়ো সর্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহারাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার চেষ্টা করলেন, কাকুতি-মিনতি, এমন কি শেষে রাজগুরুকে পর্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, সর্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন — "আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি, এক বৎসর পর্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।"

সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ঙ্কর পরামর্শে কেটে গেল। এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন। রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন; যখন শুনলেন যে বাপ্পাকে তিনি পথের ধুলো থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীনহীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়েও প্রিয় ভেবেছিলেন — হায় রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল।

তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন ; সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ ; যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মান-রাজা প্রাণ দিলেন।

ষোলো বৎসরের বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহাসনে বসলেন। বালিয় ও দেব দুটি ভাই ভীল, বাপ্পার কপালে রাজ-তিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বকশিশ পেলে। বাপ্পা সেদিন নিয়ম করে দিলেন যে, তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই দুই ভীলের বংশাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে। আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত করলেন, তখন এই ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার কথা যে শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল ; কিন্তু মান-রাজাব সভাপণ্ডিতেরা ভাবলেন, ইনি কি তবে গিহ্লোট-রাজকুমার গোহের বংশীয়! — সূর্যবংশেই তো ভীলেব হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষী চিতোর-রাজকুমারীব ছেলে নয় তো? বাজা মান, বাপ্পার মায়ের ভাই মামা নয় তো? ছি! ছি! বাপ্পা কি অধর্ম করলেন — চোরের মতন মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ। পণ্ডিতেরা আর বাজসভাব মুখো হলেন না — একে-একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। হায় তাঁরা যদি জানতেন বাপ্পা কত নির্দোষ , বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা। তিনি তাঁর পালক পিতা, সেই বাজপুরোহিতের কাছে ভীল-বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না, যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলেরা একদিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা ; তিনি জানতেন না যে, তাঁরই পূর্বপুরুষ রাজকুমার গোহ, যাঁকে পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে, চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্পা ভাবতেন তিনি কোনো সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র।

রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতা দেবীর সোনার মূর্তি সঙ্গে এনেছিলেন। চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত-পাথরের মন্দিরে সোনার সেই দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পুজো করতেন।

অনেক দিন কেটে গেছে, বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন, সেই সময় একদিন ভক্তিভরে বাণমাতাকে প্রণাম করে উঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল। বাপ্পা বড় হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতোয় বাঁধা তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন, তেমনই ছিল — অনেকদিনের অভ্যাসে মনেই পড়ত না যে, গলায় একটা কিছু আছে। আজ যখন হীরামতির কুড়িগাছা হারের নিচে থেকে সেই পুরোনো কবচখানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল, তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন, এ কি! এতদিন আমার মনেই ছিল না যে এতে লেখা আছে আমি কে, কোথায় ছিলুম! আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে! বাপ্পা প্রফুল্ল-মুখে সেই তামার কবচ মহারানীর হাতে এনে দিয়ে বললেন — "পড় তো শুনি।" বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না। মহারানী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে বলতে

লাগলেন। কবচের এক পিঠে লেখা রয়েছে — "বাসস্থান ত্রিকূট পর্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর-অরণ্য।" বাপ্পা হাসি-মুখে রানীর কাঁধে হাত রেখে বললেন —" এই আমার ছেলেবেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি। সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশী বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরে ঝুলন-পূর্ণিমার সেই জ্যোৎস্না-রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর মধুর হাসি, স্বপ্নের মতো আমার এখনো মনে আসে। কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু পৃথিবীতে তিনটি-চুড়ো পাহাড় কত আছে, কে তার সন্ধান পাবে। আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মতো তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোট শহরের নাম নগেন্দ্রনগর, যদি জানতে পারতেম সেই ঘন বন, যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতাম, যেখানে ঝুলন-পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম, সেটি পরাশর-অরণ্য তবে কোনো গোলই হত না ; হায় হায়। জন্মাবধি লেখা-পড়া না শিখে এই ফল। এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি-রাজনন্দিনীকে ফিরে পাব? পড় তো শুনি আর কি লেখা আছে।" রানী কবচের আর-এক পিঠ উল্‌টে পড়তে লাগলেন — "জন্মস্থান মালিয়া পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোর-কুমারী, নাম বাপ্পা।"

মহারানীর বড-বড় চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড হয়ে উঠল — তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায়, ফুলের বিছানার মতো সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন ; আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙুলে এক ফোঁটা রক্তের মতো বড় একখানা লালের আঙটির দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন, হায়-হায়! কি পাপ করেছি! এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে, মামার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি! "মহারানী! আমি মহাপাপী ; আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল।"

একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেইদিনই সকলের কাছে বিদায় হয়ে, দশ হাজার দেওয়ানী ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন। তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া-পাহাড় ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল। বাপ্পা মালিয়া পাহাড় জয় করে ভীল-রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন। তারপর দেশ-বিদেশ — কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরান, তুরান জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল ; মালিয়া-পাহাড জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়-বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল ; কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোনো দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন-পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি-রাজকুমারীর হাসি-মুখ মনে পড়ত ; যখন কোনো নতুন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নতুন রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিক ঘিরে-ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন-গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত। শেষে যেদিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটীর মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি-রাজবাড়ি জনশূন্য, নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে — সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই, তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙে গেল, তিনি শান্তিহারা পাগলের মতো সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশে-ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন ; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ, শূন্য সিংহাসন আর অন্দরে একা মহারানীকে নিয়ে পড়ে রইল।

এই রকম দেশে-বিদেশে ঘুরতে-ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নীনগরে যেখানে দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন, সেইখানে উপস্থিত হলেন। একদিন ষোলো বৎসর বয়সে রাজা মানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী নগর থেকে তাড়িয়ে চিতোরে ফিরে গিয়েছিলেন ; আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরনো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নীনগরে ফিরে এলেন। গায়নীনগর দেখে বাপ্পার সেই দুটি ভাই-বোন গায়েব-গায়েবীর গল্প মনে পড়ল।

বাপ্পাদিত্য সেই সূর্যকুণ্ডের জলে সূর্য-পূজা করে গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্ধেক রাত্রে কার একটি মধুর গান শুনতে-শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি শয়নমন্দির থেকে পাথরের ছাদে বেরিয়ে দাঁড়ালেন। সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মসজিদ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপ্‌ধপ্ করছে। আকাশে আধখানি চাঁদ ; চারিদিক নিশুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন। তাঁর মনে হল, এ গান যেন কোথায় শুনেছেন। হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল ; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন — "আজ কি আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।" — এ যে সেই গান! নগেন্দ্রনগরে রাজপুত-রাজকুমারীর ঝুলন গান!

বাপ্পা ছাদের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন , নিচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে — "আজ কি আনন্দ।" বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন। সেই চাঁদের আলোয় নির্জনে শ্বেতপাথরের ছাদে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন — "কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি-রাজকুমারী? তুমি কি কখনো ঝুলন-পূর্ণিমায় এক রাখাল-বালককে বিয়ে করেছিলে?" ভিখারিণী অনেকক্ষণ একদৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটুখানি হেসে বলল —"মহারাজ, অর্ধেক-রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কি তামাশা!" বাপ্পা বললেন — "তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?" ভিখারিণী নিঃশ্বাস ফেলে বললে — "আমি একদিন রাজকুমারী ছিলাম বটে, আজ ভিখারিণী। মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা। একদিন পনেরো বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সেদিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাদের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলাম — কি সুন্দর মুখ, কি প্রকাণ্ড শরীর। আর আজ তোমায় কি দেখছি! সে শরীর নেই, সে হাসি নেই। এমন দশা তোমার কে করলে? কোন রাজপুত-কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মতো দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" বাপ্পা বললেন — "সে কথা থাক ; তুমি আবার সেই গান গাও।" ভিখারিণী গাইতে লাগল — "আজ কি আনন্দ! ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ।" বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল; বাপ্পা বললেন —"নবাবজাদী তোমায় কি দেব বল?" ভিখারিণী বললে — "আমার যদি রাজ্য থাকত তবে তোমায় বলতেম আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর — কিন্তু সে আশা এখন নেই, এখন আমি ভিখারিণী যে। আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে-কাছে রাখ।" বাপ্পা বললেন — "তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।"

তার পরদিন, সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেয়ালা হাতে বেগম-সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন-গান শুনতে-শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম, মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে।

একশত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল। পূর্বদিকে —হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষী, হিন্দু প্রজারা ; পশ্চিমে ইরানীস্থানে তাঁর মুসলমানী বেগম আর পাঠানের দল ; হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন একপিঠে সূর্যের স্তব আর একপিঠে আল্লার দোয়ালেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল,তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না — কেবল রাশি-রাশি পদ্মফুল আর গোলাপফুল। চিতোরের মহারানী সেই পদ্মফুল বাণমাতাজীর মন্দিরে মানস-সরোবরের জলে রেখে দিলেন। ইরানী বেগম একটি গোলাপ ফুল শখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে গোলাপ ফুলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন , আর সেইদিন হিন্দুস্থান ও ইরানীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন —"সখী, তোরা সেই গান গা।" চারদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে-ঘিরে গাইতে লাগল — "আজ কি আনন্দ।"

সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী , আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ — দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

মালতীর মালা

সরলা দেবী

রেঙ্গুনে স্পার্ক ষ্ট্রীটের দু'ধারে বড় বড় গাছের সারি দিয়া সাজান প্রকাণ্ড বাঁধান রাস্তাটার উপর শ্রাবণের বাদলধারা যেন মায়াজাল বিস্তার করিয়া দিযাছিল।

দেখিলে আপনা হইতেই মন উদাস হইয়া পড়ে।

তাহারই একদিকে ফুটপাথের উপর ডাইনে বাঁয়ে পোড়োজমিব বেড়া দেওয়া চারতলা বাড়ীর তিনতলার এক কামরায় উষা স্বামীব অফিসেব জলখাবাব কৌটায় ভরিতেছিল।

শুইবার ঘরে কোট্ প্যান্ট পরিতে পবিতে মোহিত হাঁকিযা কহিল, "ওগো শুনছ।"

"কি?"

"আজ তুমি দুপুরে একটু ঘুমিয়ে নিও।"

"কেন শুনি?"

"এ-যে বাদল নামল, আজ আব কোথাও বেকনো যাবে না দেখছি সন্ধ্যেবেলায়!"

"তাই কি?"

"নিরুপায়েব উপায তুমি। তোমার সঙ্গেই দেখছি সন্ধ্যেটা আড্ডা দিযে কাটাতে হবে। তুমি আবার আলো না জ্বলতে জ্বলতে যে ঘুম লাগাও তাই সাবধান কবে দিচ্ছি।"

"আহা মরে যাই! আমি অত তোমাব দয়ার ধার ধাবি না। কেন তোমার আজ "বেঙ্গল ক্লাব" "ফেয়াব ষ্ট্রীটের মেস" কি অপবাধ কবলে?"

"বারে, তুমি কি চাও আজও কালকের মত বেড়াতে গিয়ে ভিজে কাকটি হয়ে ফিবে এসে 'ইনফ্লুযেঞ্জায' ভুগে মরি! তাব চাইতে তুমি একটু দযা কবে দুপুবে ঘুমিযে নিও, সন্ধ্যেটা জমবে ভাল।"

"ঈশ, তা বই কি! আজ আমি দুপুর বেলা বুবুদের বাড়ী বেড়াতে যাব, কাল থেকে কথা দিযে রেখেছি। তাবপব সন্ধ্যে হলেই ঘুমুব, তুমি একলাটি বসে বসে হাই তুলবে — তুমি রোজ বেডাতে গেলে আমি যা করি। আজ হবে শোধ-বোধ।"

হাসিয়া মোহিত কহিল "আচ্ছা, তোমার চোখেব ঘুম কেড়ে নেবাব ওষুধ আমাব জানা আছে।"

(২)

বাড়ীওলা মজিদ সাহেবের পৌনা স্ত্রী মা হেন্‌কে উষা বুবু বলিত। মা হেন্ উষাকে বলিত দিদি। চীনাবাজার মজিদ সাহেবের আবাস ভবন। সেখানে তাঁহার স্বজাতীয়া প্রৌঢ়া স্ত্রী, উপযুক্ত পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র পৌত্রী বর্তমান।

মজিদ সাহেব মান্দালয়ে একবার ব্যবসায় উপলক্ষে গিয়া বন্ধুকন্যা মা হেনের রূপে মুগ্ধ হইয়া বন্ধুব অগোচরে বিবাহ করিয়া বসেন। এবং গোপনে আনিয়া স্পার্ক ষ্ট্রীটের এই বাড়ীতেই আছেন।

অবশ্য বিবাহটা হইয়াছিল একটু নূতন রকমে। মা হেন্ কড়ার করিয়া লইয়াছিল যে সে নামাজ পড়িবে না এবং নিষিদ্ধ বস্তুও খাইবে না।

আর রাত্রে মজিদ সাহেব আসিয়া যে সকল পাত্রে চা, কফি, লেমনেড সরবৎ ইত্যাদি পান করিত, মা হেন্, সেই সকল পাত্রগুলি পৃথক স্থানে রাখিয়া দিত, নিজে ব্যবহার করিত না।

কারণ মা হেন্ হিন্দু। মা হেন্ বৈষ্ণবী। নবদ্বীপের বড় বড় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ একসময়ে স্বাধীন বর্ম্মা নৃপতির সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা কৌলিন্য মর্য্যাদায় কিছুমাত্র ছোট হন নাই। রাজা থিব'র পিতৃপিতামহের হুকুমে তাঁহারা এক এক বর্ম্মা তরুণীর পাণিগ্রহণ করিয়া বংশমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন।

কিন্তু তাহার পর মুস্কিল বাধিল বংশধরদের লইয়া। তাহারা ত আর নবদ্বীপের "কাব্যতীর্থ" "স্মৃতিতীর্থদের" মধ্যে নিকট আত্মীয় বলিয়া স্মৃতি ফিরাইতে পারিল না।

অতএব বর্ম্মা রাজার অনুগ্রহে তাহারা পৌনা নামে অভিহিত হইতে লাগিল। না হিন্দু না বৌদ্ধ, না বাঙ্গালী না বর্ম্মা।

এই ত গেল হেনের পিতৃ পিতামহের ইতিহাস।

(৩)

ঊষা যখন বুবুদের বাসার দরজার ঘা দিল, বেলা তখন আড়াইটা। জরীর বুটি দেওয়া বেগুনি রংয়ের লুঙ্গীর উপর ফিরোজা রংয়ের ফুলহাতা এঞ্জী পরিহিতা, কানে হীরার ফুল, গলায় চুনিপান্না খচিত মফচেন, পায়ে সোনার মল শোভিতা মা হেন্ সহাস্যবদনে দরজা খুলিয়া দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া সাদরে অভ্যর্থনা করিল।

"আইয়ে দিদি, বৈঠিয়ে। আজ্ হামারা নসীব বহুত আচ্ছা হ্যায়। আজ মালুম হোতা পূব্‌কা সূরজ পচ্ছিম্‌মে উঠা হ্যায়।"

ঊষা হাসিমুখে প্রবেশ করিয়া মা হেনের নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে উপবেশন করিয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে সে আসিবে মনে করে প্রায়ই, কিন্তু হইয়া উঠে না।

তাহার পর নানারূপ আলাপ করিতে করিতে মা হেন্ সহসা প্রশ্ন করিল, "আজ সকাল থেকে উঠে অবধি কি কি কাজ করলে বল?"

ঊষা উর্দ্দুঘেঁষা হিন্দীতে যে জবাব দিল তাহার মর্ম্মার্থ এই —

"কি আর এমন করব বল ভাই! ছেলে নেই — পুলে নেই, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ গড়িয়েই দিন কেটে যায়। কালকে থেকে যে বৃষ্টি, আজ সকালে ত কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। উনি কিন্তু এমন মানুষ, ভোর না হতেই উঠে হাত-মুখ ধুয়ে রোজ নিজে হাতে দু'কাপ চা করে তারপর আমায় ডাকাডাকি করবেন। আমি যত বলি যে আমি এখন চা খাব না, বেলায় খাব, সেকথা কে শোনে? দু'জনে গল্প করে চা না খেলে ওঁর চলবেই না! কাজেই আজও টানাটানির চোটে উঠতেই হল।

"তারপর চা খেয়ে উনি গেলেন বাজার, আমি রান্না করতে লাগলুম। বাজার থেকে এসে আমায় রান্নার যোগাড় দিতে লাগলেন, হয়ত ছুরি করে আলু ছাড়িয়ে দিতে লাগলেন, নয়ত আমি যখন মাছ কুটছি তখন হয়ত কড়ার তরকারীটা নেড়ে দিতে লাগলেন!

"আজ আবার দেখ না দিনে ঘুমুতে হুকুম দিয়ে গেছেন।"

"কেন?"

"কেন আবার, জল-বাদলায় বেরুতে পারবেন না, তাই আমাকে আড্ডা দিতে হবে।"

"তোমরা বেশ আছ ভাই, এক একদিন যখন দু'জনে গান গাও, আমার শুনতে বেশ লাগে, আমি বারান্দায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকি।"

"আমার কথা ত' বেশ শুনে নিলে, এইবার তোমার কথা বল সকাল থেকে কি করেছ?"

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া মা হেন্ কহিল, "আমি আর কি করব ভাই, জানই ত' আমার একঘেয়ে জীবন।"

এই বলিয়া মা হেন্ উষারই নিকট হইতে শেখা একটি কীর্ত্তনের সুর ধরিয়া কহিল —

"হরি গেলেন মধুপুরী, হাম কুলবালা,
বিপথে পড়িয়ে আছি হয়ে মালতীর মালা
আমি পড়ে যে আছি গো —
মালতীর মালা হয়ে আমি পড়ে যে আছি
কৃষ্ণ উপেক্ষিতা হয়ে পড়ে যে আছি গো —"

বুবুর বাহু ধরিয়া কাতর কণ্ঠে উষা কহিল, 'কেন, ভাই এমন করে বলছ, তুমি ত' উপেক্ষিতা নও।"

"না, তা নই, কিন্তু এমন ধারা একঘেয়ে জীবন যে আর ভাল লাগে না ভাই। রাত ১২ টায় সাহেব এল, ভোর পাঁচটায় চলে গেল, তারপর ৯টা অবধি ঘুমুলুম। তারপর মাসী চা নিয়ে ডাকল, উঠলুম, চা খেয়ে ঘর-দোর আসবাবপত্র ঝাড়লুম, গোছালুম বান্নাব কাজ সব মাসীই করে। আমাকে কিছু করতে দেয় না, বলে — আগুনের তাতে গেলে আমার বং ময়লা হয়ে যাবে, সাহেবের মন থাকবে না।

"কি আর করি?"

"গা ধুয়ে সাজ সারলুম। খাওয়া দাওয়াব পর মাসী বসল চুরুট তৈরী করতে, আর আমি আমার এই লুঙ্গীটায় পুঁতির ফুল বসাচ্ছিলুম আর তুমি এলে। দেখ ত' ভাই কেমন হযেছে?"

"সুন্দর! আমায় একটু কাগজ পেন্সিল দাও না ভাই, ডিজাইনটা এঁকে নিই।"

নক্সা আঁকিয়া উষা কহিল, "আজ তবে উঠি ভাই, চারটে বাজে, ওঁব আবার জলখাবার তৈরী করতে হবে, উনি ঠিক পৌনে পাঁচটায় আসেন।"

(৪)

বাসায় পা দিয়াই মোহিত কহিল, "জল্‌দি করো ম্যান জল্‌দি।"

বিস্মিত কণ্ঠে উষা কহিল "কেন?"

"তোমার রাগ দেখে বৃষ্টি যখন থেমে গেল, আর আমিও যখন বলেছি সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গেই কাটাব, তখন চল বায়োস্কোপে যাই। 'গ্লোবে' একটা বাংলা বই এসেছে।"

"আচ্ছা, ৬টা বাজতে তো এখনও দেরী আছে। আমি ততক্ষণ রাত্রের খাবারটা তাড়াতাড়ি সেরে রাখি। তুমি ধড়াচুড়া ছেড়ে হাত-পা ধোও, চা রেডি।"

ছাই রংয়ের কট্‌কি শাড়ীর জরিপাড় আঁচল দোলাইয়া উষা স্বামীর পাশে পাশে পথ চলিতে শুরু করিয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, মা হেন্ বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহাদেরই দিকে নির্মিমেষে চাহিয়া আছে।

উষার চিত্ত ব্যথিত হইল।

বায়োস্কোপেও উষার মন বসিল না, তার মনে বাজিতে লাগিল সখীর সকরুণ দৃষ্টিভঙ্গী আর তার নিঃসঙ্গ জীবনের কথা।

৯টায় বাসায় ফিরিয়া উষা সিঁড়িতে উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইল মা হেন্ গাহিতেছে—

"বিপথে পড়িয়ে আছি, হয়ে মালতীর মালা।"

সাহেব কত রাত্রে আসিবে কে জানে? যখন আসিবে তখন হয়ত যত্নে আঁকা সুরমা, তেনাখা চোখের জলে ভাসিয়া যাইবে।

মাতৃহীনা

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

ছোট বেলা থেকে আমার মা নেই। লোকে আমায় বলত 'মা-খেকো'', — মানুষের এত বড় দুর্ভাগ্যেব উপর এতখানি নির্মম উপহাস মানুষে যে কেমন করে' করে, আমি ত তা ভেবে পাই না। এই মায়ের অভাবে যে কি বোধ হয আমার মত ত আব কেউ তা কখনো অনুভব কবত না, অথচ আমিই ছিলেম আমাব ভাগ্যের জন্যে দায়ী! বাবা আমার মা-বাপ দুই-এব অভাবই পূর্ণ করেছিলেন। আমার আদব-আব্দাবেব অন্ত ছিল না। লোকে বিবক্ত হত, — 'মাওডা' মেয়ের অত কেন? বাবা হাসতেন, বলতেন, ''আহা, করুক। সে থাকলে ত সইত — না হয় আমিও সইলেম।'' তবু যত বড় হচ্ছিলেম, আমার মনেব অভাব ততই বেড়ে উঠছিল। কিছুতে যেন সুখ পেতেম না। খেলার সাথীবা যখন ''মা'' বলে ডাকত, আমার মন তখন তৃষিত হযে উঠত, ঐ ডাকটিব জন্যে। মা! মা! মা! কি মিষ্টি এই নামটি। আমাব কেবল কান্না পেত। বাগ হত, কেন আমাব মা নেই! মা-ডাকেব কিছু অভাব পূর্ণ কববাব জন্যে আমাব জেঠিমা কি খুডিমা কেউ ছিলেন না। আমার শুক্‌নো বুকেব ভিতবটা যেন তাই থেকে-থেকে হাঁপিযে উঠত। যশোদা আমায মানুষ করেছিল — তাকে আমি মা বলে ডাকতে শুরু কবায সে বাধা দিলে, ''ছি দিদিমণি, যাকে-তাকে কি মা বলতে আছে! বিযে হোক, বাঙ্গা শাশুড়ি হোক, তাকে মা বলে ডাকবে।'' সেই দিনটি থেকে বিযেব জন্য মনে মনে বডই সাধ জন্মাল। বিয়ে জিনিসটা যে কি, তা তখন ভাল কবে জানতুম না। তাব সুখ-দুঃখ লাভ-লোকসানেব হিসাব খতিযে দেখাব সে বযসও নয়। বিয়ের প্রধান যা স্বামী তাঁব কথা তখন জানতেমও না, ভাবতেমও না — কেবল জানতেম, বিয়ের সঙ্গে মস্ত-বড একটা যৌতুক আমাব পাওনা আছে — সে মা।

ক্রমে বযস বাডতে লাগল। সংসাবেব সঙ্গে ছোটখাট পবিচযও আরম্ভ হ'ল — তবু আমাব মানসেব মানসী প্রতিমাকে, আমাব ভবিষ্যৎ শাশুড়িকে আমি এতটুকু মলিন হতে দিলেম না। খুব উজ্জ্বল রঙে-বাঙতায মুড়ে মাকে আমাব দুর্গাপূজাব প্রতিমার মতই আমাব বুকের ভিতব আমি পূজা করতেম। শাশুডি সম্বন্ধে কেউ আমায় ঠাট্টা ক'বে কোন অন্যায কথা বললে আমি তা সইতে পাবতেম না। মুখবাব মত তখনি ঝগড়া বাধিযে দিতেম। লোকে বলত, ''দেখ, দেখ! রানুব এখন থেকেই শাশুডির উপব কত দবদ — ওরে, অত ভক্তি করিস নে বে — শেষে বাখতে পাববি নে।''

বাবো উত্তীর্ণ হযে তেরয পা দিতেই আমাব জন্য পাত্র খোঁজা শুরু হ'ল। আমি বাবাব বড আদবের ছোট মেযে, তাই আমার জন্যে একটু বিশেষ ক'বেই যাচাই-বাছাই চলছিল। বাবার মনের মত আব হয না। শেষে তাঁব পছন্দ-মত একটি পাত্র মিলে গেল। কলকাতায় বাড়ি, বেশ সচ্চরিত্র। একশো টাকা মাহিনাব চাকরি করেন। ঘরে ভাত-কাপড়ের অভাব নাই, অবস্থা ভালো। চাকরিতে ভবিষ্যৎ উন্নতিরও সম্ভাবনা আছে। বিধবার একমাত্র সন্তান! এইখানটায় বাবার মন একটু খুঁত-খুঁত কবছিল। আমারও যে না হযেছিল এমন নয়, —

আমার এতদিনের এত সাধের দুর্গাপ্রতিমার বিসর্জন হয়ে গেল। তা হোক মনের ভিতবকাব যে মনোময়ী মা — তাঁর সাজের বদলে কিছু এসে যায় না। তবে অনেক দিনেব ঘসা-মাজা নাড়া-চাড়ায় যে উজ্জ্বল মূর্তি আরও উজ্জ্বল হযে উঠেছিল তাঁকে নিজের হাতে নিরাভবণা করতে মনে একটা ব্যথাও লাগল। মনকে প্রবোধ দিলেম, নসুর মা ত বিধবা, কাঞ্চনে· মাও ত তাই! কি আর হবে তায়, তবু মা ত! বাবা একদিন কাছে ডেকে আদব কবে বুকে জড়িয়ে ধবে বললেন, "রানু, এবার বাবা ছেড়ে মার কাছে যাচ্ছিস। মা পেযে বাবাকে ভুলে যাবি নে ত রে?" আমি বাবার কোলে মাথা রেখে বললেম, 'না বাবা, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে থাকতে পারব না — কিছুতেই না!" বাবার আমাব মনেব ভাব তখন অম্নি ধাবাই ছিল বটে, তবু তার মধ্যে ঐ যে বাবা মিষ্টি কবে বললেন, "মা পাচ্ছিস" — এই কথাটি আমাব কানে এমন মধুব সুবে বেজে উঠল যে তেমন মধুব কোন শব্দ বুঝি আমাব কান দুটো কখনো শোনেনি। ওগো, সত্যই হবে এবাব আমি মা পাবো। মা ডাকেব সাধ আমাব এ-জন্মে পূর্ণ হবে তাহলে!

বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের কথায় বর্ণনার কিছু নাই। অধিকাংশ বাঙালী গৃহস্থঘরে মেয়েব বিয়ে যেমনভাবে হয়, আমাব বেলাতেও কোনদিকে তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। সেই আত্মীয়কুটুম্বের সমাগম, গহনা কাপড আলো বাজনা, ফুলেব মালা, ছাপানো কবিতা — আপ্যায়নেব সহিত একখানি অপবিচিত সুন্দব মুখ শুভদৃষ্টিব মধুব মিলন. — সবই তাই। তাতে নূতনত্ব বা বিশেষত্ব কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, কিছু তফাৎ ছিল। সেই সুন্দব মুখেব যিনি অধিকারী, তিনি আজ মন্ত্র পড়ে আমায নিজের বলে গ্রহণ কবে তাঁর মাকে "মা" বলবাব পূর্ণ অধিকাব আমায় দিয়েছিলেন। আব তাঁর সেই মহৎ দানের বিনিময়ে আমি আমাব তেব বছব বযসেব কৃতজ্ঞতার পুষ্পাঞ্জলি ভক্তিভরে তাঁব পাযে ঢেলে দিলেম। মাতৃহীনাকে যিনি মা দিলেন. তাঁকে অদেয় কিছু থাকে কি! ভাল কবে এসব মনস্তত্ত্বেব ব্যাখ্যা তখন মনে-মনেও কবতে পাবিনি, তবে মনেব নদীতে যেন এমনি ভাবেবই একটা আলোড়ন উঠেছিল। বিযেব পব শ্বশুববাড়ি এলেম , বাবাকে ছেড়ে ভাইদেব ছেড়ে এই আমাব প্রথম বাইবেব সংসারে পা ফেলা। তাই ভযে-ভাবনায় চোখে জল ঝরছিল। তবু একটা নূতন আশায় মনেব ভিতরটা থেকে থেকে, যেন আনন্দে দুলে-দুলেও উঠছিল, — মাকে দেখতে পাব।

আমাদেব গাড়ি এসে দোবে দাঁড়াতেই, শাঁখ বেজে উঠল। একজন গহনা-পবা মোটা সোটা আধাবয়সী স্ত্রীলোক আমায় নামিযে নিতে এলেন। বযস আমাব তেব হলে কি হয়, দেখলে লোকে ষোলর কম বলত না। যিনি নামিযে নিতে এসেছিলেন, তিনি খুড়শাশুড়ি। হাত ধবে নামাতে হোল। আমি তৃষিত চোখে চেযে বইলেম, লোকে আমায় বেহাযা বলবে কিনা, সে উপদেশ মনেও ছিল না। শুনে ছিলেম শাশুড়ি বিধবা, তাই তাঁকে চিনে নিতে দেরী হল না। স্বামীব মুখের সঙ্গে তাঁব মুখের অনেকখানি মিল। ছোটখাট গৌববর্ণ আধাবযসী। চেহাবাখানি দেখলেই ভক্তি হয়, মা বলে ডাকতে মনে কুণ্ঠা আসে না। খুড-শাশুড়ি বললেন, "দিদি, বৌমার মুখে মধু সন্দেশ দাও। সোনাব জলে মা-লক্ষ্মীব মুখ দেখো ভাই! সোনাব চাঁদেব বৌকে যেন সোনার চোখে দেখতে পাব।" শাশুড়ি গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমবা দেখ, ছোট বৌ, — মিথ্যের মুখোস পবা আমার কর্ম নয়।" চারদিকেব লোকজনদের বিস্মিত লজ্জিত মুখের পানে চেয়ে না দেখেই তিনি তখনকার কোন দরকাবি কাজে চলে গেলেন। স্বামী আস্তে আস্তে মুখ নিচু করে গাড়ি থেকে নেমে এলেন। আমি ছেলেমানুষ, তাঁর হেঁয়ালি কথার অর্থ না বুঝে খুশি হযে দুধে-আলতায় এসে দাঁড়ালেম। এমন কবে আমাব নব জীবনের অভ্যর্থনা হয়ে গেল।

বিযেব পর যে কয়দিন সেখানে বইলেম গোলমালেই দিন কেটে গেল। মা বলে ডাকবার মত এতটুকু অবসরও শাশুড়ি আমায পেতে দিলেন না। দিন-রাতই এমন তাঁর কাজ, আর কাজ। খাওযানো দেখা-শোনা ঘবগুছোন পবিচ্ছন্নতা-সাধন এই সবেতেই এমন ব্যস্ত হ্যে থাকতেন তিনি, যে আমাব কাছে, আসবাব কি বসবাব তাঁব সময হতো না। শুনতে পেলেম একদিন মাস্-শাশুডি শাশুডিকে বলছেন, "পদ্ম, তোব বৌ-ভাগ্যি ভালোই হবে, মেয়ে বড় সুবোধ! মা কি কচ্চেন, মার খাওযা হযেছে কিনা, পিসিদের কাছে খবব নেয়। আহা, ছোটবেলায় মা মরা। ও তোকে মা বলে নিতে পাববে।" শাশুড়ি দালানে বসে লুচির ময়দা মাখছিলেন, আমি যে ঘবের এক কোণে বসেছিলেম, তা বোধ হয ওঁবা জানতেন না।

শাশুডি বললেন, "তা যদি হতো দিদি, তা হলে মানুষেব পেটে ভগবান সন্তান দিতেন না, গাছপালাতেই ফলাতেন। তুমিও যেমন পাগল।" বাকি কথা শোনা গেল না। যেটুকু গেল তাব অর্থও যে ভাল কবে বুঝলুম না, তা নয়। তবু তাঁব বিবক্ত বিবস কণ্ঠস্বব আমাব বালিকা চিত্তেও একটা আঘাতেব দোলা দিয়ে গেল। মনে হলো, আমি ওঁকে খুশি কবতে পাবিনি। কি উনি আমাব কাছে চেযেছিলেন? কি কল্লে ওঁকে আমি খুশি করতে পারি? আমায যদি বুঝিযে দেন, বলে দেন, প্রাণপণেই যে আমি তা করতে বাজি আছি।

বছব-খানেক পরে শ্বশুববাডি ঘব করতে এলেম। বাবা সঙ্গে অনেক জিনিসপত্র দিযেছিলেন। শাশুডি সবাইকে ডেকে দেখালেন। কুটুম্বেব সুখ্যাতি কল্লেন — আমাব সম্বন্ধে তাঁর একই ভাব। আমায় তিনি মা বলে ডাকতে দিলেন না। প্রথম প্রথম আমি তাঁব মানা না মেনে মা বলেই ডাকতেম। তিনি যেন শুনতে বা বুঝতে পাবেননি, এমনিভাবেই থাকতেন উত্তব দিতেন না। কিন্তু এভাবে বেশি দিন চলে না, একদিন স্পষ্ট কবেই তা বুঝিযে দিলেন। অত্যন্ত বিবক্ত হযে বললেন, "গুরুজনেব কথা মানো না, বাপেও ভাল শিক্ষা দেযনি। আমাব বাছা স্পষ্ট কথা, মিথ্যে আমি বলতেও পাবি না, সইতেও পারি না। মুখে যতই মা-মা কব, মনে-মনে তুমিও জানো আমিও জানি, সত্যি ত তা নয। সেজন্যে কেউ তোমায দুষবেও না। তখনকাব লোকে ঠাকুব-ঠাক্রুণ বলত — মিথ্যেব উপব ঘেন্না ছিল কি না। — এখন যত ফাঁকি তত ঢং। মা-মা আমায কবো না।" তর্ক কববাব মত জ্ঞান-বুদ্ধি আমাব ছিল না। সাহস বা শক্তিব অভাব আবও বেশি। অগত্যা চুপ কবে আদেশ পালন কবাই সহজ পথ। তা ছাড়া সত্য কথাই আমি বলব। এব পব মা ডাকেব লোভও আমাব কমে গিযেছিল। তৃষ্ণা শুধু শীতল জলেই মেটে এমন নয, অভাবেও মিটে থাকে।

শাশুডি লোক মন্দ ছিলেন না। পাড়া-প্রতিবাসী তাঁব সুখ্যাতি কবত। এমন পবোপকাবী মানুষ হয না। দাসী-চাকববাও খুশি ছিল তাঁর মিষ্ট কথা আব খাওযানোব যত্নে। ছেলেদেব প্রতি ভালবাসাব তাঁব অন্ত ছিল না। তাঁর স্নানের জল গবম থেকে জামা-ব্রশের পর্যন্ত তিনি তদাবক কবতেন, কেবল যত অপবাধ কি এই অধম আমাব! মিথ্যা বলব না, তিনি আমাব খাওযা-পবার কোন দুঃখ বাখতেন না। তাঁতিনী এলে "কবোনেশান" "ইয়ারোপ্লেন" প্রভৃতি নামজাদা পাডেব শাড়ি কিনে দিতেন। সেমিজ ব্লাউজ-ওলা এসেও এমনি ফিরে যেত না। কিন্তু মানুষ কি শুধু খাওযা-পবাবই কাঙাল। পাখিকে খাঁচায পুবে ক্রমাগত ছোলা মটব আব ভাল ভাল ফল খেতে দেওযা যায়, তাতে তার মনের অভাব কি মেটে? আমার কতদিনের কত যত্নে নিজের হাতে গড়া সাধের অট্টালিকা যে ভেঙে-চুবে গুঁড়ো হয়ে গেল, সে খবব ত কেউ নিলেন না। ছেলেবেলার আশা-ভবা প্রাণ নিয়ে মা বলে যাঁর কাছে এলেম, তিনি আমায মাতৃস্নেহে কাছে ত টেনে নিলেনই না বরং অপরাধিনী কবে পাশে ঠেলে সরিয়ে রেখে দিলেন। মা আমায় আদর করে একদিনও কাছে ডাকেননি। "বৌমা" বলেও ডাকতেন না। আমার উপর ভালবাসার এতটুকু বুদ্বুদও সে স্থিব জলে কখনো ভাসতে দেখিনি। যা

তিনি দিতেন না তা আমার কাছেও চাইতেন না; বরং সেধে দিতে গেলে বিরক্তই হতেন, রাগ করতেন। বাড়ির পাঁচজনের মত আমিও একজন থাকি। খাই পরি, ইচ্ছা হলে চুল বাঁধি, কাজ করি, ইচ্ছা না হয় করিও না। এ সবে নিষেধও নাই ; অনুবোধও নাই। ছিল কেবল এক জায়গায়। সে তাঁর ছেলের বিষয়ে। ছেলের খাবার কবা, ছেলেকে খেতে দেওয়া — এসব তিনি নিজের হাতে করতেন। কাকেও তাতে ভাগ নিতে দিতেন না। মা আমায় যে চোখেই দেখুন, আমি যে তাঁকে সেই প্রথম যেদিন সবুজ বেনাবসী শাড়িব আঁচলে গ্রন্থিবাঁধা তাঁর ছেলের সঙ্গে একসঙ্গে তাঁর পায়ের কাছে প্রণাম করে মনে মনে বলেছিলেম, "তুমি আমার মা, আমার চিরদিনের মা, আমার ক্ষুধিত তাপিত চিত্তেব বেদনাহবা অমৃত-ভরা সুখের উৎস মা, —" সে কথা ত আর ফিরিয়ে নিতে পারি না। তাঁর হাতে পাওযা অবিচারেব আঘাত খেয়ে-খেয়ে মন আমাব এখন আর তেমন ক'রে সাড়া দেয় না, তবু কর্তব্যের কাছে তিনি এখন যে আমার মা, আর চিরদিনই সেই মা-ই থাকবেন।

স্বামী আমায ভাল বাসতেন, আদর-যত্ন করতেন। তবু তিনিও ত মায়ের ছেলে, বাইরেব উচ্ছ্বাসটা তাঁর একেবারেই ছিল না। কতখানি গভীর জলে তবঙ্গ ওঠে, আব কোনখানে ওঠে না, এ-সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্বেব খবব ত বাখতেম না, তাই নিজেকে বড একা বড অসহায় ব'লে মনে হতো! মাকে তিনি ভাল বাসতেন ভগবানেব প্রতিভূ রূপে, তাই মার মনে পাছে ব্যথা লাগে সর্বদাই ছিল তাঁর এই ভয়। আমার সম্বন্ধেও তাই এত সঙ্কোচ সাবধানতা। বুঝতুম সব, আবার এও বুঝতুম না মা যে শুধু তাঁর একলারই মা — আমাব যে তিনি সব হয়েও কেউ নন।

এমনি করেই তিন-চাব বছব কেটে গেল। অসিত আমাব কোলে এলো। শাশুড়ি এবাব ডাকার দাযে অব্যাহতি পেলেন। "অসির মা" বলেই আমাব পবিচয হলো। আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেম! ত-বড় সংসাবে একান্ত অসহায় আমাব সহায হোল, সঙ্গী হোল, আনন্দ আশা সবই হোল — আমাব এতটুকু ছেলে অসিত। তোমবা শুনে হাসচ, ভাবচ, এ-সব কবিত্বের কথা! আসলে সত্যিই তাই, — তবু মানুষ যে মানুষ! শুধু সংসাবে সংগ্রাম করেই সে বেঁচে থাকতে পাবেনা, মাঝে মাঝে শান্তিরও তার দবকাব হয়। বাইরেব অভাব যাই থাক্, মনেব অভাব মন নিযেই মেটাতে সাধ যায় — হযত কাবও মেটে, কাবও মেটে না।

এমনি ক'রে বছবের পর বছর কেটে এখন আমার মনেব নদীতে ভাঁটা পড়ে এসেছে। আমি যে মাতৃহীন, এ অভাব আব আমার মনের কোণেও উঁকি মাবে না! মনে হয়, জন্মজন্মান্তব ধ'বে এমনি ক'বে ঝরা ফুলের মত প্রকৃতির কোলেই আমি পড়েছিলেম। সংসাবের লেন-দেন নিযেই আমাব কারবার। তিন ছেলেব পর দুই মেয়ে হওয়ায মা তাদের নাম বেখেছিলেন — সাধনা আর আরাধনা। নাতি-নাতনীরা ছিল তাঁর গলাব হাব। তারা এক মুহূর্ত চোখের আড় হোলে তিনি সংসার অন্ধকার দেখতেন। তাদের নাওযান তেল-মাখান চুল-আঁচড়ান সব তিনি নিজের হাতে ক'রে দিতেন। পাড়াব ছেলে-মেয়েদের দেখে নূতন ক'রে হেজলীন পাউডার ব্লুম রিবনের ব্যবহার শিখলেন। নৈলে তাঁব নাতি-নাতনীদের লোকে যদি তারিফ না করে। তারা যা-কিছু করে মার চোখে তাই ভাল, তাই অদ্ভুত। তাদের বাহাদুরি আর গুণপণার ইতিহাস শুনে-শুনে বাড়ির লোকের ত কান ঝালাপালা হযে উঠত। মার কিন্তু বলে আশ মিট্‌তনা — সন্ধ্যাব পর জপের মালা হাতে মাদুর পেতে মা তাঁর নাতি-নাতনীদের নিয়ে গল্প শোনাতে বসতেন। সে এক রূপকথার রাজ্য। কোথায় কোন্ সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্র— নদীর ভিতর সাতমহলা বাড়ির ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা, সাত ভাই চম্পার আদরিণী বোন পারুলবালা, আরও যে কত দেশ-বিদেশের বিচিত্র কাহিনী — মা শুনিযে যেতেন, সে সব শুনতে শুনতে এই এত বয়সেও পাশের ঘরে অন্ধকার

বিছানার মধ্যে ছোট খুকিকে বুকে চেপে ধরে আমার ব্যাকুল মন কে জানে কি অতৃপ্ত বেদনাব ভারে লুটিয়ে পড়তে থাকত! মনে হোত সুধা সমুদ্রেব তীরে দাঁড়িয়ে জন্মভ'বে কেবল তৃষ্ণা সয়েই কাটিয়ে দিলেম!

একদিন পাড়ার এক বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফিরে এসে মাকে বললেম, "অসিব বিয়ে খুব ছোট বেলায় দিতে হবে। ওদের মত অম্নি একটি টুক্‌টুকে ছোট্ট বৌ আমায এনে দিয়ো কিন্তু।" মা বললেন, 'দুর্গা! না বাছা, আমি বেঁচে থাকতে তোমবা অসির বিয়ে দিযো না। যে দুঃখ আমি পেলুম তা আমি তোমায় দেব না।" শুনলে একবার কথাব শ্রী! মুখে একটা তীব্র উত্তব এসে ছিল, কষ্টে জিহ্বাকে সংযত কবে নিলেম, তবু ব্যথাব উপব অস্ত্রচ্ছেদের মত — বেদনার মধ্যে আনন্দের আভাসও বুঝি একটুখানি পেয়েছিলেম। যে দুঃখ উনি পেলেন আমায তা দিতে চান না! তবু এতটুকু অন্তরের টান আমাব উপব ওঁব আছে! এক এক সময মনে হয — আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে, এখন ছুটি পেলেই হয় — উনি খুশি হন। ঠিক বুঝতে পাবি না। একদিনের কথা বলি। পুবোনো ঠাকুব বাড়ি গেছে, — মা ঠাকুব-ঘবে, স্বামী খেতে বসেছেন। আমি সামনেব দালানে বসে পান সাজছি। অসিত স্কুলে যাবে, ভাতেব জন্যে ঠাকুরকে তাড়া দিচ্ছে। স্বামী খেতে খেতে নুন চাইলেন। ঠাকুব খোকাব ভাত বাড়্ছিল, আমায় বললে "বহুমা, বাবুকো জাবা নুন দেনত।" এ নূতন লোক, এ-বাড়িব অলি-গলিব সব সন্ধান ত জানত না! উঁকি দিযে চেযে দেখলেম, নুনেব জন্যে উনি হাত গুটিয়ে বসে বযেছেন, — দেবে অখন ভেবে নিশ্চিন্ত হ'তে পাললেম না, পান ফেলে উঠে এসে একটু নুন এনে পাতে দিলেম। লিখতে যতখানি সময গেল, কাজে হযত এতটা সময যাযনি। আমবা যে সেবিকাব জাত। সেবা কবাই যে আমাদেব পবম ধর্ম বলে চিবদিন শিখে এসেছি। ওঁব খাওযা হচ্ছে না, সেইটেই আগে মনে হোল, পাতে নুন দিযে সবে এলেম। স্বামী মুখ নিচু ক'বে খাচ্ছিলেন। মুখ তুলে আমাব দিকে চেযে দেখলেন। তাঁব ঠোঁটেব কোণে একটু খানি হাসিব আমেজ ফুটেছে কি না ফুটেচে হঠাৎ শাশুড়িব কণ্ঠস্বব কানে এলো, "এই যে খাবাব কাছে সবাই আছে। আমাব যেমন পাপেব মন, নুন চাইলি শুনে তাড়াতাড়ি জপ ছেড়ে উঠে এলেম।" স্বামী বললেন, " কেন তুমি উঠে এলে মা—ওবা ত সব বযেছে, যে হয দিত।" মা বললেন, "আব আসব না বাছা, এবাব থেকে ওবাই খাওয়াবে। বুঝতে পাবিনি, অন্যায় কবেচি।" শাশুড়ি সেখানে আব একটুও দাঁড়ালেন না, অপেক্ষাকৃত জোবে জোবে পা ফেলে আবাব পূজাব ঘবে ফিবে গেলেন। তিনি তাঁব অসমাপ্ত জপেব সূত্র ফেব খুঁজে পেযেছিলেন কি না জানি না, কিন্তু তাঁব ছেলেব পাতেব নুন যে নিজেব স্বাদ হাবিযে তিত হযে গেছল, সে আমি তাঁব মুখ দেখেই বুঝতে পেবেছিলেম। তাবপব থেকে শাশুড়ি আব একদিনও তাঁকে হাতে তুলে কিছু খেতে দেননি! প্রথম কিছুদিন খাবাব সময কাছেও আসতেন না, ছেলেব অনুনয-বিনয কান্নাকাটি রাগাবাগিতে শেষে মা এসে বসতেন, কিন্তু নিজেব হাতে পাতে কিছু তুলে দিতেন না। স্বামীব শিক্ষামত আমি সে সময সেদিকেই থাকতেম না। ঠাকুবকে সব জিনিস ছুঁতে দেওযা হোত না, তবু হাজাব অসুবিধা সত্ত্বেও শাশুড়ি তাঁব জেদ বজায় বেখেছিলেন। তিনি জপের মালা হাতে নিয়ে এসে বসতেন; কাজেই নিজে কিছু পারতেন না, নন্দ আমার মেজ ছেলে, একদিন পাতে দই দিতে গিযে সবটুকু দই মেঝেতে উল্টে ফেলে দিলে। স্বামী রাগ ক'রে বললেন, "দই আমি আর খাব না। আমাব জন্য দই আব পেতোনা মা — দই আমি আর খাব না।" মা শান্ত মুখে জবাব দিলেন — "না খাস্‌ ত পাতব কেন!" এই দই খাওয়াটি যে মা ও ছেলের চিবদিনের অভ্যাস। ছেলের যদিই চলে মার যে চলে না, তা স্বামীও জানতেন। অর্ধেকগুলি ভাত তিনি এই দই দিযেই খেযে থাকেন। স্বামী দই ছেড়ে দেওয়ায় শাশুড়িও আব দই স্পর্শ কবতেন না। আমাব মুখে মাব খাওযা

হচ্ছে না খবর পেয়ে উনি সেধেই বললেন, "দই দেওয়া ছেড়ে দিলে মা — জানো, শেষ-পাতে দই না হলে আমার খাওয়াই হয় না।" মা যে তা ভালই জানতেন, সে তাঁর ক'দিনের ব্যথাকাতর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। সেদিনের রাগ তাঁর অনেক আগেই পড়ে গেছল। ছেলের খাবার কষ্ট তিনি সইতে পারছিলেন না, এখন কেবল জেদেব মামলা চলছিল। ছেলের উপর ভালবাসার ত তাঁর অভাব ছিল না! কেবল সে ভালবাসার উপর শনিগ্রহ-রূপিণী এই আমার আবির্ভাবই তাঁর স্নেহ-রাজ্যে বিপ্লব বাধিয়ে ছিল বই ত নয়।

সেদিন মেয়ে আবদার ধল্লে — সন্ধ্যেবেলা গা ধোবে। অনেক করে "মা আমার, — মামণি আমার, লক্ষ্মী আমার" বলে ভুলিয়ে আমসত্ত্বর লোভ দেখিয়ে তবে ছাড়ান পেলেম। মেয়ে চলে গেলে মা দালান থেকে বললেন, "দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে! — সোনা যে পেলে না, তার গিল্টি পরা কেন? মা ত দেখনি, অসির মা, তাই যাকে-তাকে মা ডাকতে তোমার লজ্জা করে না!" মনে হোল বলি, ভগবান দেননি, মানুষেও দিলেনা — কাজেই ঘোলে স্বাদ মেটাচ্চি, তবু চিত্রগুপ্তের দরবারে গিয়ে বলব যে গব্যরসেব স্বাদ পেয়েচি কখনো — থাক্ — কাজ কি আর তর্ক ক'রে।

এইবাব আমার সকল অপরাধের চরম শাস্তি হয়ে গেছে। মা আজ কাশীবাসিনী — এটা তাঁর ধর্মোন্নতির জন্যে, তাঁর স্বেচ্ছার ফল নয়। এ আমাব অপরাধেব দণ্ড। কি আমি করেছিলেম — সেই কথাই বলব।

সেদিন, যেদিনকার ঘটনা আমার জীবন-ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, সেদিন সকালবেলা মেজ পিশ্ শাশুড়িব ছেলে অপূর্ব আমাদের নিমন্ত্রণ কবতে এলো। —লবঙ্গর "সাধ", এখনি যেতে হবে। সে আমাদের নিয়ে যাবে। ছেলেরা ত সব নাচতে শুরু ক'রে দিলে। শিবপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখাতে হবে। স্বামী বললেন, "বেশ ত, কাল থেকে সেখানে বাগান দেখে সন্ধ্যার সময সব ফিবলেই হবে।" মা তাঁব নাতি নাতনীদেব সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি হলেন। আমাকেও যাবাব কথা বলেছিলেন। কিন্তু ছোট খুকির বাত থেকে জ্বর হয়েছে বলে আমি যেতে চাইলেম না। মাও বললেন, "থাক্ — কর্মবাড়িতে অনিযম হবে, কাজ নেই। বরং বিপিন বাবুকে ডেকে একবাব ভাল ক'রে দেখাও, সর্দিও রয়েছে, ভাল নয়।" মা চলে গেলেন। আমার মনটা ভাব হয়ে রইল। গেলাম না খুকির অসুখেব দোহাই দিয়ে — মাও তাই বুঝে গেলেন, — কিন্তু ওগো আমার অন্তরবাসী অন্তর্যামী, তুমি ত জান আমার মনের কথা — যে পাপের সলুই আমার মনের ভিতর জন্মেছিল, সে যে সাপ হয়েই শেষে আমায দংশাবে — তা কি আমি জানতে পেবেছিলেম। মাতৃ-গর্বকে আমি মিথ্যা দিয়ে বাড়াব না। খুকির জন্য সত্যই আমার মনে ভাবনা হয়নি — হয়েছিল দুর্জয় অভিমান। নইলে বাঙালি গৃহের অন্তঃপুরবদ্ধা কুলনাবী আমি, উৎসব-গৃহেব স্বজন-মিলন আনন্দ উৎসবের লোভ কি আমার মনেও জাগেনি? জেগেছিল বই কি! তবু যে গেলেম না — সে কেবল জব্দ কবতে। তাঁর আদুরে নাতি-নাতনীদের জন্যেও আমার অভাব লাগে কি না, মা দেখুন। তাছাড়া সেখানে সবাই জিজ্ঞাসা কববে, কিগো শাশুড়ি এখন বৌ বলে ডাকে? মা বলতে দেয় ত? কাজ নেই আমাব এত কৈফিয়ৎ কাটাব। স্বামী ভাত খেতে বসে বললেন, "আজ কোবিন্থিয়ানে "মধুর মুবলী" প্লে হচ্ছে, — যাবে? সকালবেলা পানু এসে একখানা রিজার্ভবক্সের টিকিট দিয়ে গেল। ছেলেদের হাঙ্গামা নেই — চল না — ঘুরে আসা যাক্।" মনে মনে লোভ খুবই হচ্ছিল। তবু বললেম, "খুকির অসুখ, তাছাডা মা যদি শোনেন?" স্বামী হেসে বললেন, "নাই বা বললে মাকে। বিপিনবাবু ত বলে গেলেন, খুকির এমন কিছু নয়। যশোদা রাখবে এখন ওকে, কতক্ষণেরই বা মামলা!" কথা ঠিক। কতক্ষণই বা। ও ত যশোদারই কাছে বেশি সময় থাকে। নেহাৎ কাঁদে, ফুড খাইয়ে দেবে'খন। তবু মন বলছিল

কাজ নেই, মা যদি জানতে পারেন — মেয়েছেলে থিয়েটার দেখতে যাওয়া। লোভ বলছিল, এ আর এমনই কি অপরাধ। চিরদিনই কি ভয়ে চোর হয়ে থাকতে হবে। তুই ত এখন পাঁচ ছেলের মা — কোণের বৌটিও নোস্। লোভ আর সংযম—শক্তি যে কার বেশি সে খবর অনেকেই জানেন, আমিও জানতেম, তবু স্রোতে ভেসে যাবার মত মনের কাছে না জানাবই ভান করেছিলেম। কিন্তু হে আমার পাষাণ ঠাকুর, তুমি যে তা ভাল ক'রে জেনেছিলে, তাই না এ দারুণ পরীক্ষায় ফেললে। নাহ'লে এ মুগ্ধা কুরঙ্গিনীকে স্বামীর কণ্ঠ দিয়ে এমন আশ্বাসের মোহনবাঁশী শোনাবে কেন? তোমার যে মোহনবাঁশীর মধুর সুরে অবলা ব্রজের বালা লজ্জা-ভয় কুল-মান সব ভুলে সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে অকূলে ভেসেছিল — সে বাঁশীর সুরে না ভুলবে কে! স্বামী বললেন, "চল।" তাঁর উপর সব ভাবনার ভার সঁপে দিয়ে আমিও উঠলাম। কিন্তু এ ডাক যে অকূলের ডাক সে খবর কি তখন জানতেম।

থিয়েটারে অভিনব উপাখ্যানের সৌন্দর্য-মাধুর্য উপভোগ দূরে থাক্, ঘরের কথাই ভাবছিলেম বেশি। খুকিটা কেমন আছে? কি করছে? কাঁদবে কি না, কে জানে? মন তাই থেকে থেকে চমকে উঠছিল। "মধুর মুরলীর" নায়িকা সেজেছিল বিখ্যাত অভিনেত্রী মিস গওহর। তার হাব-ভাব লীলাচাতুর্য অভিনব দৃশ্যাবলী লোকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। — আমার কিন্তু বেশি ভাল লাগছিল, ঐ সঙ্গে জড়ানো অন্য উপাখ্যানের নায়ক এক মাতৃভক্তকে। গল্পটির সব কথা বলবার এ সময় নয় — ভাল মনেও নেই তবু সব-কিছুর মধ্যেও তার ভীষণ পরীক্ষা আমার মনের উপর আজও ছাপ মেরে রেখেছে। বিধি কষ্ট হওয়ায় যখন তার দুর্গতির চরম অবস্থা, এমনি সময় মার কুঁড়ে ঘরে গেল আগুন ধরে, — একমাত্র ছেলেটি গেল জলে ডুবে, সে কি তাঁর ভীষণ পরীক্ষা। কাকে রাখবে — কাকে ছাড়বে। মাতৃ-ভক্তিরই জয় হোল — জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আশি বছরের বুড়িকে সে কোনরকমে বার ক'রে আনলে। আর তার তরুণ-কান্তি বারো বছরের ছেলে অতল জলে তলিয়ে গেল। কিন্তু না, তা গেল না — যাঁর পরীক্ষা, তিনিই যে বিচারক। তাই ছেলেকোলে ভিজে জলের ভিতর থেকে সেই শ্যামকান্তি নবজলধর ভুবনমোহন মূর্তি তাঁর ভক্তকে নিয়ে উঠলেন। আনন্দে দুচোখ দিয়ে হু-হু ক'রে জল ঝরছিল। স্বামীকে বললেম, "থাক্, আর দেখব না, বাড়ি চল।" স্বামী বললেন — "জগন্নাথ-দর্শনের বদলে পুঁইশাক দেখা। বৃথা তোমায় টেনে আনলেম, চল।"

কড়া নাড়তেই ঠাকুর এসে দরজা খুলে দিলে। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘুমন্ত মেয়ের গায়ে হাত দিলেম। গা যে পুড়ে যাচ্ছে! ওরে বাপরে, কত জ্বর। তার উপর যশোদা যা খবর দিলে, শুনে ত আমি বসে পড়লেম। যশোদা বললে — আমরা চলে যাবার খানিক পরেই মা ফিরে এসে ছিলেন, খুকির জ্বর দেখে গেছলেন, তাই থাকতে পারেননি। আমরা থিয়েটারে গেছি শুনে ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আধ ঘণ্টা পরেই চলে গেছেন। অপূর্বই তাঁকে নিয়ে গেছে। মেলগাড়ি না কি — তাইতে না কি কাশী গেছেন। ঠাকুর — সে কথার সাক্ষী হোল। মা তবে আমাদের ছেড়ে গেছেন। এত-বড় অন্যায় কেমন ক'রেই বা সইবেন। কাশীতে মার পিসিমা ছিলেন — নিশ্চয় মা সেইখানেই গেছেন। খুকি একটু সামলালে আমরা সবাই তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেছলেম। মা এলেন না, — বলেছেন, সাধনার বিয়ের সময় আসবেন। স্বামী আসবার সময় চোখে জলে ভেসে বললেন — "একটা অপরাধ ক্ষমা করতে পারলে না, মা?" মা বললেন, "একটা নয় আশু, তোর একশোটা অন্যায় আমি ক্ষমা করছি, করবও, কিন্তু তোদের সংসারের ভেতর আমায় আর টানিস নে — আমি আর পাচ্ছিলুম না। বিশ্বনাথ আমায় জুড়ুতে দিন একটু।"

মা তাঁর ছেলেকে ক্ষমা করতে পেরেছেন — তিনি যে ওঁর ছেলে। কিন্তু আমায়। লোকে আমায় হয়ত নিন্দা করে। শাশুড়ি আমার জন্যে তাঁর সাজানো সংসার, সাথে সন্তান সব ছেড়ে আজ কাশীবাসিনী। ছেলেরা রাগ করে, আমার জন্যেই তাদের ঠাকুমা চলে গিয়েছেন। স্বামী মুখে স্পষ্ট না বলুন কিন্তু মনটা তাঁর ভার হয়েই থাকে — কেন আমি এত কালেও তাঁর মন নিতে পারলেম না — তাঁর মা ত যেমন-তেমন মা নন। সব সত্যি। কিন্তু ওগো, তোমরা সবাই আমায় ব'লে দিতে পার, আমি রাগ করব কার উপর? আমার মার সঙ্গে দেখা হবার শুভদৃষ্টির শুভ মুহূর্তটিকে — ! না, চির-মাতৃহীন ক'রে যিনি আমায় এ সংসারে পাঠিয়েছিলেন, তাঁর উপর?

রসময়ীর রসিকতা

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পবিচ্ছেদ

ক্ষেত্রমোহন বাবুব অষ্টাদশবর্ষব্যাপী দাম্পত্যজীবন স্ত্রীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি করিতে কবিতেই কাটিয়াছে। এমন রণরঙ্গিণী স্ত্রী বঙ্গদেশে প্রায়ই দেখা যায় না।

ক্ষেত্রমোহনেব বযস এখন চল্লিশ বৎসব। স্ত্রী বসমযীব বয়স ত্রিশ। 'রসমযী'!— এ নাম যে রাখিযাছিল, বলিহারি তাহার প্রতিভা! তবে বসও ত অনেকগুলি আছে কি না— এ ক্ষেত্রে রৌদ্ররস!

ক্ষেত্রমোহন একজন বাঙ্গলানবীস মোক্তার, হুগলীতে থাকিযা বেশ দুই পযসা উপার্জ্জন কবেন। বাড়ী তাঁহাব হুগলীতে নহে— জেলার মধ্যে কোন এক পল্লীগ্রামে। তবে কয়েক বৎসব হুগলীতে নিজ বাটি নির্ম্মাণ কবিযা বাস করিতেছেন।

দুঃখেব বিষয এ পর্য্যন্ত ক্ষেত্রমোহনেব সন্তানাদি কিছুই হয নাই—স্ত্রীব যেরূপ বয়স, আব হইবার ভবসাও নাই। অনেকদিন তাঁহাব মাসী পিসী প্রভৃতি পুনর্ব্বাব বিবাহ কবিবাব জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনেব আন্তবিক বাসনাও তাহাই। কিন্তু রসময়ীব ভয়ে এ পর্যন্ত এ বিষযে কোনরূপ চেষ্টাচবিত্র কবিতে সাহস কবেন নাই।

ইতিমধ্যে সামান্য একটা ঘটনা উপলক্ষ্যে বসমযী ভযানক বিপ্লবের সৃষ্টি কবিযা ক্ষেত্রমোহনকে দুই দিন গৃহছাড়া কবিল। অবশেষে নিজে তাহার পিত্রালয় হালিসহবে চলিযা গেল। ক্ষেত্রমোহন তখন সাহসে ভব কবিযা গৃহে ফিরিযা আসিলেন এবং প্রতিজ্ঞা কবিলেন, বসময়ীব আব মুখদর্শন কবিবেন না—অন্যত্র বিবাহ কবিবেন। এ বাড়ীতে বসমযীকে আর ঢুকিতে দিবেন না—এই শেষ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হালিসহর গ্রামটি হুগলীরই অপব পাবে—মধ্যে গঙ্গা প্রবাহিতা। চৌধুরী পাড়ায় রসময়ীব পিত্রালয়। অনেক দিন হইল তাহার পিতামাতার কাল হইয়াছে। এখন সে বাড়ীতে রসময়ীব বিধবা দিদি বিনোদিনী এবং তাহার দুইটি ছোট ভাই নবীন ও সুবোধ বাস করে। নবীন কাঁচড়াপাড়ার কাবখানায় কর্ম্ম করে, সুবোধ স্কুল ছাড়িয়া এখন বাড়ীতেই বসিয়া আছে— এখনও কিছু জুটে নাই।

মাসাধিক কাল রসময়ী হালিসহরে বাস করিতেছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এরূপ স্থলে দুই চারিদিন বা বড় জোর এক সপ্তাহ পরে, দন্তে তৃণ করিয়া ক্ষেত্রমোহন আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং কত সাধ্যসাধনা করিয়া স্ত্রীকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাইতেন। কিন্তু এবার সে নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিয়া রসময়ী কিছু চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে।

পাড়ার একজন বালক প্রত্যহ নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইয়া হুগলী ব্র্যাঞ্চ স্কুলে পড়িতে যাইত। সে ছেলেটি গ্রামে প্রচার করিয়া দিল—ক্ষেত্রমোহনবাবুর বিবাহ, দিনস্থির হইয়া গিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রসময়ীর দিদি বিনোদিনী একদিন বৈকালে ছেলেটিকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিলেন। তাহাকে সন্দেশ ও রসগোল্লা খাইতে দিয়া বলিলেন—"বাবা, শুনলাম নাকি আমাদের ক্ষেত্তর আবার বিয়ে করছে? এ কথা কি সত্যি?"

বালক বলিল—"হ্যাঁ সত্যি বৈকি। আমাদের ক্লাশে সুরেশ বলে একটি ছেলে পড়ে, চুর্চড়োয় তাব মামার বাড়ী। তারই মামাতো বোনের সঙ্গে বিয়ে।"

"ঠিক জান?"

"জানি বৈকি। সুরেশই ত আমাকে বলেছে! দিনস্থির পর্য্যন্ত হয়ে গেছে।"

"তার মামাব নাম কি?"

"নাম হরিশ্চন্দ্র চাটুয্যে। জজ আদালতে কাজ করেন।"

"তাদের বাড়ীটি তুমি চেন বাবা?"

"হাঁ চিনি বৈকি। সুরেশেব সঙ্গে কতবাব গিযেছি!"

"কত বড় মেযে?"

"এই আমাদের বয়সীই হবে।"—বালকটির বয়স ত্রয়োদশ বৎসব।

"কেমন দেখতে?"

"তা—বেশ সুন্দব।"

বিনোদিনী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা কবিলেন। শেষে বলিলেন — "আচ্ছা, কাল একবাব আমাদেব দু'বোনকে সে বাড়ীতে নিয়ে যেতে পাবো বাবা?"

"কেন?"

"তাদেব একবার মিনতি কবে বলে দেখি। বিয়ে হলে আমার বোনটিবও সুখ হবে না—তার মেয়েও জলে পড়বে। কাল একবার আমাদের নিয়ে চল।"

"কখন?"

"এই—খাওয়া দাওয়ার পরে?"

"আমার ইস্কুল কামাই হবে যে?"

"একদিনের জন্যে মাষ্টারের কাছে ছুটি নিও এখন? আমি বরং তোমায় একটি টাকা দেব—ঘুড়ি, নাটাই এ সব কিনো।"

বালকটি ব্যগ্রভাবে নিজ সম্মতি জানাইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন বেলা এগারোটার সময় দুই ভগিনীকে লইয়া বালকটি চুঁচূড়া যাত্রা করিল। গঙ্গাপার হইয়া, ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া, মাধবীতলায় হরিশবাবুর গৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। খিড়কি দরজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

রসময়ী বলিল—"এই বাড়ী?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, তুমি গাড়ীর ভিতর বসে থাক। আমরা চট করে ওঁদের সঙ্গে দেখাটা করে আসি।"—বলিয়া দুইজনেই অবতরণ করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

সে বাড়ীর মেয়েরা কেহ তখন স্নান করিতেছে, কেহ খাইতে বসিয়াছে, কেহ বা আহারান্তে উঠানে বসিয়া চুল শুকাইতেছে। হঠাৎ দুইজন ভদ্রঘরের অপরিচিতা স্ত্রীলোককে প্রবেশ করিতে দেখিয়া একজন সবিস্ময়ে বলিল—"তোমরা কারা গা?"

বিনোদিনী বলিল—"আমরা হালিসহর থেকে তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।"

স্ত্রীলোকটি সন্দিগ্ধভাবে বলিল—"এস—বস।"

দুইজনে বারান্দায় উঠিয়া উপবেশন করিয়া বলিল—"বাড়ীর গিন্নী কোন্‌টি?"

একজন প্রৌঢ়াকে দেখাইয়া সকলে বলিল—"ইনি গিন্নী।"

গৃহিণী বলিলেন—"তোমরা কি মনে করে এসেছ বাছা?"

বিনোদিনী বলিল—"তোমাদের মেয়ের নাকি বিয়ে?"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—আমার ছোট মেয়েটির বিয়ে।"

"কবে?"

"এই বিশে মাঘ দিনস্থির হয়েছে।"

"পাত্রটি কে?"

"ক্ষেত্রমোহন চক্রবর্ত্তী—হুগলীতে মোক্তারী করেন।"

"সতীনের উপর মেয়ে দিচ্ছ বাছা?"

গৃহিণীব বিস্ময প্রতি কথায় বাড়িয়া চলিয়াছিল। তিনি জিজ্ঞাসা কবিলেন—"তোমবা চেন নাকি?"

বিনোদিনী বলিল—"চিনিনে আবার —খুব চিনি। আমাদের গ্রামেই ত বিয়ে করেছে।"

গৃহিণী বলিলেন—"হ্যাঁ—সতীন আছে বটে—কিন্তু সে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করেছে।"

বসমযী এতক্ষণ চুপ করিযা বসিয়া শুনিতেছিল, তাহার মনের বাগ ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই কথা শুনিয়া হস্তপদ ঠক্ ঠক্ কবিয়া কাঁপিতে লাগিল —চক্ষু দুইটি লাল হইয়া উঠিল।

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল—"কেন পরিত্যাগ করেছে কিছু শুনেছ গা?"

"শুনেছি সে নাকি বড় দজ্জাল!"

শ্রবণমাত্র বসময়ী তড়াক্ কবিযা লাফাইয়া উঠিল। বারান্দার কোণে ছিল একগাছা ঝাঁটা। নিমেষ মধ্যে সেইটা দুই হস্তে ধবিয়া গৃহিণীব উপর সপাসপ্ মারিতে আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বলিতে লাগিল—"কেন? —কেন? —আব কি মরবাব জায়গা পেলে না?—জাযগা পেলে না—আমার সোয়ামি ছাড়া কি তোমার মেয়ের অন্য পাত্তর জুটলো না? জুটলো না?—"

এই অভাবনীয় ঘটনায় বাড়ীর লোকে ক্ষণকালের জন্য হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তাহাব পব মহা গণ্ডগোল আরম্ভ হইল। অল্পবয়স্কা বালিকারা কাঁদিয়া ছুটিযা কেহ খাটেব নীচে, কেহ সিন্দুকের আড়ালে লুকাইল। বাড়ীর ঝি বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, সে বাসন ফেলিয়া—"ওরে খুন কল্লে রে—খুন কল্লে রে—সেপাই—এ সেপাই—এ পাহারাওয়ালা"—বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

বাড়ীর অপর মেয়েরা আসিয়া রসময়ীকে ধরিয়া ফেলিল। রসময়ী তখন গৃহিণীকে ছাড়িয়া তাহাদের উপর কিল চড় ও নিষ্ঠীবন-বৃষ্টি করিতে লাগিল। কাহারও কাপড় ছিঁড়িয়া দিল, কাহারও চুল ছিঁড়িয়া দিল, কাহাকেও খামচাইয়া দিল, কাহাকেও কামড়াইয়া দিল। হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিতে লাগিল—"কনেটি গেল কোথা? তাকে একবার বের কর না। চোখ দুটো গেলে দিয়ে যাই। নাকটা কেটে দিয়ে যাই। দাঁতগুলো ভেঙ্গে দিয়ে যাই!"

বিনোদিনী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ক্রমে সদর দরজার লোক হৈ হৈ করিতে লাগিল। তখন সে বলিল—"রসময়ী—থাম্ থাম্ ক্ষ্যামা দে বোন—খুব হয়েছে। চল্ বাড়ী চল।"

ঝি ছুটিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া বলিল—"ওগো যেতে দিওনি—থানায় খবর দিয়ে এসেছি, দারোগা আসছে।"

পুলিশের নাম শুনিয়া রসময়ী বলিল—"চল দিদি, চল।"

"যাবে কোথা—দারোগা আসুক তবে যেও।"—বলিয়া দুই তিনটি স্ত্রীলোক রসময়ীকে ধরিতে অগ্রসর হইল।

রসময়ী এক লম্ফে উঠানের কোণ হইতে আঁশবটিখানা সংগ্রহ করিয়া মাথার উপর সবেগে ঘুরাইয়া বলিল—"খুন চেপেছে—আমার খুন চেপেছে—সবাইকে খুন করে ফাঁসি যাব!"

ইহা দেখিয়া সমস্ত স্ত্রীলোক 'মা গোঃ' বলিয়া ছুটিয়া ঘরে ঢুকিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। "পাহারাওয়ালা—এ পাহারাওয়ালা—আসামী পালায়"—বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ঝি পুনশ্চ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িল।

রসময়ী তখন দিদির সহিত খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বলিল—"পারঘাটে চল।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বলা বাহুল্য হরিশচন্দ্রবাবু ক্ষেত্রমোহনকে কন্যাদান করিলেন না। তাঁহার গৃহিণী বলিলেন—"সে খুনে মেয়েমানুষ, বিয়ে দিলে আমার মেয়েকে খুন করে ফেলবে। তুমি অন্যত্র চেষ্টা দেখ।"

পরদিন কাছারীতে গিয়া হরিশবাবুর মুখে ক্ষেত্রমোহন সকল কথাই শ্রবণ করিলেন। রাগে তাঁহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল।

কাছারী হইতে বাড়ী ফিরিয়া, হাত মুখ ধুইয়া, অন্তঃপুরে বসিয়া ক্ষেত্রবাবু তামাক খাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ ঝড়ের মত রসময়ী আসিয়া প্রবেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ব্বাক হইয়া ক্ষেত্রমোহনের পানে দৃষ্টিপাত করিল— সেই প্রকার দৃষ্টিপাত, যে দৃষ্টিপাতে পূর্ব্বে মুনিঋষিরা লোককে ভস্ম করিয়া ফেলিতেন।

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কি মনে করে?"

রসময়ী অসম্ভব সংযমের সহিত উত্তর করিল—"একটা শ্রাদ্ধের যোগাড় করতে।" তাহার ওষ্ঠযুগল ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল।

তামাক টানিতে টানিতে ক্ষেত্রমোহন বাবু বলিলেন—"শ্রাদ্ধটা কার?"

"হরিশ চাটুয্যের মেয়ের—আর মেয়ের মার।"

"তা হলে দুটো শ্রাদ্ধ বল। সঙ্গে সঙ্গে অমনি নিজেরটাও সেরে নিলে হয় না?"

"সেইটি হবে না এখন। বুড়ো বয়সে বিয়ে করছ নাকি শুনলাম?"

হুঁকা নামাইয়া, একটু উত্তেজিতভাবে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"করছিই ত। করব না কেন? তোমার ভয়ে না কি?"

রসময়ী চীৎকার করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—"কর না, করে একবার মজাটাই দেখ না!"

"কি করবে তুমি?"

"এই এমন কিছু না। আঁশবঁটিটি দিয়ে সে মেয়ের নাক কেটে দেব—আর বুকে একখানা দশমুণে পাথর চাপিয়ে দেব।"

"আর তোমার নাকটা যদি কেউ কেটে দেয়?"

"এস না! কাট না। তুমি কাট না হয়!" —বলিয়া রসময়ী নিজে কোমরে দুই হাত দিয়া, ঝুঁকিয়া, নিজের মুখ ক্ষেত্রমোহনের অতি নিকটে সরাইয়া দিল।

স্ত্রীর এতাদৃশ বিনয় দেখিয়া ক্ষেত্রমোহন আবার হুঁকা উঠাইয়া লইযা আপন মনে টানিতে লাগিলেন। ঝুঁকিয়া থাকিয়া যখন ক্লান্তি বোধ হইল, রসময়ী তখন নিজের মুখ সরাইয়া লইযা আবার সোজা হইয়া দাঁড়াইল। বলিল—"তা হলে আঁশবঁটিতে শান দিয়ে রাখিগে? সম্বন্ধ পাকা হলে খবরটা দিও—চুপি চুপি যেন শুভকম্মটা সেরে ফেল না!"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তুমি না মরলে আর বিয়ে করছিনে। মরবে কবে?"

এই কথা শুনিয়া রসময়ী বিদ্রূপের স্বরে হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল—"আমি মবব কবে জিজ্ঞাসা করছ? রসি বামনি এমনি মরছে না। তার এখনও অনেক দেরী—বিস্তব বিলম্ব। তোমাব বিয়ে করবার বয়স যাবে—বুড়ো থুড়থুড়ো হবে—ভুঁয়ে মুয়ে হয়ে যাবে — যখন আর কেউ মেয়ে তোমায় দিতে রাজি হবে না—তখন আমি মরব।"

দাম্পত্য রসালাপ এই পর্যন্ত অগ্রসর হইলে বাহিরে একখানি গাড়ী থামিবার শব্দ হইল। রসমযী বলিল—"তবে সেই কথাই বইল। এখন তবে আসি। দিদি ওপাড়ায় তাব যাযেব বাড়ী গিযেছিল—ভাবলাম তার সঙ্গে এসে তোমার সঙ্গে দুটো মনেব কথা কয়ে যাই।" বলিযা বসময়ী প্রস্থান করিল।

পঞ্চম পবিচ্ছেদ

উক্ত কথোপকথনের পব ছয মাস কাটিযা গিযাছে। বসময়ীর গর্ব্ব সফল হইল না। সে এখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত।

সংবাদ পাইযা ক্ষেত্রমোহন বাবু হালিসহরে গেলেন। চিকিৎসাদিব কিছুই ত্রুটি হইল না। কিন্তু রসময়ী বাঁচিল না।

গঙ্গাতীবে লইযা গিয়া ক্ষেত্রমোহন স্ত্রীব মুখাগ্নি কবিলেন। আশ্চর্য সংসাবেব মায়া— যে এত কষ্ট দিযাছে, তাহার জন্যও ক্ষেত্রমোহন ঝর্ ঝর্ কবিয়া অশ্রুপাত কবিতে লাগিলেন।

আরও মাস ছয কাটিল। ক্ষেত্রমোহনেব পার্শ্বচব বন্ধুবান্ধবগণ নানা স্থানে পাত্রী অন্বেষণে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে হুগলীর নিকটবর্তী একটি গ্রামে সুযোগ্য পাত্রীব সন্ধান পাওযা গেল। ক্ষেত্রমোহন স্বযং গিযা দেখিযা আসিলেন। মেযেটি ডাগর—দেখিতেও ভাল। বিশেষ. মেযেব পিতা একটি বড় জমিদারের নায়েব—ওদিককাব মামলা মোকর্দ্দমাগুলিও এই সূত্রে ক্ষেত্রমোহন বাবুব কবায়ত্ত হইবে! কন্যার পিতা বজনীকান্ত ঘোষাল ইংবাজী লেখাপড়া-জানা ব্যক্তি।

বিবাহেব কথাবার্ত্তা পাকা হইল। বরের খুড়া মহাশয গ্রাম হইতে আসিযাছেন—কল্য আশীর্ব্বাদ। প্রভাতে অফিসকক্ষে বসিয়া দুই চাবিজন মক্কেলের সঙ্গে মোক্তারবাবু কথাবার্তা কহিতেছিলেন—খুডা মহাশয একখানি "বঙ্গবাসী" হস্তে ঘবের কোণে বসিয়া তামুক সেবন কবিতেছিলেন। এমন সময় ডাকপিযন আসিল, ক্ষেত্রমোহন বাবুব হস্তে একখানি পত্র দিয়া গেল।

খামের উপব হস্তাক্ষরেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষেত্রমোহনের মাথা ঘুরিয়া গেল। দুই চারিবার চক্ষু বগডাইযা বারম্বাব খামখানির শিরোনামা পবীক্ষা করিতে লাগিলেন। কাছে আনিয়া, দুরে সরাইয়া নানা প্রকাব দেখিলেন।

অবশেষে কম্পিত হস্তে পত্রখানি খুলিলেন। পড়িয়া তাঁহাব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। মক্কেলকে বলিলেন—"আচ্ছা এখন তোমরা যাও—আজ সকাল সকালই কাছারী যাব—সেইখানেই বাকী কথাবার্ত্তা হবে এখন।"

মক্কেলগণ চলিয়া গেলে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"চিঠি এল ক্ষেত্তর?"

জড়িতস্বরে ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কোথাকার চিঠি?"

"তাই ত ভাবছি।"

ক্ষেত্রমোহনের মুখভাব এবং কণ্ঠস্বরের বিকৃতি লক্ষ্য করিযা খুড়া মহাশয় উঠিযা নিকটে আসিলেন। তখন ক্ষেত্রমোহন পত্রখানি দ্বিতীয়বার পাঠ করিতেছেন। তাঁহাব নিশ্বাস বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে।

খুড়া মহাশয় দ্রুতভাবে বলিলেন—"কি? ব্যাপার কি? কোন দুঃসংবাদ নয় ত?"

ক্ষেত্রমোহন বাবু নীরবে পত্রখানি খুড়া মহাশয়ের হাতে দিলেন। তিনি পত্র লইযা চশমার অনুসন্ধান করিয়া চক্ষে পরিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া খুডা মহাশয পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। সাধারণ পাতলা চিঠিব কাগজে, বেগুনী রঙেব ম্যাজেণ্টা কালি দিয়া লেখা—উপরে স্থানের নাম নাই, তারিখ নাই—নিম্নপ্রকার লিখিত ঃ—

শ্রী শ্রী দুর্গা
সহায়

প্রণামপূর্ব্বক নিবেদনঞ্চ বিসেস—

তোমার মোত্তিশ্চন্য ধবি আছে। মোনে কবিয়াছ রসমই মরিআছে আপোদ গিআছে। এইবার বিবাহ করি। আমি মরিআছি বটে কিন্তু তাই বলিযা তুমি নিশ্চিতি পাইআছ তাহা মোনে করিও না। বাড়িব সনমুখে যে বটগাচ আছে তাতেই আমি আজ কাল বাস কবিতেছি। তুমি কিস্কর কোতায় যাও সমস্থই আমি সেখানে বসিয়া দেখিতেছি। বাত্তিবে গাচ হইতে নামিয়া মাজে মাজে তোমার শযন ঘরে যাই। তোমার খাটেব চাবিদিকে ঘুবিযা বেড়াই। এক একবার ইচ্ছা করে গলাটা টিপিয়া দিয়া তোমাকে আমার সঙ্গি করি। আমাব একানে বডডো একলা বোধ হয়। আমার চেহারা একন অতিশয় খারাপ হইয়া গিআছে। আমাব গাএর মাংসো চামড়া আর কিছুই নাই। খালি হাড আছে তাও সাদা নয। গংগাস্তিবে আমাকে জে পোড়াইআছিলে তাইতে হাড়গুনো কালো কালো হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক নিজেব রূপ বন্ননা নিজের মুখে শোভা পায় না। বিবাহ করিও না করিলে তোমার নলাটে অসেস দুগগতি নেকা আছে।

রসমই।

পত্র পড়িয়া খুড়া মহাশয়েরও মুখ কালিমাময় হইয়া গেল। ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা কবিলেন—"এ হাতের লেখা কার চিনতে পারছ?"

"খুব চিনি। তারই হাতের লেখা।"

"অন্য কেউ জাল করে নি ত?"

ভগবান জানেন।"

খুড়া মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ ছাদের কড়িকাঠের পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন—"জয়রাম—সীতারাম—রাম-রাঘব—রাবণারি—রাম—রাম—রাম।"

খুড়া মহাশয়কে এতদবস্থায় দেখিয়া, ক্ষেত্রমোহনের আরও ভয় হইল। বলিলেন —"আচ্ছা খুড়ো মশায়—ভূতে কখন চিঠি লেখে?"

খুড়া মহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"ভূত বলতে নেই—ভূত বলতে নেই—উপদেবতা বল। জয় রাঘব রামচন্দ্র।"

দুইজনেই নির্ব্বাক। অবশেষে খুড়া মহাশয় বলিলেন—"দেখ—কারুর বদমাইসি নয় ত? এমনটাই কি হতে পারে? অনেক রকম ভৌতিক উপদ্রবের কথা শুনেছি বটে—কিন্তু—এ রকমটা—কখনও ত শোনা যায় নি। আচ্ছা—বউমার হাতের লেখা আগেকাব চিঠিপত্র কিছু আছে কি? লেখাটা মিলিয়ে দেখলে হয়?"

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"পুরাণো চিঠি আছে বৈ কি।"—বলিয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাবি পাঁচখানা বাহির করিয়া আনিলেন।

খুড়া মহাশয় চশমাব কাচ দুইখানি কোঁচাব কাপড়ে ভাল করিয়া মার্জনা করিয়া লইলেন। পরে পত্রগুলি লইয়া অত্যন্ত সাবধানে হস্তাক্ষর মিলাইতে লাগিলেন। অবশেষে সেগুলি টেবিলের উপব ফেলিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পবিত্যাগ করিয়া বলিলেন— "একই হাতেব লেখা ত দেখছি।" খামখানা উলটিয়া পালটিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক পয়সার ছয়খানওযালা শাদা খাম। তাহাতে একখানি দুই পযসার টিকিট আঁটা আছে। ক্ষেত্রমোহনের হাতে খামখানি দিয়া বলিলেন—"কোথাকার ছাপ দেখ ত?"

ক্ষেত্রবাবু বাঙ্গলানবীশ মোক্তাব হইলেও ইংরাজি ছাপার অক্ষর পডিতে পাবিতেন। ছাপ পরীক্ষা করিযা বলিলেন—" হুগলীর ছাপ। কালকের তারিখ।"

খুড়া মহাশয় চুপ করিযা বসিয়া রহিলেন। মাঝে মাঝে কেবল অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন—"জয রাম—শ্রীবাম—সীতারাম।"

কাছাবীর বেলা হয় দেখিযা মোক্তারবাবু স্নান কবিয়া আহাবে বসিলেন—কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। রান্নাঘরের বারান্দায় যেখানে বসিয়া তিনি আহার করিতেছিলেন, সেখান হইতে বটগাছটাব অগ্রভাগ দেখা যায়। খান, আর মাঝে মাঝে সেই গাছটার পানে চাহেন। এক সমযএকটা গাছের ডাল খড় খড় করিযা নড়িয়া উঠিল। কাহার যেন হাসিব শব্দ শোনা গেল। ক্ষেত্রমোহন বাবুর আব খাওয়া হইল না। উঠিয়া পড়িলেন। মুখ প্রক্ষালন কবিয়া বাহিবে আসিয়া বটগাছটার পানে চাহিয়া বহিলেন। দুই তিনটা কাঠবিড়ালী ডালে ডালে পরস্পরকে তাড়া করিযা ফিরিতেছে। গোটাকতক কাক উচ্চশাখায় বসিয়া জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে। ইহা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেই দিন সন্ধ্যাবেলা ক্ষেত্রমোহনের শয়নকক্ষে খুড়া-ভাইপো বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। দিবসে খুড়ামহাশয় কপাটের বাহিরে এবং ভিতরে দেওযালময় রামনাম লিখিয়া দিয়াছেন। অদ্য দুইজনেই এক শয্যায় শয়ন করিলেন। বালিসের তলায় একখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণ বক্ষিত হইবে এবং ঘরে সমস্ত রাত্রি আলো জ্বলিবে বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—"তা হলে খুড়ো কি করা যায়? বিবাহটা বন্ধ করে দেওয়া যাবে?"

খুড়া মহাশয় বলিলেন—"আমি ত তার দরকার দেখছিনে!'

"যদি কোনও উপদ্রব অত্যাচার হয়?"

খুড়া মহাশয় কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন—"ভয়ের কোনও কারণ দেখিনে।"

"ঐ যে বলেছে 'ইচ্ছা করে তোমার গলাটা টিপে দিই'?"

"নাঃ—তা পারবে না। হাজার হোক স্বামী ত বটে!"

"আর যে বলেছে 'বিয়ে কোরো না, করলে তোমার অশেষ দুর্গতি হবে'?"

"অশেষ দুর্গতি হবে, তার মানে এ নাও হতে পারে যে আমি তোমার অশেষ দুর্গতি করব। ওর মনে বোধ হয় এই যে, অধিক বয়সে বিবাহ করলে যে সমস্ত সাংসারিক অশান্তি উপস্থিত হয়, তাই তোমারও অদৃষ্টে ঘটবে।"

ক্ষেত্রমোহনবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। মনে ভয়ও যথেষ্ট আছে—অথচ বিবাহ করিবার লোভটিও সম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য।

পরদিন আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল , কিন্তু ক্ষেত্রমোহন যে ভৌতিক পত্র পাইয়াছেন সে কথাও রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। নায়েব রজনীবাবুরও কানে ক্রমে এ কথা পৌঁছিল। বলিয়াছি—তিনি ইংরাজী জানা ব্যক্তি—শুনিয়া হাঃ হাঃ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ভূত। এই বিংশ শতাব্দীতে ভূত বিশ্বাস করতে হবে?"

বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে ৮ই ফাল্গুন। আর পাঁচ দিন মাত্র বাকী আছে। উভয় পক্ষ হইতে সমস্ত আয়োজনাদি হইতেছে। বিকালে বৈঠকখানায় ক্ষেত্রবাবু জনকয়েক বন্ধু-বান্ধব সহ বসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে একজন সরকারী উকিল—নাম মনোহরবাবু। লোকটির বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। চোখে সোনার চশমা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল—মুখমণ্ডল প্রচুর গোঁফদাড়িতে আবৃত—হাতে বড় বড় নখ—এক কথায়, —লোকটি থিয়জফিষ্ট। ক্ষেত্রবাবুর ভৌতিক পত্রর প্রাপ্তির সমাচার অবগত হইয়া অবধি, মনোহর বাবুর ইহার সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। —অপর একজন মধ্য যুবক—নাম সুরেন্দ্রনাথ। ইনি এল-এ ফেল করা শিক্ষিত মোক্তার। বিস্তর ইংরাজী উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"ক্ষেত্রবাবু, একটা কথা আমার মনে হচ্ছিল। অনেক উপন্যাসে পড়া গেছে, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল, যেমন রেলে কলিশন বা নৌকাডুবি বা আর কিছু, সকলেই মনে করেছে অমুক লোকটা মরে গেছে, মৃত্যুর চাক্ষুষ সাক্ষীরও অভাব নেই, —কিন্তু শেষ দিকটায় দেখা গেল সে বেঁচে আছে। তাই আমার মনে হয়, হয় আপনার স্ত্রী এখনও বেঁচে আছেন, নয় এ চিঠি জাল। কিন্তু আপনার দৃঢ় বিশ্বাস এ চিঠি তাঁরই হাতের লেখা—জাল নয়। সুতরাং আপনার স্ত্রী বেঁচে আছেন বিশ্বাস করা ছাড়া আর উপায়ান্তর নেই। কারণ, এ বিংশ শতাব্দীতে, ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারা যায় না।"

থিয়জফিষ্ট উকিল বাবুটি ইহা শুনিয়া বলিলেন—"কেন মশাই—বিংশ শতাব্দীতে ভূতের অস্তিত্ব কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারেন না কেন?"

নবীন মোক্তারবাবু বলিলেন—"কারণ আমি কখনও দেখিনি।"

শুনিয়া মনোহরবাবু বিজ্ঞভাবে হাস্য করিয়া বলিলেন—"সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডকে কখনও দেখেছেন?"

"না, দেখিনি।'

"তিনি আছেন বলে বিশ্বাস করেন?"

"করি। তার কারণ, আমি না দেখলেও, হাজার হাজার লোক তাঁকে দেখেছে। তাঁর দশ বিশখানা ছবিও দেখেছি। কিন্তু 'ভূত আমি নিজে দেখেছি' এমন কথা আজ পর্য্যন্ত কাউকে বলতে শুনলাম না। সবাই বলে, খুব বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনেছে যে তারা স্বয়ং ভূত দেখেছে।"

মনোহরবাবু তাঁহার সুঘন দাড়ির মধ্যে দীর্ঘনখ অঙ্গুলিগুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন— "আপনি বললেন, হাজাব হাজাব লোক সম্রাটকে দেখেছে। তেমনি হাজার হাজার লোক অশরীরী আত্মাকেও প্রত্যক্ষ কবেছে। আপনি বললেন যে সম্রাটেব দশ বিশখানা ছবি দেখেছেন। তেমনি দশ বিশখানা ভূতেরও ছবি আপনাকে আমি দেখাতে পাবি। যদি দেখতে চান, একদিন আমার বাড়ীতে যাবেন। আমাব একখানা বইয়ে কেটি কিং-এব ছবি আছে। প্রথম চার্লসেব সময় কেটি কিং নামে একটি মেয়ে জীবিত ছিলেন। ষোল বৎসব বযসে তাঁব মৃত্যু হয। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে আমেরিকা ও ইউবোপের নানা স্থানে অনেক সেয়াঁসে, কেটি কিং স্থূলশবীর ধাবণ কবে আবির্ভূত হযেছিলেন। তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করা হয়েছে, তাঁর শবীবে ছুবি ফুটিযে দিয়ে দেখা হযেছে ঠিক মানুষেব মত বক্তপাত হয, তাঁর ফটোগ্রাফ পর্যান্ত তোলা হয়েছে , ফটোগ্রাফ থেকে ছবি আমার বইযে আছে—আসবেন, দেখাব।"

সুবেন্দ্রবাবু মৃদু মৃদু হাস্য কবিযা বলিলেন—"আপনাবাও যেমন ভাল মানুষ! ঐ সব বিশ্বাস কবেন? ভূতবাদীদেব কত জোচ্চুবি ধবা পড়েছে তাব সংখ্যা নেই। কেটি কিং-এব দেহে ছুবি ফুটিযে বক্তপাত হযেছে, ঐটে আপনি বিশ্বাসযোগ্যতাব প্রমাণ বলে উল্লেখ কবলেন। আমাব ত ঠিক উল্টো মনে হয। ছুবি ফোটালে বক্ত না পডত—অথচ শরীবী মানুষ একটা দাঁড়িযে বযেছে দেখছি—তা হলে ববং বিশ্বাস হত এটা বাস্তবিক মানুষ নয। এ ক্ষেত্রে দেখুন, ভূত, তিনি বাড়ীব সামনেই বটগাছে থাকেন। চিঠি যখন লিখতে পাবেন, তখন অনাযাসেই মূর্ত্তি গ্রহণ কবে নিজেব বক্তব্য বলে যেতে পাবতেন। কিন্তু তা না কবে খাম, কাগজ, কালি সংগ্রহ কববাব কষ্ট স্বীকার কবলেন। এইটুকু থেকে এইটুকু—চিঠিখানি টেবিলেব উপব বেখে গেলেই হত, তা না কবে এক মাইল দূবে পোষ্ট আপিসে গেলেন, তাকে পোষ্ট কবতে। আবাব দুটো পযসা খবচ কবে টিকিট কিনতে হল। মশায, ভৌতিক জগতে পযসা যদি বাস্তবিকই এত সস্তা হয, তা হলে না হয সেইখানে গিযেই প্র্যাক্টিস সুরু কবি।"

মনোহববাবু একটু বিবক্তিব সহিত বলিলেন—"মশায, জিনিষটা হাসি তামাসাব নয। এ সব গভীব বিষয। অনেক চর্চ্চা, অনেক আলোচনা না করে এ বিষযে মতামত প্রকাশ কবা উচিত নয়। ভৌতিক জগৎ থেকে ডাকে চিঠি আসা এই প্রথম নয়। হিমালয থেকে মহাৎমাবাও মাঝে মাঝে ডাকে চিঠিপত্র লিখে থাকেন। কুটুম্বিলাল নামক এক মহাৎমা এ বকম অনেক চিঠি আমাদেব মাদাম্ ব্লাভাটস্কিকে লিখেছিলেন। তাঁবাও মনে কবলে সাক্ষাৎ আবির্ভাব হযে বক্তব্য বলে যেতে পাবতেন কিম্বা চিঠি উড়িযে টেবিলেব উপব ফেলে যেতে পারতেন— কিন্তু ডাকেই তাঁবা চিঠিপত্র পাঠাতেন।"

ইহা শুনিযা শিক্ষিত মোক্তাববাবু মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। বলিলেন— "কুটুম্বিলালের চিঠি ত কোন্ কালে জাল বলে সাব্যস্ত হযে গেছে। ডাক্তাব হজ্সন বলে একজন বৈজ্ঞানিক নিজে ভাবতবর্ষে এসে এ বিষযে অনুসন্ধান কবে প্রমাণ কবে দিয়েছেন যে, মাদাম ব্লাভাট্স্কি আর দামোদব বলে এক ব্যক্তি সব চিঠি জাল কবেছিলেন।"

একথা শুনিযা থিযজফিষ্ট বাবুটি ভ্রূকুঞ্চিত কবিয়া বিবক্তির স্ববে বলিলেন—

"ও সব ঈর্ষাপবায়ণ লেখকেব বই পড়বেন না। আমার কাছে আসবেন, ভাল ভাল বই সব আপনাকে পডতে দেব। তা পড়লে আপনাব সমস্ত অবিশ্বাস দূব হযে যাবে। মাদাম ব্লাভাট্স্কি যে কত বড লোক তা তাঁব 'আইসিস্ আনভেল্ড' বইটে পডলেই বুঝতে পাববেন।"

সুরেন্দ্রবাবু মুচকিয়া হাসিয়া বলিলেন—"সে বইটে পড়িনি বটে, তবে এড্‌মণ্ড গ্যারেট প্রণীত "আইসিস্ ভেরি মচ্ আন্‌ভেল্ড—অর্ দি ষ্টোরি অব্ দি মাহাৎমা হোক্স" বইটে পড়েছি। লাইব্রেরীতে আছে। দেখতে চান ত এনে দিতে পারি।"

এ কথায় মনোহরবাবু রাগিযা আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঐ আপনারা এক কথা শিখে রেখেছেন! গাল দেওয়া যায় না এমন ভাল জিনিসই নেই। যত সব কুচক্রী বদমায়েস লোক মিছামিছি মাদামের অপরাধ রটনা করেছে।"

এমন সময় বাইরে শব্দ উত্থিত হইল—"বাবু—চিঠি আছে।"

পরমুহূর্ত্তে ডাকপিয়ন প্রবেশ করিয়া ক্ষেত্রবাবুব হাতে একখানি পত্র দিল। পত্রখানি হাতে লইয়াই ক্ষেত্রমোহনবাবুব চক্ষুস্থির হইয়া গেল। বলিলেন—"মশাই্—আবাব সেই।"

পত্র খুলিয়া পাঠ করিযা সেখানি সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। থিয়জফিষ্ট বাবুটি অতি আগ্রহেব সহিত সেখানি কুড়াইযা লইযা পাঠ কবিলেন। শেযে নবীন মোক্তার বাবুব হাতে সেখানি দিলেন।

পত্রখানি এইরূপ—

শ্রীশ্রী দুর্গা
সহায

প্রণাম পূর্ব্বক নীবেদনঞ্চ বিসেস

এত সাহস তোমার? আসিব্বাদ পজন্ত হইয়া গিআছে। তুমি মোনে কবিআছ আমি তোমায় জে পত্র লিখিযাছিলাম তাহা ফাকা আওযাজ। বসি বামনি তেমন মেযে নয়। আমি মানা করা সতোও বিবাহ্ কবিবে। একনও সাবধান হও। এ দুবমোতি পবিত্যাগ কব। নহিলে একদিন গভীব রাত্তিরে তুমি যকন ঘুমাইয়া থাকিবে বটগাচ হইতে নামিযা বুকে একখান দসমুনে পাতর চাপাইযা দিব। ঘুম আর ভাঁগিবে না।

বসমই।

একে একে সকলেই পত্রখানি পড়িলেন। পড়িযা স্তম্ভিত হইযা বসিযা বহিলেন। শিক্ষিত মোক্তারবাবুরও মুখ শুকাইয়া গেল। তথাপি মন হইতে সংশয দূবে নিক্ষেপ করিযা বলিলেন—"আচ্ছা ক্ষেত্রবাবু—আর একবার বেশ কবে লেখাটা পবীক্ষা কবে দেখুন দেখি। আপনাব স্ত্রীব হাতেব লেখাই বটে ত? না কোন জাযগায কোন সন্দেহজনক তফাৎ আছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"কোন সন্দেহ্ নেই। শুধু হাতের লেখাব মিল হলেও বা সন্দেহ কবতাম। তাব যেখানে যেখানে যে যে বানান ভুল চিবকাল হত এ চিঠিতেও তাই। সে চিরকালই শ্রীশ্রী এক জাযগায় দুর্গা একটু তফাতে লিখত—এ দুখানা চিঠিতেও তাই। তা ছাড়া, চিঠিতে এমন সব কথাবার্ত্তা রয়েছে যা সে জীবিত কালেও মুখে সর্ব্বদা ব্যবহাব করত।"

সকলে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া বহিলেন। কিযৎপরে সুবেন্দ্রবাবু গলা ঝাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মৃত্যুর সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"ছিলাম বৈকি।"

"সঙ্গে সঙ্গে ঘাটে গিযেছিলেন?"

"গিযেছিলাম।"

"চিতার উপর তাঁর দেহ রাখবার পর তাঁর মুখ আপনি আর দেখেছিলেন?"

"দেখিনি আবার? আমি নিজেই ত মুখাগ্নি করেছি। ওহে তুমি যা ভাবছ তা নয়। কোনও ভুল হয়নি।"

নব্য মোক্তারবাবু তখন ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একজন বলিল—"There are more things in heaven and earth Horatio
Than are dreamt of in your philosophy"

(হে হোরেশিও—স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহার বিষয় তোমার দর্শনবিজ্ঞান স্বপ্নেও অবগত নহে)।

অপর একজন বলিলেন—"তা ত বটেই, তা ত বটেই। ধরুন আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশই বা বলি কেন—সকল দেশেই, আদিকাল থেকে যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে, ভূত বলে একটা জিনিস আছে, তার কি কিছুই ভিত্তি নেই?"

সরকারী উকিল বাবুটি বলিলেন—"শুধু অন্ধ বিশ্বাসের কথা নয়। গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইউরোপে ও আমেরিকায় ভূতের অস্তিত্ব নিঃসংশয়িতভাবে প্রমাণ হয়ে গেছে। এক সময় বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ টিণ্ডাল পর্য্যন্ত ভূতকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। এখন আর শিক্ষিত সমাজে সে ভাব নেই। বিখ্যাত সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব তাঁর এক গ্রন্থে লিখেছেন- - of all the vulgar superstitions of the half educated none dies harder than the absurd delusion than there are no such things as ghosts (অর্দ্ধশিক্ষিত ব্যক্তিগণের মনে যতগুলি ইতরজনোচিত কুসংস্কার আছে, তাহার মধ্যে 'ভূত নাই' এই অদ্ভুত ভ্রমটিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল)।"—বলিয়া বিজয়ী বীরের মত তিনি সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি কটাক্ষপাত করিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল--- সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল। সেই বটগাছের তলা দিয়া যাইতে সুরেন্দ্রবাবুরও গাটা যেন ছম্ ছম্ করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খুড়া মহাশয় কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, দ্বিতীয় পত্রের কথা শুনিয়া বলিলেন—"দেখ ক্ষেত্তর-ব্যাপারটা ক্রমে গুরুতর হয়ে দাঁড়াল। বিবাহটা এখন না হয় বন্ধই রাখা যাক। আমার মতে বৎসর পূর্ণ হলেই, গয়ায় গিয়ে একটা পিণ্ড দিয়ে এস, উদ্ধার হয়ে যাবেন। বৎসর পূর্ণ হতে ত আর বেশী দেরী নেই—আর মাসখানেক হলেই হয়। তখন নির্ব্বিঘ্নে শুভকর্ম্ম শেষ করা যাবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"তা বেশ— সেই ভাল কথা।"

কন্যার পিতাকে বলিয়া কহিয়া বিবাহের দিন পিছাইয়া দেওয়া হইল। নিমন্ত্রণ পত্র সমস্ত প্রত্যাহৃত হইল। গয়া-শ্রাদ্ধ সারিয়া আসিয়া ক্ষেত্রবাবু বিবাহ করিবেন ইহা সকলেই জানিতে পারিল।

ক্ষেত্রবাবুর হস্তে একটা বড় জালিয়াতির মোকর্দ্দমার তদ্বিরের ভার রহিয়াছে। মোকর্দ্দমাটা দায়রা-সোপর্দ্দ হইয়াছে। সেটা শেষ না হইলে ক্ষেত্রবাবু গয়া যাইতে পারিতেছেন না। ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষীদিগকে সমস্তদিন ধরিয়া তালিম দিতে হইতেছে।

মোকর্দ্দমার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যাবেলা কাছারী হইতে ফিরিবার সময় 'বসমযী'র তৃতীয় পত্র ক্ষেত্রবাবুর হস্তগত হইল। তাহাতে অন্যান্য কথার সঙ্গে লেখা আছে—

"সুনিলাম না কি গয়ার আমার পিণ্ডি দিতে যাইতেছ। ভাবিআছ বুঝি পিণ্ডি দিলে আমি উধার হইয়া যাইব তকন সচন্দে বিবাহ কবিবে। গয়ায় যদি যাও তবে চোবের বেস ধরিযা রেলগাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তোমার বুকে ছোরা বসাইয়া দিব।"

ক্ষেত্রবাবুর আর বাড়ী যাওযা হইল না। কাছারীব পোষাকেই মনোহরবাবুর বাড়ী গিয়া তাঁহাকে পত্র দেখাইলেন।

মনোহববাবু পত্র পড়িয়া বলিলেন—"এ যে বড় বিপদ দেখছি। বিবাহ কববাব কল্পনা আপনাকে পরিত্যাগ করতে হল।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মশায, অশবীবী আত্মা মানুষেব বুকে ছুরি বসিযে দিতে পারে? আপনাব থিয়জফি শাস্ত্রে কি বলে?"

মনোহববাবু একখানি মোটা বহি আলমাবী হইতে পাড়িযা এক স্থান খুলিযা বলিলেন—"এ সম্বন্ধে থিযজফি শাস্ত্রের মত এই —মুক্তাত্মাগণ সাধারণত অশবীবী। কিন্তু কখন কখনও তাঁবা নিজেকে মেটিবিয়েলাইজ অর্থাৎ জড়দেহ সম্পন্ন কবে থাকেন। তাঁদের এমন ক্ষমতা আছে যে বায়ু থেকে, গাছপালা থেকে, ভূমি থেকে,—এমন কি কাছাকাছি মানুষেব দেহ থেকে, আবশ্যক পদার্থগুলি সংগ্রহ কবে নিজ দেহ ধাবণ কবেন। সুতরাং সে অবস্থায বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে পাবা কিছুই আশ্চর্য্য নয। আব এও বিবেচনা করুন না, যে হস্ত কলম ধবে চিঠি লিখতে সক্ষম, সে হস্ত ছুবি ধবতে পাববে না কেন?"

ক্ষেত্রমোহনবাবু কিযৎক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন— "দেখুন এ পত্রগুলো জাল কিনা সেটা একবার ভাল করে তদন্ত কবতে হচ্ছে। আমি বলি কি, এই যে কলকাতা থেকে হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক আমাদের দাযবাব মোকর্দ্দমায সাক্ষী দিতে আসছেন, তাঁকে দিযে এ চিঠিগুলো পবীক্ষা করালে হয না?"

থিযজফিষ্ট বাবুটি ক্ষেত্রমোহনেব এ সন্দেহবাদে মনে মনে বিবক্ত হইলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—"তা—যদি আপনাব ইচ্ছে হয, পবীক্ষা কবাতে পাবেন।

পবদিন দায়রার জালেব মোকর্দ্দমাটিব বিচাব আবম্ভ হইল। হস্তলিপি-বৈজ্ঞানিক সফ্‌টমোব সাহেব সাক্ষ্য প্রদান কবিলেন। দিনেশেষে কাছাবীব পব, ক্ষেত্রমোহন ডাক-বাঙ্গলায গিযা সফ্‌টমোব সাহেবকে ভৌতিক পত্র তিনখানি দিলেন। তুলনাব জন্য বসময়ীব কযেকখানি পুরাতন আসল পত্রও দিয়া আসিলেন। সাহেব বলিলেন—"কল্য প্রাতে পবীক্ষাব ফলাফল জানাইব।"

পরদিন প্রাতঃকালে সবকাবী উকীল মনোহববাবুকে সঙ্গে লইযা ক্ষেত্রমোহন আবাব ডাক-বাঙ্গলায উপস্থিত হইলেন। সাহেব বলিলেন—পবীক্ষাধীন পত্র তিনখানি এবং আসল পত্রগুলি সমস্তই এক হস্তেব লেখা।"

ইহা শুনিয়া ক্ষেত্রবাবুব মুখখানি ছোট হইযা গেল। মনোহববাবু বলিলেন —"সাহেব, অনুগ্রহ কবিযা একখানি সার্টিফিকেট দিতে পাবেন?"

সাহেব মনে করিলেন—নিশ্চয়ই এ পত্র লইযা একটা মামলা মোকর্দ্দমা হইবে। আবাব সাক্ষী দিতে আসিযা ফী পাওযা যাইবে।—সুতরাং আহ্লাদেব সহিত তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

বাসায় যাইতে যাইতে মনোহরবাবু ক্ষেত্রবাবুকে বলিলেন—"এই চিঠিগুলিব নকল আর সায়েবের সার্টিফিকেট যদি আমাদের 'থিয়জফিক্যাল রিভিউ' নামক মাসিক পত্রে ছাপাতে পাঠাই তাতে আপনার কোন আপত্তি আছে কি?—আমবা যাকে স্পিরিট-বাইটিং বলি, তার সুন্দব অকাট্য প্রমাণ হবে।"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন, —"তাতে আমাব আপত্তি নেই।"

পরবর্ত্তী সংখ্যা 'থিওজফিক্যাল রিভিউ' পত্রে সার্টিফিকেট সহ চিঠিগুলি ছাপা হইয়া গেল। নানাস্থান হইতে বড় বড় থিয়জফিষ্টগণ ক্ষেত্রমোহন বাবুকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ কেহ হুগলীতে আসিয়া পত্রগুলি স্বচক্ষে দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইতে লাগিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

থিওজফিষ্ট মহলে ক্ষেত্রবাবুর পসারের আর সীমা নাই— কিন্তু ইহাতে তিনি কিছুমাত্র সান্ত্বনা লাভ করিলেন না। পত্রগুলি জাল প্রমাণ হইলে তিনি বিবাহ করিয়া সুখী হইতে পারিতেন। ভয়ে গযায গিযা পিণ্ডদান করিতেও পারিলেন না। তাহার অদৃষ্টে বুঝি বিবাহ আর নাই।

চৈত্র মাস আসিল—বসন্তের বাতাস বহিতেছে। দোল উপলক্ষ্যে কাছারী বন্ধ। ক্ষেত্রমোহন বাড়ীতে বসিযা নিজ দুরদৃষ্টের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল, হালিসহরে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে মহা বিপদ উপস্থিত। দোল উপলক্ষ্যে বাজি পোড়াইতে গিয়া, একটা বোম্ ফুটিয়া তাঁহার ছোট সম্বন্ধী সুবোধ বিশেষ আঘাতপ্রাপ্ত হইযাছে। তাহাকে হুগলীর হাঁসপাতালে আনা হইযাছে।

শুনিয়া ক্ষেত্রবাবু থাকিতে পারিলেন না—গাড়ী ভাড়া করিযা হাঁসপাতাল অভিমুখে ছুটিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, ছেলেটির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন—বিছানার নীচে মেঝের উপর বসিযা বিধবা বিনোদিনী রোদন করিতেছেন। ক্ষেত্রমোহনকে দেখিয়া তিনি আরও রোদন করিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন ঔষধ-প্রয়োগ ও শুশ্রূষা চলিল। সন্ধ্যার দিকে ডাক্তারেরা বলিলেন আর প্রাণের আশঙ্কা নাই।

ক্ষেত্রমোহন শ্যালিকাকে বলিলেন—"ঠাকুরঝি, সন্ধ্যা হল— এইবার বাড়ী চল।"

বিনোদিনী বলিলেন—"আমি সুবোধকে ছেড়ে বাড়ী যেতে পারব না।"

"সমস্ত দিন অনাহারে আছ—স্নানাহার পর্য্যন্ত হল না।"

"তা না হোক! আমি যেতে পারব না।"

অবস্থা বুঝিয়া হাঁসপাতালের ডাক্তারেরা বলিলেন—"আপনাকে বাড়ী যেতে হবে। এখানে ত রাত্রে থাকতে পারবেন না। কাল সকালে আবার আসবেন এখন। আর কোন ভয় নেই। বিপদ যা, তা কেটে গেছে। আমরা সেবা শুশ্রূষা করব—আপনার কোন চিন্তা নেই— আপনি বাড়ী যান।"

অনেক বুঝাইতে, বিনোদিনী সম্মত হইলে। ক্ষেত্রমোহনকে বলিলেন—"তুমি তবে আমায় হালিসহরে নিয়ে চল। রাত্রে সেখানে থাকব। কাল ভোরে আবার এখানে আমায় পৌঁছে দিতে হবে।"

ক্ষেত্রমোহন তাহাই করিলেন। হালিসহরে রাত্রি কাটিল।

ভোরে উঠিযা স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিযা ক্ষেত্রমোহন ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। তাড়াতাড়ি হুঁকা রাখিয়া বাহিরে গিয়া দেখিলেন, লালপাগড়ীতে বাড়ী ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে। অশ্বপৃষ্ঠে স্বয়ং পুলিসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দুয়ারে দাঁড়াইয়া। সঙ্গে কয়েকজন দারোগা ও হেড্ কনষ্টেবলও আছে।

পুলিস সাহেবের সঙ্গে ক্ষেত্রবাবুর পরিচয় ছিল। নত হইযা সাহেবকে সেলাম করিলেন।

সাহেব চুরুট মুখে বলিলেন—"হেল্লো মুখ্‌টিয়ার, টুমি হেখানে খি খডিতেছে?"

ক্ষেত্রবাবু বলিলেন—"হুজুর এই আমাব শ্বশুরবাড়ী।"

"ইহা টোমাব শ্বশুরবাড়ী আছে? উটম, হামি তোমার শ্বশুরবাড়ী সার্চ্চ খডিবে।"

"কেন হুজুর?"

"হেখানে বোমা টৈয়াডি হয কিনা ডেখিবে। ইহা সার্চ্চ-ওযাবেণ্ট আছে।"—বলিযা সাহেব সার্চ্চ-ওয়াবেণ্টখানি ক্ষেত্রবাবুর হস্তে প্রদান কবিলেন।

ক্ষেত্রবাবু সেখানি উলটিয়া পালটিয়া দেখিয়া, সাহেবের হাতে ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন,—"হুজুর মালেক—যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

সাহেব বলিলেন—"স্ত্রীলোক ঘন্‌কে লুকাইয়া বাখ।"

পুলিশ গৃহমধ্যে প্রবেশ কবিল। স্ত্রীলোকগণের মধ্যে কেবল বিনোদিনী। তিনি পুলিসেব ভযে কোথাও লুকাইবাব প্রয়োজন দেখিলেন না। হবিনামেব মালাটি হাতে কবিযা উঠানে তুলসীতলায় বসিয়া বহিলেন।

খানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। বন্দুক, বারুদ, ডিনমাইট্‌, বোমা, বর্ত্তমান, বণনীতি, যুগান্তর, গীতা, দেশের কথা, রিভিউ অব্‌ রিভিউজ প্রভৃতি কিছুই বাহিব হইল না। বাহির হইল—হিন্দু সৎকর্ম্মমালা, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা, কাশীদাসী মহাভাবত এবং একখানা বটতলার ছেঁড়া উপন্যাস। ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোনও দেশনায়কেব কোনও ছবি বাহিব হইল না—বাহির হইল কেবল খানকতক কালীঘাটেব পট এবং একখানা আর্ট ষ্টুডিওব গণেশ মূর্তি। জমিদাবেব খানকতক পুরাতন দাখিলা এবং একটা ধূলিমলিন চিঠিব ফাইল বাহিব হইল। বিনোদিনীব বাক্স হইতে বাহির হইল এক বাণ্ডিল চিঠি এবং খানকতক ঠিকানা লেখা শাদা খাম।

সমস্ত জিনিষ উঠানে আনিযা জমা কবা হইল। একজন দাবোগা কাগজপত্রগুলির ফির্বিস্তি প্রস্তুত কবিতে লাগিলেন। ক্ষেত্রমোহনও সেইখানে বসিযাছিলেন। তিনি দেখিলেন, শাদা খামগুলিব প্রত্যেক খানিতে তাঁহাবই শিবোনামা লেখা এবং রসময়ীব হস্তাক্ষব। পুলিস সাহেবেব অনুমতি লইযা খাম ও চিঠিগুলি ক্ষেত্রবাবু পরীক্ষা কবিতে লাগিলেন। খানকুড়ি চিঠি বহিযাছে—সমস্তই বেগুনী বঙেব ম্যাজেণ্টা কালিতে বসময়ীব হস্তাক্ষবে লিখিত। কযেকখানি চিঠি খুলিযা ক্ষেত্রবাবু পাঠও কবিলেন। নানা অবস্থা কল্পনা কবিয়া অনুমানে পত্রগুলি লিখিত। কোন কোনটাতে বটগাছে বাসস্থানেবও উল্লেখ আছে। একখানাতে আছে—'গযায পিণ্ডদান কবিযা আসিয়াছ বলিযা মনে করিও না আর তোমাব অনিষ্ট করিতে পাবি না। এখনও রসি বামনী তোমার ঘাড় মটকাইতে পারে।' একখানাতে বহিযাছে—'শুনিলাম বিবাহেব দিনস্থিব হইযাছে, এখনও সাবধান।' একখানাতে আছে—'কল্য তোমাব বিবাহ। এত মানা করিলাম, কিছুতেই শুনিলে না। আচ্ছা বাসবঘবে আগুন জ্বালাইযা তোমাকে ও তোমার বধূকে পোড়াইযা মারিব।'

সমস্ত ব্যাপারটা দিনেব আলোব মত তখন ক্ষেত্রমোহনেব নিকট পরিষ্কাব হইযা গেল।

বিনোদিনী তুলসীতলায় বসিয়া সমস্ত দেখিতেছিলেন। ক্ষেত্রমোহন বলিলেন—ঠাকুরঝি, এসব কি?"

ঠাকুরঝি আপন মনে মালা জপ করিযা যাইতে লাগিলেন।

সাচ্চা গিনি ও ঝুটা গিনি

স্নেহলতা সেন

দার্জিলিং পাহাড় হইতে ফিরিবার এক মাস পরেই আমার বিবাহ হইয়া গেল। বড় দিনের ছুটিতে পত্নীকে লইয়া শ্বশুর গৃহে গেলাম। বিবাহের পর এই প্রথম নতুন জামাই বাড়ীতে আসাতে অত্যন্ত ধূমধাম পড়িয়া গেল। আমার শ্যালিকা, বীণার খুড়তত ভগ্নী, নূতন ভগ্নীপতিকে জলযোগ করাইয়া বলিলেন, "প্রমথ বাবু, আপনার ঘড়ির চেনে এ সব কি ঝুলছে? দেখি, একটি হীরে বসান পেন্সিল, একটি সোনার কম্পাস্, আর একটা—এটা কি একটা নূতন পয়সা?"

প্রমথ বাবু বলিলেন, "তা বেশত। কিছু দোষ আছে কি?"

"তা কি বলছি। কিন্তু কেন রেখেছ তাহা বলতে কি দোষ আছে?"

"উহা একটা Charm।"

"কি রকম চার্ম?"

"বিয়ের দিন রাত্রে তোমার দিদি আমার চেনে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।"

"না, মিথ্যা কথা।"

"না সত্যি স্বামী বশ করবার মন্ত্র পড়ে তোমার দিদি জেদ করে পরিয়ে দিলেন।"

আমার শ্যালিকা লাবণ্যপ্রভা আর কিছু বাহির করিতে পারিলেন না। তাঁহার উপহাসের জ্বালার ভয়ে বলিতে সাহসও হইল না, কিন্তু যদি কেহ শুনিতে চাহে তাই বলিতেছি।

আমি বিলাত না গিয়াই ষোল আনা সাহেব ছিলাম, কাজেই মাঝে মাঝে বিলাতি দোকানে যাইতে হইত—সেলের (Sale) সময়ত কথাই নাই। গ্রীষ্মের উপযুক্ত কয়েকটা কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, তাহা কিনিবার নিমিত্ত White away-র দোকানের জন্য বাহির হইলাম। এই দোকানে (Chronic state of sale) সেল চলিত, রোগটা কখনও বেশি কখনও কম। আজ দেখিলাম আর এক সেলের বিজ্ঞাপন দোকানের দেওয়ালে রহিয়াছে। এখান হইতে দুচারখান জিনিষ কিনিয়া অন্য দুএক দোকানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে সন্ধ্যার সময় Harri son Hathaway-র দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে দেখিলাম (Half price) অৰ্দ্ধেক মূল্যের সেল হচ্ছে। ইংরাজ সাহেব মেম, বাঙ্গালি সাহেব মেম, পার্সি, বাঙ্গালি বাবু, মাড়ওয়াড়ি, দর্জি মহাশয়, চান্দনির দোকানদার ইত্যাদিতে ঘরগুলি পরিপূর্ণ, নড়িবার জায়গা নাই। দর্জি, মাড়ওয়াড়ি ও দোকানদারগুলি কাপড়ের থান যে টেবিলের উপর রাশীকৃত ছিল, তাহা আক্রমণ করিয়াছেন। মেমগণ লেস ফিতা ইত্যাদির নিকট মৌচাকের চতুর্দ্দিকে মৌমাছির ন্যায় বেড়াইয়া বেড়াইতেছিলেন, বাঙ্গালি বাবুগণ সস্তা দরে বিলাতি বুট ও জুতা আনন্দিত মনে উৎসাহের সহিত কিনিতেছেন, সাহেবগণ এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন। আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু অত্যন্ত সস্তা একটি রেশমের ছাতা দেখিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। উহা কিনিয়া দোকানের সাহেবের হাতে একটা গিনি দিয়া ফেরত টাকার জন্য কাউন্টারের নিকট গিয়া দাঁড়াইলাম।

সে বৎসর সরকার গরিব ভাবতবাসীদিগের মধ্যে স্বর্ণমুদ্রা (গিনি) বিতবণ করিয়াছিলেন। একজন দ্বারবান বা পাখা-কুলি চারি মাসের মাহিনা হইতে অতি কষ্টে ষোলটি টাকা সঞ্চয় কবিয়া সুদূর গ্রামে তাহার জননী বা পত্নীকে মনি-ওর্ডার পাঠাইলে, সেখানে তাহার হাতে ডাকওয়ালা একটি গিনি ও একটি টাকা দিযা আসিত। সে দুঃখিনী জন্মে একবার সোনা স্পর্শ করিযা জীবন সার্থক করিত, কিন্তু তাহা পুনরায় ভাঙ্গাইতে গিযা প্রাণান্ত হইত ও পাঁচটি বা ছয়টি পয়সা ব্যয় করিতে হইত।

আমি ভাবিলাম বেশ হযেছে এখানেই গিনিটা ভাঙ্গান হইবে। চারিদিকে কি হইতেছে তাহাই দাঁড়াইযা দেখিতে ছিলাম, এমন সময সাহেব আসিয়া কহিল, "মশায এ গিনিটা কি বকম?" (Sir this guinea looks queer) আমি আশ্চর্য্য হইয়া উহা হাতে লইযা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম যথার্থ Queer কাবণ ইহা গিনি নহে, একটি মাজা ঘসা ঝক্‌ঝকে নূতন পযসা! আমার পার্সে গিনি রাখিয়া ছিলাম পযসাটা কি আসিল। তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম যে আমার পূজনীয়া বৌঠানেদের মধ্যে কাহারও কাণ্ড। আমি পযসাটা রাখিযা, একখানি দশ টাকাব নোট বাহিব কবিযা দিলাম। সাহেবটি আমাব মুখপ্রতি তীক্ষ্ণ সন্দেহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চেঞ্জ (Change) আনিতে গেল। এমন সময় আমাব পার্শ্বে কাউন্টাবেব সম্মুখে আব একজন আমারই মত বাঙ্গালি সাহেব আসিযা দাঁডাইলেন। তাঁহার বযস পঞ্চাশ বা অধিক হইবে, তাঁহাব পশ্চাতে এক চৌদ্দ পনেব বৎসবেব বালিকা সলজ্জভাবে দাঁডাইযা আছে। তাহাব প্রতি আমার মন ও চক্ষু আকৃষ্ট হইল। নাটক নভেলে নায়িকার ন্যায ইহার যে তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, নিখুঁত মুখমণ্ডল তাহা বলিতে পাবি না, তবে এমন অনির্বচনীয কমনীয কোমল লাবণ্যমযী মুখশ্রী আব কখনও দেখি নাই। আধুনিক বিলাত প্রত্যাগত সমাজেব ন্যায বেশভূষা, মস্তক অনাবৃত, ঘন মুক্ত কেশবাশি পৃষ্ঠ ছাইযাছে, একটি সক রুবীব ফিতা মস্তকে বাঁধা রহিয়াছে। বালিকা এত লোকেব মধ্যে যেন জডসড হইযা দাড়াইযা বহিল। একজন বেহাবা বাবুব বিবিধ আকাবের চাবি পাঁচটি পার্সেল লইযা আসিল, তখন তিনি একটি ৫০ টাকাব নোট একজন সাহেবেব হাতে দিলেন। সে হিসাব কবিযা একটি গিনি এবং কযেকটা টাকা ও পযসা ফিরাইযা বাবুব সম্মুখে টেবিলেব উপব বাখিল। ঠিক এই সময দোকানেব একজন মেম ঠক্ ঠক্ ক'বে বাবুব ও আমার মাঝখানে আসিযা কেবাণী বাবুকে কি একটা তাড়াতাড়ি বলিয়া একখানা কাগজ ফেলিয়া ফিরিলেন। মনে হইল যেন একটি ছোট বকম ঝড় বহিয়া গেল। এমন সময অন্য সাহেব আমাব হাতে আমাব ফেরত টাকা ও বেজকী দিযা গেল ; আমি অন্যমনস্কভাবে পার্সে ভবিলাম কিন্তু উহা বন্ধ কবিতে আর সময পেলাম না। ঠিক এই সময় মেমেব -নূতন ফ্যাসনের পাঞ্জাবি কুর্ত্তাব ন্যায় আস্তিনের এক ঝাপটা লাগিয়া টেবিলের উপরে বাবুর টাকা পয়সা ও গিনি সমুদায় ঝনাৎ কবিযা মাটিতে পড়িযা গেল। মেমটি মধুর স্বরে বলিলেন, "Oh I beg your pardon" এবং সে স্থান হইতে সন্তুষ্ট চিত্তে চলিয়া গেলেন। বাবু এদিকে ঝুঁকিয়া কুড়াইতে লাগিলেন, আমিও তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত ঝুঁকিলাম, আমার খোলা পার্সেব সমুদায এবাব ঝন্-ঝন্ শব্দে পড়িযা গেল। তখন আমি বাবুকে জিজ্ঞাসা কবিলাম "আপনাব কত ছিল?"

"একটা গিনি ও সাড়ে চারিটি টাকা।" আমি সব একত্র করিয়া তাহার পর তাঁহাব হাতে একটা গিনি ও চারি টাকা আট আনা দিয়া নিজের পার্সে অবশিষ্ট যাহা ছিল তাহা ভরিলাম। এদিকে দোকান বন্ধ হইবার সময় হইয়াছে, দুই তিনজন দোকানের সাহেব মেম তাহাদের অধৈর্য্য স্পষ্টই প্রকাশ করিতেছিল। আমি আর একবার বালিকাব সুন্দর-মুখখানির প্রতি চাহিয়া আমাব ছাতা হাতে লইয়া প্রস্থান করিব এমন সময় বাবুটি উচ্চৈস্বরে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "I say how's this ? What did you give me ? This is not a guinea!"

আমি একটু থমকিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম সত্য গিনি নহে, আমার সেই লক্ষ্মী ছাড়া পয়সাটা , বোধহয় উঠাইবার সময় সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে ও তাড়াতাড়িতে এই ভুলটা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে সাহেবকে ভুলক্রমে উহা দিয়াছিলাম সে বিদ্রূপ ও সন্দেহযুক্ত স্বরে ধীরে ধীরে বলিল, "Why, that's the very coin You gave me just now for a guinea"। (এইটাইত আপনি আমাকে গিনি বলিয়া দিযাছিলেন) ইতিমধ্যে চারি পাঁচ জন দোকানের লোক আমাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল, সকলের মুখে সন্দেহের ভাব। বাবু হাত বাড়াইযা ঝুটা গিনিটা আমায় দিলেন ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। বালিকা বিস্ময়পূর্ণ বিস্ফারিত নয়নে আমাব মুখ প্রতি চাহিয়া আছে। চোখে চোখ পড়িল, তাহার মুখ লাল হইল আমি চারিদিকে পুনর্বার চাহিলাম। মনে মনে বলিলাম "ধবণী দ্বিধা হও" কিন্তু ধরণী দ্বিধা হওয়া সহজ ব্যাপাব নহে, তাহার পর ভাবিতে লাগিলাম, 'ডাইনেমাইট্, এক্সপ্লোসন হউক, আগ্নেয় গিরি অগ্ন্যুৎপাত হউক, কলিকাতা জাহান্নমে যাক্, (Russian) "রাসিযান"রা এখনই আসুক। আবার ভাবিলাম যে এক লাফ দিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়ি , কিন্তু হায় কিছুই হইল না। আমি সেখানেই নির্ব্বিঘ্নে বেষ্টিত হইয়া চোরের মত দাঁড়াইয়া বহিলাম ও থতমত ভাবে কহিলাম, "উঠাইবার সময় গোলমাল হইযাছিল বোধহয। এই নিন্ আপনার গিনি।"

"সুবিধারকম ভুল"। এই কথা শুষ্ক ভাবে বলিয়া তিনি পার্সে ভরিলেন।

আমি আব একবার চেষ্টা কবিযা বলিলাম, "আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আমি পার্সে একটা গিনি বাখিয়াছিলাম, বোধ হয় বাড়ীতে কেহ ঠাট্টা করিযা উহা বদলাইয়া দিযাছিল, তাই আমি--"

"ওঃ তাই বুঝি আপনি ঠাট্টাটা আমাব উপর চালালেন।" একটু বিদ্রূপের হাসি অধবে দেখা দিল। বালিকা তিবস্কাবেব স্ববে মৃদু কণ্ঠে বলিযা উঠিল, "বাবা।"

একটি কথা কেবল, কিন্তু আমার কানে যেন অমৃত বর্ষণ হইল। দেখিলাম আব কিছু বলা বৃথা। বালিকাব প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে একবাব চাহিলাম, তাহার পব বৌঠানকে কি রূপে জব্দ করিব তাই ভাবিতে ভাবিতে কোন বকমে দোকান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলাম। বাড়ী গিয়া আমাব দুই বৌঠানকে সম্মুখে হাজিব কবিযা খুব ঝগড়া করিলাম। ঝগড়াটা এক পক্ষীয় কাবণ দুইজনেই হেসে হেসে কুটি কুটি হইলেন। যখন বাক্‌শক্তি ফিবিযা পাইলেন তখন একজন বলিলেন, "বাবা গেলুম।" আব একজন বলিলেন, "ঠাকুরপো কেমন জব্দ হয়েছেন আজ।" আমি খুব চটিয়া বলিলাম, "আচ্ছা দেখা যাবে, দুইজনেই পরে বুঝিবে।" এতক্ষণে আমাব বাগটা একটু পড়িয়া আসিয়াছিল, আর সেই মধুর কণ্ঠস্বরের একটি কথা "বাবা!" কানে লাগিয়াছিল, সেই মুখ কেবল মনে আসিতেছিল, মেজাজটা শিগ্‌গিবই ঠাণ্ডা হইল। তখন বলিলাম, "আচ্ছা এখন তোমাদের আনন্দটা যদি একটু ক'মে থাকে তবে এখন বল ত কে করেছে, এই কাজটা?" কেহ কিছু স্বীকার করিল না। তখন বলিলাম "যদি Sherlock Holmes -এর মত (Detective) ডিটেক্‌টিভ হতুম, তা হ'লে এখনি বলে দিতে পারতাম্।"

ছোট বৌঠান চোখ দুটি বড় করিয়া বলিলেন, "সে আবার কি?"

"Sherlock Holmes ব'লে একজন ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ ছিল; তাহাব অসাধাবণ শক্তি ছিল। সে খুনের বা ডাকাতির স্থানে যাইয়া একটা কাগজের টুকরা বা একটা পযসা উঠাইয়া বলিয়া দিত, "যে যাহার' এই কাগজ বা পয়সা তাহার এক চোখ কানা, লাল চুল, ৪০ বৎসর বয়স বেঁটে, রাগী আর খুব দুধ ...... তার এমন শক্তি যে ঐ কাগজটা ... এই সব বাহির করিত।"

"যাও, আর গল্প বলে ...."

"সত্যি বৌঠান, এ রকম একটা ...... ছিল। আচ্ছা Count of Mo   Cristoর গল্পটা বলা শেষ হ'লে, এই বইয়ের গল্প বলিব। কিন্তু আজকের কথা ভুলছি না, এর শোধ নেবো।" আর বাস্তবিকই লইয়াছিলাম। এইখানে বলিয়া রাখি যে আমি মাঝে মাঝে   বৌঠানদের ছুটীর সময় কোন ইংরাজি বইয়ের গল্প বলিতাম।

তার পরদিন অমৃতবাজার পত্রিকা পড়িতে হঠাৎ আমার চক্ষু স্থির হইয়া গেল। একটি প্যারাতে লেখা আছে, "The dangers of shopping in English shops" . তাহার মর্ম্ম এই যে আজ কাল বিলাতি দোকানের সেলে নানাপ্রকার লোক যায়। জুয়াচোর ভদ্রলোক, সাহেব সেজে যায়। গত কল্য সন্ধ্যাবেলা একজন লোক একটি পয়সা গিনি বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিতেছিল ইত্যাদি।" প্যারাটার নিম্নে নাম ছিল "By one who knows" আমি নীরবে একা একা ইহা তিনবার পড়িয়া, উহা কাটিয়া বাহির করিয়া আমার বাক্সে তুলিয়া রাখিলাম। আর সেই লোকটিও তাহার কন্যা কে জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল।

তিন চারি মাস পরে আমি পূজার ছুটীতে দার্জ্জিলিঙ্গ পাহাড়ে বেড়াইতে গেলাম। হাঁটিতে হাঁটিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, আমি একটি বেঞ্চে বসিব ভাবিতেছি—দেখিলাম নিকটেই এক বেঞ্চ দেখা যাইতেছে কিন্তু তাহার উপর দুইজন উপবিষ্ট, পুরুষ কি রমণী হঠাৎ ক্ষীণ আলোকে বোঝা গেল না। যখন একেবারে নিকটে গেলাম তখন থমকিয়া দাঁড়াইলাম, দেখিলাম দোকানের সেই ব্যক্তি ও তাহার কন্যা বেঞ্চের উপর বসিয়া আছেন। ভদ্রলোকও আমাকে তৎক্ষণাৎ চিনিলেন, আমার প্রতি চাহিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, "কি, তুমি আবার দেখা দিয়েছ?"

আমি অতি ভদ্রতার সহিত কহিলাম, "আজ্ঞে হাঁ, আমি এখানে বসিতে পারি?"

"অবশ্য, বসিবে না কেন, ইহাত আমার বেঞ্চ নহে।" বলিয়া তিনি কন্যাকে ঠেলিয়া দুইজনে একেবারে এক কিনারায় গিয়া সরিয়া বসিলেন।

"আপনার যদি আপত্তি থাকে, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম।"

"না, সরকারি বেঞ্চে কেহ বসিবে তাহাতে আর আপত্তি কি, Practical Jokes (ঠাট্টা) পছন্দ করি না, আর কোন আপত্তি নাই।"

"আপনি দেখিতেছি, সে কথা এখনও ভুলেন নাই, কিন্তু—"

"না আমার স্মৃতিশক্তিটা খুব ভাল।"

"সে দিনকার ঘটনাটা যে একটা মস্ত ভুল, আমি কে, তাহা একবার শুনিলে বোধ হয় আর অবিশ্বাস করিবেন না।"

"মহাশয়, আমার এখন ওসব ইতিহাস শুনিবার সময় নাই। চল বীণা, অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে।" বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কন্যা একবার চকিতদৃষ্টিতে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া চক্ষু নত করিয়া পিতার সহিত চলিল। সে চাহনিতে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে—যেন বলিতেছে, "আমি তোমাকে বিশ্বাস করি, কিছু মনে করো না।" অবিলম্বে পিতা ও কন্যা অক্ল্যাণ্ড রোডে উঠিয়া অদৃশ্য হইলেন। আমি তৎক্ষণাৎ প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে কালই ইহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আত্মপরিচয় দিব ও কলঙ্ক দূর করিব। অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে আমার পিতার বন্ধু ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র ঘোষ তাঁহাদের পরিচিত। উক্ত ডাক্তার আমার ন্যায় স্যানিটেরিয়ামে ঘর লইয়া ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট হইতে একটি পত্র Letter of introduction পাইলাম। আহারের পর জলাপাহাড়ে বীণার পিতার বাড়ী Cecil Cot-এ গিয়া উপস্থিত হইলাম। বীণা বাহিরে একখানি বই হাতে লইয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, আমাকে দেখিবামাত্র মুখ লাল হইয়া গেল, উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি টুপি তুলিলাম

কিন্তু ততক্ষণে সে ঘবে প্রবেশ কবিযাছে। একটু পবে তাহাব পিতা বাহিব হইযা আসিলেন। বলিলেন, "কি হে, আবাব এখানে এসেছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আশা করি আরও অনেক বাব আসিব।"

"বটে?"

"এ চিঠিটা অনুগ্রহ করিযা পড়ুন।"

তিনি কৌতূহলী হইযা হাতে লইযা খুলিযা পড়িলেন। পড়া শেষ হইলে, চোখ তুলিযা আমাকে আপাদ মস্তক নিবীক্ষণ কবিযা হাত বাড়াইয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, "তুমি প্রকাশ বাবুব পুত্র জানিতাম না। তোমাকে ভুল সন্দেহ কবেছিলাম বলিযা মাপ কব, তবে যে বকম কাণ্ডটা হয়েছিল আমাব বড দোষ নাই, কি বল?

"একটু দোষ আছে, আমার কি জুযাচোবেব মত চেহাবা?"

"জুযাচোবেব কি কপালে "জুযাচোব" লেখা থাকে, তা হ'লে আব লোকে ঠক্‌তো না। থাক্ সে সব কথা, তোমাব পবিচয পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। বীণা, এদিকে এসত।"

বীণা সলজ্জ ভাবে হাসি মুখে নিকটে আসিযা দাঁড়াইল।

"বীণা, ইনি মিষ্টাব চৌধুরী, প্রকাশ বাবুব পুত্র। আমাদেব কমলাব স্বামীব খুড়তত ভাই।"

বীণাব সহিত পবিচয হইল, দু-একটি কথা কহিলাম, তাহাব পিতাব সহিত নানা প্রকাব গল্প করিযা চলিযা গেলাম। তাহাব পর্বদিন প্রাতঃকালে সেখানে আমাব আহাবেব নিমন্ত্রণ বহিল। সমযমত আসিলাম, সাবা দিন থাকিযা চা খাইযা বৈকালে বিদায লইলাম। শুনিলাম বীণা মাতৃহীনা, পিতাব একমাত্র কন্যা। যাইবাব সময বীণা আমাব হাতে একটা কি দিযা দ্রুতপদে অন্য ঘবে চলিযা গেল। দেখিলাম সেই নূতন পযসাটা। তখন মনে হইল যে উহা ভুলিযা দোকানেই টেবিলেব উপব ফেলিযা আসিযাছিলাম। এত দিন বালিকা উহা তাহাব নিকটে রাখিযা দিয়াছিল, আমাকে কখনও অবিশ্বাস কবে নাই। এসব ভাবিতে হৃদয আনন্দে বিহ্বল হইল। ইহার পব কযদিন যেন সুখস্বপ্নে কাটিল। প্রতিদিন সেখানে চা পান কবিতাম আব বীণাব সৌন্দর্যাসুধা পান কবিতাম, সমস্ত জগৎ যেন আমার কাছে নূতন সৌন্দর্য্যে শোভিত হইল। একদিন বীণাব পিতাব নিকট মনেব ভাব প্রকাশ কবিলাম, পিতাকেও এক পত্র লিখিলাম। দুজনেব অনুমতি পাইযা একদিন বৈকালে আবেগপূর্ণ হৃদযে বীণার নিকটে গেলাম। বীণা বাহিবে বেলিঙ্গ ধবিযা দাঁড়াইযা সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল তাহা দেখিতেছিল। অস্তমিত সূর্য্যেব লাল আভা তুষাবমণ্ডিত পর্ব্বত চূড়ায পড়িযা তাহাতে যেন ক্ষণকালেব জন্য স্বর্ণমুকুট পবাইয়া দিল,—ক্ষণকালের জন্য মানব স্বর্গশোভা দেখিযা লইল, পবমুহূর্ত্তে সূর্য্যদেব পর্ব্বতের পশ্চাতে ডুবিযা গেলেন। বীণাব কোমল হাতখানি হাতে লইযা কহিলাম, "বীণা, একদিন তোমার বাবার সোনাব গিনি লইযা একটি ঝুটা গিনি দিযাছিলাম। আজ একটি বত্ন লইতে আসিয়াছি।" বীণা বুঝিল, মুখখানা আবক্তিম হইযা উঠিল কিন্তু সে কথায কাহার কাছে হার মানে না। অধর প্রান্তে একটু হাসি দেখা দিল, অতি মৃদুস্ববে বলল, "বত্নেব পরিবর্তে কি দেবেন?"

" এই ঝুটা রত্নটি।" আপনাকে দেখাইলাম। তার পব দুজনের অনেক কথাবার্ত্তা হইল, সে সব বাজে কথা আর বলিয়া কি হইবে , বিবাহের পরে নূতন পযসাটাতে একটি ছেঁদা করিয়া ঘড়ির চেনে ঝুলাইয়া বাখিলাম। বীণা মাঝে মাঝে পরিষ্কাব করিয়া দেয়। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলি, "উহা একটা চার্ম।" তাতো সত্যি কথা।

সেকালের রোমান্স

সরলাবালা সরকার

'বোমান্স' জিনিসটা চিবকালেব। তবে দেশ কাল ও পাত্র ভেদে তার ধরনটা ভিন্ন ভিন্ন রকমেব হয়।

আমার এই কাহিনী এমন এক প্রেমেব কাহিনী, যে-কাহিনীর নাযিকাব বয়স তেবো বৎসব। মেয়েটির নাম বিজয়িনী, ডাক নাম বিজু।

আট বৎসর বয়সেই বিজুব বিয়ে হয়ে গিযেছিল ; বাবা ছিলেন সবকাবী বড চাকুবে, তাই তাঁকে দেশে দেশে বেডাতে হত, বিজুও বাপের সঙ্গে নানা দেশ বেড়িয়েছে। শ্বশুববাড়ি বাংলা দেশের এক পল্লীগ্রামে। বিয়ের চার বছর পরে সে একবার শ্বশুববাডি এসেছে, আর এসেই সে তাব স্বামীর প্রেমে পড়ে গিয়েছে।

স্বামীর সঙ্গে প্রেমে পড়া, এটা অবশ্য একটা নূতন কথা, কেন না বিয়ের মন্ত্রই হচ্ছে, "যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদযং মম।" সুতরাং হিন্দু বিবাহমন্ত্রই যখন প্রেমের গ্রন্থিবন্ধন, তখন নূতন করে আবাব প্রেমে পডাব কথাই উঠতে পাবে না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাই ঘটেছিল, কেন না বিযেব পর বিজুব সঙ্গে তাব স্বামী বিনযেব খুব কমই দেখা হযেছে, আবাব যদি বা দেখা হযেছে সে কথা বিজুর বিশেষ মনেই নেই।

পশ্চিমে থেকে থেকে বিজুব স্বভাবটা এমন হযেছিল যে সে বাঙ্গালীব ঘবেব বৌ হযে কি করে যে একগলা ঘোমটা টেনে একেবাবে ভাল মানুষটি হয়ে থাকবে বিজুব মা সে কথা ভাবতেও পারতেন না। তাই যখন বিজুর শ্বশুরবাড়ি যাবার পর তিনি তাঁব বেয়ানের পত্রে জানলেন যে, 'বিজু বড়ই সরল ও লক্ষ্মীমেয়ে' তখন তাঁর মন অনেকটা হাল্‌কা হল। কিন্তু শাশুড়ী একথাও লিখেছেন "পশ্চিমে থেকে বাংলা দেশের আদব কাযদা কিছু শেখে নি সেজন্য ভাববেন না, দু দিনেই সব শিখে নেবে।"

বিজুর শ্বশুরবাড়ি গ্রাম্য জমিদারেব বাড়ি। শ্বশুর—জেলার বড় উকিল, কিন্তু ছেলেবা কেউই বিদ্বান নয়। বিজুর স্বামীব বয়স বাইশ বৎসর, কিন্তু সে এনট্রান্স পাস করার পর পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে গ্রামের ছেলেদের মোড়লগিরি কবছে। চাষীদেব সঙ্গে তার বিষম ভাব, এমন কি মাঠে গিয়ে মাঝে মাঝে লাঙ্গল চষেও দেয়। চাষীরা বলে, "ন বাবুর মত আর মানুষ হয় না, ওঁকে তো দ্যাবতা বললেই হয়।" কিন্তু বাড়িতে তার উৎপাতে বৌ-ঝিরা সব সময় তটস্থ থাকে, কোন সময় তার কি খেয়াল হয় কে জানে! তাই বিজয়িনী শ্বশুরবাড়ি এলে মেজবৌ একদিন বলেছিল, "এবার তো নবৌ আসছে, এবার তুমি জব্দ হবে, তার সঙ্গে এমন করে লাগতে পারবে না।" এখন এক পারিবারিক নাটক অভিনয়ের দৃশ্যের বর্ণনায় আসছি।

১২৫১ সাল। তখনকার দিনের একান্নবর্তী পবিবাব। দবদালানে একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ জন খেতে বসেছে, খুড়তুতো, জেঠ্‌তুতো, পিস্‌তুতো ভাইয়েবা, ভাগনে এবং শ্যালকও আছে, গুরুজনদেব মধ্যে আছেন ছোটকাকা ও পিসেমশাই। বধূরা এবং মেয়েরা পবিবেশন করছে, গৃহিণী আছেন বান্নাঘরে।

পবিবেশনে বিজুর খুবই উৎসাহ। মাছেব থালায় দু হাতই জোড়া, তাই মাঝে মাঝে তাব ঘোমটা সরে যাচ্ছে। মেজো ননদ এসে মাঝে মাঝে ঘোমটা ঠিক কবে দিচ্ছেন। গৃহিণীব আদেশ, নবৌকে কিছু বলা চলবে না তবে সহবত অবশ্য শিখিয়ে দিতে হবে।

বিজুর স্বামী বিনয হঠাৎ চেঁচিযে উঠল, "মেজ্‌দা, দেখ, বড মুড়োটা দেখছি আমাবই পাতে পড়েছে। তোমরা কখানা কবে মাছ পেয়েছ দেখি, আমার পাতে দেখ বড বড় পাঁচখানা মাছ।"

মেজদাদা বললেন, "বিনয, থাম্‌ দেখি। বড় মাছটা তুইই তো ধবেছিলি তবে মুড়োটা তোব পাতে পডবে না কেন?"

বিনয বললে, "পরিবেশন কবছে কে, ও নবৌ বুঝি? ঘোমটা দিয়ে আছে বলে আগে চিনতে পারি নি, আমি বলি বুঝি মেজবৌদি। তবে তো আমাব পাতে থালা শুদ্ধ মাছই পড়বে। মা, মা, ওকে কেন মাছ পবিবেশন কবতে দিলে?"

মা তাডাতাডি বান্নাঘব থেকে বাইবে এসে বললেন, "বিনু, আবাব কি নষ্টামি জুড়েছিস্? কেন ওকে ওবকম কবিস্? আমিই তো বলেছিলাম তোব পাতে বড মুডোটা দিতে। কাল আবাব অভযকে দেব। পুকুরে কি মাছেব অভাব হযেছে?"

বিজযিনী আড়ষ্ট, থালা হাতে কবে দাঁডিযে। তাব চোখেব জলে ঘোমটা ভিজে গিযেছে। শাশুডী এসে তাব হাত থেকে থালাটি নিযে বললেন, "ছিঃ, কাঁদে না, যাও মা, হাত মুখ ধুযে এস।"

মুডোটি বিনয খায নি, পাতেই পডে আছে। সেজবৌ ফুস্‌ ফুস্‌ কবে বললে, "দেখলে তো ভাই, নঠাকুবপো মুড়োটা নবৌযেব জন্যে পাতে বেখে গেল।"

কথাটা শাশুড়ীর কানে গেল, বললেন, "পাতে রেখেছে তাতে হযেছে কি? যাও মা, বিনুর পাতে গিয়ে বোসো। স্বামীব পাতেব মাছের মুড়ো খেলে স্বামীব আয়ু বৃদ্ধি হয়, সেজপিসিমা বলেন, শোন নি?"

দু ঘণ্টা পরে। বিজয়িনী ডাঁসা পেযাবাব সন্ধানে পেয়াবা গাছের তলায় গিযেছে। গিযে দেখল, বিনয় গাছতলায় দাঁড়িয়ে।

বিনযকে দেখে বিজুব মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছে গিযে বললে, "আমাকে গোটা কতক পেয়াবা পেড়ে দেবে?"

বিনয বললে, "গোটা কতক? ও বাবা, আম্বা তো কম নয দেখছি। বল না কেন, গাছে যতগুলো পেয়াবা আছে সবই পেড়ে দাও।"

বিজযিনী : "সব পেড়ে দিতে বলব কেন? সবগুলো তো আর ডাঁসা পেয়াবা নয?"

বিনয়ঃ "আচ্ছা, পেয়ারা পেড়ে দেব। তার আগে বল্‌ দেখি, ঘাটে তোদের চুপি চুপি কি পবামর্শ হচ্ছিল?"

বিজুর মুখ মলিন হয়ে গেল। সে বললে, "ছাড, মাব ঘরে যাব, মা ডেকেছেন পাকা চুল তুলে দিতে।"

কিন্তু বিনয় জোব করে তাব হাত চেপে ধরল, বললে, "সেটি হচ্ছে না। কি পবামর্শ হচ্ছিল না বললে ছেড়ে দেব না। বল, শিগ্‌গির বল পরামর্শটি কি? বনভোজন হবে? ও না, বোধ হয চাষীদের খেজুর গাছের রস চুবি কবা হবে, তাই না?"

বিজু বললে, "বস চুরি করব কেন, তুমি ভাবি বাজে কথা বল। বোজ তো এক কলসী কবে জিবেন রস চাষীবা দিযে যায়।"

"তা হলে কি হবে, কৃষ্ণযাত্রা? হ্যাঁ, এইবার ঠিক ধবেছি।"

বিজু বললে, "তাই বুঝি, বেহুলার ভাসান তো করা হবে। দেখো নি সেদিন। কি সুন্দব বেউলাব ভাসান গান কবেছিল মুসলমানপাডাব ছেলেবা?" বলতে বলতে চমকে উঠল, ঃ "ওমা! কি হবে? দিদিবা যে বাবণ করেছিল বলতে?"

সন্ধ্যার সময কোন কাজ থাকে না। রান্নাব পাট দিনে দিনেই চুকিয়ে বাখা হয, কেবল সময়মত গবম ভাতটি নামিযে নেওযা, আর সেও বাত্রি দশটা এগাবোটায়। কাজেই সন্ধ্যাতে প্রায়ই কড়ি খেলাব আসর বসে, দশ-পঁচিশ, ছক্কা-পাঞ্জা, বাঘবন্দী খেলা। তার মধ্যে দশ-পঁচিশই প্রধান খেলা। দশ-পঁচিশের ঘবে ঘরে যে চাবটি কবে কড়ি বসানো হয় তাব জন্য কত বঙ-বেরঙেব কডি সংগ্রহ করা হয়েছে, আবাব দানেব সাতটি কডিও বাছাই-কবা বড বড কডি।

কিন্তু আজ আব কডিখেলা নয, আজ হবে বেহুলার ভাসানেব গান। দব-দালানেব উপবের বড ঘবটা তালা চাবি দিযে বন্ধ করাই থাকে, কেবল একবার ঘবটা ঝাঁট দিযে পরিষ্কার কববাব জন্য খোলা হয। দেযালে বড বড ছবি আছে সেগুলোও মাঝে মাঝে মুছে পবিষ্কাব কবা হয। চাবিটা থাকে ভাঁডাব-ঘবেব তাকেব উপব। আজ সেই ঘবেই বেহুলাব ভাসান কবা হবে।

বেহুলাব ভাসানে কান্নাব পালা অনেক আছে, আবাব তাব মধ্যে সং এনে হাসিব খোবাকও জোগান দেওয়া হয়। মাথায পাগড়ী বাঁধা রামসিং জমাদাবেব সে কি ভঙ্গী, সে কি লাঠি ঘুরানো, যেন বাতাসেব সঙ্গে লডাই কবছে। আবার যেই শুনেছে একটা "ম্যাঁও" শব্দ, অমনি "ডাকু আযা, ডাকু আযা" বলে তাব পালানোব ভঙ্গিমা দেখে দর্শকেবা হেসে কুটি কুটি হয়ে এ ওব গায়ে গড়িযে পড়ে। তখনকাব দিনে লোকেব আমোদবোধেব বিশেষ প্রবণতা ছিল।

বেহুলাব নৌকায 'গোদা' গিয়ে উঠেছিল, বেহুলা যখন স্বামীব দেহ নিয়ে ভেসে যাচ্ছিলেন কলার ভেলায করে , নৌকা নয, কলাব ভেলা। সেই 'গোদা'কে নিয়েও সং দেওযা হ'ত। গোদা পায়ে তুলো আব পাট জড়িযে 'গোদ' তৈবী কবেছে, আর থপ্ থপ্ ক'বে হাঁটতে হাঁটতে গোদা-পা তুলে তার তিন বৌকে শাসাচ্ছে, "মাবব এই গোদা পায়ের লাথি।" আবার গানও করছে নেচে নেচে,—

"আমায়, 'গোদা, গোদা' করিস নে গোদা বড় ভাগ্যিমান।
গোদাব ডোলে গরু, শামুখে ধান।"

একটা ছোট বাছুরকে ধান রাখা ডোলের ভিতব ক'বে নিযে এসেছে, আবার একটা শামুখে ধান ভরে এনেছে। সেই শামুখটা সকলের সম্মুখে তুলে ধরে বলছে "দ্যাখ্ তোরা আমাব কত ধান ; গোলায আব কত ধানই ধরবে, আমাব শামুখেব ধানে সম্বৎসর ওড়ন ফোডন্, অতিথ-পতিত, এসো জন বসো জন সব কুলান হয়ে যাবে।" আবার বেহুলাব নৌকা ধববার জন্যে মাটিতে উপুড হযে সাঁতারেব অভিনয।

এই অভিনযগুলিই বিশেষ কবে দর্শকদেব মন আকর্ষণ কবত, তাই মাঠে ঘাটে গান শোনা যেত—

"গোদা গোদা কবিস নে গোদা বড় ভাগিমান।"

আজ গোদা সেজেছে সেজো বৌ, পাযে তুলো জমিযে গোদ কবা হযেছে, আবাব শামুখে ধান ভরেও আনা হযেছে, কিন্তু ডোলটি খালি ডোল, বাছুব তাতে নেই।

এদিকে বামসিং-জমাদাববেশী মেজবৌ লাঠি ঘাড়ে পাঁযতাবা কষতে কষতে এমন এক লাফ দিযেছে যে জানলাব সার্সি ভেঙে চুরমাব এবং ঠিক সেই সমযেই বিনয ঘবেব মধ্যে এসে হাজির।

অভিনযকাবিণীগণ এব পব যেভাবে লাঞ্ছিতা হলেন, তা বর্ণনা কবা যায না।

দুজন দুজন কবে চুলেব বিনুনীতে বিনুনীতে বেঁধে এক এক কোণে দাঁড কবিযে দিযে বিনয বললে, "ঠিক এইভাবে আধ ঘণ্টা দাঁডিযে থাক, তাবপব ছুটি হবে।"

বিজু কোথায়? বিজুকে কোথাও দেখতে পাওযা গেল না। সেই বিশ্বাসঘাতিনীই যে সমস্ত সন্ধান দিযেছে তা বুঝতে কাবও আব বাকি বইল না।

বেচাবা বিজযিনী! এই কাণ্ডেব পব সে একেবারে একঘবে হ'ল। তাব সঙ্গে আব কেউই কথা বলে না—সে সকলেব পিছনে পিছনে বেডায, কিন্তু কেউই তাব দিকে ফিবেও তাকায না।

শাশুড়ী ব্যাপাবটি লক্ষ্য কবলেন, বললেন "হ'ল কি তোদেব? বিজু অমন মুখ কালি কবে একা একা ঘুবে বেডাচ্ছে কেন? বান্নাঘবেব দুযোব-গোডায দাঁডিযে ছিল, তোবা ওকে কাজে ডাকিস নি বুঝি?"

সেজ মেযে বিমলা বললে, "না, ওকে আমবা আমাদেব কোন কাজেই ডাকব না। ও ভারী দুষ্টু, যে কথাটি হবে সেইটি গিযে ন-দাব কানে তুলে দেবে। এদিকে দেখে মনে হয ভাজা মাছটি যেন উলটে খেতে জানে না।"

বিজযিনী কাঁদছিল, বললে, "মা, আমি তো ওব কাছেই যাই নি, আমি তো তোমাব ঘবে আসছিলাম, তোমার পাকা চুল তুলতে, ও যে জোর কবে ধবে নিয়ে গেল।"

সেজ ননদ মুখ নাড়া দিয়ে বললে, "নিয়ে গেল তো নিযে গেল, ওকে সব বলে দিতে গেলি কেন?"

বিজয়িনী অবিশ্রান্ত চোখেব জল ফেলছিল ঃ "আমি তো বলতে চাই নি, আমি তো বলতে চাই নি—ও যে, ও যে —" বলতে বলতে কান্নায় তার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

আবাব পবের দিন। মায়ের অনুরোধে বৌয়েরা ও মেয়েরা অপরাধিনীকে ক্ষমা করেছে, সঙ্গে নিযে বাগানে গিয়েছে। বিজু একেবারে কৃতার্থ।

বাগানের মাঝখানে একটা ঝোপড়া তেঁতুলগাছ। বিজু মনের আনন্দে অনবরত বকে চলেছে। "জান ভাই, জান ভাই, উনি হাত গুনতে পারেন, তোমাকে দেখে সব বলে দেবেন, সব ঠিক মিলে যাবে। এই যে গাছটা দেখছ, এটা কি গাছ বল দেখি?"

ননদ বিমলা বললে, "ওটা তো তেঁতুলগাছ, তুই কখনও বুঝি তেঁতুলগাছ দেখিস নি।"

বিজু বললে, "না ভাই, ওটা তেঁতুলগাছ নয়। উনি বলেছেন, ওটা এক রকমের তালগাছ। দেখো, তালের সময় ও-গাছে তাল ধরবে।"

এই অদ্ভুত কথায় সকলে হেসে উঠল। কিন্তু বিজুব তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বলতে লাগল, "দেখো, তালেব সময় ও-গাছে তাল ধরবে। উনি বলছিলেন যে, তোমরা গাছটাকে তেঁতুলগাছ মনে কব, কিন্তু আসলে ওটা তালগাছ। কি জন্যে যেন ওর পাতাগুলো তেঁতুলগাছেব মত হয়ে গিয়েছে, উনি সে কথা আমাকে বুঝিয়ে বলেছিলেন, আমি ভুলে গেছি।"

মেজ-জা ধমক দিয়ে উঠল, "থাম্ দেখি নেকি, অত 'উনি, উনি' করিস নে। তোব 'উনি' সগ্‌গ্ থেকে নেমে এসেছেন। আমরা তো মানুষ নই, আমাদেব তো চোখ নেই।"

কিন্তু বিজয়িনীব দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ গাছে তাল ধববেই। সে বললে, "আচ্ছা, দেখো, তালের সময় গাছে তাল ধরে কি না!"

বিজয়িনী যখনই বিনয়কে এড়িয়ে চলে, চতুব বিনয তখনই বুঝতে পারে নিশ্চয কিছু পরামর্শ চলছে। আব তখনই সে "বিজু, বিজু" ডাক ছাড়ে। সেই "বিজু বিজু" ডাক শুনলে বিজয়িনী আব দূরে থাকতে পারে না। বিনযেরও আর বিজযিনীব গোপন কথা বের কবে নিতে কষ্ট হয না।

তাই আজকাল গোপন-সভায বিজযিনীর আব প্রবেশেব অধিকাব নেই। বিজু যতই কাকুতি-মিনতি করুক কেউই তাকে দলে নেয না, বলে, "বিজু তো! ন-ঠাকুবপো কাছে এলে ওর কি আর জ্ঞান থাকে? দেখ না, যে দিকে ন-ঠাকুবপো, ওব নজরটি কেবল সেই দিকেই আছে।"

গ্রীষ্মের দুপুর, বিনয় ঘরের মেঝেয শীতলপাটি পেতে শুযে আছে। ছেলেদেব খাওযা হযে গিযেছে, এইবার মেয়েরা পাতে খেতে বসবে। বিজযিনী কি একটা কাজে ঘরে এসেছিল, বিনয ডাকল, "বিজু, বিজু, এদিকে আয দেখি।"

বিজয়িনী এগিয়ে এসে বলল, "মা খেতে ডাকছেন, কি চাই তোমাব?"

"খেতে ডাকছেন? বলিস কি? তোর যে চোখ লাল হয়েছে দেখছি, নিশ্চয জ্বর হয়েছে। এদিকে আয তো! ও বাবা! এ যে বিষম জ্বর! শো, শো, শীগ্‌গির খাটের ওপব শুয়ে পড়্। আমি লেপ্ এনে তোব গায়ে ঢাকা দিচ্ছি।"

সেই দারুণ গ্রীষ্মে বিজয়িনী লেপ গাযে দিয়ে হাঁসফাঁস করছে। শাশুড়ী শুনলেন, বৌয়েব জ্বব এসেছে। ছেলের মুখে সংবাদ পেয়ে শাশুড়ী ঘবে এসে বধূব অবস্থা দেখলেন, বললেন, "দুখানা লেপ দেখছি গায়ে চাপিয়েছ, খুব কি শীত করছে?"

বিজয়িনী বললে, "না মা, ভয়ানক গরম হচ্ছে।"

শাশুড়ী ব্যাপারটি তখনই বুঝতে পারলেন, বললেন, "ওঠো, ভাত খেতে চল। বাছা রে, একেবারে ঘেমে তিরখুস্তি। বিনু, হতভাগা ছেলে, আয় এদিকে, বৌটাকে খুন না করে বুঝি তোর শান্তি হবে না?"

বিনয দুয়ারেব কাছে মুখ বাড়িয়ে বললে, "ও গিয়ে বিছানায লেপ মুড়ি দিল কেন, আমাব কি দোষ? নিজের জ্বর হয়েছে কি না সেটুকু বুদ্ধি নেই?"

বিজয়িনী তবুও উঠতে রাজী হয না, বলে, "উনি বলেছেন খুব জ্বব হয়েছে।"

শাশুড়ী বেগে উঠলেন, "বলুন উনি। জ্বব হয়েছে না ওর মাথা হয়েছে। আয এদিকে, ওকে উঠতে বল্, আমি চলে যাচ্ছি।"

সেদিনেব এই ঘটনায় বিজয়িনীকে অনেক ঠাট্টা সহ্য কবতে হয়েছিল, কিন্তু উপহাসেব কাবণটি যে কি বিজযিনী বুঝতে পাবে নি।

ইতিমধ্যে একদিন চিঠি এল দুঃসংবাদ নিয়ে, বিজযিনীর বাবা হঠাৎ মারা গিয়েছেন।

চিঠি পড়ে গৃহিণী স্তম্ভিত। তিনি তো জানেন বিজযিনী তাব বাবাকে কতখানি ভালবাসে। সময ও সুযোগ পেলেই সে সকলকেই বাবাব গল্প শোনায়। বিশেষ কবে শাশুড়ীব যখন পাকাচুল তুলতে বসে তখন অনর্গল বকে যায়, কেননা সে বুঝতে পাবে শাশুড়ী মনোযোগ দিয়েই তাব কাহিনী শোনেন এবং শুনতে ভালবাসেন।

গৃহিণীব মনে পড়ছিল, সবলা বালিকার সেই উজ্জ্বল দৃষ্টি, সেই হাসিমাখা মুখেব ভাব। বাবাব কথা বলতে বলতে সে যেন আত্মহারা হয়ে যেত। অবশ্য বাপেব বাড়িব সকল খুঁটিনাটি ঘটনাই সে বলত। মাব কথা, ভাইবোনদের কথা, ঝগড়ু সহিসের বৌয়েব কথা, এমন কি মেনি বেড়ালটা কথাও বাদ দিত না। কিন্তু বাবাব কথা বলতে গেলেই তার মুখ সবচেয়ে যেন উজ্জ্বল হযে উঠত, গৃহিণী তা লক্ষ্য কবেছেন বৈ কি।

আজ যখন বিজযিনী শুনবে তাব বাবা আব নেই, তখন তাব কি অবস্থা হবে সে-কথা যেন মনে কবাই যায না।

গৃহিণী ছেলেকে ডেকে তাব দুই হাত ধবে মিনতি কবে বললেন, "লক্ষ্মী বাবা, বাত্রেই যেন মেযেটাকে এই দারুণ খবর শোনাস নে।"

খাওযাদাওযাব পব যে যাব ঘবে শুতে গেল। গৃহিণী উদ্বিগ্ন হযে বিজযিনীব শোবাব ঘবেব দিকে কান পেতে থাকলেন।

বিজযিনীব স্বামীব কাছে এলেই খুশী হযে উঠত, আব অনর্গল নানা কথা বলত। স্বামী সে কথায কান দিচ্ছে কি না সে দিকে তাব খেযাল থাকত না। আজও ঘবে এসে আনন্দময়ী মহা আনন্দেব দিনে কি কি ঘটেছে অর্থাৎ মেজদিদি, সেজদিদি ও ঠাকুরঝি যখন পুকুবঘাটে গিয়েছিল, তখন মেজদিদি কিভাবে পা পিছলে পড়ে গেল, সেজদিদি ঘড়া বুকে দিযে সাঁতবাবাব সময ঘড়াটা হঠাৎ কি কবে ডুবে গেল, আবাব সেজদিদি ডুব-সাঁতাব দিযে কি কৌশলে ঘড়াটি তুলল ইত্যাদি বর্ণনা দিতে দিতে নিজের মনেই মাঝে মাঝে হেসে অস্থিব, তখন বিনয় হঠাৎ বলে উঠল, "হ্যাঁ, খুব তো হাসিখুশি হচ্ছে, এদিকে কি চিঠি এসেছে জান? তোমাব বাবা মাবা গিযেছেন।"

"কি বললে?" বিজু চমকে উঠল, "বাবা মারা গিয়েছেন বলে চিঠি এসেছে? তোমাব পায়ে পড়ি, কি হয়েছে বল। আমার বাবা নেই? আমার বাবা?"

বিজুর গলা দিয়ে "বাবা গো!" শব্দের আর্তনাদ শুনেই গৃহিণী ছুটে এলেন।

দরজায় ঘা দিচ্ছিলেন তিনি ঃ "দোব খোল্, শীগগির দোর খোল্, লক্ষ্মীছাড়া ছেলে! বউটাকে তুই নিকেশ না কবে ছাড়বি নে দেখছি।"

সেই আনন্দ-প্রতিমা কেমন যেন হযে গেল। তাব মুখেব দিকে যেন আর চাওযাই যায় না। গৃহিণী কোন রকমে তাকে দিয়ে চতুর্থী করালেন, ভাবলেন বধূকে তাব মাযেব কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মা-ও তো শোকাতুবা, মা মেয়েকে দেখে হয়তো কিছু শান্তি পাবেন, আব বিজুও মায়েব কোলে গিয়ে একটু জুড়বে।

কিন্তু কাকে পাঠাবেন ? বিজু বিষম জ্বরে শয্যাগত হযে পডল, তাব আর উঠবাব শক্তি নেই।

জ্বেবে ঘোরে অজ্ঞানের মত হয়ে থাকে, কিন্তু বিনয কাছে আসলেই যেন বুঝতে পাবে, তখন চোখ খুলবার চেষ্টা কবে।

গৃহিণী সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানত কবেছেন, বিজুর বাপেব বাড়িতেও খবব দেওযা হযেছে।

বিনয় ছটফট কবে বেডায, বিজযিনীব কাছে বেশীক্ষণ বসতে পাবে না। বাড়িব সকলেই পালা করে বাত জাগে, সকলেবই মুখ মলিন, বাড়িব আনন্দেব উৎস যেন একেবাবে শুষ্ক হযে গিযেছে।

গৃহিণী সব সমযই বধূব ঘবে আছেন, তাঁব বান্নাবান্নায আব মন নেই। মাঝে মাঝে বিনয়কে বলেন, "তুই গিযে ওব কাছে একটু বোস্, তা হলে হযতো হুঁশ আসবে।"

হুঁশ এল, কিন্তু একেবাবে শেষ অবস্থায। স্বামীব হাত দু'হাতে জডিযে ধবে বিজযিনী কিছুক্ষণ চুপ কবে বইল, তাবপব বলল, "তুমি,—তুমি তো আমায ভালবাসতে না।"

এইটিই তাব শেষ কথা।

বিনয যেন পাগলের মত হযে গেল। মাব কোলে মুখ লুকিযে অস্ফুট স্ববে কেবলই বলতে লাগল, "মা, মা, সে কিনা বলে গেল, আমি তাকে ভালবাসতাম না।"

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

।। ১ ।।

গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদারি আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।

জমিদারের ছোট ছেলের জন্মতিথি-পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাটী ফিরিতেছিলেন। বৈশাখ শেষ হইয়া আসে, কিন্তু মেঘের ছায়াটুকু কোথাও নাই, অনাবৃষ্টির আকাশ হইতে যেন আগুন ঝরিয়া পড়িতেছে।

সম্মুখের দিগন্তজোড়া মাঠখানা জ্বলিয়া পুড়িয়া ফুটিফাটা হইয়া আছে, আর সেই লক্ষ ফাটল দিয়া ধরিত্রীর বুকের রক্ত নিরন্তর ধুঁয়া হইয়া উড়িয়া যাইতেছে। অগ্নিশিখার মত তাহাদের সর্পিল উর্ধ্বগতির প্রতি চাহিয়া থাকিলে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে— যেন নেশা লাগে।

ইহারই সীমানায় পথের ধারে গফুর জোলার বাড়ী। তাহার মাটির প্রাচীর পড়িয়া গিয়া প্রাঙ্গণ আসিয়া পথে মিশিয়াছে, এবং অন্তঃপুরের লজ্জাসম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

পথের ধারে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়াইয়া তর্করত্ন উচ্চকণ্ঠে ডাক দিলেন, ও গফ্‌রা, বলি, ঘরে আছিস?

তাহার বছর দশেকের মেয়ে দুয়ারে দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কেন বাবাকে? বাবার যে জ্বর।

জ্বর! ডেকে দে হারামজাদাকে। পাষণ্ড! ম্লেচ্ছ!

হাঁক-ডাকে গফুর মিঞা ঘর হইতে বাহির হইয়া জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঙা প্রাচীরের গা ঘেঁসিয়া একটা পুরাতন বাব্‌লা গাছ—তাহার ডালে বাঁধা একটা ষাঁড়। তর্করত্ন দেখাইয়া কহিলেন, ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে? তাঁর মুখখানা রাগে ও রৌদ্রের ঝাঁজে রক্তবর্ণ, সুতরাং সে মুখ দিয়ে তপ্ত খরবাক্যই বাহির হইবে, কিন্তু হেতুটা বুঝিতে না পারিয়া গফুর শুধু চাহিয়া রহিল।

তর্করত্ন বলিলেন, সকালে যাবার সময় দেখে গেছি বাঁধা, দুপুরে ফের্‌বার পথে দেখছি তেমনি ঠায় বাঁধা। গোহত্যা হ'লে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে-সে বামুন নয়।

কি কর্‌ব বাবাঠাকুর, বড় লাচারে পড়ে গেছি। ক'দিন থেকে গায়ে জ্বর, দড়ি ধ'রে যে দু-খাটো খাইয়ে আন্‌ব—তা মাথা ঘুরে প'ড়ে যাই।

তবে ছেড়ে দে না, আপ্‌নি চরাই ক'রে আসুক।

কোথায় ছাড়বো বাবাঠাকুর, লোকের ধান এখনো সব ঝাড়া হয় নি— খামারে প'ড়ে, খড় এখনো গাদি দেওয়া হয় নি, মাঠে আলগুলো সব জ্ব'লে গেল— কোথাও একমুঠো ঘাস নেই, কার ধানে মুখ দেবে, কার গাদা ফেড়ে খাবে—ক্যাম্‌নে ছাড়ি বাবাঠাকুর?

তর্করত্ন একটু নরম হইয়া কহিলেন, না ছাড়িস্ তো ঠাণ্ডায় কোথায় বেঁধে দিয়ে দু আঁটি বিচুলি ফেলে দে না, ততক্ষণ চিবোক্। তোর মেয়ে ভাত রাঁধে নি? ফ্যানে-জলে দে না এক গাম্‌লা, খাক্।

গফুর জবাব দিল না। নিরুপায়ের মত তর্করত্নের মুখের পানে চাহিয়া তাহার নিজের মুখ দিয়া শুধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল।

তর্করত্ন বলিলেন, তাও নেই বুঝি? কি করলি খড়? ভাগে এবার যা পেলি সমস্ত বেচে পেটায় নমঃ? গোরুটার জন্যেও এক আঁটি ফেলে রাখ্‌তে নেই? ব্যাটা কসাই।

এই নিষ্ঠুর অভিযোগে গফুরের যেন বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ক্ষণেক পরে ধীরে ধীরে কহিল, কাহন-খানেক খড় এবারে ভাগে পেয়েছিলাম, কিন্তু গেল সনের বকেয়া ব'লে কত্তামশায় সব ধ'রে রাখ্‌লেন। কেঁদে কেটে হাতে পায়ে প'ড়ে বল্‌লাম, বাবুমশাই, হাকিম তুমি, তোমার রাজত্বি ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণ-দশেক বিচুলিও না হয় দাও। চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপ-বেটিতে থাকি, তাও না হয় তালপাতায় গোঁজা-গাঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ ম'রে যাবে।

তর্করত্ন হাসিয়া কহিলেন, ইস্! সাধ ক'রে আবার নাম রাখা হয়েছে মহেশ! হেসে বাঁচিনে!

কিন্তু এ বিদ্রূপ গফুরের কানে গেল না, সে বলিতে লাগিল,—কিন্তু হাকিমের দয়া হ'ল না। মাস দুয়েক খোরাকের মত ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারে গাদা হ'য়ে গেল, ও আমার কুটোটি পেলে না।—বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর তাহার অশ্রুভারে ভারী হইয়া উঠিল। কিন্তু তর্করত্নের তাহাতে করুণার উদয় হইল না, কহিলেন, আচ্ছা মানুষ তো তুই— খেয়ে রেখেছিস, দিবি নে? জমিদার কি তোকে ঘর থেকে খাওয়াবে না কি? তোরা রাম রাজত্বে বাস করিস্— ছোটলোক কিনা, তাই তাঁর নিন্দে ক'রে মরিস্।

গফুর লজ্জিত হইয়া বলিল, নিন্দে কর্‌ব কেন বাবাঠাকুর, নিন্দে তাঁর আমরা করিনে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বল তো? বিঘে-চারেক জমি ভাগে করি, কিন্তু উপরি উপরি দু'সন অজন্মা—মাঠের ধান মাঠে শুকিয়ে গেল—বাপ-বেটিতে দুবেলা দুটো পেট ভ'রে খেতে পর্যন্ত পাই নে। ঘরের পানে চেয়ে দেখ বিষ্টি-বাদলে মেয়েটাকে নিয়ে কোণে ব'সে রাত কাটাই, পা ছড়িয়ে শোবার ঠাঁই মেলে না। মহেশকে একটিবার তাকিয়ে দেখ, পাঁজ্‌রা গোনা যাচ্ছে—দাও না ঠাকুরমশাই, কাহন-দুই ধার, গোরুটাকে দুদিন পেট পুরে খেতে দিই। বলিতে বলিতে সে ধপ্ করিয়া ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তর্করত্ন তীরবৎ দু-পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আ মর্—ছুঁয়ে ফেল্‌বি না কি?

না বাবাঠাকুর ছোঁব না, ছোঁব না। কিন্তু দাও এবার আমাকে কাহন-দুই খড়। তোমার চার-চারটে গাদা সেদিন দেখে এসেছি—এ ক'টি দিলে তুমি টেরও পাবে না। আমরা না খেয়ে মরি ক্ষেতি নেই, কিন্তু ও আমার অবোলা জীব—কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে, আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।

তর্করত্ন কহিল, ধার নিবি, শুধ্‌বি কি ক'রে শুনি?

গফুর আশান্বিত হইয়া ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিল, যেমন ক'রে পারি শুধ্‌বো বাবাঠাকুর, তোমাকে ফাঁকি দেব না।

তর্করত্ন মুখে একপ্রকার শব্দ করিয়া গফুরেব ব্যাকুল কণ্ঠের অনুসরণ করিয়া কহিলেন. ফাঁকি দেব না। যেমন ক'বে পাবি শুধ্‌বো। বসিক নাগর। .. যা যা সর্, পথ ছাড়্! ঘরে যাই, বেলা হ'যে গেল! এই বলিযা তিনি একটু মুচ্‌কিয়া হাসিয়া পা বাডাইয়া সহসা সভয়ে পিছাইযা গিয়া সক্রোধে বলিযা উঠিলেন, আ মর্, শিঙ নেড়ে আসে যে, গুঁতোবে না কি?

গফুর উঠিযা দাঁড়াইল। ঠাকুবের হাতে ফলমূল ও ভিজা চালের পুঁটুলি ছিল, সেইটা দেখাইযা কহিল, গন্ধ পেযেচে, এক মুঠো খেতে চায—

খেতে চায? তা বটে। যেমন চাষা তাব তেমনি বলদ। খড জোটে না, চাল-কলা খাওযা চাই! নে-নে, পথ থেকে সবিয়ে বাঁধ্। যে শিঙ, কোন্‌দিন দেখ্‌চি কাকে খুন কর্‌বে। এই বলিয়া তর্কবত্ন পাশ কাটাইযা হন্ হন্ করিয়া চলিযা গেলেন।

গফুব সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিবাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইযা মহেশেব মুখেব দিকে চাহিল। তাহাব নিবিড় গভীব কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভবা. কহিল. তোকে দিলে না এক মুঠো? ওদের অনেক আছে. তবু দেয না—না দিক্ গে—তাহাব গলা বুজিযা আসিল, তাব পবে চোখ দিযা টপ্ টপ্ কবিযা জল পডিতে লাগিল। কাছে আসিযা নীববে ধীবে ধীবে তাহাব গলায মাথায পিঠে হাত বুলাইযা দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল. মহেশ, তুই আমাব ছেলে, তুই আমাব ছেলে, তুই আমাদেব আট সন প্রতিপালন ক'বে বুড়ো হযেছিস্. তোকে আমি পেট পুবে খেতে দিতে পাবি নে—কিন্তু তুই তো জানিস্ তোকে আমি কত ভালবাসি।

মহেশ প্রত্যুত্তবে শুধু গলা বাড়াইযা আবামে চোখ বুজিযা বহিল। গফুব চোখেব জল গোরুটাব পিঠেব উপব বগডাইয়া মুছিযা ফেলিযা তেমনি অস্ফুটে কহিতে লাগিল, জমিদাব তোর মুখেব খাবাব কেডে নিলে. শ্মশানেব ধাবে গাঁযেব যে গোচবটুকু ছিল তাও পযসাব লোভে জমা-বিলি ক'বে দিলে. এই দুর্বচ্ছবে তোকে কেমন ক'বে বাঁচিযে বাখি বল্? ছেড়ে দিলে তুই গাদা ফেড়ে খাবি, লোকেব কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিযে আমি কি কবি। গাযে আব তোব জোব নেই. দেশেব কেউ তোকে চায না—লোকে বলে তোকে গো-হাটায বেচে ফেল্‌তে—কথাটা মনে মনে উচ্চাবণ কবিযাই আবার তাহাব দুচোখ বাহিযা টপ্ টপ্ কবিযা জল পডিতে লাগিল। হাত দিযা মুছিযা ফেলিযা গফুব একবাব এদিক ওদিক চাহিল, তাব পবে ভাঙা ঘবেব পিছন হইতে কতকটা পুবানো বিবর্ণ খড় আনিযা মহেশেব মুখের কাছে বাখিযা দিযা আস্তে আস্তে কহিল. নে, শিগ্‌গিব ক'বে একটু খেযে নে বাবা. দেবি হ'লে আবাব--

বাবা?

কেন মা?

ভাত খাবে এসো,—এই বলিয়া আমিনা ঘব থেকে দুয়ারে আসিযা দাঁড়াইল। এক মুহূর্ত চাহিয়া থাকিযা কহিল, মহেশকে আবাব চাল ফেড়ে খড দিয়েচ বাবা?

ঠিক এই ভয়ই সে করিতেছিল, লজ্জিত হইযা বলিল, পুরোনো পচা খড় মা, আপনিই ঝ'বে যাচ্ছিল—

আমি যে ভেতরে থেকে শুনতে পেলাম বাবা, তুমি টেনে বার কর্‌চ?

না মা, ঠিক টেনে নয় বটে—

কিন্তু দেওয়ালটা যে প'ড়ে যাবে বাবা—

গফুর চুপ করিয়া রহিল। একটিমাত্র ঘর ছাড়া যে আর সবই গিযাছে এবং এমন করিলে আগামী বর্ষায় ইহাও টিকিবে না, এ কথা তাহার নিজেব চেয়ে আর কে বেশি জানে? অথচ এ উপাযেই বা কটা দিন চলে?

মেযে কহিল, হাত ধুয়ে ভাত খাবে এসো বাবা, আমি বেড়ে দিয়েচি।

গফুব কহিল, ফ্যানটুকু দে ত মা, একেবাবে খাইয়ে দিযে যাই।

ফ্যান যে আজ নেই বাবা, হাঁড়িতেই ম'রে গেছে।

নেই? গফুর নীরব হইয়া রহিল। দুঃখেব দিনে এটুকুও যে নষ্ট কবা যায না এই দশ বছরেব মেযেটাও তাহা বুঝিয়াছে। হাত ধুইয়া সে ঘবের মধ্যে গিযা দাঁড়াইল। একটা পিতলেব থালায় পিতাব শাকান্ন সাজাইযা দিযা কন্যা নিজের জন্য একখানি মাটিব সান্‌কিতে ভাত বাড়িয়া লইয়াছে। চাহিয়া চাহিয়া গফুর আস্তে আস্তে কহিল, আমিনা, আমাব গায়ে যে আবার শীত কবে মা,—জ্বর গায়ে খাওযা কি ভাল?

আমিনা উদ্বিগ্নমুখে কহিল, কিন্তু তখন যে বল্‌লে বড ক্ষিধে পেয়েচে?

তখন? তখন হয ত জ্বব ছিল না মা।

তা হ'লে তুলে বেখে দি, সাঁঝের-বেলা খেযো।

গফুব মাথা নাড়িযা বলিল. কিন্তু ঠাণ্ডা ভাত খেলে যে অসুখ বাড়বে, আমিনা।

আমিনা কহিল, তবে?

গফুব কত কি যেন চিন্তা করিযা হঠাৎ সমস্যাব মীমাংসা কবিযা ফেলিল, কহিল, এক কাজ কব্‌ না মা. মহেশকে না হয ধ'বে দিযে আয। তখন বাতেব বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিযে দিতে পাববি নে আমিনা? প্রত্যুত্তবে আমিনা মুখ তুলিযা ক্ষণকাল চুপ করিযা পিতাব মুখেব প্রতি চাহিযা বহিল, তাবপবে মাথা নীচু কবিযা ধীবে ধীবে ঘাড় নাড়িযা কহিল, পাবৃব বাবা।

গফুবেব মুখ বাঙা হইয়া উঠিল। পিতা ও কন্যাব মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনাব অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আবও একজন বোধ কবি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।

॥ ২ ॥

পাঁচ-সাত দিন পবে একদিন পীড়িত গফুব চিন্তিত মুখে দাওযায বসিযা ছিল, তাহাব মহেশ কাল হইতে এখন পর্যন্ত ঘবে ফিবে নাই। নিজে সে শক্তিহীন, তাই, আমিনা সকাল হইতে সর্বত্র খুঁজিযা বেড়াইতেছে। পড়ন্ত বেলায সে ফিবিয়া আসিয়া বলিল, শুনেচ বাবা, মাণিক ঘোষেবা আমাদেব মহেশকে থানায দিয়েছে।

গফুর কহিল, দূব পাগ্‌লি।

হাঁ বাবা, সত্যি! তাদের চাকব বল্‌লে তোব বাপকে বল গে যা দরিযাপুবের খোঁয়াড়ে খুঁজতে।

কি করেছিল সে?

তাদের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করেচে, বাবা।

গফুর স্তব্ধ হইযা বসিয়া রহিল। মহেশের সম্বন্ধে সে মনে মনে বহু-প্রকারের দুর্ঘটনা কল্পনা করিয়াছিল, কিন্তু এ আশঙ্কা ছিল না। সে যেমন নিরীহ, তেমনি গবীব, সুতবাং প্রতিবেশী কেহ তাহাকে এত বড শাস্তি দিতে পারে এ ভয় তাহার হয় নাই। বিশেষতঃ মাণিক ঘোষ। গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি তাহার এ অঞ্চলে বিখ্যাত।

মেয়ে কহিল, বেলা যে প'ড়ে এল বাবা, মহেশকে আন্‌তে যাবে না?

গফুর বলিল, না।

কিন্তু, তাবা যে বল্‌লে তিন দিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গো-হাটায বেচে ফেল্‌বে?

গফুর কহিল, ফেলুক গে।

গো-হাটা বস্তুটা যে ঠিক কি, আমিনা তাহা জানিত না। কিন্তু মহেশেব সম্পর্কে ইহাব উল্লেখমাত্রেই তাহাব পিতা যে কিরূপ বিচলিত হইযা উঠিত, ইহা সে বহুবাব লক্ষ্য কবিযাছে, কিন্তু আজ সে আব কোন কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

বাত্রেব অন্ধকারে লুকাইয়া গফুর বংশীর দোকানে আসিযা কহিল, খুড়ো একটা টাকা দিতে হবে, এই বলিযা সে তাহার পিতলের থালাটা বসিবাব মাচাব নীচে বাখিয়া দিল। এই বস্তুটিব ওজন ইত্যাদি বংশীব সুপবিচিত। বছব-দুযেকেব মধ্যে সে বার-পাঁচেক ইহাকে বন্ধব বাখিযা একটি কবিযা টাকা দিযাছে। অতএব আজও আপত্তি কবিল না।

পবদিন যথাস্থানে আবাব মহেশকে দেখা গেল। সেই বাব্‌লাতলা, সেই দড়ি, সেই খুঁটা, সেই তৃণহীন শূন্য আধাব, সেই ক্ষুধাতুব কালো চোখেব সজল উৎসুক দৃষ্টি। একজন বুড়াগোছেব মুসলমান তাহাকে অত্যন্ত তীব্র চক্ষু দিযা পর্যবেক্ষণ কবিতেছিল। অদূরে একধাবে দুই হাঁটু জড়ো কবিযা গফুব মিঞা চুপ কবিযা বসিযা ছিল, পবীক্ষা শেষ কবিযা বুড়া চাদবেব খুঁটি হইতে একখানি দশ টাকাব নোট বাহিব কবিযা তাহাব ভাঁজ খুলিযা বাব বাব মসৃণ কবিযা লইযা তাহাব কাছে গিযা কহিল, আব ভাঙব না, এই পুবোপুবিই দিলাম, --নাও।

গফুর হাত বাড়াইয়া গ্রহণ কবিযা তেমনি নিঃশব্দেই বসিযা বহিল। যে দুইজন লোক সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহাবা গোরুব দড়ি খুলিবাব উদ্যোগ কবিতেই কিন্তু সে অকস্মাৎ সোজা উঠিযা দাঁড়াইযা উদ্ধতকণ্ঠে বলিযা উঠিল, দড়িতে হাত দিযো না বল্‌চি-- খববদাব বল্‌চি, ভাল হবে না।

তাহারা চমকিযা গেল। বুড়া আশ্চর্য হইযা কহিল, কেন?

গফুব তেম্‌নি বাগিযা জবাব দিল, কেন আবাব কি? আমাব জিনিস আমি বেচ্‌ব না-- আমাব খুশি। বলিযা সে নোটখানা ছুঁড়িযা ফেলিযা দিল।

তাহারা কহিল, কাল পথে আস্‌তে বায়না নিলে যে?

এই নাও না তোমাদেব বায়না ফিরিযে। বলিযা সে ট্যাঁক হইতে দুটা টাকা বাহিব কবিযা ঝনাৎ করিযা ফেলিযা দিল। একটা কলহ বাধিবাব উপক্রম হয় দেখিযা বুড়া হাসিয়া ধীবভাবে কহিল, চাপ দিযে আর দুটাকা বেশি নেবে, এই ত? দাও হে, পানি খেতে ওব মেযেব হাতে দুটো টাকা দাও। কেমন, এই না?

না।

কিন্তু এর বেশি কেউ একটা আধ্‌লা দেবে না তা জানো?

গফুর সজোরে মাথা নাড়িয়া কহিল, না।

বুড়া বিরক্ত হইল, না ত কি? চামড়াটাই যে দামে বিকোবে, নইলে মাল আর আছে কি?

তোবা! তোবা! গফুরের মুখ দিয়া হঠাৎ বিশ্রী একটা কটু কথা বাহির হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই সে ছুটিয়া গিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া চীৎকার করিয়া শাসাইতে লাগিল যে তাহারা যদি অবিলম্বে গ্রাম ছাড়িয়া না যায় ত জমিদারের লোক ডাকিয়া জুতা-পেটা করিয়া ছাড়িবে।

হাঙ্গামা দেখিয়া লোকগুলা চলিয়া গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই জমিদারের সদর হইতে তাহার ডাক পড়িল। গফুর বুঝিল, একথা কর্তার কানে গিয়াছে।

সদরে ভদ্র-অভদ্র অনেকগুলি ব্যক্তি বসিয়া ছিল। শিববাবু চোখ রাঙা করিয়া কহিলেন, গফ্‌রা, তোকে যে আমি কি সাজা দেব ভেবে পাই নে। কোথায় বাস ক'রে আছিস, জানিস?

গফুর হাত জোড় করিয়া কহিল, জানি। আমরা খেতে পাই নে, নইলে আজ আপনি যা জরিমানা করতেন, আমি না করতাম না।

সকলেই বিস্মিত হইল। এই লোকটাকে জেদী এবং বদমেজাজী বলিয়াই তাহারা জানিত। সে কাঁদ-কাঁদ হইয়া কহিল, এমন কাজ আর কখনও কর্‌ব না কর্তা। বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখৎ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

শিবুবাবু সদয়কণ্ঠে বলিলেন, আচ্ছা, যা যা হয়েচে। আর কখনো এ সব মতি-বুদ্ধি করিস নে।

বিবরণ শুনিয়া সকলেই কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন এবং এ মহাপাতক সে শুধু কর্তার পুণ্যপ্রভাবে ও শাসনভয়েই নিবারিত হইয়াছে সে বিষয়ে কাহারও সংশয়মাত্র রহিল না। তর্করত্ন উপস্থিত ছিলেন, তিনি গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করিলেন এবং যে জন্য এই ধর্মজ্ঞানহীন ম্লেচ্ছজাতিকে গ্রামের ত্রিসীমানায় বসবাস করিতে দেওয়া নিষিদ্ধ তাহা প্রকাশ করিয়া সকলের জ্ঞাননেত্র বিকশিত করিয়া দিলেন।

গফুর একটা কথার জবাব দিল না, যথার্থ প্রাপ্য মনে করিয়া অপমান ও সকল তিরস্কার সবিনয়ে মাথা পাতিয়া লইয়া প্রসন্ন চিত্তে ঘরে ফিরিয়া আসিল। প্রতিবেশীদের গৃহ হইতে ফ্যান চাহিয়া আনিয়া মহেশকে খাওয়াইল এবং তার গায়ে মাথায় ও শিঙে বারংবার হাত বুলাইয়া অস্ফুটে কত কথাই বলিতে লাগিল।

॥ ৩ ॥

জ্যৈষ্ঠ শেষ হইয়া আসিল। রুদ্রের যে মূর্তি একদিন শেষ বৈশাখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সে যে কত ভীষণ, কত বড় কঠোর হইয়া উঠিতে পারে তাহা আজিকার আকাশের প্রতি না চাহিলে উপলব্ধি করাই যায় না। কোথাও যেন করুণার আভাস পর্যন্ত নাই। কখনো এ রূপের লেশমাত্র পরিবর্তন হইতে পারে, আবার কোন দিন এ আকাশ মেঘভারে স্নিগ্ধ সজল হইয়া দেখা দিতে পারে, আজ একথা ভাবিতেও যেন ভয় হয়। মনে হয় সমস্ত প্রজ্বলিত নভঃস্থল ব্যাপিয়া যে অগ্নি অহরহঃ ঝরিতেছে ইহার অন্ত নাই, সমাপ্তি নাই—সমস্ত নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া না গেলে এ আর থামিবে না।

এম্‌নি দিনে দ্বিপ্রহর বেলায গফুব ঘরে ফিরিয়া আসিল। পরেব দ্বারে জন-মজুর খাটা তাহাব অভ্যাস নয় এবং মাত্র দিন চার-পাঁচ তাহার জ্বর থামিয়াছে, কিন্তু দেহ যেমন দুর্বল তেমনি শ্রান্ত। তবুও আজ সে কাজের সন্ধানে বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল মাথাব উপর দিয়া গিয়াছে, আব কোন ফল হয় নাই। ক্ষুধায়, পিপাসায় ও ক্লান্তিতে সে প্রায অন্ধকার দেখিতেছিল, প্রাঙ্গণে দাঁড়াইযা ডাক দিল—আমিনা, ভাত হয়েছে বে?

মেযে ঘর হইতে আস্তে আস্তে বাহিব হইয়া নিরুত্তবে খুঁটি ধরিযা দাঁড়াইল।

জবাব না পাইয়া গফুর চেচাঁইযা কহিল, হয়েছে ভাত? কি বল্‌লি, হয নি? কেন শুনি?

চাল নেই বাবা।

চাল নেই? সকালে আমাকে বলিস্‌ নি কেন?

তোমাকে রাত্তিরে যে বলেছিলুম।

গফুব মুখ ভ্যাঙাইয়া কণ্ঠস্বব অনুকবণ কবিয়া কহিল, বাত্তিবে যে বলেছিলুম। রাত্তিবে বল্‌লে কাব মনে থাকে? নিজের কর্কশকণ্ঠে ক্রোধ তাহার দ্বিগুণ বাড়িযা গেল। মুখ অধিকতব বিকৃত কবিযা বলিযা উঠিল, চাল থাকবে কি ক'বে? বোগা বাপ্‌ খাক্‌ আব না খাক্‌, বুড়োমেযে চারবাব পাঁচবাব ক'বে ভাত গিল্‌বি। এবাব থেকে আমি চাল কুলুপ বন্ধ ক'রে বাইবে যাবো। দে, এক ঘটি জল দে, তেষ্টায বুক ফেটে গেল। বল, তাও নেই।

আমিনা তেমনি অধোমুখে দাঁড়াইযা বহিল। কযেক মুহূর্ত অপেক্ষা কবিয়া গফুব যখন বুঝিল গৃহে তৃষ্ণাব জল পর্যন্ত নাই, তখন সে আব আত্ম সংববণ কবিতে পাবিল না। দ্রুতপদে কাছে গিযা ঠাস্‌ কবিযা সশব্দে তাহাব গালে এক চড কসাইযা দিযা কহিল, মুখপোড়া হাবামজাদা মেয়ে, সাবাদিন তুই কবিস্‌ কি? এত লোক মবে, তুই মবিস্‌ নে।

মেযে কথাটি কহিল না, মাটিব শূন্য কলসীটি তুলিযা লইযা সে বৌদ্রেব মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহিব হইযা গেল। সে চোখেব আড়াল হইতেই কিন্তু গফুরেব বুকে শেল বিঁধিল। মা-মবা এই মেযেটিকে সে যে কি কবিযা মানুষ কবিযাছে সে কেবল সেই জানে। তাহাব মনে পড়িল তাহার এই স্নেহশীল কর্মপবাযণা শান্ত মেযেটিব কোন দোষ নাই। ক্ষেতের সামান্য ধান কযটি ফুবানো অবধি তাহাদেব পেট ভবিযা দুবেলা অন্ন জুটে না। কোনদিন একবেলা, কোনদিন বা তাহাও নয। দিনে পাঁচ-ছয়বাব ভাত খাওযা যেমন অসম্ভব তেমনি মিথ্যা এবং পিপাসাব জল না থাকার হেতুও তাহাব অবিদিত নয। গ্রামে যে দুই-তিনটা পুষ্কবিণী আছে তাহা একেবারে শুষ্ক। শিবচবণবাবুব খিড়কির পুকুবে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িযা-যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়। বিশেষতঃ মুসলমান বলিয়া এই ছোট মেয়েটা ত কাছেই ঘেঁসিতে পাবে না। ঘণ্টার পব ঘণ্টা দুবে দাঁড়াইযা বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে একটু ঢালিয়া দেয় সেইটুকুই সে ঘরে আনে। এ সমস্তই সে জানে। হয়ত আজ জল ছিল না, কিংবা কাড়াকড়ির মাঝখানে কেহ তাহার মেয়েকে কৃপা করিবার অবসর পায় নাই—এমনিই কিছু একটা হইয়া থাকিবে নিশ্চয় বুঝিয়া তাহার নিজের চোখেও জল ভরিযা আসিল। এমনি সময়েই জমিদারের পিয়াদা যমদূতের ন্যায় আসিয়া প্রাঙ্গণে দাঁড়াইল, চীৎকাব করিয়া ডাকিল, গফ্‌রা ঘরে আছিস?

গফুর তিক্তকণ্ঠে সাড়া দিয়া কহিল, আছি। কেন?

বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।

গফুর কহিল, আমার খাওয়া দাওয়া হয়নি, পরে যাবো।

এত বড় স্পর্ধা পিয়াদার সহ্য হইল না। সে কুৎসিত একটা সম্বোধন করিযা কহিল, বাবুব হুকুম, জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।

গফুর দ্বিতীয়বার আত্মবিস্মৃত হইল, সেও একটা দুর্বাক্য উচ্চারণ কবিযা কহিল, মহারানীর রাজত্বে কেউ কাবো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অত বড় দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কাবণ। বক্ষা এই যে অত ক্ষীণ কণ্ঠে অত বড় কানে গিয়া পৌঁছায় না—না হইলে তাহাব মুখেব অন্ন ও চোখেব নিদ্রা দুই-ই ঘুচিযা যাইত। তাহাব পরে কি ঘটিল বিস্তারিত বলার প্রযোজন নাই, কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে যখন সে জমিদারের সদব হইতে ফিরিয়া ঘরে গিযা নিঃশব্দে শুইযা পড়িল তখন তাহাব চোখ মুখ ফুলিয়া উঠিযাছে। তাহার এত বড় শাস্তিব হেতু প্রধানতঃ মহেশ। গফুর বাটী হইতে বাহির হইবার পরে সেও দড়ি ছিঁড়িয়া বাহিব হইযা পড়ে এবং জমিদারের প্রাঙ্গণে ঢুকিযা ফুলগাছ খাইযাছে, ধান শুকাইতেছিল তাহা ফেলিয়া ছড়াইযা নষ্ট কবিয়াছে। পরিশেষে ধরিবাব উপক্রম করায বাবুর ছোটমেযেকে ফেলিয়া দিযা পলায়ন করিয়াছে।

এরূপ ঘটনা এই প্রথম নয—ইতিপূর্বেও ঘটিযাছে, শুধু গবীব বলিযাই তাহাকে মাপ কবা হইয়াছে। পূর্বেব মত এবারও সে আসিয়া হাতে-পায়ে পড়িলে, হযত ক্ষমা করা হইত, কিন্তু সে যে কর দিয়া বাস কবে বলিযা, কাহাবও গোলাম নয বলিযা প্রকাশ করিয়াছে—প্রজার মুখের এতবড় স্পর্ধা জমিদার হইয়া শিবচরণবাবু কোন মতেই সহ্য কবিতে পাবেন নাই। সেখানে সে প্রহাব ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদ মাত্র করে নাই, সমস্ত মুখ বুজিয়া সহিয়াছে, ঘরে আসিয়াও সে তেমনি নিঃশব্দে পডিযা রহিল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা তাহার মনে ছিল না, কিন্তু বুকের ভিতরটা যেন বাহিরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতই জ্বলিতে লাগিল।

এমন কতক্ষণ কাটিল তাহার হুঁশ ছিল না, কিন্তু প্রাঙ্গণ হইতে সহসা তাহার মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যাইতেই সে সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ছুটিয়া বাহিবে আসিতে দেখিল, আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং তাহার বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মত যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।

একটিবারমাত্র মহেশ মুখ তুলিবার চেষ্টা করিল, তাহার পরেই তাহার অনাহারক্লিষ্ট শীর্ণ দেহ ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল। চোখের কোণ বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু ও কান বাহিয়া ফোঁটা-কয়েক রক্ত গড়াইয়া পড়িল। বার দুই সমস্ত শরীরটা তাহার থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার পরে সম্মুখ ও পশ্চাতের পা দুটা তাহার যত দূরে যায় প্রসারিত করিয়া দিয়া মহেশ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

আমিনা কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে ম'রে গেল।

গফুর নড়িল না, জবাব দিল না, শুধু নির্নিমেষচক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরেব মত নিশ্চল হইয়া বহিল।

ঘণ্টা-দুযেকের মধ্যে সংবাদ পাইয়া গ্রামান্তরের মুচির দল আসিয়া জুটিল, তাহাবা বাঁশে বাঁধিয়া মহেশকে ভাগাড়ে লইয়া চলিল। তাহাদেব হাতে চক্‌চকে ছুবি দেখিয়া গফুর শিহবিয়া চক্ষু মুদিল, কিন্তু একটা কথাও কহিল না।

পাড়াব লোকে কহিল, তর্কবত্নেব কাছে ব্যবস্থা নিতে জমিদার লোক পাঠিযেছেন, প্রাচিত্তিরের খরচ যোগাতে এবার তোকে না ভিটে বেচতে হয।

গফুর এ সকল কথার উত্তর দিল না, দুই হাঁটুর উপব মুখ রাখিযা ঠায় বসিযা বহিল।

অনেক বাত্রে গফুর মেয়েকে তুলিযা কহিল, আমিনা, চল, আমবা যাই—

সে দাওযায ঘুমাইয়া পড়িযাছিল, চোখ মুছিযা উঠিয়া বসিয়া বলিল, কোথায বাবা?

গফুব কহিল, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

মেয়ে অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও পিতা তাহাব কলে কাজ করিতে রাজী হয় নাই,—সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদেব ইজ্জত-আব্রু থাকে না, এ সে বহুবাব শুনিযাছে।

গফুব কহিল, দেবি কবিস্ নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে।

আমিনা জল খাইবাব ঘটি ও পিতাব ভাত খাইবাব পিতলের থালাটি সঙ্গে লইতেছিল, গফুব নিষেধ কবিল, ওসব থাক্ মা, ওতে আমাব মহেশেব প্রাচিত্তির হবে।

অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেযের হাত ধরিযা বাহিব হইল। এ গ্রামে আত্মীয় তাহাব ছিল না, কাহাকেও বলিবাব কিছু নাই। আঙ্গিনা পাব হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিযা সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু কবিযা কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিযা বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিযে মরেচে। তার চ'বে খাবাব এতটুকু জমি কেউ রাখে নি! যে তোমার দেওয়া তেষ্টাব জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'বো না।

সতীন

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক ঠাকুরের দুয়ার ধবিয়া হাতে-কোলে পূজা দিবাব মানত কবিযা, মাদুলি কবচ ধারণ করিয়া, ঔষধ খাইয়া, নৃত্যকালীর যখন কিছুতেই একটি ছেলে হইল না, তখন সে জেদ করিয়া নিজে দেখিযা শুনিয়া স্বামীর আর একটি বিবাহ দিল। একটি ছেলে না হইলে কি ঘর সংসার মানায়।

স্ত্রীলোক যখন ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে তখন অসাধ্যসাধন কবিতে পারে। আজ বাইশ বৎসর স্বামী তাহার ছিল, যাহার জীবনের সহিত তাহাব দুঃখ জড়াইয়া গিযাছিল, সেই স্বামীকে নৃত্যকালী হাসি মুখে প্রশান্ত মনে তবঙ্গিণীকে দান করিযা, সেই নব দম্পতিব সেবা ও যত্নের ভাব গ্রহণ করিল। নৃত্যকালি তরঙ্গিণীকে ছোট বোন্‌টিব মতন যত্ন করে, সখীব মনে তবঙ্গিণীকে প্রণযেব দীক্ষা দেয, নবযৌবনা তবঙ্গিণী বৃদ্ধ স্বামীকে লইযা বঙ্গ বসিকতা কবে, তাহাদেব দুজনের নূতন প্রণযেব ভাবলীলা ও কুণ্ঠিত গোপন মিলন প্রযাস দেখিযা কৌতুক ও আনন্দ অনুভব কবে।

তবঙ্গিণীও বাপেব বাড়ী হইতে অকস্মাৎ বিচ্ছিন্ন হইযা, দিদিব যত্ন মমতায একদিনেব তরেও মুখ মলিন কবিবার অবসব পায নাই। সে খাইতে না চাহিলেও নৃত্যকালী তাহাকে "দিদি আমার, বোন্‌টি আমাব, মেয়ে আমার" বলিযা সাধিয়া সাধিযা বাব বাব বিবিধ খাবাব খাওয়ায় , সে সাজিতে না চাহিলেও দিদি তাহাব নিজ হাতে বিচিত্র বস্ত্র অলঙ্কাবে দিনেব মধ্যে তাহা পাঁচ বার পাঁচ বকম করিযা সাজায় ; নৃত্যকালী নিজেব হাতে বিবিধ ছাঁদেব চুল বাঁধিয়া, টিপ কাটিযা, কাপড় পরাইয়া, তরঙ্গিণীকে জেদ করিযা জোব কবিযা দিনের মধ্যে পাঁচবার স্বামীর কাছে পাঠাইয়া দেয।

সংসারেব এতটুকু কাজও তরঙ্গিণীকে কবিতে হয় না। সংসাবেব সমস্ত সেবা ও কর্ম্মেব ভার নৃত্যকালীব, হাসি আনন্দ ও সম্ভোগেব জন্যই যেন তবঙ্গিণীব জীবন।

তাহার পব যখন তরঙ্গিণীব সন্তান-সম্ভাবনা হইল তখন নৃত্যকালী যেন কৃতার্থ হইযা গেল। তাহাব এতদিনের সাধ এইবার তবঙ্গিণী হইতে পূর্ণ হইবে। একটি সোনাব চাঁদ কোলে পাইবে। তাহার সংসাব উহার হাসিতে আলো হইয়া উঠিবে। তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালী এখন চোখে হারায়, সদাই তাহাকে সাবধান করিয়া বাখে, অনুক্ষণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে টিক টিক করিয়া বেড়ায, কোনো মতে যেন কিছু অনাচার না হয়, কাহারো ছোঁয়াচ নজব না লাগে ; দুজন দুঠাঁই হইয়া গেলে সে বাঁচে। তরঙ্গিনী সন্ধ্যাবেলা মাথার ঘোমটা খুলিয়া থাকিলে বা এঘর ওঘর করিবার সময় মাথায় একটার খড়কুটা গুঁজিয়া না বাখিলে তাহাও নৃত্যকালীর নজর এড়ায় না, সে তরঙ্গিণীকে বলে— পেটের কাঁটাটা আমাব কোলে একবাব ফেলে দে, তারপর তোর যা খুসি তাই করিস, আমি আর তোকে তখন কিচ্ছু বলব না।

যেদিন তরঙ্গিণী প্রসববেদনায় কাতর হইয়া নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—দিদি, আব আমি বাঁচব না। —সেদিন নৃত্যকালীও সুখে ও দুঃখে তাহার সহিত কাঁদিয়া ফেলিল। এই বেদনার ভিতব দিয়া আমাদের উভয়ের মাতৃত্ব আজ পবিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিবে।

তবঙ্গিণীর একটি পুত্রসন্তান হইল। নৃত্যকালী সেই আঁতুর ঘবেই একরাশ করবীফুলেব মতো সাদা ধবধবে খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া অশ্রুসজল হাসিমুখে তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, দেখ দেখ, আমার কেমন খোকা হয়েছে!

তরঙ্গিণী সুখের গর্ব্বভবা হাসিমুখে বলিল—দিদি, খোকা তোমাবই।

সেই দিন হইতে নৃত্যকালীব কাজ দ্বিগুণ বাড়িয়া গেল। এতদিন সে একটি বৃদ্ধ খোকা ও একটি তরুণী খুকিকে পবম যত্ন ও আগ্রহে মানুষ করিতেছিল, এখন আব একটি নূতন শিশু খোকাব ভাব তাহাব উপব পড়িল। খোকাকে তেল-মাখানো, সেঁক দেওযা, নাওযানো, ধোযানো, দুধখাওযানো, কাজল পবানো সমস্ত কাজই তার। খোকা সমস্ত দিনবাত তাহাবই কাছে থাকে। একবার কেবল মাই দিবাব জন্য সে খোকাকে তবঙ্গিণীব কোলে দেয়। তখন তবঙ্গিণী হাসিযা বলে—দিদি তোমাব খোকাকে আমি মাই দেবো কেন?

নৃত্যকালী সুখের হাসিতে দুঃখ ঢালিযা দিযা বলে—কি কবব বোন, বিধাতা আমায বঞ্চিত কবেছেন। নইলে কি আমি তোকে এ কষ্টটুকুও দিতাম। আমাব বিধাতা দুধ দেন নি, তাই তোকে আমার খোকার দুধমা রেখেছি।

নৃত্যকালীব স্বামী একদিন ঠাট্টা কবিযা তাহাকে বলিল—খোকাকে পেয়ে যে আমাদেব একেবাবে ভুলে গেলে? আমাদেব দিকেও একটু দেখো?

নৃত্যকালী হাসিযা বলিল—তোমায় দেখবাব জন্য ত তবিকে এনে দিযেছি।

স্বামী লজ্জিত হইয়া প্রস্থান কবিল।

তবঙ্গিণী একদিন হাসিযা বলিল—দিদি, খোকা হয়ে অবধি তুমি আব আমাব খোঁজও কব না যে, তরি মবল কি বাঁচল।

নৃত্যকালী তবঙ্গিণীব চিবুক স্পর্শ কবিযা নিজেব হস্তাঙ্গুলি চুম্বন কবিযা বলিল—ষাট ষাট অমন কথা মুখে আনতে আছে। তুই আমাদেব ঘবেব লক্ষ্মী, সংসাবেব সুখ। তুই আমাকে সোনাবচাঁদ খোকা দিযেছিস, আমাদের এই আঁটকুড়ো নিবানন্দ সংসাবে হাসি এনেছিস। তুই যে আমাব ছোট বোন তবি! তোব ঘরসংসাব তুই এখন চিনে শুনে নে—চিরকাল কি দিদির হাততোলা নিয়ে থাকবি? আমায় ছুটি দে, আমি আর সংসাবেব কেউ নই, আমি আর খোকা এখন দুজনে মিলে খেলা করবাব ছুটি নিযেছি, কাজ কববাব অবসব এখন আব আমাব নেই। আমি দেখতে শুনতে পারিনে, তুই এখন সব দেখ শোন। নিজেব শরীবের যত্ন করিস, আব যে বুড়োটাকে তোব হাতে দিয়েছি, সেটাকেও একটু যত্ন কবিস।

তরঙ্গিণী লজ্জিত হইয়া বলিল—না দিদি, সে আমি পারব না। তোমাব কাজ আমি কবতে যাব কেন? তুমি আমায় না দেখলে আমাব বড় কষ্ট হয, আমাব কিচ্ছু ভালো লাগে না।

তরঙ্গিণীকে আদরে চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিয়া নৃত্যকালী হাসিযা বলিল—তুই এখন বড়সড় হয়েছিস, এখনও দিদির হাততোলা হয়ে থাকলে লোকে বলবে কি? বলবে, তোব ঘরসংসার আমি তোকে ঠকিযে দখল করে বসে আছি।

তরঙ্গিণী দৃষ্টিতে তিরস্কার ভরিয়া নৃত্যকালীব দিকে তাকাইয়া বলিল—দিদি, যাও তোমার সঙ্গে আড়ি। ফের ওরকম কথা বল্লে আমি কেঁদে কেটে অনর্থ করব কিন্তু বলে রাখছি।

বলিতে বলিতেই তরঙ্গিণীর চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অভিমান গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৃত্যকালী তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া গালে কপালে চুম্বন করিয়া সজল চোখে হাসিয়া বলিল—ছি পাগলী, এই তুচ্ছ কথায় কাঁদলি।

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর কোলে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অভিমান ব্যথিত স্বরে বলিল— কেন তুমি আমাকে অমন কথা বললে? বল আর কখনো বলবে না।

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীর পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল—চুপ কর্ লক্ষ্মীটি, চুপ কর্। আমি আর কখনো বলব না। কিন্তু কখনো যদি তোর সংসারের ভার হাতে নেবার ইচ্ছে হয়, মুখ ফুটে আমায় বলতে লজ্জা করিস নে। তুই বলা মাত্তর তোর ঘরকন্না তোকে ছেড়ে দিয়ে আমি সরে একপাশ হব। কেবল খোকাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিসনে।

তরঙ্গিণী অশ্রুস্নাত মুখখানি তুলিয়া নৃত্যকালীর দিকে বেদনাভরা কাতরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—দিদি, আবার ঐ কথা। আমি যে তোমার ভালোবাসায় কেনা দাসী। আমাকে ও সব কী বলছ।

নৃত্যকালী তাহার চোখ মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল—তুই আমার বোন, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী, তুই আমার খোকার দুধমা। তোকে আমি মন্দ ভেবে কিছু বলিনি। তবু কথাটা বলে রাখলাম।

এমনিতর সুখের মিলনে হাসি আনন্দে তাহাদের তিনটি প্রাণীর সংসার একটি শিশুকে ঘিরিয়া স্বচ্ছন্দে চলিতে লাগিল। খোকা দিনে দিনে তাহার নব নব আনন্দলীলা প্রকাশ করিয়া সংসারটিকে আনন্দে হাসিতে সুখে ভরিয়া তুলিতে লাগিল।

খোকার যখন বছর দেড়েক বয়স, যখন সে চারটি সাদা দুধের দাঁত বাহির করিয়া নৃত্যকালীকে বলে—জি, এবং তরঙ্গিণীকে তা-তি বলিয়া ডাকে , যখন সে দুধ খাইতে ও কাজল পরিতে বিষম আপত্তি জানাইতে শিখিয়াছে, এবং যখন সে হামাগুড়ি দিয়া ঘরের শিশি-বোতল ভাঙিয়া মধু ও তেল একত্র মিশাইয়া পেটে মাথায় মাখিয়া বাঃ বাঃ বলিয়া উল্লাস প্রকাশ করিতে পারিতেছে , তখন একদিন সন্ধ্যাকালে নৃত্যকালী দালানে বসিয়া খোকার সহিত চাঁদমামার পরিচয় করিয়া দিতেছিল এবং চাঁদমামাকে খোকা কপালে একটি টি দিয়া যাইবার জন্য ধান ভানিলে কুঁড়ো, মাছ কুটিলে মুড়ো, ও উড়কি ধানের মুড়কির মোয়া দিবার লোভ দেখাইতেছিল ; খোকা তাহার ক্ষুদে ক্ষুদে হাত দুটি বিস্তারিত করিয়া কচি কলার ছড়ার মতো আঙুল ঘন ঘন সঞ্চালিত করিয়া চাঁদকে ডাকিয়া ডাকিয়া নিজের কপালে হাত ঠেকাইয়া বলিতেছিল—আ আ চি। —এক একবার মাতা নৃত্যকালীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল—জি! চি! —আবার তরঙ্গিণীর দিকে ফিরিয়া বলিতেছিল— তা-তি! চি!

এমন সময় উঠান হইতে কে একজন রমণী বলিয়া উঠিল—গেরস্তর বাড়ী আছ গো?

নৃত্যকালী বলিল—কে গা?

আগন্তুক রমণীকণ্ঠে উত্তর হইল—আমরা কুটুম গো।

নৃত্যকালী তরঙ্গিণীকে বলিল—তরি, দেখ ত কে?

তরঙ্গিণী উঠিয়া দালানের ধারে গিয়াই বলিয়া উঠিল—ওমা, বামা যে। তুই কোত্থেকে এলি।

বামা হাসিয়া গলায় আঁচলের খুঁটটা দিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—মা ঠাকরুণের সঙ্গে গঙ্গা নাইতে এইচি।

তরঙ্গিণী বলিল—মাসিমার সঙ্গে। কৈ মাসিমা কোথায়?

বামা পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিয়া উচ্চ কণ্ঠে ডাকিল, মা ঠাকরুণ, কৈ গো, এস না গো।

আর একটি রমণীমূর্ত্তি অন্ধকার আবছা আলোয অগ্রসর হইয়া আসিল। তবঙ্গিণী তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে উঠানে নামিয়া গিয়া দ্বিতীয বমণীর পদধূলি লইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিযা বলিল—দিদি, আমার মাসি এসেছেন!

নৃত্যকালী খোকাকে কোলে কবিয়া দালানেব ধাবে আসিযা দাঁড়াইযাছিল। সে তরঙ্গিণীর আহ্বানে উঠানে নামিয়া গিয়া তরঙ্গিণীর মাসিমার পদধূলি লইযা বলিল—এস মা এস।

মাসিমা নৃত্যকালীকে লক্ষ্য না কবিযাই তরঙ্গিণীকে বলিল—তরু, এই বুঝি তোব খোকা?

এই প্রশ্নে তরঙ্গিণীর কেমন লজ্জা বোধ হইল। খোকা কেবল তাহার এ কথা সে নৃত্যকালীব সম্মুখে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে? খোকা যে তাহার অপেক্ষা তাহার দিদিরই বেশি, ইহাও বা সে কেমন করিয়া একজন আগন্তুক বাহিরেব লোককে বুঝাইবে? তাহাবা দুই সতীন স্নেহ সখিত্বের যে মধুর সম্পর্ক পাতাইয়া নিরুপদ্রবে খোকাকে লইযা আনন্দে আছে তাহাব মধ্যে একজন অপর লোক আসিযা উপস্থিত হওযাতে তবঙ্গিণীব মনেব মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ হইল। তবঙ্গিণীব মনে হইল তাহাবা বেশ ছিল, তাহাদের এই সুখনীড়ের মধ্যে তাহার মাসিমা কেন আসিয়া পড়িল, তাহার মাসিমা কি তাহাদের ঠিক কবিয়া বুঝিতে পাবিবে? তরঙ্গিণী আর মাসিমাব দিকে চাহিতে পাবিল না। সে কোন কথা না বলিয়া লজ্জিত মুখ নত করিয়া বহিল।

মাসিমা এই সলজ্জ নীরবতা তবঙ্গিণীর নব মাতৃত্বেব লক্ষণ মনে করিযা হাত বাড়াইযা খোকাকে বলিল —এস দাদা বাবু, এস।

খোকা দুইহাতে নৃত্যকালীর বুকের ও পিঠের কাপড় মুঠি করিয়া আঁকডাইয়া ধবিয়া নৃত্যকালীব বুকেব মধ্যে সঙ্কুচিত হইযা লাগিযা গিযা বলিল—জি, ভ।

নৃত্যকালী খোকাকে একটু ঠেলিয়া মাসিমাব দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল—যাও লক্ষ্মী মাণিক আমার, যাও! উনি দিদিমা!

খোকা সে কথাব প্রতিবাদ কবিযা বলিল— ভ।

বামা একমুখ হাসিযা অগ্রসর হইযা আসিযা হাত বাড়াইযা বলিল—আমার ঠেঞে এসবে খোকাবাবু?

খোকা তেমনি ভাবে নৃত্যকালীকে জড়াইয়া ধবিয়া বলিল ভ। ভ!

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—অচেনা লোকেব কাছে যায় না বুঝি? এই নেও দাদামণি দেখ!

মাসিমা দুটি টাকা বাহির করিয়া খোকাব সম্মুখে ধরিল। খোকা টাকা লইতে কিছুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া কেবলই বলিতে লাগিল—ভ। ভ!

তখন নৃত্যকালী তবঙ্গিণীকে বলিল—তরি, তুই নে ত। তোর কাছে গিয়ে যদি মাসিমার কাছে যায়।

তরঙ্গিণী হাত পাতিল।

খোকা নৃত্যকালীকে জড়াইয়া থাকিয়াই তরঙ্গিণীকে বলিল—তা-তি, ভ।

মাসিমা অপ্রতিভ হইয়া তরঙ্গিণীকে বলিল—তরু, তোর ছেলে ত বাছা আমার কাছে আসবে না। এই নে তোর বেটাকে সন্দেশ কিনে খাওয়াস। মিষ্টিমুখ হ'লে যদি আমায় মিষ্টি চোখে দেখে!

তরঙ্গিণী একবার নৃত্যকালীর মুখের দিকে তাকাইয়া আবার মাথা নত করিয়া দাঁড়াইল।

নৃত্যকালী বলিল—আবার টাকা কেন মাসিমা! পায়ের ধুলো দিয়ে অমনি আশীর্ব্বাদ কর, আমাদের এই কত দুঃখের গুঁড়োটুকু বেঁচে থাক! খোকা আমার কোল বাছে না।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ বাপু, ও মুখই দেখতে পাচ্ছে না। এস দালানে এস। তবি, একখানা কিছু পেতে দে বসতে।

মাসিমা নৃত্যকালীর কোনো কথায় সাড়া না দিয়াই তরঙ্গিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—জামাই কোথায়, ওদিকে জামাই নেই ত।

মাসিমা যে নৃত্যকালীর সহিত কথা কহিতেছে না ইহা তবঙ্গিণীর মোটেই ভালো লাগিতেছিল না। কাজেই সেও মাসিমার কোনো কথার জবাব দিতে পারিতেছিল না।

নৃত্যকালী বলিল—না, উনি বাড়ীতে নেই। এস মাসিমা। তবি, মাসিমাব পা ধোবাব জল দে, ওর গরদ খানা দে। মাসিমা কাপড় ছেড়ে জপ করে নিন, আমি খোকাকে ঘুমি পাড়িয়ে জলখাবার করে আনি।

তরঙ্গিণী মাসিমার কাছ হইতে সরিয়া পডিবার সুযোগ পাইযা যেন বাঁচিয়া গেল।

কিন্তু যখন নৃত্যকালী জলখাবার আনিতে গেল তখন তবঙ্গিণীকে একাকী তাহার মাসিমার কাছে থাকিতে হইল। ইহাতে সে কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

মাসিমা বলিল—তরু, ঐ নাকি তোব সতীন?

সতীন শব্দটা তরঙ্গিণীব কানে বাজিল। সে মৃদুস্বরে বলিল—উনিই দিদি।

—তোকে খুব কষ্ট দ্যায় দেখছি।

তরঙ্গিণী বিবক্ত হইযা বলিল—না মাসিমা, দিদি আমায় খুব ভালোবাসেন।

মাসিমা বিজ্ঞতার হাসি হাসিয়া বলিল—আ নেকি, তুই তেমনি নেকিই আছিস এখনো! একটা মিষ্টি কথা বললেই ভুলে যাস। মিছরীব ছুরি মুখে মিষ্টি লাগে বলে' মনে কবিস যে বুকে যখন বেঁধে তখনও তেমনি মিষ্টি লাগে? ঐ বুঝি তোব ভালোবাসা। এসে বাড়ীতে পা দিতেই ত বুঝতে পারছি, তুই বাড়ীব দাসী, আব বাড়ীর গিন্নি ঐ ডাইনি মাগী! তবি যা পা ধোবাব জল দে, তরি যা বসতে দে, আব আমি যাই জলখাবাব দি , তুই দাসীব খাটনা খেটে মর্ববি, কিন্তু সংসারটি ওব মুঠোর ভেতব! তোর সংসারে তুই পবেব হাততোলায কেমন করে আছিস! আমরা হ'লে ত একদণ্ড থাকতে পাবতাম না।

তবঙ্গিণী বিবক্ত হইয়া বলিল—এব আব হাততোলা থাকা কি? দিদি যদি অযত্ন করতেন ত কষ্ট হ'ত। দিদি নিজে না খেযে আমায় খাওয়ান, নিজে না পবে আমায পবান, দিদি আমাব ছেলেকে মাযের বাড়া যত্ন করেন।

মাসিমা হাসিয়া বলিল—ওবে তাইত কথায বলে—মায়ের চেযে যে ভালোবাসে তাবে বলে ডা'ন! ঐ ডাইনি মাগী তোকে গুণ করেছে নিয্যস। ছেলেকে অত ন্যাওটো কবছে কেন তাও বুঝি বুঝতে পারিসনে হাবা মেযে! ছেলে ওব ন্যাওটো হলে তোকে নাথি ঝাঁটা কোস্তা বাড়ন মারলেও তুই ওর কিছু কবতে পাববিনে, ছেলেব জন্যে তোকে সব সয়ে থাকতে হবে। দুটো মিষ্টি কথা আর লোক দেখানো আত্তি, এই দেখেই ত ভুলেছিস। সতীন সম্পক্ক কি কখনো ভালো হয় নেকি। শক্ত হ, শক্ত হ, এখনো সময আছে, ছেলেটাকে ডাইনীর মাযা থেকে বাঁচা! কথায় না বলে, বাঁজা আত্তি বাঘিনীর পথ্যি! তাতে এ আবাব বাঁজা সতীন।

তরঙ্গিণী লজ্জায় ঘৃণায় বিরক্ত হইয়া উঠিল। তাহাব মাসীমাকে কেমন করিযা বলিবে যে, যেদিন হইতে সে এ বাড়ীতে আসিয়াছে সেই দিন হইতে স্বামী সম্পূর্ণ তাহার, দিদি তাহার সতীন নয়। তরঙ্গিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িযা বলিল— দেখি জলখাবার হল কি না।

মাসিমা খুসি হইয়া বলিল—হ্যাঁ, নিজেব ঘরকন্না নিজে দেখ শোন, এই ত চাই।

তরঙ্গিণী মনে করিল সতীন সম্পর্কটা বড় খারাপ। সহজেই লোকে ভুল বুঝিয়া অবিচার করিয়া বসে। মাসিমা দুদিন থাকিলেই বুঝিতে পারিবে দিদি তাহার কেমন মানুষ।

দুদিন ছাড়িয়া চারিদিন গেল, মাসিমার ধারণার কোনো পরিবর্ত্তন সে বুঝিতে পারিল না। মাসিমা ও তাঁহার সহচরী বামা নিরন্তর তাহার কানে বিষ উদ্‌গিরণই করিতেছে।

তরঙ্গিণী অতিষ্ঠ হইয়া একদিন নৃত্যকালীকে বলিল—দিদি, ওরা কবে যাবে? যোগ ফোগ ত চুকে বুকে গেল। আর কতদিন গঙ্গা নাইতে হ'বে?

নৃত্যকালী হাসিয়া বলিল— কেন তরি, মাসিমা দুদিন আছেন তাতে তুই ব্যাজার হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর হাসির সঙ্গে হাসিতে পারিল না। সে গম্ভীর ভাবে বলিল—না দিদি, আমরা দুটিতে নিরিবিলি বেশ ছিলাম, কোথা থেকে এক যোগ নরক গোলযোগ এসে জুটল! দিদি, পাজি পাঁজিগুলো এত গোলযোগও বাধাতে জানে।

নৃত্যকালী একটু তিরস্কারের স্বরে বলিল—ছি, অমন কথা মুখে আনতে নেই। মাসিমা শুনতে পেলে কি ভাববেন? তোর বাড়ীতে ও আর ওঁরা চিরকাল থাকতে আসেননি। তুই অত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন?

তরঙ্গিণী কেমন করিয়া বলিবে সে কেন ব্যস্ত হইতেছে। তাহার যে দুঃখ তাহা সহিবারও নয় বলিবারও নয়। তরঙ্গিণী বলিল—ব্যস্ত হব না। খোকা হয়ে অবধি ত তুমি আমায় আগের মতন যত্ন কর না। তার ওপর মাসিমা এসে ত তোমায় একদণ্ড কাছে পাওয়াই ভার হয়েছে। তুমি আর কারু বেশি যত্ন করলে আমার বড় রাগ হয়।

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর চিবুক স্পর্শ করিয়া নিজের হস্ত চুম্বন করিয়া বলিল—হিংসুটে, ভয় নেই রে ভয় নেই, তোর দিদিকে তুই না ছাড়লে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

ইহার পর তরঙ্গিণী নৃত্যকালীকে আর কিছু বলিতে পারিল না। সে আস্তে আস্তে গিয়া মাসিমার কাছে বসিয়া বলিল—মাসিমা, তুমি কবে বাড়ী যাবে?

– বাড়ী ত শিগ্‌গির যাওয়া দরকার। বাড়ীতে সব অরক্ষিত করে ফেলে ছড়িয়ে রেখে এসেছি। ইঁদুরে বাঁদরে কি করছে তার ঠিক নেই। কিন্তু তোর ঘর করারও ত একটা বিলিবন্দেজ না দেখে আমি নড়তে পারছিনে।

—আমার ঘরকন্নার বিলিবন্দেজ আমি করে নেব, তার জন্যে তোমার ঘরকন্না অরক্ষিত করে থাকতে হবে না মাসিমা।

—কেন, আমাকে তুই তাড়াতে পারলে যে বাঁচিস দেখছি।

তরঙ্গিণী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না তা কেন। তবে জামাইবাড়ী এতদিন এসে আছ, আমার ভারি লজ্জা করছে।

—জামাই কি কিছু বলেছে?

—না।

—তবে এ ডাইনী মাগী কিছু বলেছে বুঝি। যাই দেখি একবার মাগীর ধুদ্ধুড়ী ধুয়ে দিয়ে আসি! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা। আমি কি তার বাপের বাড়ীতে এসেছি?- -এ আমার আপনার বোনঝির বাড়ী? খুব করব আসব। একবার কেন একশ বার আসব। কোথায় সেই শতেকখোয়ারী হারামজাদী মাগী!

তরঙ্গিণী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ মাসিমা, কি কর? দিদি কিচ্ছু বলে নি।

বামা হাসিয়া পরম বিজ্ঞস্বরে বলিল—মুখে না বলুক, মনে মনে বলেছে। গুণ করে নিজের মনের কথাটা অ্যার মনে চালান করে দিইচে।

মাসিমা বলিল—বামা, আজকে ত শনিবার আছে। আজ সন্ধ্যেবেলা তোর সেই জলপড়াটা তরুকে দিস ত। গুণ টুন গুণো কেটে যাবে।

বামা বলিল—তাই খেয়ো দিদিমণি, তাই খেয়ো। বড় জবর জলপড়া। এ আমাদের গাঁয়ের বিন্দে হাড়ি তুষ্টু গয়লাকে শিখিয়েছিল ; তার ঠেঞে মোর শিক্ষে। এর ফল পেরতক্ষ হাতে হাতে দেখে নিয়ো। যেমন জলটুকু খাবে অমনি বুক এস্তক হিম হয়ে যাবে, প্রাণডা যেন জুড়োবে। আর যে নোক গুণ ওষুধ করেছে তাকে একেবারে বিষ নজরে দেখবে।

দিনের পর দিন অহরহ ও অনুক্ষণ এইরূপ মন্ত্র জপ শুনিতে শুনিতে ক্রমশ তরঙ্গিণীর মনও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সত্যই ত সতীন তাহাকে কেন ভালোবাসিবে, সতীনকে কি কখনো ভালো বাসা যায়? যে স্বামীর ভাগ কাড়িয়া লইয়াছে তাহাকে ভালো বাসা কি সোজা কথা? আব একজন মেয়ে যদি নোলক পরিয়া আসিয়া মল বাজাইয়া এখন তাহার স্বামীর হৃদয় জুড়িয়া বসে তবে কি তরঙ্গিণী তাহাকে একদণ্ডও বরদাস্ত কবিতে পারে? সে তাহাকে নখে টিপিযা মারিযা তবে নিশ্চিন্ত হয। নিজেব ছেলে হয় নাই বলিযা নৃত্যকালী তবঙ্গিণীকে ঘরে আনিয়াছিল , এক্ষণে তাহাব ছেলেটি দখল কবিযা সে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছে। ছেলে হওযাব পব হইতে নৃত্যকালী ত বাস্তবিকই তাহাকে আব তেমন যত্ন করে না, তাহার খাওযা পবা সম্বন্ধে আগের মতো খোঁজ খবব লয না। সমস্ত সংসাব তাহাব মুঠোর ভিতর, সে হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তবঙ্গিণীর। পাছে তরঙ্গিণী নিজেব সংসার দেখিযা শুনিয়া বুঝিযা লয় তাই তাহাকে নৃত্যকালী সংসাবের একখানা কুটা ভাঙিযা দুখানা কবিতে দেয না। তবঙ্গিনীকে একটিও কাজ করিতে না দিযা নৃত্যকালী যে একাই খাটিযা মবে, ইহা ত তাহাব মমতা নহে, পুবাদস্তুর স্বার্থপবতা। তবঙ্গিণীকে সমস্ত হইতে বঞ্চিত কবিবাব ফন্দি। সমস্তর না হোক, সে অদ্ধের্কেব ভাগী ত? অর্দ্ধেকেবই বা কেন? নৃত্যকালীকে অশ্রদ্ধা কবিযা ত্যাগ কবিযাই না তাহার স্বামী তাহাকে বিবাহ কবিযাছে? তাহাব স্বামীব যে পুত্রধনেব অভাব নৃত্যকালী হইতে মিটে নাই তাহা সেই না মিটাইযাছে? সমস্ত তাহাব—স্বামী তাহাব, খোকা তাহাব, ঘরকন্না তাহাব। অথচ তাহাব যেন কিছুই নয—স্বামী যেন নৃত্যকালীব দয়াব দান, খোকা বাজেযাপ্ত, ঘবকন্না বেদখল। ইহাব প্রতিকাব তাহাকে কবিতেই হইবে।

এত কথা তবঙ্গিণী নিজে গুছাইয়া মনে ভাবিতে পাবে নাই। তাহাব মাসিমা ও মাসিমাব সহচরী বামা বিনাইযা বিনাইয়া গুছাইযা গুছাইযা তাহাব মনেব সম্মুখে এই সমস্ত কথা দিনের পব দিন সাজাইযা ধবিতেছিল।

তবঙ্গিণী মুখ ভাব কবিযা থাকে। নৃত্যকালী যদি জিজ্ঞাসা কবে—তবি, তোব হল কি? অমন করে' থাকিস কেন?

তবঙ্গিণী বলে—না, কিছু ত হযনি। শবীবটা ভালো নেই।

প্রথম প্রথম নৃত্যকালী মনে করিত যে মাসিমা এতদিন আছে বলিযা বোধ হয় তবঙ্গিণী কুণ্ঠিত ও বিবক্ত হইতেছে। কিন্তু সে অল্প লক্ষ্য কবিযাই বুঝিল যে তাহাব অনুমান যথার্থ নয, এখন তবঙ্গিণী সদাসর্ব্বদাই তাহাব মাসিমাব কাছে কাছেই থাকে , তিনজনে মিলিযা সর্ব্বদাই ফিসফিস গুজগুজ হয়, নৃত্যকালীকে দেখিলেই চুপ কবে। নৃত্যকালী বুঝিল যে একটা কিছু ষড়যন্ত্র চলিতেছে, কিন্তু সে তরঙ্গিণীকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।

তবঙ্গিণীব মনে বদ্ধমূল ধারণা হইযা গেল যে নৃত্যকালী এতদিন তাহাকে নিছক ঠকাইয়া আসিযাছে। এখন সংসারেব ভার তাহার নিজের হাতে না লইলে নয। তখন তাহাব মনে পড়িল যে নৃত্যকালী একদিন তাহাকে বলিযাছিল যে যেদিন তাহার ইচ্ছা হইবে মুখ ফুটিযা বলিলেই সে সংসাব হইতে সবিয়া যাইবে। তবঙ্গিণী আস্তে আস্তে গিয়া নৃত্যকালীব কাছে গেল। নৃত্যকালী একবার তাহার গম্ভীর মুখেব দিকে তাকিয়ে বলিল—তবি, এতদিনে দিদিকে মনে পড়ল? এখন দিদিব কাছে থাকতে ভাল লাগে না, না?

তরঙ্গিণী বাঁ হাতের বালা ডান হাত দিয়া ঘুবাইতে ঘুরাইতে বলিল—দিদি, ভাঁড়ার-ঘরের আর সিন্দুকের চাবিগুলো আমাকে দাও।

নৃত্যকালী তাহার কথার অর্থ না বুঝিতে পারিয়া বলিল—কেন, কি নিবি?

তরঙ্গিণী মাথা নত করিয়া বলিল—কিছু নেব না।

—তবে?

—চাবিগুলো আমার কাছেই রাখব।

—তা হলে সংসার থেকে আমায় এতদিনে ছুটি দিচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

নৃত্যকালী হাসিয়া তরঙ্গিণীর মুখচুম্বন করিয়া বলিল—আঃ! বাঁচলাম তরি। তোর ঘরকন্না তোবই ত দেখা উচিত। এই নে চাবি। কিন্তু খোকাকে কেড়ে নিসনে লক্ষ্মী বোন আমাব।

নৃত্যকালীব চোখ হইতে বড় বড় ফোঁটায় দু'ধাবে অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

তবঙ্গিণী সেখানে আব থাকিতে না পাবিয়া উঠিয়া পড়িল। সে চলিযা যাইতেছে দেখিযা নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি আঁচলে চোখ মুছিযা বলিল—তরি, চাবি তো পড়ে বইল!

তবঙ্গিণী বলিল—না দিদি, চাবি আমাব চাইনে। তোমাবই থাক।

কোথা হইতে মাসিমা তাডাতাডি বাহিব হইযা চাবিগুলি হস্তগত করিযা বলিল—তক, বড় মেযে তোকে চাবি দিচ্ছে, নে। কেমন মেযে বাছা, বড মেয়ে চাবি বাখবে না, তুই বাখবি নে, ত বাখবে কে? থাক তবে আমবই কাছে।

মাসিমা চাবিগুলি লইযা তবঙ্গিণীব পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান কবিল। নৃত্যকালী অবাক হইযা মাসিমাব গমন পথেব দিকে চাহিযা বসিযা বহিল।

মাসিমা গিযা তবঙ্গিনীকে ভর্ৎসনা কবিযা বলিল—বোকা মেযে কোথাকাব। ডাইনীব চোখেব মাযা-কান্না দেখে অমনি গলে' গেলেন। ভাগ্যিস আমি কাছাকাছি ছিলাম।

বামা বলিল—সব ত লিলে, কিন্তু মাগীব প্যাটবাটা দেখলেনি। ঐটাব মধ্যে ও সব লুকিযে বেখে দিইচে।

মাসিমা বলিল—ভালো বলেছিস বামা। দেখ তরু, মাগীব প্যাঁটবা একবাব খুলে দেখে নিগে যা।

তরঙ্গিণী জোরে ঘাড নাডিযা দৃঢ়স্বরে বলিল— সে আমাকে দিযে হবে না মাসিমা।

—তবে আমি বলিগে।

—না মাসিমা, খববদাব ও বকম কবে দিদিকে অপমান কবলে আমি মাথায কাটাবী মেবে বক্তগঙ্গা হব।

মাসিমা অমনি নাকি কান্নাব সুবে বলিয়া উঠিলেন—ওমা, কি সর্ব্বনেশে কথা বলিস তক। যার জন্যে চুরি কবি সেই বলে চোব! কি জবর ডাইনী ও মাগী। তোকে একেবাবে বশ কবে ভেড়া কবে বেখেছে। তোব যা খুশি করগে যা, কালকে আমি বাড়ী চলে যাব। কেন বে বাপু নিজেব সব বইযে ছইযে পবেব জন্য বুকেব বক্ত জল কবা।

মাসিমা ক্রমশ ফোঁস ফোঁস করিতে কবিতে চক্ষে অঞ্চল আবোপ কবিল। বামাও চোখ মুছিতে লাগিল।

তরঙ্গিণী শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল , একটিও সান্ত্বনার কথা বলিল না।

পবদিন মাসিমার বাড়ী যাইবাব কোনো উদ্যোগই দেখা গেল না। বরং উল্টা মাসিমা ভাঁড়াব ঘবেব চাবি হাতে পাইয়া সংসাবের বিলি বন্দেজ কবিতে মনঃসংযোগ করিল। রোজ দুধ লওয়া হয় দুই সের এক সের খোকা খায়, আধ সের খোকার বাবা পায়, বাকি আধসের নত্যকালী ও তরঙ্গিণী খাইত। মাসিমা আসাব পব নৃত্যকালীব দুধেব ভাগ মাসিমাব বরাদ্দ

হইয়াছিল। সেই ববাদ্দর কাযেমি হইয়া গেল। রাত্রে সকলেই লুচি খাইত ; এখন নৃত্যকালীব জন্য ভাতের ববাদ্দ হইল—এয়োস্ত্রী মানুষের দুবেলা ভাত খাওয়াই ত উচিত।

মাসিমা বিধবা মানুষ, তাঁহার লুচি ত না খাইলেই নয। বছরে চারখানা কাপড়েব বেশি কেনা বাজে খবচ, ফোতো নবাবী—নৃত্যকালীর বাক্সভরা কাপডআছে, পূজার সময তাহার আর নূতন কাপড় কেনাব দরকাব নাই। নৃত্যকালী দোক্তা খায বলিয়া তাহাব পানেব খবচ বেশি—নেশা ভাঙ যাহাব কবিতে হয সে নিজেব খবচে করুক, সংসাব হইতে সে বাজে খরচেব জন্য পয়সা কেন পাইবে? বাড়ীতে দুজন দাসী ছিল, একজন সংসারের ঘরকন্নাব কাজ কবিত, আর একজন দুই বৌ-এব কাজ করিত—এখন একজন ঘবকন্নাব কাজ কবিযাই ছুটি পায না, অপবজন তরঙ্গিণীব কাজ কবিয়া মাসিমার বাতে তেল মালিশ করিয়া ও মাথার পাকা চুল তুলিয়া সময় পায় না।

নৃত্যকালী কিন্তু হাসিমুখেই এ সমস্ত সহ্য করিতেছিল। সে একদিনে দোক্তা আর পান খাওয়া ছাড়িযা দিল। নিজেব কাপড সে নিজে কাচে। অশ্রদ্ধাব দানও সে হাসিমুখে গ্রহণ করে। কেহ তাহাকে কাজ কবিতে দেখিযা কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে বলে—বাড়ীতে দুটি বৌ ত ঝি নেই, কুটুম্ব মানুষ বাড়ীতে, পাছে তাঁদের কষ্ট হয তাই ঝিযেদেব ওঁদেব কাছে কাছেই থাকতে বলে দিয়েছি।

এইরূপ বিলি বন্দেজ করিয়া মাসিমা দেখিল যে নৃত্যকালী কোনো আপত্তি তুলিল না, জামাইযের কানেও এ কথা উঠিল না, তখন সে সাহস পাইয়া তবঙ্গিণীব কানে মন্ত্রজপ কবিতে সুরু করিযা দিল — দেখ্ তরু তুই কি ভাবছিস জানিনে, আমি তোবই ভালোর জন্যে সংসাবের খবচ কমিযে আনছি—যে দু'পযসা বাঁচবে সে তোবই, আমাব কি বল্‌না। কিন্তু মাগী কি শয়তান, টুঁশব্দটি কবছে না। ও কি তুকতাক করবাব মতলবে আছে। তোব সোযামীর কাছে তোর যে আদব সে তোব খোকাব জন্যেই না? নইলে ও হ'ল, গিযে ওব সমযেব বৌ, ওব ওপর সোযামীব যতখানি টান হয়ে ততখানি কিছু আব তোব ওপব হবে না। এখন খোকাব কোনো বকম ভালো মন্দ কবতে পাবলেই ওব মনস্কাম সিদ্ধ হয। এখন খোকাকে ত ওব ত্রিসীমানায যেতে দেওযা ঠিক হবে না। দেখিসনে খোকাকে সামনে বসিযে একদৃষ্টে হাঁ কবে কেমন তাকিযে বযেছে।

তবঙ্গিণীব বুকের ভিতর ধুপ্ করিযা উঠিল। বাস্তবিক ত সে দেখিযাছে নৃত্যকালী খোকাকে সামনে বসাইয়া রেখে তাহাকে দেখে। তাই সে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা কবিল—অমন কবে তাকিয়ে থাকলে কি হয?

বামা বলিল—বুকের বক্ত শুযে নেয গো বুকেব বক্ত শুযে নেয। মন্তর পড়ে সাত দিন তাকালেই হাতি মালট খায ও ত একবত্তি বাচ্চা। আমাদেব গাঁযেব ইচ্ছে বুড়ী অমনি কবে আমার ভাসুর-পোব পেবাণডা শুযে খেযেছিল—না গা মা ঠাকরুণ, তুমি ত সব জান!

মাসিমা মুখ অত্যন্ত ম্লান কবিযা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—হ্যাঁ মা জানি বলেই ত ভাবনা। কিন্তু তরু ত কথা শুনবে না। জামাইকে বলে' ওকে এক্ষুণি বাড়ী থেকে বিদেয কবে দেওয়া উচিত!

মাসিমার অবিশ্রাম মন্ত্রজপে তবঙ্গিণীব মন নৃত্যকালীব উপব বিরূপ হইয়া উঠিলেও সে একবার বাঁকিতে ছিল, এক একবাব দিদিব প্রাণ-ঢালা স্নেহ স্মবণ কবিযা সমস্ত বিরূপ ভাব মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু যখন তাহাব বিশ্বাস জন্মিল যে তাহাব সৌভাগ্যেব নিদান বুক চেরা ধন খোকাকে প্রাণে মারিবাব জন্য নৃত্যকালী চেষ্টায আছে, তখন তরঙ্গিণীর মন নৃত্যকালীকে একেবাবে বিষেব মত বোধ কবিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তবঙ্গিণী স্বামীকে গিযা বলিল—ওগো শুনেছ, বড় গিন্নি আমাব খোকাকে রোজ তুক করে ...

নৃত্যকালী কিছু না বলিলেও তাহার স্বামী অনুমানে বুঝিতে পারিতেছিল যে মাসিমার ব্যবহার নৃত্যকালীর প্রতি বিশেষ হৃদ্য ত নহেই, বরং নৃত্যকালী যেন কিছু উৎপীড়িত হইতেছে। মাসিমা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া তাহাদের সুখের সংসারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ঘটানোতে তরঙ্গিণীর স্বামী তরঙ্গিণীর উপরও একটু বিরক্ত হইয়াই ছিল, মনে করিতেছিল সেই বোধ হয় মাসিমাকে ধরিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছে। তাই এখন তরঙ্গিণীকে নৃত্যকালীর নামে লাগাইতে শুনিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া রাগ করিয়া বলিয়া উঠিল—যাও যাও যাও, ওসব ছোটলোকের মত কথা শুনতে চাইনে। ও বুকের রক্ত জল করিয়া তোমার ছেলে মানুষ করছে কিনা, তার এই পুরস্কার ! কে তোমাকে এসব শেখাচ্ছে? আগে ত তুমি এমন মেয়ে ছিলে না। ফের ও রকম কথা মুখে আনলে ঝাড়ে মুছে সবাইকে একদিনে একসঙ্গে দূর করে দেবো!

সূত্রপাতেই স্বামীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া তরঙ্গিণী কাঁদিয়া গিয়া মাসিমার কাছে পড়িল। মাসিমা তা শুনিয়া বলিল—এ সমস্তই ঐ ডাইনী মাগীর খেলা মন্তর পড়ে' তোর ওপরে জামাইয়ের মন চটিয়ে দিচ্ছে, হয় নয় তুই ভেবে দেখ—জামাই কি কখনো তোকে এমন করে' একদিনও বকেছে?

তরঙ্গিণী দেখিল, সত্যই ত, স্বামী শুধু সোয়াগ করিয়াছে, তিরস্কার আজ এই প্রথম এবং অতি অকস্মাৎ। তখন তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তাইত মাসিমা, তবে কি হবে?

মাসিমা গম্ভীর ভাবে বলিল—আমি ত বাছা কবে থেকে পয পয করে বলছি যে বিষদাঁত চেপে বসবার আগে সাবধান হ। এখন ও কামড়ে ধরেছে—তোর কপাল ভাঙতে আর দেরি নেই। সোয়ামীর মন কেড়ে নিলে, ছেলে কেড়ে নিলে, তোর আর থাকল কি! আহা ছেলে নয়ত যেন রাজপুত্তুর। রোগে ভোগে মরে, সহ্য হয়, এ আলটপকা গিলে খাবে গা।

সর্ব্বনাশের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বাঁচাই আর কেমন করে মা—মাগীর চোখের আড়াল না করলে শিবের সাধ্য নেই যে বাঁচায়। একেবারে মক্‌খম্ কামড় কামড়েছে! ছেলে দিনকের দিন একেবারে নীলমূর্ত্তি হয়ে উঠেছে দেখছিস নে?

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তবে মাসিমা আমি খোকাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে পালিয়ে যাই চল।

মাসিমা হতাশ ভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না মা, তাতেই কি নিস্তার আছে! খোকার নাড়ী পোঁতা যে এখানে। নাড়ীর টানে ঐ প্রাণপুরুষকে টেনে বার করে আনবে।

তরঙ্গিণী ভয়ে একেবারে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া বলিল—মাসিমা তবে উপায়?

—উপায় এক-মাত্তর ঐ মাগীকে সরানো।

— কেমন করে সরাব? ওঁকে বলতে গেলাম

রামা বলিয়া উঠিল—না না, অমন করে নয়। ডাইনীকে কি অমন করে সরায়? তুক তরিবৎ করে সরাতে হবে।

তরঙ্গিণী ব্যস্ত হইয়া বলিল—তুই কিছু জানিস রামা?

রামা ঘাড় কাত করিয়া আতার বীচির মতো মিশ দেওয়া কালো কালো দাঁত বাহির করিয়া বলিল— হ্যাঁ, তেরোস্পর্শ দিনে তেমাথা পথের উপর ঘেঁটফল আর নিব্বিধরী দিয়ে ঘেঁটুঠাকরুণের পূজো করতে হবে, উপোষ করে ভরসন্ধ্যেবেলা ঠিক যেই একটি তারা

উঠেছে অমনি একটা আফলা শিমূল গাছের কাছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে সাতটা পাতা তুলতে হবে, আর মন্তব বলতে হবে—

শিমূল, শিমূল, শিমূল!
শত শত্তুর নির্ম্মূল।
আঠায় কাঁটায ভরা গা,
শত শত্তুরের মাথা খা!
আঠায় আঁটো
কাঁটায বেঁধো,
যে আমার সঙ্গে শত্তুরতাই সাধে
তার সঙ্গে শত্তুবতাই সেধো।

তারপব সেই সাতটি পত্তব মাথায় করে নিযে উলুঙ্গু হয়ে জলে যমেব দুয়োর দক্ষিণামুখো হয়ে একটা ডুব দিতে হবে। পাতা সাতটি ভেসে উঠলেই বুঝবে যে নিব্বিধবী হয়েছে আব একটি পাতাও যদি মাথায় লেগে থাকে তবে বুঝবে যে কামড় তখনো ছাড়েনি।

মাসিমা তাডাতাড়ি বলিল—তোব সেই পাগলাকালীব গুঁডোটা তককে দিস না? যতবডই ডাইনী হোক, মাকালীব কাছে ত আব বডাই খাটবে না?

বামা বলিল—হ্যা দ্যাখ! ডাকিনী যোগিনী হল গে মা-কালীব দাসী, মা-কালীব কাছে তাদের আবার বডাই কি? বড্ডি মনে কবেছ মাঠাকরুণ! সেই গুঁডোর একবত্তি দিলেই যত বড় ডাইনি হোক চোখ উল্টে পডতেই হবে। সে গুঁডো কি আমি কম কষ্টে জোগাড় কবেছিনু? গয়েসপুরেব কালীর মোহন্তকে এক বোতল মদ দিযে ছিদাম মোডল এনেছিল—বল্লে না পেত্যয় যাবে, অমাবস্যের রাত্রে চাঁড়ালের মাথার খুলিতে চিতাব আগুনে মদ দিযে ঐ ওষুধ তৈরি। ওব কি কম মাহিত্তির!

এই বলিযা বামা করজোড়ে উদ্দেশে কি জানি কাহাকে প্রণাম কবিল। দেখা-দেখি মাসিমাও প্রণাম কবিল। ভয়ে ভয়ে তরঙ্গিণীও করিল।

তবঙ্গিণী বলিল—সে কি গুঁড়ো? বিষ টিষ নয তো?

বামা বলিল—আবে বাম বাম! বিষ লয, বিষ লয়। মা-কালীব পেবসাদ, চবণধূলি।

স্থিব হইয়া গেল বামার উপদেশ অনুসাবে তবঙ্গিণী নৃত্যকালী ডাইনীকে ঝাড়াইয়া ভিটে মাটি ছাডা কবিবে।

একাদশীর দিন সমস্ত তুকতাক করিযা তবঙ্গিণী এক বাটি দুধেব সঙ্গে একটা শাদা গুঁড়ো মিশাইয়া রাখিল, বাত্রে নৃত্যকালীকে খাইতে দিবে, সকালে সে চক্ষু উল্টাইযা পড়িযা থাকিবে। তবঙ্গিণী বার বাব করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ বামা, বিষ-টিষ নয তো?

বামা বলিল—বিষ কেনে হবেক গো? আমবা কি মানুষ খুন কবি?

তরঙ্গিণী ভযে বিবর্ণ মুখে বলিল—দেখিস বামা, হিত কবতে যেন বিপবীত না হয।

বামা জোর দিযা বলিল—লা গো লা, তোমাব কিচ্ছু ভয লেই।

সন্ধ্যার পর নৃত্যকালী রান্নাঘরে খোকাব দুধ আনিতে গেল। তাহাকে রান্নাঘরে যাইতে দেখিযাই তবঙ্গিণী জিজ্ঞাসা কবিল—দিদি, কি নেবে?

—খোকার দুধ।

—খোকার দুধ ঐ ক্ষিত্তুরে বাটিতে আছে। ঐ সব ফুলে বাটির দুধ নিয়ো না যেন, ও দুধ তোমার জন্যে আছে।

নৃত্যকালী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া বলিল—আমার জন্যে। আমি কি দুধ খাই?

তরঙ্গিণী থতমত খাইয়া অপ্রতিভ হইযা বলিল—মাসিমাব আজ একাদশী কিনা, তাই একটু রেখেছি।

নৃত্যকালী আর কিছু না বলিয়া বান্নাঘরে গিযা দু-বাটিব দুধ এক করিযা খোকাকে খাওয়াইতে লইযা গেল।

তরঙ্গিণী দেখিল যে নৃত্যকালী জগন্নাথী বাটিতেই দুধ লইয়া গেল। কিন্তু তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইযা উঠিল। সেই সাদাগুঁড়ো মা-কালীব চবণবেণু বলিযা এতক্ষণ মনকে বোকা বুঝাইবার চেষ্টা করিলেও, ভুলক্রমে খোকার তাহা খাওযাব সম্ভাবনা মনে কবিয়া তবঙ্গিণী ব্যস্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই সাদা গুঁড়া যে বিষ, ইহা এখন সে নিজেব মনেব কাছে কিছুতেই অস্বীকাব কবিতে পাবিল না। সে ভাবিতে লাগিল সাদা গুঁড়া মিশাইয়াছিল সরফুলে বাটিতেই ত ঠিক? শ্রীক্ষেত্রের বাটিতে ত নয়? ভাবিতে ভাবিতে তাহার সমস্ত গোলমাল ঠেকিতে লাগিল—একবাব মনে হয শ্রীক্ষেত্রেব বাটিতে গুঁড়া মিশাইযাছে, একবার মনে হয সবফুলের বাটিতে। সে ব্যস্ত হইয়া বান্নাঘবে যে বাটি আছে তাহাতে আঙুল দিযা দেখিতে গেল তলায গুঁড়া থিতাইযা আছে কি না। বাটিতে আঙুল দিতেই দেখিল বাটিতে দুধ নাই. বাটিব তলায় গুঁড়া কিচকিচ কবিতেছে। তরঙ্গিণী একেবাবে পাগলের মতো হইযা ঝড়ের বেগে ঘর হইতে ছুটিয়া যাইতে যাইতে চীৎকাব কবিযা বলিযা উঠিল—দিদি দিদি, ও দুধ খোকাকে খাইয়ো না, খোকাকে ও দুধ খাইয়ো না!

তবঙ্গিণী দালানে উঠিযা দেখিল নৃত্যকালী খোকাকে ঝিনুকে কবিযা দুধ খাওযাইতেছে। তবঙ্গিণী বাঘিনীব মতো ঝাঁপাইযা পড়িয়া একহাতে নৃত্যকালীব হাত চাপিযা ধবিয়া অপব হাতে বাটি তুলিযা এক নিশ্বাসে সমস্ত দুধটা নিজে খাইযা ফেলিযা বাটিটা দূবে আছড়াইযা ফেলিযা দিল।

নৃত্যকালী হাসিযা গডাইতে গড়াইতে বলিল, আ মব পোড়াবমুখী, তুই দিনকেব দিন পাগল হচ্ছিস নাকি, ছেলের দুধটা খেযে ফেল্লি, আমি এখন খোকাকে কি খাওযাই বলত?

এতক্ষণে তরঙ্গিণী নিশ্বাস লইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিযা উঠিযা নৃত্যকালীর পা ধবিয়া বলিল—দিদি শযতানীদের কথা শুনে আমি বিষ দিযেছিলাম। তোমায খাওয়াব বলে। তাব ফল আমি হাতে নাতে পেলাম। দিদি, তোমাব খোকাকে তুমি বাঁচাও।

নৃত্যকালী তাড়াতাড়ি খোকাব গলায আঙুল দিযে খোকা যে দু ঝিনুক দুধ খাইযাছিল তুলিযা ফেলিলে সুস্থ সবল খোকা একটু অবসন্ন হইযা থাকিল। পবে চাঙ্গা হইযা উঠিল। কিন্তু ডাক্তাবেব চেষ্টাতেও তবঙ্গিণী বাঁচিল না। তরঙ্গিণী অজ্ঞান হইযা পডিতে পড়িতে ক্ষীণকণ্ঠে একবাব জিজ্ঞাসা করিল—দিদি, খোকা বাঁচবে?

নৃত্যকালী তবঙ্গিণীর ভূমিলুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিযা লইযা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাঁচবে লো বাঁচবে। তুইও বেঁচে উঠে তোব খোকাকে তুই নে. আমি আর তোর খোকাব ভাগ নেব না।

তরঙ্গিণী আশ্বস্ত হইযা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! দিদি, তোমাব খোকা, তোমারই রইল! আমাব অপরাধ ক্ষমা কোরো! পায়েব ধুলো দেও দিদি। একবাব ওঁকে ডাক, পাযেব ধুলো নেব!

এমন সময় মাসিমা ডুকরাইয়া কাঁদিযা আসিয়া পড়িল—ওবে তরু রে, এ কি সর্ব্বনাশ হল রে!

তরঙ্গিণী নৃত্যকালীর দিকে বিষাবিষ্ট ম্লান দৃষ্টি ফিরিযা লইযা বলিল—আঃ দিদি! ওদের এখান থেকে দূর করে দাও।

ছুটি

ইন্দিরা দেবী

প্রবাসে আত্মীযহীন মুন্সেফ হীরালাল মিত্র যখন পীড়িতা পত্নী ও ছয মাসেব শিশুকন্যার তত্ত্বাবধানে প্রতি মুহূর্তে বিপন্ন হইযা উঠিতেছিলেন, সেই সমযে তাঁহাব পিতাব আমলেব বৃদ্ধ ভৃত্য রাইচবণ দেশ হইতে ফিরিয়া আসিযা তাঁহাকে অনেকটা মুক্তিদান কবিল। পশ্চিমে বাঙ্গালী ঝি পাওয়া যায না, হিন্দুস্তানী দাসী লইযা কাজ চালানো যে কতদুব শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর, তাহা পশ্চিমপ্রবাসী বাঙ্গালীমাত্রেবই অল্পবিস্তব জানা আছে। তাই বাইচবণ যখন স্বেচ্ছায মাতৃদুগ্ধ-বঞ্চিতা শিশুর সেবাব ভাব গ্রহণ কবিল তখন বাবু অনেকটা নিশ্চিন্ত হইযা বলিলেন, "রাইচরণ, ওকে তোমায দিলুম।" বাইচবণ মনিবেব কথায় একটু হাসিযা ক্ষুদ্র শিশুটিকে আপনার বক্ষেব মধ্যে গ্রহণ কবিল।

অনেক দিনেব কথা, সে আজ প্রায ২০ বৎসর হইবে — বাইচবণেব ক্ষুদ্র কুটীবেও একদিন এমনি একটি ক্ষুদ্র বালিকাব আবির্ভাব হইয়াছিল, সে আজ নাই. অনেক দিনেব পব তাহাব স্নেহপ্রবণ পিতৃহৃদয আজ আবাব নতুন কবিযা সেই পবলোকগতা দুহিতাব বিযোগ-শোক অনুভব কবিল। — সে এই মাতৃস্নেহ-বঞ্চিতা শীর্ণদেহা গৌবাঙ্গী দুহিতাব অসাধাবণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইল। ইহাব হাস্যে ও বোদনে এবং প্রত্যেক কার্যে তাহাব শিশুকন্যাব স্মৃতি পবিস্ফুট হইল। বাইচরণেব বয়স পঞ্চাশ অতিক্রম কবিযাছিল, তাহাব স্বাস্থ্যও তত ভাল ছিল না। সম্প্রতি দেশে ম্যালেবিযায় ভুগিযা তাহাব জীর্ণ দেহ একেবাবেই ভাঙ্গিয়া পডিযাছিল। দেশে বাইচরণেব এক উপযুক্ত পুত্র ও দুই ভ্রাতা ব্যতীত কেহই ছিল না , পত্নী ক্ষেমঙ্কবী এয়োতিব চিহ্ন লইযা ইতিপূর্বেই তাহাব গৃহশূন্য কবিযা স্বর্গাবোহণ কবিয়াছিল।

বাইচরণ এই ক্ষুদ্র শিশুকন্যাটি এমনি স্নেহে পালন কবিতে আবম্ভ কাবিযাছিল যে, সম্ভবত বালিকাব প্রসূতিও তাহাকে অধিকতব স্নেহযত্ন কবিতে পাবিতেন না। পা ছাড়াইযা বসিযা ঝিনুকে কবিযা দুগ্ধ পান করান হইতে তাহাব ছোটখাট সমস্ত কার্যই সে অতি যত্ন ও নিপুণতাব সহিত সম্পন্ন কবিত, এবং কখন কোলে লইয়া দোলাইতে দোলাইতে, কখনও বা বুকে কবিযা বেড়াইতে বেড়াইতে, মৃদু-গুঞ্জনে ঘুম-পাড়ানিব গান করিযা শিশুব নিদ্রা আনযন করিত। সমস্ত রাত্রি বিহঙ্গ-মাতা যেমন কবিযা পক্ষ আচ্ছাদনে তাহাব শাবকটিকে বক্ষা করে, তেমনি কবিযা সে এই শিশুটিকে আপনার বক্ষেব মধ্যে লুকাইযা বাখিত। মেয়েটিও খুব শান্ত হইয়াছিল, প্রাযই কাঁদিত না। রাইচবণ আদব কবিয়া তাহাব নাম দিয়াছিল লক্ষ্মী। পিতামাতা পছন্দ করিযা কন্যাব নাম রাখিযাছিলেন স্নেহলতা। কিন্তু পাছে রাইচবণ মনঃক্ষুণ্ণ হয়, তাই সে নামে কেহই তাহাকে ডাকিত না। বালিকাব লক্ষ্মী নামই বহাল রহিল।

দুই বৎসর বোগে ভুগিয়া গৃহিণী যখন সুস্থ দেহে কন্যার পালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন সহসা বাইচরণেব মনে হইল তাহাব সমস্ত কার্য ও কর্তব্য ফুবাইযা গিয়াছে। দুই বৎসর লক্ষ্মীকে লইয়া এমনিভাবে সে আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল যে, সে ইচ্ছা হইতে মুক্ত হইবাব তাহার ইচ্ছা বা সাধ্য ছিল না। দুই বৎসবের পবে আবাব

নূতন করিয়া সংসারের কাজকর্ম করা তাহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়াই মনে হইল। এক কার্য করিতে গিয়া সে অন্য কার্য করিয়া ফেলিত। কর্তার জন্য চা তৈয়ারী করিতে গিয়া দেখিত লক্ষ্মীর জন্য দুধ লইয়া আসিয়াছে। বাজার করিতে গিয়া দেখিত মাঠাকুরাণী যাহা বলিয়া দিযাছেন সে তাহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। অবশেষে অপ্রতিভ হইয়া নিরস্ত্র হইত। গৃহিণী যদি কখনও রাগ করিয়া বলিতেন, "রাইচরণ, তুমি দিন দিন যেন কি হয়ে যাচ্চ!" রাইচরণ অল্প হাসিয়া বলিত, 'আব মা! বুড় হলুম, ১৪, ১৫ গণ্ডা বয়েস হল, আব কি শরীরে জোর আছে, না কিছু মনে থাকে, এখন যম ডেকে নিলেই হয়।" কিন্তু লক্ষ্মীর জন্য কোন কার্যেই তাহার শ্রান্তি বা ভুল দেখা যাইত না। সংসাবে কাজ সারিয়া অবকাশ কাল লক্ষ্মীকে লইযা খেলা কবাই তাহার প্রধান সুখের সময় ছিল। বালিকা লক্ষ্মীও মাতৃহস্ত হইতে উদ্ধাব পাইলেই ছুটিয়া বাইচরণের ক্রোড়ে গিযা লুকাইত। তাহার দুগ্ধ পান, পোশাক পরা, এবং বাত্রে নিদ্রার অনুষ্ঠান রাইচবণ না হইলে কোন মতেই সম্পন্ন হইত না। লক্ষ্মী বাইচবণকে "চন্নদা" বলিয়া ডাকিত — যদিও ইহা কেহই তাহাকে শিখাইয়া দেয় নাই। ইহাতে তাহাব মাতা পিতা আশ্চর্যান্বিত না হইলেও রাইচবণ কিন্তু এই প্রকাব অসাধাবণ বুদ্ধিমত্তায বিস্ময়ে অভিভূত হইযাছিল। অবশেষে রাইচরণেব বিস্ময বৃদ্ধি কবিযা লক্ষ্মী যখন বাপকে 'বাবা' ও মাকে 'মা' বলিতে আরম্ভ কবিল, এবং হিন্দুস্থানী চাকবদেব অনুকরণে নানারূপ ভাষা ও ক্রীড়াব অভিনয় দেখাইতে লাগিল, তখন বাইচবণ তাহার জীবনাশায় এক প্রকাব হতাশ হইয়া পড়িল। কিন্তু শিশু লক্ষ্মীর পালনভাব গ্রহণ কবিযা দুই বৎসর সে দেশে যায নাই। ইতিমধ্যেই দেশ হইতে তাহাকে যাইবার জন্য অনেক অনুবোধপত্র আসিযাছে। বাইচবণেব পুত্র বামাচরণ তাহাকে কর্মে জবাব দিযা যাইবাব জন্য অনেক অনুবোধ করিযাছে, উপযুক্ত পুত্র থাকিতে এই বৃদ্ধ বযসে দাসত্বেব কোন প্রযোজন নাই তাহাও সে লিখিতে ক্রটি কবে নাই। রাইচবণ কিন্তু প্রতি পত্রেই কর্মত্যাগ বিষযে স্বীয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করিযা জানাইয়াছে যে, শীঘ্রই সে যাইবাব জন্য ছুটী লইবে। কিন্তু মনিবকে ছুটীর জন্য কোন দিনই জানায নাই, কি জানি যদি ছুটী চাহিলেই পাইয়া যায়! তখন সে কেমন কবিয়া লক্ষ্মীকে ছাড়িযা থাকিবে? তাহাব অবর্তমানে না জানি লক্ষ্মীব কত কষ্টই হইবে। সেই ক্ষুদ্র বালিকা তাহাকে যে মাযাজালে বদ্ধ কবিযাছিল তাহা ছাডাইবার শক্তি ও ইচ্ছা তাহাব ছিল না। সেবাব দুই বৎসবেব পর দেশে গিযাও বাইচবণ পনের দিনেব অধিক থাকিতে পাবে নাই। লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, "মনিব ছাড়েন না।" কিন্তু বাস্তবিক মনিব ছাডিলেও তাহাব ছাড়িয়া যাইবাব সাধ্য ছিল না। এদিকে বযসেব সহিত তাহাব স্বাস্থ্যও দিন দিন ভাঙ্গিযা যাইতেছিল।

২

বাবু বলিলেন, "রাইচরণ, তোমার শরীর দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে, দিন কতক না হয় বাড়ী থেকে ঘুরে এস, আমি তোমায় ছুটী দিচ্ছি।" মনিবের কথায় রাইচরণ নতশিরে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু তাহার মুখে সন্তোষের বিন্দুমাত্র চিহ্নও দেখা গেল না। বাবু চলিয়া গেলে রাইচরণ আপনার বস্ত্র প্রান্তে চক্ষু মার্জনা কবিল। লক্ষ্মী এখন বড় হইয়াছে ; বাইচরণকে আর তাহার কোন কাজই করিতে হয় না। বরং লক্ষ্মীই এখন রাইচরণের তত্ত্বাবধান করে, তাহার আহারের সময় আপনি কাছে গিয়া বসে, এবং 'চন্নদার' কেন একখানা মাছ বলিয়া ব্রাহ্মণীর সহিত ঝগড়া বাধায়। দুপুর বেলা আহারান্তে 'চন্নদাব' পাকাচুল তুলিতে গিয়া তাহার কেশবিরল মস্তক অধিক কেশশূন্য করিয়া ফেলা লক্ষ্মীর একটা প্রধান ও নিত্য কার্যের মধ্যে ছিল। রাইচরণ তন্দ্রা-জড়িত অর্দ্ধমুদ্রিত নেত্রে তাহাদের দেশের কথা, তাহাব

নাতি ক্ষেতু ও নাতনী মেনুর কথা ও আবও অনেক সামান্য অসামান্য বিষয়েব গল্প কবিত, আর এই মুগ্ধা বিশ্বস্তহৃদয়া প্রবাসিনী বালিকা পরম আগ্রহের সহিত তাহা শ্রবণ করিত। কল্পনা নেত্রে সেই গোময়লিপ্ত বা আলিপনাচিত্রিত মৃৎকুটিরগুলি, সরিষা ফুলের হবিৎ ক্ষেত্র ও বঙ্গবাসিনী পল্লী বালিকা ও বধূদের কথা চিন্তা করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ কবিত। সেই এক কথাই প্রতিদিন বলিত, তথাপি এই বৃদ্ধ বক্তা ও বালিকা শ্রোত্রীব তাহাতে বিবক্ত বা শ্রান্তি ছিল না। কোন দিন মাকে লুকাইয়া তাঁহার কেশ রচনাব "কুন্তলীন" আনিয়া রাইচরণের সহস্র অনুনয় উপেক্ষা করিয়া সে তাহার কেশবিবল শুভ্রমস্তকে অতি যত্নেব সহিত মাখাইয়া দিত; এবং পরম বিশ্বস্তভাবে প্রতি মুহূর্তে চন্নদাব শুভ্র মস্তকে নবোদ্ভূত কৃষ্ণ কেশের আবির্ভাবের প্রতীক্ষা কবিত। রাইচবণ কৃত্রিম রাগ করিয়া বলিত, "তুই আমায় এমন কোরে জ্বালাতন কচ্ছিস্, চল্, মাকে বলে দিয়ে আসি" — লক্ষ্মী হাসিয়া বলিত, "না চন্নদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি মাকে বলো না। আর কখন করব্ না।" কিন্তু পবদিনই সে তাহার প্রতিজ্ঞার কথা ভুলিয়া গিয়া সেই অপবাধেরই অপবাধিনী হইত।

ছুটী পাইলেও আজ-কাল্ কবিয়া দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল . রাইচবণের দেশে যাইবার কোন আগ্রহ বা আয়োজন দেখা গেল না। বাবুব খানসামা নফর বলিলেন, "সর্দার দা, বাবু যে তোমায় ছুটী দিলেন, তা দেশে গেলে না?" কথাটায বাগেব কোন কাবণ ছিল না , কিন্তু রাইচরণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, সে মনিবেব নিমক খায়, মনিব ভাল, ছুটী দিযাছেন, তা' বলিযা অপরের মত মনিবের সুবিধা অসুবিধা না দেখিয়া সে যাইতে পাবে না (ইতিপূর্বে নফব মনিবের অসুখের সময় বাড়ী গিযাছিল)।

অবশেষে রাইচবণ যখন দেশে যাইতে কৃতসংকল্প হইয়া দিন স্থিব করিল, তখন সহসা লক্ষ্মী আসিয়া বলিল, "চন্নদা, তুমি নাকি দেশে যাবে?" বাইচবণের চক্ষু আর্দ্র হইযা আসিযাছিল, সে বলিল, "হ্যাঁ দিদি এবার আমায় যেতেই হবে।"

লক্ষ্মী ম্লান মুখ করিয়া বলিল, "না চন্নদা, তা হবে না, তুমি দেশে যেতে পাবে না।" কথাটা বাইচবণেব খুব মনোগত হইলেও সে সহসা কঠিন ভাবে বলিল, "না দিদি, আমায যেতেই হবে. বাবু আমায় ছুটী দিয়েছেন যে।" কথাটা এমনিভাবে বলিল যেন বাবু ছুটী দিয়া তাহাকে বাধ্য কবিয়া পাঠাইতেছেন , নচেৎ তাহার যাইবাব কোন প্রয়োজনই ছিল না। পিতার বিরুদ্ধে কথা বলা বালিকার স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই সে করুণভাবে বলিল, "কিন্তু শীগ্‌গির তোমায় ফিরে আসতে হবে, আসবে চন্নদা?"

রাইচবণ অশ্রু মুছিয়া সম্মতি জানাইলে, লক্ষ্মী তাহার অঞ্চলের মধ্য হইতে একটি ছোট শিশি ও গুটিকতক কাচেব পুতুল বাহির করিয়া বলিল, "চন্নদা, এগুলি তুমি বাড়ি নিয়ে যেও, ক্ষেতু মিনিকে দিও। এ শিশিতে কি আছে জান? একে দেলখোস্ বলে, আমার দ্বিতীয় ভাগ শেষ হয়েছে, তাই বাবা আমাকে কিনে দিয়েছেন , আবার তৃতীয় ভাগ শেষ হলে এইচ্ বোসের কুন্তলীন দেবেন , এ দিশী তা জান? এর খুব চমৎকার গন্ধ।" রাইচরণ কতদুর বুঝিল সেই জানে, কিন্তু লক্ষ্মীব সেই দান প্রত্যাখ্যান করিবার সাধ্য তাহার ছিল না। লক্ষ্মীর অদর্শনকালে তাহার এই ক্ষুদ্র স্নেহপূর্ণ স্মৃতিচিহ্নটুকুই তাহার আনন্দের সম্বল হইবে ভাবিয়া সে তাহা সাগ্রহে গ্রহণ করিল।

৩

পরদিন হঠাৎ গলা ফুলিয়া লক্ষ্মীর জ্বর দেখা দিল। ডাক্তার আসিয়া বলিলেন, 'রোগ সাংঘাতিক, বিউবনিক প্লেগ!' সে বৎসর পাটনায় ভয়ানক প্লেগ হইতেছিল, প্রতিদিন শত

সহস্র লোক প্লেগে প্রাণ হারাইতেছিল। অনেকে দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছিল, চারিদিকে হাহাকাব পড়িয়া গিয়াছিল। মুন্‌সেফবাবুও স্ত্রীকন্যাকে দেশে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময় লক্ষ্মী ঐ ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইল। ব্যাপার দেখিযা ভৃত্যবর্গ কাজ ছাড়িয়া দিযা চলিয়া গেল। ছুটীপ্রাপ্ত রাইচরণেব আর দেশে যাওয়া হইল না ; সে ইচ্ছা করিয়াই দেশে গেল না।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, ''রাইচবণ, লক্ষ্মী বুঝি আমায় ফাঁকি দিয়ে চলে যায়!'' লক্ষ্মীর রোগ-যাতনা-মসীলিপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া এই স্নেহকাতর বৃদ্ধেব বুকের পঞ্জব এক একখানি করিয়া বসিয়া পড়িতেছিল, তথাপি সে সান্ত্বনা দিযা বলিল, 'ভয কি মা, ভগবানকে ডাকুন, দিদি আমাব ভাল, দিদিকে আমি ধবে বাখব'' বলিয়াই সেই যন্ত্রণাকাতব অচৈতন্য বালিকাকে ছয মাসেব শিশুর মত সে আপনার বক্ষে ধারণ কবিল , যেন সেখান হইতে কেহই তাহাকে ছাড়াইয়া লইতে পাবিবে না। ছয দিন ছয় বাত্রি অনাহাবে অনিদ্রা অক্লান্ত শুশ্রূষায সে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ কবিল। সেই জবাজীর্ণ বৃদ্ধদেহে তখন যেন নব যুবকেব বলেব আবির্ভাব হইযাছিল। পিতামাতাও সেরূপ ভাবে শুশ্রূষা কবিতে পাবিতেন না। অবশেষে স্নেহেবই জয হইল, ভগবান ভক্তেব আহ্বান শুনিলেন। ডাক্তাব আসিযা বলিলেন, ''আব ভয নাই. বোগী সাবিয়া উঠিয়াছে — কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, এমন প্রভুভক্ত ভৃত্য আমি জীবনে কখনও দেখি নাই — এ দুশ্চিকিৎস্য বোগ শুধু সেবায আবোগ্য হইয়াছে।''

মৃত্যুব সহিত যুদ্ধ কবিযা বাইচবণ লক্ষ্মীকে কাড়িযা লইলেও আপনাকে অক্ষত বাখিতে পাবিল না। লক্ষ্মী একটু চলিযা বেড়াইয়া আবম্ভ কবিতেই সে শয্যাগ্রহণ কবিল। এতদিন মনেব বলে সে দাঁড়াইযাছিল। এখন তাহাব স্নেহেব ধনকে বিপন্মুক্ত ও নিবাপদ বুঝিযা সে আপনাকে ছাড়িযা দিল। প্রথমে সামান্য জ্বব দেখা দিযা অবশেষে সেই সামান্য জ্বব প্লেগে পবিণত হইল। ডাক্তাব দেখিযা বলিলেন, ''বোগ কঠিন বৃদ্ধের জীবন-আশা চব্বিশ ঘণ্টার অধিক নাই।'' প্লেগ বোগীব শুশ্রূষা যতদূব হওযা সম্ভব বাইচবণেব জন্য তাহাব ক্রুটি হইল না। ডাক্তার বলিলেন, ''বোগ সংক্রামক, বোগীকে হাঁসপাতালে চালান কবা হউক।''। হীবালাল বাবু মাথা নাড়িয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, ''বাইচরণ দুবাব আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছে, ওকে আমি হাঁসপাতালে পাঠাইতে পাবিব না।'' ডাক্তাব বাবু আব আপত্তি কবিলেন না। বাইচরণ জ্ববে ও যন্ত্রণায় অচৈতন্য হইযাছিল, তাহার কিছু বলিবার ও বুঝিবার শক্তি ছিল না। শুধু মাঝে মাঝে বিকাবেব ঘোরে বলিতেছিল, ''দিদি, আমার ছুটী হযেছে, আমি বাড়ী যাই!'' অনেক রাত্রে চৈতন্য প্রাপ্ত বাইচরণ যখন ক্ষীণস্বরে জল চাহিল, তখন সেখানে জল দিবার কেহই ছিল না। কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশব্দে দরজা খুলিযা কে অতি মৃদু পদসঞ্চালনে তাহার মাথার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কুন্তলীনেব স্নিগ্ধ গন্ধে বাইচবণ অনুভব করিল ঘরে কেহ আসিযাছে। সে ক্ষীণস্বরে অভ্যাসের বশে বলিল, ''কে? দিদি, এলি!'' লক্ষ্মী ধীবে ধীরে তাহার রোগশীর্ণ শীতল কোমল হস্তখানি বৃদ্ধের উত্তপ্ত ললাটে রাখিয়া বলিল, ''চন্নদা, আমি এসেছি। সারাদিন কেউ আমায় আস্‌তে দেয়নি, এখন সব ঘুমিয়ে পড়েছে, তাই আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছি।'' বালিকার স্নেহপূর্ণ কথায় বৃদ্ধের দুই কোটর প্রবিষ্ট চক্ষে দুই বিন্দু জল গড়াইয়া পড়িল, সে অতি কষ্টে তাহার উত্তপ্ত হস্ত মস্তকে বাখিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, ''দিদি আমার! সুখী হও ; রাজরানী হও, আর আমাব মরণে দুঃখু নাই।'' পবক্ষণেই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া চুপ করিল। লক্ষ্মী ধীরে ধীরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলিল, ''চন্নদা, তুমি ঘুমিয়ে পড়, সব কষ্ট কমে যাবে, আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।'' রাইচরণ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ''দিদি আমি বাড়ী যাই, আমার ছুটী হযেচে।''

প্রভাতে হীরালালবাবু যখন ডাক্তার লইয়া রোগীব গৃহে প্রবেশ করিলেন তখন চারিদিক পবিষ্কার হইয়া গিয়াছে, পথে লোক চলিতে আবম্ভ করিয়াছে; প্রভাত রবির স্বর্ণ-রশ্মি বাইচরণেব ক্ষুদ্র গৃহে প্রতিদিনেব মত প্রবেশ কবিতে গিয়া রুদ্ধ সার্সি ভেদ কবিবাব নিষ্ফল চেষ্টায ইতস্তত সঞ্চারণ করিয়া ফিরিতেছিল। ডাক্তাব ঘরে প্রবেশ কবিযাই বিস্মিতভাবে বলিলেন, ''একি মা লক্ষ্মী। তুমি এখানে কেন?'' লক্ষ্মী পিতার দিকে ফিরিয়া সকরুণ মিনতিপূর্ণ স্বরে বলিল, ''বাবা, চন্নদা ঘুমিয়ে পড়েছে ওকে জাগিয়ো না, চন্নদা কাল সারা দিন ঘুমায়নি।'' ডাক্তার বোগীব নাড়ী পবীক্ষা করিয়া হাত ছাড়িয়া দিযা বলিলেন, ''না মা, আর ওকে জাগাতে হবে না. ভগবান ওর সব কষ্ট দূব কবে দিযেছেন; বেচাবাব ছুটী হয়ে গ্যাছে।''

উমাপতি

কিরণবালা দেবী সরস্বতী

এক

কালীগঞ্জ স্টিমার যখন গোয়ালন্দ ঘাটে আসিয়া ভিড়িল, তখন ঢাকা মেল প্রায় ছাড়ে ছাড়ে।

হঠাৎ ষ্টিমার খানি চড়ায় ঠেকিয়া যাওয়ায় এই বিলম্ব। ঘড়ির দিকে চাহিয়া ট্রেন ধরিবার আশায় নিরাশ হইয়া আজিকার রাত্রি যে ষ্টিমারেই কাটাতেই হইবে, ইহারই জল্পনাকল্পনা যাত্রীদিগের মধ্যে অনেকেই করিতেছিল। ইহার মধ্যে যাঁহাদের সঙ্গে বালক-বালিকা, ও মালপত্র বেশী, তাঁহারা রাত্রি যাপনের জন্য বিছানা পত্র বিছাইয়া শয়নের ব্যবস্থাও করিতেছিলেন, তবে বেশিরভাগ লোকই ট্রেন ধরিবার আশায় স্টিমার ঘাটে ভিড়িবার পূর্বেই, মালপত্র-সহ নীচের তলায় গিয়া ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। স্টিমার ঘাটে ভিড়িবামাত্র কুলির ও যাত্রীদিগের চীৎকার, হুড়োহুড়ি, ঠেলাঠেলি — কে কাহার আগে গিয়া ট্রেন ধরিবে।

একে অল্প মিনিট কয়ে সময় হাতে তাহার উপর ষ্টীমার ঘাট হইতে ষ্টেশন কতকটা যাইতে হয়, পথেও ভীষণ অন্ধকার। অল্প জন কতক যাত্রী যাঁহাদের সঙ্গে অচল এবং সচল মাল ছিল না, তাঁহারাই শুধু দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিয়া কোনরকমে ট্রেন ধরিলেন।

ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে বলিয়া উঠিলেন — "সুবি, সুবি, আমি গাড়ীতে উঠতে পারলাম না, শীগ্‌গির নেমে পড়।" ভদ্রলোকের মুখের কথা চলন্ত ট্রেনের শব্দে সম্পূর্ণ শ্রুতিগোচর না হলেও ব্যাপার বুঝিতে সুবির বিলম্ব হইল না। সুবিকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া ভদ্রলোকটি দেখেন জিনিসপত্র সহ কুলী তাঁর পিছনে আসিতে আসিতে হঠাৎ কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে। তিনি 'কুলী কুলী' বলিয়া ডাকিবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রেন ছাড়িয়া দিয়াছে। রাত্রিকাল, তাহাতে যেরকম সময় পড়িয়াছে, নিজের সঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়া নিরাপদ মনে করিয়া ভদ্রলোকটি সুবিকে পুরুষের কামরায় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

দুই

সুবির বয়স চোদ্দ কি পনের, পাতলা ছিপছিপে একহারা চেহারা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, মুখখানি বড় সুন্দর — একবার দেখিলে পুনর্বার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। একখানি কালো চওড়া পাড়ের শাড়ী মাদ্রাজী ফ্যাসানে পরা, গায়ে একটি পাতলা ব্লাউজ, পায়ে নাগরা জুতা, হাতে সরু সরু দুগাছি তারের বালা ও কাপড় আটকান একটি প্লেন ব্রুচ ছাড়া অন্য অলঙ্কারের বাহুল্য ছিল না। মাথায় কাপড় নাই বলিয়া মনে হয় মেয়েটি এখনও অবিবাহিতা।

গাড়ীতে সুবি একেবারে একা, স্বাভাবিক লজ্জাবশতঃ সে বেঞ্চের কোণ ঠেসিয়া জড়সড় ভাবে বসিয়াছিল। সে গাড়ীতে পুরুষ-যাত্রীর মধ্যে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের যুবক ছাড়া অন্য কেহ ছিল না।

ব্যাপার বুঝিতেও সুবির মিনিট কয়েক বিলম্ব হইয়াছিল, কিন্তু আপনার অসহায় অবস্থা বুঝিবামাত্র একটা অব্যক্ত অস্ফুট আর্তনাদের সহিত সে সেই গতিশীল ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িবার জন্য গাড়ীর দরজাব হাতল ঘুরাইতেই তাহার সম্মুখের বেঞ্চে উপবিষ্ট যুবকটি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল — "কি করেন? মারা পড়বেন যে।"

বাস্তবিক পক্ষে ট্রেনেব গতি তখন বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কিন্তু সে কথা কানে না তুলিয়া ঝড়ের বেগে সুবি ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। "সর্ব্বনাশ। কি কবেন, কি করেন" বলিতে বলিতে সেই যুবকটিও সেই গভীর নিশীথের কৃষ্ণ যবনিকা তলে, বনানী বেষ্টিত স্তব্ধ প্রান্তরের বুকে চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইয়া পড়িল। বিপদ জ্ঞাপন শিকলটি টানিযা গাড়ি থামাইবার কথাও তাহাব মনে হইল না। চলন্ত ট্রেন হইতে লাফাইযা পডিবাব দরুন গুরুতব আঘাত না লাগিলেও অল্পবিস্তব আঘাত উমাপতিব যে না লাগিয়াছিল এমন নয়। টাল সামলাইয়া উমাপতি সুবিব খোঁজ করিল কিন্তু কোথায় সুবি? গাড়ী হইতে লাফাইয়া পডিতে উমাপতির যেটুকু সময বিলম্ব হইয়াছিল, তাহারই মধ্যে তাহাদের উভযের ব্যবধানের দূরত্বটি হইয়াছিল অনেকখানি, সে কামরায অন্য যাত্রী কেহ থাকিলে হয় ত শিকল টানিযা গাড়ী থামাইলে লোকজন, আলোক, আশ্রয় সবই মিলিত, এখন এই বিরাট অন্ধকাব স্তূপেব মধ্যে কেমন করিয়াই বা সে সুবির খোঁজ করিবে, আব এই জনহীন প্রান্তরের বুকে এই দীর্ঘ বাত্রিই বা কাটাইবেন কেমন করিয়া? তথাপি আশায নিরাশায লাইনের ধার বাহিযা সে অগ্রসর হইল, কিছুদূর যাইতেই দেখিল, — লাইনেব বাহিবে মৃতেব মত কি একটা পড়িযা আছে. নিকটে গিয়া দেখিল — সুবিই বটে।

মেয়েটি মাথায চোট পাইযাছিল বটে, কিন্তু ভয়ে সে প্রায আধমরাব মত হইযাছিল, উমাপতিকে তাহাব নিকট আসিতে দেখিযা সুবির বিবর্ণ মুখখানি আতঙ্কে একেবাবে ছাইয়েব মত সাদা হইযা গেল, এবং একটা অব্যক্ত অস্ফুট শব্দ কবিবাব সঙ্গে সঙ্গেই ত্বরিতপদে উঠিযা বসিল। উমাপতিব মুখেব উপর জ্বলন্ত দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিযা সে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল — "আপনি যদি আমাব কাছ থেকে সরে না যান" — কথাটা শেষ কবিল না — কিন্তু তীব্রদৃষ্টিতে রেলের লাইনেব দিকে তাকাইযা রহিল। তাহাব মনেব কথা উমাপতিব নিকট স্পষ্টই হইয়া গেল, সে তাড়াতাডি বলিযা উঠিল — "ছিঃ! কি ছেলেমানুষি করেন। কি বিপদে পড়েছেন ভেবে দেখুন দেখি একবাব। দেবি কববেন না, আসুন আমার সঙ্গে।"

মেয়েটি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে উমাপতির মুখের দিকে চাহিযা বোধ কবি তাহাব অন্তরেব সমস্ত কথা জানিয়া লইল, তারপর কোন কথা না বলিয়া ধীবে ধীবে তাহাব অনুসবণ করিল।

তিন

সুবিকে সঙ্গে করিয়া উমাপতি যখন গোয়ালন্দে আসিযা পৌছিল, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। বহু অনুসন্ধানেও সুবির ভগ্নিপতির সন্ধান করিতে না পারিয়া সুবিকে লইয়া এখন কি করা ভাবিয়া উমাপতি চিন্তিত হইয়া পড়িল।

মাসখানক পূর্বে সুবি তার ভগ্নীর গৃহে গিয়াছিল, ভগ্নিপতি তাহাকে তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌছাইতে যাইতেছিলেন। ভগ্নীর বাড়ী যাইতে হইলে এখনই উজান স্টিমারে উঠিতে হয়, উমাপতি সুবিকে জিজ্ঞাসা করিলে সে ভগ্নীর বাড়ী যাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাহার পিত্রালয় নয়নপুরে পৌছাইয়া দিবার জন্য উমাপতির অনুগ্রহ ভিক্ষা করিল।

সুবির ম্লান মুখের দিকে চাহিয়া উমাপতি বলিল — "গাড়ীর তো এখন অনেক দেরী, একটা ভাল হোটেলে গিয়ে চলুন ততক্ষণ স্নানাহার সেরে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক।"

যাত্রীদিগের বসিবাব বা দাঁড়াইবাব স্থান গোযালন্দে নাই। জ্যেষ্ঠেব খবরৌদ্র-ঝলসিত অনাবৃত রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বে শত চক্ষুব দর্শনীয হইয়া বসিযা থাকিতে উভয়েই দারুণ অস্বস্তি অনুভব কবিতেছিল। তাই সুবিও এ প্রস্তাব সমর্থন না করিয়া থাকিতে পাবিল না।

চার

পরদিন কুষ্টিয়া ষ্টেশন হইতে নৌকা করিয়া নয়নপুর পৌঁছিতে জ্যৈষ্ঠের দীর্ঘ দিবাও প্রায অবসান হইয়া আসিল। নদী হইতে পুনরায় গরুর গাড়ীতে দুই মাইল পথ চলিয়া প্রায সন্ধ্যার সময় তাহারা একখানি মেটে খড়োবাড়ীর সম্মুখে আসিযা পৌঁছিল। অন্য সময় হইলে অর্থাৎ, এই দৈবদুর্ব্বিপাকে পড়িয়া উমাপতির সঙ্গে না আসিয়া ভগ্নীপতিব সঙ্গে আসিলে আনন্দোন্মত্তা বালিকা এই বাড়ীর দবজায গাড়ী থামিবামাত্রই এতক্ষণ ছুটিয়া বাড়িব মধ্যে চলিয়া যাইত। আজ বাড়ীব দিকে গোযান খানি যতই অগ্রসব হইতেছিল, ততই তাব বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ কবিতেছিল, দ্রুত বক্ষস্পন্দনের সহিত হাত-পা একেবাবে অসাড নিস্পন্দ — নাড়িবাব শক্তিও যেন নাই।

গাড়ী থামিলে তাব এই নিশ্চেষ্টতা দেখিয়া উমাপতি বলিল — "সুমুখেব এই বাড়ীই ত আপনাদের?"

সুবি মাথা হেলাইয়া জানাইল—"হাঁ, এই তাদেব বাড়ী।"

উমাপতি বলিল—"তা হলে আপনি নেমে বাড়ির ভেতব যান, আমি এই গাড়ীতেই ফিবে যাই।"

সুবি তেমনি ম্লান মুখখানি নত করিয়া বসিযা বহিল, কোন উত্তর দিল না। বিস্মিত উমাপতি একটু নীবব থাকিযা বলিল — "আমি নেমে বাড়ীব কাউকে ডেকে দেব কি?"

সুবি অশ্রুপূর্ণ নযনে কাতব চাউনিটুকু উমাপতিব মুখের উপব স্থিব কবিযা জড়িতস্ববে বলিল — "বাড়ী ঢুকতে আমাব কেমন যেন বড্ড ভয কবছে —"

"এই কথা আসুন, আমি আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

উমাপতি সুবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীব দিকে অগ্রসব হইল। এই সময় কয়েকটি বালক বালিকা সুবিকে ঘিরিয়া উল্লসভরে চেঁচাইয়া বলিযা উঠিল — "ও মা দিদি এসেছে।"

সুবির ভগ্নিপতি রাজবাড়ী ষ্টেশন মাষ্টারেব নামে গোয়ালন্দ হইতে টেলিগ্রাম করিযাছিলেন, — ট্রেন পৌঁছিলে তাঁহাবা যেন সুবিকে নামাইযা লন। পরের ট্রেনে সেখানে পৌঁছাইযা তিনি জানতে পাবেন, সুবি নামে কোন মেয়ে সে ট্রেনে ছিল না। ভদ্রলোক নিরুপায হইযা সুবির পিতাকে সকল সংবাদ সংক্ষেপে জানাইযা টেলিগ্রাম কবেন। টেলিগ্রামখানি কিছুক্ষণ পূর্ব্বে এখানে আসিযা পৌঁছিয়াছে।

সুবির পিতা জগমোহন ভট্টাচার্য্য এমনি মুহ্যমান হইয়া পড়িযাছিলেন যে, উপস্থিত কি করা উচিত কিছুই স্থিব কবিতে পারিতেছিলেন না। বযস্কা মেয়ে একা পথে। — কোথায গেল সে।

সুবিব মা সুবিকে বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়া আত্মহারার মত ছুটিয়া গিয়া কন্যাকে একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

"বের করে দাও, বের করে দাও, এখুনি ঘাড় ধরে বাড়ী থেকে বের করে দাও ওকে" — বলিতে বলিতে জগমোহন ঘরের দাওয়া হইতে লাফাইয়া উন্মাদের মত সুবি ও তাহার কাছে আসিয়া তাহাদের মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টি ফেলিয়া দাঁড়াইলেন। পিতার এই ক্রোধোন্মত্ত রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া সুবির ম্লান মুখখানি ভযে বিবর্ণ হইযা গেল — তাহার সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

উমাপতি একেবারে বাড়ীর ভেতরে না গেলেও সে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেখান হইতে সকল ব্যাপারই তাহার দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল। দেখিয়া শুনিয়া উমাপতি একেবারে নির্ব্বাক, এতক্ষণ যাই-যাই করিয়াও সুবির এই সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় যাইতে পারিতেছিল না। এদিকে সুবিব পিতাব কর্কশ চীৎকারে, পাড়া প্রতিবাসী বর্গেব ব্যঙ্গ বিদ্রূপপূর্ণ কটাক্ষে ও তাঁহাদেব নির্লজ্জ অবান্তর প্রশ্নে, নিবপরাধ বালিকাব এই দারুন বিব্রত অবস্থায় উমাপতির করুণ হৃদয় আর স্থির থাকিতে পারিল না। সে ভিতরে আসিয়া বিনয়-পূর্ণ স্বরে বলিল — "শুনুন আপনাবা, আপনারা যা ভেবে এই নিরপবাধ মেয়েটীর কষ্ট দিচ্ছেন, তা ঠিক নয়। ইনি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমায় ভদ্র সন্তান বলেই জানবেন। আপনার মেয়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই তাঁকে পৌঁছে দিতে এসেছি।" পরে আনুপূর্ব্বিক ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া উমাপতি বলিল — "এর মধ্যে দূষণীয় ত কিছু নেই —"

মুখ খিচাইয়া জগমোহন বলিয়া উঠিলেন — "বাপু হে, সে যেন আমি বুঝলাম, অন্যে বুঝবে কেন? একে বয়স্কা মেয়ে, তায় দুদিন বাদে তাব বিয়ে দিতে হবে। একথা তখন তো আর গোপন থাকবে না। কে ওই মেয়েকে গ্রহণ করবে? এই তুমি যে মুরুব্বিযানাচালে এত বক্তিমে করছ, তোমাকেই যদি ধরে পড়ি, তুমিই কি ওকে নিতে চাইবে?"

দারুণ উত্তেজনায় বৃদ্ধ থরথর কবিযা কাঁপিতে লাগিলেন এবং পুনবায় গর্জ্জিয়া স্ত্রীর দিকে ফিবিয়া বলিয়া উঠিলেন — "হয় মেয়েব গলায় কলসী বেঁধে পুকুরে ডুবিয়া মার, নয় যে ওকে সঙ্গে করে এনেছে, তার সঙ্গী কবে দাও।"

উমাপতিব মুখে হাসি ফুটিযা উঠিল, সে ধীব কণ্ঠে বলিল — "তাতে আমি মোটেই অ-সম্মত নই। যদি বিনা অপবাধে এত বড় সাজা ওঁকে নিতেই হয়, আমায জানাবেন শেষ পর্য্যন্ত ওর বোঝা আমার ভারী হবে না ," বলিযা সে সেখান হইতে চলিযা গেল।

পাঁচ

তারপর বছব খানেক কাটিয়া গিযাছে — আজও সেদিনেব স্মৃতি উমাপতিব মনে দোল দিযা যায়। সুবিব ব্যথাতুব পাণ্ডুব মুখখানির কথা ভুলিতে সে চেষ্টা খুবই কবে, কিন্তু পাবে না। তাই পূজাব ছুটিতে বাড়ী আসিযা যখন সে শুনিল — 'তাহাব বিবাহ ঠিক হইযা গিয়াছে, তাহাকে জিজ্ঞাসামাত্র না কবিয়া মা বিবাহ সম্বন্ধ একেবারে স্থির কবিযা ফেলিয়াছেন — তখন মায়ের উপর অভিমানেব সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে বিলক্ষণ ক্রোধেব সঞ্চাব হইল, সে তখনকাব মত তাঁহাকে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করিযাও থাকিতে পারিল না, সে স্পষ্টই জানাইয়া দিল — এ বিবাহ কবিতে সে পাবিবে না, অন্যত্র সে কথা — দিয়াছে।

সুলোচনা যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। একটু থামিযা তিনি বলিতে লাগিলেন — "দোসরা অঘ্রাণে বিয়ে ঠিক কবে দাদা চিঠি লিখেছেন। মেয়েও তিনি নিজে দেখে পছন্দ করে তবে তাঁদের পাকা কথা দিয়েছেন। গরীবের মেয়ে, একটি নগদ দেবার শক্তি নেই। তাঁরা যা দু' এক খানা গয়না ইচ্ছে করে দেবেন তাই। দাদার আগ্রহ তেমন ছিল না, মেয়েটী দেখেই কিন্তু তাঁর কেমন মমতা পড়ে গেছে। না না করেও মেয়েও ত কম দেখা হল না, এমন সুশ্রী কমনীয় মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না।"

চটি জুতার অগ্রভাগে উঠানের মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে উমাপতি বলিল — "তুমি মামাকে লিখে দাও মা, এ বিয়ে আমি করতে পারব না। এখনও সময় আছে, তাঁরা অন্যত্র মেয়ের সম্বন্ধ অনায়াসেই ঠিক করে নিতে পারবেন।"

সুলোচনা জ্বলিয়া উঠিলেন, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিলেন — "লিখতে হয়, তুমিই লিখে দাও। আমি পারব না।" তিনি দ্রুত পদবিক্ষেপে প্রাঙ্গণ ত্যাগ কবিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেলেন। উমাপতি মাথা হেঁট কবিয়া অপবাধীব মত দাঁড়াইয়া বহিল। তাহাব মনে জাগিতেছিল — সেই দুর্দ্দিনের চিত্র, সুবির করুণ কোমল মুখখানি, তার আত্মনির্ভবশীল কাতর চাউনিটুকু; কিন্তু....

ছয়

যদিও বেলা দুইটাব পূর্ব্বে ডাউন ষ্টিমার আসে না, মাল বোঝাই ইত্যাদিতে তিনটার পূর্ব্বে ছাড়ে না, এবং ষ্টিমাব ঘাট হইতে তাহাদের বাড়ীও অধিক দূব নয, তবুও সুলোচনা বিবাহের মাঙ্গলিক দ্রব্যসকল গুছাইয়া বেলা বাবটাব পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন — ভয পাছে ষ্টিমাব ছাড়িয়া যায।

সেদিন হইতে মাতা ও পুত্র এই দু'টি অতি নিকটতম আত্মীযেব মধ্যে যেন কেমন একটা অসন্তোষেব ভাব মাথা চাড়া দিযা উঠিযা ছিল। মাযেব একান্ত ইচ্ছাব বিরুদ্ধে আব কোন প্রতিবাদ না কবিযা উমাপতি এ বিবাহে সম্মতি দিযাছে।

ইহাব পবে সে এ বিবাহ সম্বন্ধে মুখে আপত্তি সূচক আব কোন কথাই বলে নাই সত্য, কিন্তু তাহাব অন্তবেব বেদনা মুখে এমনি ক্লিষ্টতা ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে, সুলোচনাব মাতৃহৃদযকেও ক্ষণে ক্ষণে পীড়িত কবিযা তুলিযাছিল। তাঁহাব কেবলি মনে হইতে ছিল— পুত্রেব অমতে বিবাহ দিযা তাহাব দাম্পত্য জীবনেব সুখ-সৌভাগ্যেব উপব একটা অশান্তিব বোঝা চাপাইতে যাইতেছেন। নৌকাব মধ্যে সকলেই নীবব। কেবল নদীব তবঙ্গ ভঙ্গেব সহিত কল্‌কল্ ছলছল শব্দ। এই নীববতা ভঙ্গ কবিযা পুত্রেব গম্ভীব মুখেব দিকে চাহিযা সুলোচনা বলিলেন — "নেমে মালটালগুলো ওজন কব না? ষ্টিমাব এসে পড়লে তখন ত আবাব তাড়াহুড়ো পড়ে যাবে।"

উমাপতি বলিল — "ষ্টিমাবেব ধোযা দেখা না গেলে কোনদিনই মাল ওজন কবে না।"

একটু নীবব থাকিযা সুলোচনা বলিলেন — 'নেবে জিজ্ঞেস কবে আযনা, স্টিমাব আসবার আর কত দেরী?"

উমাপতি মাযেব কথাব কোন উত্তব না দিযা তীবে নামিযা পড়িল। তাবপব হেমন্তেব খবরৌদ্র বিভাসিত উন্মুক্ত আকাশতলে দাঁড়াইযা পদ্মার বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গবাজিব মেলা, কখনও বা নদীব চবে সবুজ ধানক্ষেতেব মধ্যে কৃষক পল্লীব মৃন্মব কুটির, কখন বা সর্ব্বগ্রাসী প্রলয নৃত্যকাবী পদ্মাব ভাঙ্গনের দিকে চাহিযা চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাবপব হঠাৎ একসময ফিবিযা অসিযা, নৌকাব মধ্যে শুইযা একখানি মাসিক পত্রেব পাতা উলটাইতে লাগিল। 'স্মৃতিব দংশন' শীর্ষক গল্পটি তাহাব মনকে আকর্ষণ করিল, গল্পটি পড়িতে পড়িতে তাহাব কেবলি মনে হইতেছিল তাহাব মনের ভাব লইযাই যেন গল্পটি লিখিত হইযাছে। মোহাবিষ্টের মত ভাবিতে ভাবিতে উমাপতি তন্দ্রাচ্ছন্ন হইযা পড়িল। স্বপ্নে দেখিল, — পিতৃপবিত্যক্তা ব্যথিতা সুবি ম্লানমুখে করুণ নযনে চাহিয়া যেন তাহার নিকট দযা ভিক্ষা কবিতেছে। "আহা! মাথাটি এমন কবে হেলে পড়েছে বিছানায় উঠে শুলে হয না?"

মায়েব স্নেহ কোমল হস্তেব স্পর্শের সঙ্গে তাঁহার মৃদু ভর্ৎসনায় উমাপতিব তন্দ্রাটুকু ভাঙ্গিয়া গেল। সে কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নৌকার মাঝি বলিযা উঠিল — "বাবু জাহাজেব ধোঁযা দেখা যাতিছে।"

সাত

গোয়ালন্দে ট্রেনে উঠিতে গিযা ইন্টার ক্লাসের মেয়ে কামরার দিকে চাহিয়া উমাপতির হৃদকম্প উপস্থিত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ট্রাঙ্ক, বিছানাব বাণ্ডিল, কলার কাঁদি, ফলের ঝুড়ি, ঘিযের টিন, ক্ষীবের হাঁড়ি প্রভৃতিতে কামবা পূর্ণ। তারপব যাত্রীব ভিড়, কাচ্ছা-বাচ্চার কান্না এবং মহিলাগণেব স্থান দখল লইয়া, "তুমি শুয়ে আছ, আব বসতে জাযগা পাব না? কেন আমি কি ভাড়া দিই নি না কি?" ইত্যাদি ইত্যাদি ঝগড়া পুবোদমে চলিতেছে। পুরুষের কামরায়ও স্থানাভাব। অগত্যা উমাপতি মা ও ভাইবোনদেব লইয়া এঞ্জিনেব কাছাকাছি একখানি থার্ড ক্লাসের অপেক্ষাকৃত খালি গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষের বাত্রি জমাট-বাঁধা অন্ধকার ও নীববতার মাঝে আকাশে উজ্জ্বল তারকার মালা, পথিপার্শ্বস্থ বনবীথির মধ্যে খদ্যোতের মেলা এবং মাঝে মাঝে অনাদৃত স্টেশনগুলিব চকিত আলোক ছাড়া পথে দর্শনীয কিছু না থাকিলেও উমাপতি জানালাব বাহিবে দৃষ্টি স্থিব করিয়া নীরবে বসিযা রহিল। রাত্রি গভীব হইবাব সঙ্গে সঙ্গে সুলোচনাব "বসে থাকবি কতক্ষণ, রাত জেগে কি শেষটা অসুখে পড়বি? শুযে পড়না" — মৃদু ভৎর্সনায সে বাঙ্কেব উপব শয্যা বিছাইয়া শুইযা পড়িল।

উমাপতির যখন ঘুম ভাঙিল তখনও উষার আলোক ধরণীর বক্ষ আলোকিত কবে নাই। ঘুম ভাঙিতেই উমাপতির কানে চাপা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট কণ্ঠস্বব প্রবেশ কবিল। সে বুঝিতে পাবিল, নিদ্রিত থাকিবার সময় এই নবাগতাদরে গাড়ীতে আগমন হইযাছে। গাড়ীব আবোহিবর্গ প্রায় সকলেই নিদ্রিত, কেবল কোল ঘেঁসিযা বসিযা উমাপতিব বিবাহিতা ভগিনী শৈবলিনী ও আব দুইটি মেয়ে হাসি গল্পে তন্ময হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদেব সেই চাপা কণ্ঠেব মৃদু গুঞ্জন ও হাসিব শব্দ মাঝে মাঝে উমাপতিব কানে ভাসিযা আসিতেছিল।

মেয়েদের এমন একটা বযস আসে, যখন দুনিয়াব দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, অভিযোগ কোন কিছুই তাহাদেব মনকে স্পর্শ কবিতে পাবে না। বযসেব বঙ্গিন নেশা তখন মনকে এমনি অভিভূত কবিয়া বাখে।

এই নবাগতা মেযেদুটির মা একদিকেব বেঞ্চে শুইয়া আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত কবিযা গভীব নিদ্রায মগ্ন ছিলেন।

তাহাদের কথাবার্ত্তার যেটুকু অংশ উমাপতিব কানে গেল, তাহাতে সে বুঝিল, যদিও মাঝরাত্রেই তাহারা গাড়ীতে উঠিয়াছে, কিন্তু কথাটা বেশীক্ষণ আবম্ভ হয নাই, উঃ বাপবে এই সময়টুকুব মধ্যেই এত বন্ধুত্ব।

আব অল্পক্ষণ পরেই ছাড়াছাড়ি হইবে বলিযা দুঃখ প্রকাশ কবিযা শৈবলিনী ক্ষুণ্ণস্ববে একটি মেয়েকে বলিল "বড় দুঃখ হচ্ছে ভাই, হয ত জীবনে আব আমাদেব দেখা হবে না। নতুন সাথিটিকে পেয়ে আমায় ভুলে যেও না যেন, বুঝলে?"

মেয়েটি সলজ্জ হাসিব সহিত মুখখানি নত কবিল শৈবলিনী তাহাব হাতখানি পবম স্নেহে আপনার হাতের মধ্যে লইযা মৃদু চাপ দিয়া বলিল — "চিঠিব উত্তব কিন্তু দিও ভাই।"

তারপর কাহাব বাড়ীর নম্বর কত ইহা লইয়া দুইজনেব মধ্যে একটু আলোচনা হইল, কেন না, কেহই বাড়ীর নম্বর অবগত নয়। মিনিট কযেক চিন্তাব পব স্থিব হইল, — মাযেব নিকট হইতে উভয় পক্ষই ঠিকানা জানিয়া লইবে।

হঠাৎ শৈবলিনী বলিয়া উঠিল "দেখ ভাই, আমাব কি ভুল। আদত কথাই যে জিজ্ঞেস কবতে ভুলে গেছি। তোমাব শ্বশুব বাড়ী গ্রাম পোস্ট অফিস, জেলা, আব ভাই তোমাব

বরেব নামটি আমায় বল? তোমার বিয়ে ত এই পরশু, বিয়ে হলেই ত শ্বশুব বাড়ি চলে যাবে?"

শৈবলিনীব প্রশ্নে মেয়েটি একটু মৃদু হাসিল মাত্র, কোন উত্তর দিল না, শৈবলিনী বলিল — "লজ্জা কি ভাই, এখনও তো তোমাব বিয়ে হয়নি, ববের নাম বলতেও কোন দোষ নেই।

যে মেয়েটি এতক্ষণ তাহাদের নিকট বসিয়া উভযেব গল্পেব বসাস্বাদন কবিতেছিল, সে তাহার দিদিব মুখেব দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল — "কি মেজদি, বলব তোমাব ববেব নাম? বলি?"

পূর্ব্বোক্ত মেয়েটি ঈষৎ কোপ কটাক্ষ ভগ্নীব মুখেব প্রতি নিক্ষেপ কবিল, কিন্তু সে দমিবার বা ভীত হইবাব পাত্রী নহে। সে হাসিতে হাসিতে শৈবলিনীব দিকে চাহিয়া বলিল— "তা জানেন না, এই আমার মেজদিদিব পতি তিনি —"

শৈবলিনী বলিল — "তা যেন বুঝলাম, তা বলে কি তাঁব নাম নেই?"

পবম বিজ্ঞেব মত মেয়েটি বলিল —"একটু বুদ্ধি খরচ কবলেই সব বোঝা যায। আচ্ছা, শুনুন তবে - - আমার ঠাকুরমা আদব কবে দিদিকে সুভদ্রা বলে ডাকতেন, অত বড নাম ধবে ডাকতে অসুবিধে হয বলে সবাই ওকে সুবি বলেই ডাকে, কিন্তু ওব আসল নাম হচ্ছে উমাবাণী। তাই ওব ববের নামও হল উমাপতি। কেমন আমি ঠিক বলেছি কি না?"

মেয়েটি হাসিতে লাগিল। বালিকাব হাস্যোচ্ছলিত মুখেব দিকে চাহিযা শৈবলিনী বলিযা উঠিল — "আচ্ছা, তোমার দিদিব শ্বশুব বাডি গাঁয়েব নামটি কি ভাই?"

বালিকা তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল — "তা জানেন না, আমড়া, আব জেলা পাবনা, —অর্থাৎ কি না, আমরা আব আমডা খেতে পাব না।"

শৈবলিনী বাবেকমাত্র মেযেদুটিব দিকে চাহিযা উঠিযা গিয়া অন্য বেঞ্চে নিদ্রিতা মাযের গাযে ঠেলা দিযা সোৎসাহে বলিযা উঠিল - "ও মা, মা, উঠে দেখ কে! আমাদের গাডীতেই আমাদেব বৌদি"।

আনন্দেব বেগে শৈবলিনীব কণ্ঠ রুদ্ধ হইযা আসিল, বিস্মিত চকিতা সুলোচনা বলিযা উঠিলেন -- 'কই?"

বাঙ্কেব উপব উমাপতিও সেই সময তাহাব ভাবী পত্নীব মুখখানি দেখিবাব লোভে চোবাদৃষ্টিটুকু মেয়েটিব মুখেব উপব নিক্ষেপ কবিল, কিন্তু এ কি, এ কোথা হইতে আসিল, এ যে সুবি, দারুণ মানসিক উত্তেজনায় হয়ত তাহাব দৃষ্টিভ্রম হইয়াছে মনে কবিযা উমাপতি পুনবায মেয়েটিব মুখখানি দেখিবাব জন্য চাহিল, লজ্জা অভিভূতা বালিকা মাথা নিচু কবিয়া বেঞ্চেব কোণ ঘেসিযা অপরাধীর মত জড়সড়ভাবে বসিযা রহিল। লুব্ধ মধুপেব মত তাহার চাবি পাশে ঘুবিযা ফিবিযা উমাপতিব অনুসন্ধিৎসু নেত্রযুগল যে বার্ত্তা বহন করিযা আনিল, তাহাতে আব তাহাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না, — কে সে?

কচি-সংসদ

পরশুরাম

আলিপুরের সংবাদ — সাগর আইল্যাণ্ডে বায়ুমণ্ডলে যে গর্ত হইয়াছিল সেটা সম্প্রতি পাকাবকম ভরাট হইয়া গিয়াছে, সুতবাং আব বৃষ্টি হইবে না। চৌবঙ্গিতে তিনটা সবুজ পোকাব অগ্রদূত ধবা পড়িযাছে। ঘোলা আকাশ ছিঁড়িয়া ক্রমশঃ নীল বং বাহিব হইতেছে। রৌদ্রে কাঁসাব বং ধবিযাছে, গৃহিণী নির্ভযে লেপ-কাঁথা শুকাইতেছেন। শেষবাত্রে একটু ঘনীভূত হইয়া শুইতে হয। টাকায এক গণ্ডা বোগা-বোগা ফুলকপিব বাচ্ছা বিকাইতেছে। পটোল চড়িতেছে, আলু নামিতেছে। স্থলে জলে মরুৎ-ব্যোমে দেহে মনে শবৎ আত্মপ্রকাশ কবিতেছে। সেকালে রাজারা এই সময়ে দিগ্‌বিজয়ে যাইতেন।

আদালত বন্ধ, আমাব গৃহ মক্কেলহীন। সার্কুলাব বোডে ধাপা-মেলেব বাঁশি পোঁ করিযা বাজিল — চমকিত হইয়া দেখিলাম বড ছেলেটা জিওমেট্রি ত্যাগ কবিযা বেলেব টাইম টেব্‌ল অধ্যযন কবিতেছে। ছোট ছেলেটাব ঘাড়ে এঞ্জিনেব ভূত চাপিযাছে, সে ক্রমাগত দু-হাতের কনুই ঘুবাইযা ছুঁচাব মতন মুখ কবিযা বলিতেছে — ঝুক ঝুক ঝুক ঝুক। মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

এবাব কোথা যাওযা যায? দু-একজন মহাপ্রাণ বন্ধু বলিলেন — পূজাব ছুটিতে দেশে যাও, পল্লীসংস্কাব কব। কিন্তু অতীব লজ্জাব সহিত স্বীকাব কবিতেছি যে বহু বহু সংকার্যেব ন্যায় এটিও আমার দ্বারা হইব্যব নয। জানামি ধর্মং — অন্ততঃ মোটামুটি জানি, কিন্তু ন চ মে প্রবৃত্তিঃ। ভ্রমণের নেশা আমাব মাথা খাইযাছে।

পদব্রজ, গোযান, মোটব, নৌকা, জাহাজ — এসব মাঝে মাঝে মুখ বদলাইবাব জন্য মন্দ নয। কিন্তু যানেব রাজা বেলগাড়ি, বেলগাডিব বাজা ই আই আব। বন্ধু বললেন — ইংবেজের জিনিসে তোমাব অত উৎসাহ ভাল দেখায না। আচ্ছা, বেল না-হয ইংরেজ করিয়াছে কিন্তু খবচটা কে যোগাইতেছে? আজ না-হয আমবা ইংবেজকে সহিংস বাহবা দিতেছি, কিন্তু এমন দিন ছিল যখন সেও আমাদেব কীর্তি অবাক্ হইযা দেখিত। আবাব পাশা উল্‌টাইবে, দু-শ বৎসব সবুর কর। তখন তাবায তারায মেল চালাইব, ইংবেজ ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া দেখিবে, সঙ্গে লইব না, — পযসা দিলেও না।

বাংলার নদ-নদী, ঝোপ-ঝাড়, পল্লীকুটীবেব ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁযা, পানাপুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলেব গন্ধ — এসব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শবৎকালে মন চায ধবিত্রীব বুক বিদীর্ণ কবিযা সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পাঞ্জাব-মেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সাবি সাবি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড, নিমেষে নিমেষে পট-পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিবাম,

পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম, পুরী কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner sir at Shikohabad? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু-পাশে আখের খেত স্রোতের মত বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান অরণ্যানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্রমধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তার পর সন্ধ্যা —পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গীটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরও দুই কম্বল, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর-পেট ভাল ভাল খাদ্যসামগ্রী — তা ছাড়া বেতের বাক্সে আরও অনেক আছে। গাড়ির অঙ্গে অঙ্গে লোহালক্কড়ে চাকার ঠোক্করে জিঞ্জিরডাণ্ডার ঝঞ্ঝনায় মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে — আমি চিতপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন অস্ত্, ওআ হমীন অস্ত্।

এই পাশবিক পরিকল্পনা— এই অহেতুকী রেলওয়েপ্রীতি — ইহার পশ্চাতে মনস্তত্ত্বের কোন্ দুষ্ট সর্প লুক্কায়িত আছে? গিরীন বোসকে জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হয় না। চট্ করিয়া স্থির করিয়া ফেলিলাম — ডালহাউসি যাইব, আমার এক পঞ্জাবী বন্ধুর নিমন্ত্রণে। একাই যাইব, গৃহিণীকে একটা মোটা রকম ঘুষ এবং অজস্র থিয়েটার দেখার অনুমতি দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া রাখিব। কিন্তু man proposes woman disposes।

আমার বড় সুটকেসটা ঝাড়িতেছি, হঠাৎ বিদ্যুল্লতার মত ছুটিয়া আসিয়া গৃহিণী বলিলেন — 'হোআট-হোআট-হোআট?'

এইখানে একটা কথা চুপি চুপি বলিয়া রাখি। গৃহিণীর ইংরেজী বিদ্যা ফার্স্ট বুক পর্যন্ত। কিন্তু তিনি আমার ফাজিল শ্যালকবৃন্দের কল্যাণে গুটিকতক মুখরোচক ইংরেজী শব্দ শিখিয়াছেন এবং সুযোগ পাইলেই সেগুলি প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

আমি আমতা আমতা করিয়া বলিলাম — 'এই মনে করেছি ছুটির ক-দিন একটু পাহাড়ে কাটিয়ে আসি, শরীরটা একটু ইয়ে কিনা।'

গৃহিণী বলিলেন — 'হোআট ইয়ে? হুঁ, একাই যাবার মতলব দেখছি — আমি বুঝি একটা মস্ত ভারী বোঝা হয়ে পড়েছি? পাহাড়ে গিয়ে তপস্যা হবে নাকি?'

সভয়ে দেখিলাম শ্রীমুখ ধূমায়মান, বুঝিলাম পর্বতো বহ্নিমান্। ধা করিয়া মতলব বদলাইয়া ফেলিয়া বলিলাম — 'রাম বল, একা কখনও তপস্যা হয়? আমি হব না হব না হব না তাপস যদি না মিলে তপস্বিনী।'

মন্ত্রবলে স্মোক নুইসান্স কাটিয়া গেল, গৃহিণী সহাস্যে বলিলেন — 'হোআট পাহাড়?'

আমি। ডালহৌসি। অনেক দূর।

গৃহিণী। হ্যাং, ডালহাউসি। দার্জিলিং চল। আমার ত্রিশ ছড়া পাথরের মালা না কিনলেই নয়, আর চার ডজন ঝাঁটা। আর অত দাম দিয়ে গলায় দেবার শুঁয়োপোকা কেনা হ'ল — সেই যে বোআ না কি বলে — আর হীরে-বসানো চরকা-ব্রোচ — তা তো এ পর্যন্ত পরতেই পেলুম না। তোমার সেই ডালকুত্তো পাহাড়ে সেসব দেখবে কে? দার্জিলিং-এ বরঞ্চ কত চেনাশোনা লোকের সঙ্গে দেখা হবে। টুনি-দিদি, তার ননদ, এরা সব সেখানে আছে।

সরোজিনীরা, সুকু-মাসী, এরাও গেছে। মংকি মিস্ত্রিরের বউ তার তেরোটা এঁড়িগেঁড়ি ছানাপোনা নিয়ে গেছে।

যুক্তি অকাট্য, সুতরাং দার্জিলিং যাওয়াই স্থির হইল।

দার্জিলিং-এ গিয়া দেখিলাম, মেঘে বৃষ্টিতে দশদিক্ আচ্ছন্ন। ঘবেব বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না, ঘবের মধ্যে থাকিতে আবও অনিচ্ছা জন্মে। প্রাতঃকালেব আহার সমাধা করিযা পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিন্‌টশ পবিযা বেড়াইতে বাহিব হইয়াছি।. জনশূন্য ক্যালকাটা রোডে একাকী পদচাবণ কবিতে করিতে ভাবিতেছিলাম — অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর তো ভাল লাগে না... এমন সময় অনতিদূরে —

এই পর্যন্ত ববীন্দ্রনাথেব সহিত আশ্চর্য বকম মিল আছে। কিন্তু আমাব অদৃষ্ট অন্যপ্রকাব, — বদ্রাওনেব নবাব গোলাম কাদেব খাঁর পুত্রীর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দেখা হইল ডুম্‌রাওনেব মোক্তার নকুড় চৌধুবীব সঙ্গে, যিনি সম্পর্কনির্বিশেষে আত্মীয-অনাত্মীয সকলেবই সরকাবী মামা।

নকুড়-মামা পথেব পার্শ্বস্থিত খাদেব ধাবে একটা বেঞ্চে বসিযা আছেন। তাঁব মাথায ছাতা, গলায কম্ফর্টাব, গায়ে ওভাবকোট, চক্ষুতে ভ্রূকুটি, মুখে বিবক্তি। আমাকে দেখিযা কহিলেন — 'ব্রজেন নাকি?'

বলিলাম — 'আজ্ঞে হাঁ। তাবপব, আপনি হঠাৎ দার্জিলিং-এ? বাড়িব সব ভাল তো? কেষ্টোর খবব কি — বেনারসেই আছে নাকি? কি কবছে সে আজকাল?' – – কেষ্ট নকুড মামার আপন ভাগিনেয, বেনাবসেব বিখ্যাত যাদব ডাক্তাবেব একমাত্র পুত্র, পিতৃমাতৃহীন, বযস চব্বিশ-পঁচিশ। সে একটু পাগলাটে লোক, নকুড-মামাকে বড একটা গ্রাহ্যই কবে না, তবে আমাকে কিছু খাতির করে।

নকুড-মামা কহিলেন — ' সব বলছি। তুমি আগে আমার একটা কথাব জবাব দাও দিকি। এই দার্জিলিংএ লোকে আসে কি কবতে হ্যা? ঠাণ্ডা চাই? কলকাতায় তো আজকাল টাকায এক মন বরফ মেলে, তারই গোটাকতক টালিব ওপব অয়েলক্লথ পেতে শুলেই চুকে যায়, সস্তায শীতভোগ হয। উঁচু চাই — তা না হ'লে শৌখিন বাবুদেব বেড়ানো হয না? কেন বে বাপু, দু-বেলা তালগাছে চড়লেই তো হয। যত-সব হতভাগা —।'

এই পৃথিবীটা যখন কাঁচা ছিল তখন বিশ্বকর্মা তাহাকে লইযা একবাব আচ্ছা কবিযা ময়দা-ঠাসা করিযাছিলেন। তাঁর দশ আঙুলের গাঁট্টাব ছাপ এখনও রহিয়া গিয়া স্থানে স্থানে পর্বত উপত্যকা নদী জলধি সৃষ্টি করিযাছে। বিশ্বকর্মার একটি বিবাট চিম্‌টিব ফল এই হিমালয় পর্বত। নাই দিলে কুকুব মাথায় ওঠে, — ভগবানের আশকারা পাইয়া মানুষ হিমালয়ের বুকে চড়িয়া দার্জিলিং-এ বাসা বাঁধিযাছে। নকুডমামা ধর্মভীব লোক, অতটা বাড়াবাড়ি পছন্দ কবেন না।

আমি বলিলাম — 'কি জানেন নকুড়-মামা, কষ্ট পাবাব যে আনন্দ, তাই লোক আজকাল পয়সা খরচ ক'বে কেনে। অমৃত বোস লিখেছে —

ভাগ্যিস আছিল নদী জগৎ সংসারে
তাই লোকে যেতে পারে পয়সা দিয়ে ওপারে।

দার্জিলিং আছে তাই লোকেব পযসা খরচ ক'রে পাহাড় ডিঙোবাব বদখেয়াল হয়েছে। তবে এইটুকু আশার কথা — এখানে মাঝে মাঝে ধ্বস নাবে।'

মামা ত্রস্ত হইয়া খাদের কিনাবা হইতে সরিয়া বাস্তার অপেক্ষাকৃত নিরাপদ প্রান্তে আসিয়া বলিলেন — 'উচ্ছন্ন যাবে। এটা কি ভদ্দব লোকেব থাকবাব দেশ? যখন-তখন বৃষ্টি, বাসা থেকে বেরুলে তো দশ তালার ধাক্কা, দু-পা হাঁটো আর দম নাও। তাও সিঁড়ি নেই, হোঁচট খেলে তো হাড়গোড় চূর্ণ। চললে হাঁপানি, থামলে কাঁপুনি — কেন বে বাপু?'

নকুড়-মামা চারিদিকে একবাব ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সময়টা যদি সত্য ত্রেতা অথবা দ্বাপব যুগ হইত এবং মামা যদি মুনি-ঋষি বা ভস্মলোচন হইতেন, তবে এতক্ষণে সমস্ত দার্জিলিং শহব সাহাবা মরুভূমি অথবা ছাইগাদা হইয়া যাইত। আমি বলিলাম — 'তবে এলেন কেন?'

নকুড। আবে এসেছি কি সাধে। কেষ্টাব স্বভাব জানো তো? লেখাপড়া শিখলি, বে-থা কব্, বিষয়-আশয় দেখ —রোজগার তো আব কবতে হবে না। সে সব নয়। দিনকতক খেযাল হ'ল, ছবি আঁকলে। তাব পব আমসত্ত্বব কল ক'বে কিছু টাকা ওড়ালো। তাব পব কলকাতায় গিয়ে কতকগুলো ছোঁড়াব সর্দাব হ'য়ে একটা সমিতি কবলে। তাবপব বম্বে গেল, সেখান থেকে আমাকে এক আর্জেন্টি টেলিগ্রাম। কি হুকুম? না এক্ষুনি দার্জিলিং যাও, মুন-শাইন ভিলায ওঠ, আমিও যাচ্ছি, বিবাহ কবতে চাই। কি কবি, বড়লোক ভাগনে, সকল আবদাব শুনতে হয়। এসে দেখি — মুন-শাইন ভিলায নবক গুলজাব। ববযাত্রীব দল আগে থেকে এসে ব'সে আছে। সেই কচি-সংসদ্, — কেষ্টা যাব প্রেসিডেন্ট।

আমি। পাত্রী ঠিক হযেছে?

নকুড। আবে কোথায পাত্রী! এখানে এসে হযতো একটা লেপচানী কি ভুটানী বিয়ে কববে।

আমি। কচি-সংসদেব সদস্যবা কিছু জানে না?

নকুড। কিচ্ছু না। আব জানলেই বা কি, তাদেব কথাবার্তা আমি মোটেই বুঝতে পাবি না, সব যেন হেঁয়ালি। তবে তাবা খায-দায ভাল, আমাব সঙ্গে তাদেব ঐটুকুই সম্বন্ধ। কেষ্ট বাবাজী আজ বিকেলে পৌঁছবেন। সন্ধ্যেবেলা যদি এস, তবে সবই টেব পাবে, সংসদেব সভ্যদেব সঙ্গেও আলাপ-পবিচয হবে।

কচি-সংসদেব কথা পূর্বে শুনিযাছি। এদেব সেক্রেটাবী পেলব বায আমাদেব পাড়াব ছেলে, তাব পিতৃদত্ত নাম পেলাবাম। বি.এ. পাশ কবিয়া ছোকবাব কচি এবং মোলায়েম হইবাব বাসনা হইল। সে গোঁফ কামাইল, চুল বাড়াইল এবং লেডি-টাইপিস্টেব খোঁপাব মতন মাথাব দু-পাশ ফাঁপাইয়া দিল। তাবপব মুগার পাঞ্জাবি গরদের চাদব, সবুজ নাগবা ও লাল ফাউন্টেন পেন পবিয়া মধুপুবে গিয়া আশু মুখুজ্যেকে ধবিল—ইউনিভার্সিটিব খাতাপত্রে পেলাবাম বায কাটিয়া যেন পেলব বায কবা হয। স্যাব আশুতোষ এক ভলুম এন্‌সাইক্লোপিডিয়া লইয়া তাড়া কবিলেন। পেলাবাম পলাইয়া আসিল এবং বি.এ. ডিপ্লোমা

বাক্সে বন্ধ করিয়া নিরুপাধিক পেলব বায় হইল। তাবই উদ্যমে কচি-সংসদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তবে যতদূর জানি কেষ্টই সমস্ত খরচপত্র যোগায়। এই কচি-সংসদের উদ্দেশ্য কি আমার ঠিক জানা নাই। শুনিয়াছি এরা যাকে তাকে মেম্বার করে না এবং নূতন মেম্বাবের দীক্ষাপ্রণালীও এক ভয়াবহ ব্যাপার। গভীর পূর্ণিমা নিশীথে সমবেত সদস্যমণ্ডলীর করস্পর্শ কবিযা দীক্ষার্থী ষোলটি ভীষণ শপথ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে ষোল টিন সিগারেট পোড়ে এবং এনতার চা খবচ হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, মেঘও কাটিযা গিযাছে। সন্ধ্যার সময় নিশ্চয়ই মুনশাইন ভিলায় যাইব বলিযা নকুড-মামার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

গৃহিণী তিন ছড়া পাঁচ সিকা দামের চুনি-পান্নার মালা উপর্যুপবি গলায পবিয়া বলিলেন —'দেখ তো, কেমন মানাচ্ছে।'

আমি বলিলাম —'চমৎকার। যেন পবস্ত্রী।'

গৃহিণী। তুমি একটি ক্যাড। পরস্ত্রী না হ'লে বুঝি মনে ধরে না?

আমি। আরে চট কেন। পরকীয়াতত্ত্ব অতি উঁচুদরের জিনিস। তার মহিমা বোঝা যার তাব কম্ম নয, তবে যে নিজের স্ত্রীকে পরস্ত্রীর মতন নিত্য-নূতন — ধবি ধবি ধবিতে না পারি — দেখে, সে অনেকটা এগিযেছে। বাধাকৃষ্ণই হচ্ছে মডেল প্রেমিক। ফ্রযেড বলেছেন —

গৃহিণী। ড্যাম ফ্রয়েড — অ্যান্ড বাধাকৃষ্ণ মাথায় থাকুন। আমাদেব মতন মুখ্খু লোকেব সীতাবামই ভাল।

আমি। কিন্তু রাম যে সীতাকে দু-দুবাব পোড়াতে চাইলেন তাব কি?

গৃহিণী। সে ত লোকনিন্দেয় বাধ্য হ'যে। ত্রেতাযুগের লোকগুলো ছিল কুচুণ্ডে বাসকেল।

আমি। তা — তিনি ভবতকে বাজ্য দিযে সীতাকে নিয়ে আবার বনে গেলেই পাবতেন।

গৃহিণী। সেই আহ্লাদে প্রজারা যে রামকে ছাড়তে চাইলে না।

আমি। বাঃ, তুমি আমার চাইতে ঢের বড় উকিল। আমি তোমাকে বামচন্দ্রের তবফ থেকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। কিন্তু ভাগ্যিস তিনি সীতার মতন বউ পেযেছিলেন তাই নিস্তাব পেযে গেলেন। তোমার পাল্লায় পড়লে অযোধ্যা শহরটাকেই ফাঁসি দিতে হ'ত।

গৃহিণী। কেন, আমি কি শূর্পনখা না তাড়কা রাক্ষুসী?

আমি। সীতা ছিলেন গোবেচারী লক্ষ্মীমেয়ে। তোমার মতন আবদেরে নয।

গৃহিণী। সোনার হরিণ কে চেয়েছিল মশায়? কত ওজন তাব খোঁজ বাখ? যদি ফাঁপা হয় তবু পাঁচ হাজার ভরি।

আমি। আচ্ছা, আচ্ছা, তোমারই জিত। আর শুনেছ, কেষ্ট যে এখানে বিয়ে করতে আসছে। সেই কাশীর কেষ্ট।

গৃহিণী। হুরে! ভাগ্যিস খানকতক গহনা এনেছি। কিন্তু আশ্বিন মাসে লগ্ন কই?

আমি। প্রেমের তেজ থাকলে লগ্নে কি আসে যায়। তবে পাত্রীটি কে তা কেউ জানে না। হয়তো এখনও পাত্রীই স্থির হয়নি, যদিও বরযাত্রীর দল হাজির।

গৃহিণী। গ্যাড! শুনেছিলুম কেষ্টর বাপের ইচ্ছে ছিল টুনি-দিদির ননদের সঙ্গে কেষ্টর বিয়ে দিতে। সে মেয়ে তো এখানেই আছে, আর বড়-সড়ও হয়েছে। তারও বাপ-মা নেই, তার দাদা — টুনি-দির বর ভুবনবাবু — তিনিই এখন অভিভাবক।

আমি। তা বলতে পারি না। কেষ্টর মতিগতি বোঝা শিবের অসাধ্য। যাই হ'ক, সন্ধ্যার সময় একবার কেষ্টর বাসায় যাব।

মনোহারিণী সন্ধ্যা। জনবিরল পথ দিয়া চলিয়াছি। শহরের সর্বত্র —উপরে, আরও উপরে, নীচে, আরও নীচে — স্তরে স্তরে অগণিত দীপমালা ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাস্তার দু-ধারে ঝোপে জঙ্গলে পাহাড়ী ঝিঁঝির অলৌকিক মূর্ছনা ষড়্‌জ হইতে নিষাদে লাফাইয়া উঠিতেছে। পরিষ্কার আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, কুয়াশার চিহ্নমাত্র নাই। ঐ মুন-সাইন ভিলা।

কিসের শব্দ? দার্জিলিং শহরে পূর্বে শিয়াল ছিল না। বর্ধমানের মহারাজা যে-কটা আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তারা কি মুন-শাইন ভিলায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে? না, শিয়াল নয়, কচি-সংসদ্‌ গান গাহিতেছে। গানের কথা ঠিক বোঝা যাইতেছে না, তবে আন্দাজে উপলব্ধি করিলাম, এক অচেনা অজানা অচিন্তনীয়া অরক্ষণীয়া বিশ্ব-তরুণীর উদ্দেশে কচি-গণ হৃদয়ের ব্যথা নিবেদন করিতেছে। হা নকুড়-মামা, তোমার কপালে এই ছিল?

আমাকে দেখিয়া সংসদ গান বন্ধ করিল। মামা ও কেষ্টকে দেখিলাম না। কেষ্ট আজ বিকালে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু কোথায় উঠিয়াছে কেহ জানে না। শীঘ্রই সে মুন শাইন ভিলায় আসিবে এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

পেলব রায় আমাকে খাতির করিয়া বসাইল এবং সংসদের অন্যান্য সভ্যগণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিল, যথা —

শিহরন সেন
বিগলিত ব্যানার্জি
অকিঞ্চিৎ কর
হুতাশ হালদার
দোদুল দে
লালিমা পাল (পুং)

এদের নাম কি অন্নপ্রাশনলব্ধ না সজ্ঞানে স্বনির্বাচিত? ভাবিলাম জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বাধা দিল। লালিমা পাল মেয়ে নয়। নাম শুনিয়া অনেকে ভুল করে, সেজন্য সে আজকাল নামের পর 'পুং' লিখিয়া থাকে।

হঠাৎ দরজা ঠেলিয়া নকুড়-মামা ঘরে প্রবেশ করিলেন। তাঁর পিছনে ও কে? এই কি কেষ্ট? আমি একাই চমকিত হই নাই, সমগ্র কচি-সংসদ্‌ অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। হুতাশ বেচারা নিতান্ত ছেলেমানুষ; সবে সিগারেট খাইতে শিখিয়াছে, — সে আঁতকাইয়া উঠিল।

কেষ্টর আপাদমস্তক বাঙালীর আধুনিক বেশবিন্যাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। তার মাথার চুল কদম্বকেশরের মতন ছাঁটা, গোঁফ নাই কিন্তু ঠোঁটের নীচে ছোট একগোছা

দাড়ি আছে, গায়ে সবুজ রঙের খাটো জামা — তাতে বড বড় সাদা ছিট, কোমবে বেল্ট, মালকোঁচা-মারা বেগনী রঙের ধুতি, পায়ে পট্টি ও বুট, হাতে একটি মোটা লাঠি বা কোঁতকা, পিঠে ক্যাম্বিসের ন্যাপস্যাক স্ট্রাপ দিয়া বাধা।

আমিই প্রথমে কথা কহিলাম — 'কেষ্ট, একি বিভীষিকা?'

কেষ্ট বলিল — 'প্রথমটা তাই মনে হবে, কিন্তু যখন বুঝিয়ে দেব তখন বলবেন হাঁ কেষ্ট ঠিক করেছে। ব্রজেন-দা, জীবনটা ছেলেখেলা নয়, আর্ট অ্যান্ড এফিশেন্সি।'

আমি। কিন্তু চেহারাটা অমন করলে কেন?

কেষ্ট। শুনুন। মানুষের চুলটা অনাবশ্যক, শীততাপ নিবাবণের জন্যে যেটুকু দবকাব ঠিক ততটুকু রেখেছি। এই যে দেখছেন দাড়ি, একে বলে ইম্পিবিয়াল, এব উদ্দেশ্য নাকটা ব্যালান্স করা। আপনারা সাদা ধুতির ওপর ঘোর রঙেব জামা পরেন — অ-ফুল। তাতে চেহারাটা টপ-হেভি দেখায়। আমার পোশাক দেখুন — প্রাম ভাযোলেট অ্যান্ড সেজ-গ্রীন, হোয়াইট স্পট্স — কলার কনট্রাস্ট অ্যান্ড হাবমনি। এইবাব পাছাপাড় হাফপ্যান্ট ফবমাশ দিযেছি, তাতে ওয়েস্ট-লাইন আরও ইমপ্রুভ কববে। এই যে দেখছেন লাঠি, এতে বাঘ মাবা যায়। এই যে দেখছেন পিঠের ওপর বোঁচকা, এতে পাবেন না এমন জিনিস নেই। আমি স্বাবলম্বী, স্বয়ংসিদ্ধ, বেপরোয়া।

এই পর্যন্ত বলিয়া কেষ্ট দুই পকেট হইতে দুই প্রকাব সিগাবেট বাহিব কবিল এবং যুগপৎ টানিতে টানিতে বলিল — 'পাবেন এ বকম? একটা ভার্জিনিযা একটা টার্কিশ। মুখে গিযে ব্লেন্ড হচ্ছে।'

নকুড়-মামা চক্ষু মুদিযা অগ্নিগর্ভ শমীবৃক্ষবৎ বসিযা বহিলেন। তাঁহাব অভ্যন্তবে বিস্মষ ও ক্রোধ ধিকিধিকি জ্বলিতেছে।

পেলব রায় বলিল —''কেষ্টবাবু, আপনি না রুচি-সংসদেব সভাপতি? আপনি শেষটায এমন হলেন?''

কেষ্ট। রুচি ছিলুম বটে, কিন্তু এখন পাকবাব সময হযেছে।

আমি। নিশ্চয়ই, নইলে দরকচা মেবে যাবে। যাক ওসব কথা, —কেষ্ট, তুমি নাকি বে কববে?

কেষ্ট। সেই পরামর্শ কবতেই তো আসা। আপনিও এসেছেন, খুব ভালই হযেছে। প্রথমে আমি প্রেম সম্বন্ধে দু-চার কথা বলতে চাই।

আমি। নকুড়-মামা, আপনি ওপরে গিযে লেপ মুড়ি দিযে শুয়ে পড়ুন — আর ঠাণ্ডা লাগাবেন না। যা স্থিব হয় পরে জানাব এখন। তার পব কেষ্ট, প্রেম কি প্রকার? — একটু চা হ'লে যে হ'ত।

পেলব হাঁকিল — 'বোদা — বোদা—।' বোদা বলিল —'জু।'

বোদা কেষ্টর চাকর, নেপালী ক্ষত্রিয়। তাহাব মুখ দেখিলেই বোঝা যায় যে সে চন্দ্রবংশাবতংস। পেলব তাহাকে দশ পেয়ালা চা আনিতে বলিল।

কেষ্ট বলিতে লাগিল — 'প্রেম সম্বন্ধে লোকের অনেক বড় বড় ধারণা আছে। চণ্ডীদাস বলেছেন — নিমে দুধ দিয়া একত্র করিয়া ঐছন কানুর প্রেম। রাশিয়ান কবি ভড়্কাউইস্কি

বলেন — প্রেম একটা নিকৃষ্ট নেশা। মেট্‌নিকফ বলেন — প্রেমে পরমায়ু বৃদ্ধি হয়, কিন্তু ঘোল আরও উপকারী। মাদাম দে সেইয়াঁ বলেন — প্রেমই নারীর একমাত্র অস্ত্র যার দ্বারা পুরুষের যথাসর্বস্ব কেড়ে নেওয়া যায়। ওমর খায়যাম লিখেছেন -- প্রেম চাঁদের শরবত, কিন্তু তাতে একটু শিবাজী মিশুতে হয়। হেনরি-দি-এইট্‌থ বলেছিলেন, — প্রেম অবিনশ্বর, একটি প্রেমপাত্রী বধ করলে পর পর আর দশটি এসে জোটে। ফ্রয়েড বলেন — প্রেম হচ্ছে পশু-ধর্মের ওপর সভ্যতার পলেস্তারা। হ্যাভেলক এলিস বলেন --'

আমি। ঢের হয়েছে। তুমি নিজে কি বল তাই শুনতে চাই।

কেষ্ট। আমি বলি — প্রেম একটা ধাপ্পাবাজি, যার দ্বারা স্ত্রী পুরুষ পরস্পরকে ঠকায়।

রুচি-সংসদ্ একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিল। হুতাশ বুকে হাত দিয়া ক্ষীণ স্বরে বলিল — 'ব্যথা, ব্যথা।'

কেষ্ট বলিল -- 'হুতো, অমন করছিস কেন রে? বেশী সিগারেট খেয়েছিস বুঝি? আর খাস নি?'

লালিমা পালের গলা হইতে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ নির্গত হইল — জাপানী ঘড়ি বাজিবার পূর্বে যে-রকম করে সেই প্রকার। তার গলাটা স্বভাবতঃ একটু শ্লেষ্মাজড়িত। কলিকাতায় থাকিতে সে কোকিলের ডিমের সঙ্গে মকরধ্বজ মাড়িয়া খাইত, কিন্তু এখানে অনুপান অভাবে ঔষধ বন্ধ আছে। কেষ্ট তাহাকে উৎসাহিত করিয়া বলিল — 'লেলো, তোর যদি প্রেম সম্বন্ধে কিছু বলার থাকে তো বল্ না।'

লালিমা বলিল — 'আমার মতে প্রেম হচ্ছে একটা — একটা — একটা—'

আমি সাজেস্ট করিলাম — 'ভূমিকম্প।'

কেষ্ট। এগ্‌স্যাক্টলি। প্রেম একটা ভূমিকম্প, ঝঞ্ঝাবাত, নায়াগ্রাপ্রপাত, আকস্মিক বিপদ — যাতে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়।

লালিমা আর একবার বাজিবার উপক্রম করিল, কিন্তু তার প্রতিবাদ নিষ্ফল জানিয়া অবশেষে নিরস্ত হইল।

আমি বলিলাম — 'তবে তুমি বিয়ে করতে চাও কেন? কত টাকা পাবে হে?'

কেষ্ট। এক পয়সাও নেব না। আমি বিবাহ করতে চাই জগতকে একটা আদর্শ দেখাবার জন্যে। জগতে দু-রকম বিবাহ চলিত আছে। এক হচ্ছে — আগে বিবাহ, তার পরে প্রেম, যেমন সেকেলে হিঁদুর। আর এক রকম হচ্ছে — আগে প্রেম, তার পর বিবাহ, অর্থাৎ কোর্টশিপের পর বিবাহ। আমি বলি — দু-ই ভুল। আগে বিবাহ হ'লে পরে যদি বনিবনা না হয়, তখন কোথা থেকে প্রেম আসবে? আর—আগে প্রেম, পরে বিবাহ, এও সমান খারাপ, কারণ কোর্টশিপের সময় দু-পক্ষই প্রেমের লোভে নিজের দোষ ঢেকে রাখে। তারপর বিবাহ হ'যে গেলে যখন গলদ বেরিয়ে পড়ে তখন টু লেট।

আমি। ওসব তো পুরনো কথা বলছ। তুমি কি ব্যবস্থা করতে চাও তাই বল।

কেষ্ট। আমার সিস্টেম হচ্ছে — প্রেমকে একদম বাদ দিয়ে কোর্টশিপ চালাতে হবে, কারণ প্রেমের গন্ধ থাকলেই লুকোচুরি আসবে। চাই—দু-জন নির্লিপ্ত সু-শিক্ষিত নবনারী, আর একজন বিচক্ষণ ভুক্তভোগী মধ্যস্থ ব্যক্তি — যিনি নানা বিষয়ে উভয় পক্ষের মতামত

বেশ করে মিলিয়ে দেখবেন। আমি একটা লিস্ট করেছি। এতে আছে — বেশভূষা, আহার্য, শয্যা, পাঠ্য, কলাচর্চা, বন্ধু-নির্বাচন, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি তিরেনব্বইটি অত্যন্ত দবকারী বিষয়, যা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর হরদম মতভেদ হয়ে থাকে। প্রথমেই যদি এইসব মোকাবেলা হ'য়ে যায় এবং অধিকাংশ বিষযে দু-পক্ষের এক মত হয়, আর বাকী অল্পস্বল্প বিষয়ে একটা রফা করা চলে, তা হ'লে পরে গোলযোগের ভয় থাকবে না। কিন্তু খববদার, গোড়াতেই প্রেম এসে না জোটে, তা হ'লেই সব ভণ্ডুল হবে। শেষে যত খুশি প্রেম হ'ক তাতে আপত্তি নেই। এতদিন চলছিল —কোর্টশিপ, আর আমার সিস্টেম হচ্ছে —হাইকোর্টশিপ।

আমি। কোর্ট-মার্শাল বললে আবও ঠিক হয়। সিস্টেম তো বুঝলুম, কিন্তু এমন পাত্রী কে আছে যে তোমার এই এক্সপেরিমেন্টে রাজী হবে? তবে তুমি যে প্রেমেব ভয় করছ সেটা মিথ্যে। তোমার ঐ মূর্তি দেখলে প্রেম বাপ বাপ ক'রে পালাবে।

কেষ্ট। পাত্রী আমি আজ ঠিক ক'রে এসেছি।

আমি। কে সেই হতভাগিনী?

কেষ্ট। ভুবন বোসের ভগ্নী, পদ্মমধু বোস।

আমি। আরে। আমাদেব টুনি-দিদিব ননদ? তাই বল। গিন্নী তা হ'লে ঠিক আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু শুনলুম তোমাদেব বিযেব কথা নাকি আগেই একবাব হয়েছিল। এতে কেস প্রেজুডিস্‌ড হবে না?

কেষ্ট। মোটেই না। আমবা দু-পক্ষই নির্বিকাব। ব্রজেন-দা, আপনাকেই মধ্যস্থ হ'তে হবে কিন্তু। আপনার লিগাল ম্যাট্রিমনিযাল দু-বকম অভিজ্ঞতাই আছে, ভাল ক'বে জেবা কবতে পারবেন।

আমি। রাজী আছি, কিন্তু মেয়েটা আমাব ওপব না চটে।

কেষ্ট। কোন ভয় নেই, পদ্ম অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ লোক।

আমি। লোকটি তো বুদ্ধিমান্, কিন্তু মেযেটি কেমন?

কেষ্ট। মজবুত ব'লেই তো বোধ হয। সাত মাইল হাঁটতে পাবে, দু-ঘণ্টা টেনিস্ খেলতে পারে, মাস্কুলাব ইনডেক্স খুব হাই, ফেটিগ-কোয়েফিশেন্ট বেশ লো। সেলাই জানে, রান্না জানে, লজিক জানে, বাজে তর্ক করে না, ইকনমিক্স জানে, গান গাইবাব সময় বেশী চেঁচায় না। তা হ'লে কাল সন্ধ্যেবেলা ভুবনবাবুর বাড়ি ঠিক যাবেন — লাভলক রোড, মডলিন কটেজ।

আমি প্রতিশ্রুতি দিয়া গৃহাভিমুখ হইলাম। মুন-শাইন ভিলার গেট পাব হইতেই একটা কোলাহল কানে আসিল। আন্দাজে বুজিলাম কচি-সংসদেব রুদ্ধ বেদনা মুখরিত হইয়া কেষ্টকে গঞ্জনা দিতেছে। আমি আর দাঁড়াইলাম না।

সমস্ত শুনিয়া গৃহিণী মত প্রকাশ করিলেন — 'বিপিং। পারসী থিয়েটারের চাইতেও ভাল। আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। যদি পাঁচ টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে হয় তাতেও রাজী আছি।'

আমি বললাম —'কিন্তু তোমাকে তো শুনতে দেবে না। হাইকোর্টশিপ গোপনে হয়, ওইটুকুই সাধারণ কোর্টশিপের সঙ্গে মেলে। ঘরে থাকব শুধু আমি, কেষ্ট আর পদ্ম।'

গৃহিণী। আড়ি পাতব।

আমি। তার দরকার হবে না। সব কথাই পরে শুনতে পাবে। আমার যে কান তাহা তোমার হউক।

গৃহিণী। যাই হ'ক আমিও যাব।

আমি। কিন্তু পরের ব্যাপারে তোমার ওরকম কৌতূহল তো ভাল নয়। ফ্রয়েড এর কি ব্যাখ্যা করেন জান?

গৃহিণী। খবরদার, ও মুখপোড়ার নাম ক'রো না বলছি।

অগত্যা দুজনেই টুনি-দিদির বাসায় চলিলাম।

ভুবনবাবু ও টুনি দিদি —এঁরা যেন সাংখ্যদর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি। কর্তাটি কুঁড়ের সম্রাট, সমস্তক্ষণ ড্রেসিং গাউন পরিয়া ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়েন ও চুরুট ফোঁকেন। গিন্নীটি ঠিক উলটা, অসীমশক্তিময়ী, অঘটনঘটনপটিয়সী, মাছকোটা হইতে গাড়ি রিজার্ভ করা পর্যন্ত সব কাজ নিজেই করিয়া থাকেন, কথা কহিবার ফুরসত নাই। তাড়াতাড়ি অভ্যর্থনা শেষ করিয়াই অতিথিসংকারের বিপুল আয়োজন করিতে রান্নাঘরে ছুটিলেন। পদ্ম আসিয়া প্রণাম করিল।

খাসা মেয়ে। কেষ্টা হতভাগা বলে কিনা মজবুত! একি হাতুড়ি না হামানদিস্তা? রুচি-সংসদের মধ্যে বাস্তবিক যদি কেউ নিরেট রুচি থাকে, তবে সে কেষ্ট — ও-কে প্রেমের বক্তৃতা দিক। ঋষ্যশৃঙ্গের একটা শিং ছিল, কেষ্টর দুটো শিং। কিন্তু এই সুশ্রী বুদ্ধিমতী সপ্রতিভ মেয়েটি কেন এই গর্দভের খেয়ালে রাজী হইল? স্ত্রীজাতি বাঁদর-নাচ দেখিতে ভালবাসে পদ্মর উদ্দেশ্য কি শুধু তাই? স্ত্রীচরিত্র বোঝা শক্ত। না, মনস্তত্ত্বের বইগুলো ভাল করিয়া পড়িতে হইবে।

হাইকোর্টশিপ আরম্ভ হইল। ঘরের পর্দা ভেদ করিয়া সুদূর রান্নাঘর হইতে টুনি-দিদি ও আমার গৃহিণীর উচ্চ হাসি এবং কাটলেট-ভাজার গন্ধ আসিতেছে। আমি যথাসাধ্য গাম্ভীর্য সঞ্চয় করিয়া শুভকার্য আরম্ভ করিলাম —

'এই মকদ্দমায় বাদী, প্রতিবাদী, অনুবাদী, সংবাদী, বিসংবাদী কে কে তা এখনও স্থির হয় নি। কিন্তু সেজন্য বিচার আটকাবে না, কারণ দুই সাক্ষী হাজির, — শ্রীমান্ কেষ্ট ও শ্রীমতী পদ্ম —'

কেষ্ট বলিল — 'ব্রজেন-দা, আপনি এই গুরু বিষয় নিয়ে আর তামাশা করবেন না — কাজ শুরু করুন।'

আমি। ব্যস্ত হও কেন—, আগে যথারীতি সত্যপাঠ করাই। — শ্রীমান্ কেষ্ট, তুমি শপথ ক'রে বল যে তোমার মধ্যে পূর্বরাগের কোন কমপ্লেক্স নেই। যদি থাকে তবে মকদ্দমা এখনই ডিসমিস হবে।

কেষ্ট। একদম নেই। পদ্ম যখন পাঁচ বছরের আর আমি যখন দশ বছরের, তখন ওকে যে-রকম দেখতুম এখনও ঠিক তাই দেখি। তবে আগে ওকে ঠেঙাতুম, এখন আর ঠেঙাই না।

আমি। শ্রীমতী পদ্ম, কেষ্টর প্রতি তোমার মনোভাব কি রকম তা জিজ্ঞেস ক'রে তোমার অপমান করতে চাই না। কেষ্টর মূর্তিই হচ্ছে পূর্বরাগের অ্যান্টিডোট। কেষ্ট, এইবার তোমাব সেই ফিরিস্তিটা দাও। বাপ! তিরেনব্বইটা আইটেম! বেশভূষা — আহার্য —শয্যা — পাঠ্য — এ তো দেখছি পাক্কা পনর দিন লাগবে। দেখ, আজ ববঞ্চ আমি গোটাকতক বাছা বাছা প্রশ্ন করি, যদি অবস্থা আশাজনক বোধ হয় তবে কাল থেকে সিস্টেম্যাটিক টেস্ট শুরু হবে। আচ্ছা, প্রথমে আহার্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি — কারণ ওইটেই সবচেয়ে দরকারী, ফ্রয়েড যা-ই বলুন। কেষ্ট তুমি লঙ্কা খাও?

কেষ্ট। ঝাল আমার মোটেই সহ্য হয় না।

আমি। পদ্ম কি বল?

পদ্ম। লঙ্কা না হ'লে আমি খেতেই পারি না।

আমি। ব্যাড। প্রথমেই ঢেরা পড়ল। স্বামী-স্ত্রীর তো ভিন্ন হেঁশেল হ'তে পাবে না। বফা করা চলে কিনা পরে স্থির করা যাবে। জলে লঙ্কা সেদ্ধ ক'রে দুজনকে খাইয়ে দেখে এমন একটা পার্সেন্টেজ ঠিক করতে হবে যা দু-পক্ষেরই বরদাস্ত হয়। আচ্ছা — তোমবা চাযে কে ক চামচ চিনি খাও?

কেষ্ট। এক।

পদ্ম। সাত।

আমি। ভেরি ব্যাড। আবাব ঢেরা পড়ল।

কেষ্ট। আমি মেবে কেটে তিন চামচ অবধি উঠতে পারি। পদ্ম, তুমি একটু নাবো না।

আমি। খবরদাব, সাক্ষী ভাঙাবাব চেষ্টা ক'রো না। যা জিজ্ঞাসা কববাব আমিই কবব। আচ্ছা — কেষ্ট, তুমি কি-রকম বিছানা পছন্দ কব? নরম না শক্ত?

কেষ্ট। একটু শক্ত বকম, ধকন দু-ইঞ্চি গদি। বেশী নবম হ'লে আমাব ঘুমই হয না।

পদ্ম। আমি চাই তুলতুলে।

আমি। ভেবি ভেরি ব্যাড। এই ফেব ঢেবা দিলুম। আচ্ছা — কেষ্ট, পদ্মব চেহাবাটা তোমার কি-বকম পছন্দ হয?

কেষ্ট। তা মন্দ কি।

আমি সাক্ষীবিহ্বলকারী ধমক দিয়া বলিলাম — 'ওসব ভাসা ভাসা জবাব চলবে না, ভাল ক'বে দেখ তার পব বল।'

পদ্ম লাল হইল। কেষ্ট অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহাকে নিবীক্ষণ করিযা একটু বোকা-হাসি হাসিয়া বলিল— 'খাখ্-খাসা চেহাবা। এঃ, পদ্ম আব সে পদ্ম নেই। এক্কেবারে —'

আমি। বস্ বস্ — বাজে কথা ব'লো না। পদ্ম এবাবে তুমি কেষ্টকে দেখে বল।

পদ্ম ভ্রূকুঞ্চিত কবিয়া কেষ্টর প্রতি চকিত দৃষ্টি হানিয়া বলিল — 'যেন একটি সঙ!'

কেষ্ট। তা — আ আমি না-হয় মাথার চুলটা এক ইঞ্চি বাড়িয়ে ফেলব, আব দাড়িটাও না-হয় ফেলে দেব। আচ্ছা, এই হাত দিয়ে দাড়িটা চেপে রাখলাম — এইবার দেখ তো পদ্ম।

পদ্ম হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আমি বলিলাম — 'হোপলেস। আপত্তির প্রতিকার হ'তে পারে, কিন্তু বিদ্রূপেব ওষুধ নেই।'

কেষ্ট একটু গরম হইয়া বলিল — 'আপনিই তো যা-তা রিমার্ক ক'রে সব গুলিয়ে দিচ্ছেন?'

আমি। আচ্ছা বাপু, তুমি নিজেই না-হয় জেরা কব।

কেষ্ট প্রত্যালীঢ়পদে বসিয়া আস্তিন গুটাইয়া বলিল — 'পদ্ম, এই দেখ আমার হাত। একে বলে বাইসেপ্স — এই দেখ ট্রাইসেপ্স। এইবকম জবরদস্ত গড়ন তোমার পছন্দ হয়, না ব্রজেন-দার মতন গোলগাল নাদুস-নুদুস চাও? তোমার মতামত জানতে পারলে আমি না-হয় আমার আদর্শ সম্বন্ধে ফের বিবেচনা করব।'

পদ্ম। তোমার চেহারা তুমি বুঝবে — আমার তাতে কি। আমি তো আর তোমায় দবোয়ান বাখছি না।

কেষ্ট। আচ্ছা, তোমাব হাতটা দেখি একবাব — কি বকম পাঞ্জাব জোর —

কেষ্ট খপ করিয়া পদ্মব পদ্মহস্ত ধবিল। আমি বলিলাম — 'হাঁ হাঁ — ও কি। সাক্ষীর ওপব হামলা! ওসব চলবে না — আমাব ওপব যখন বিচাবের ভার তখন যা কববাব আমিই করব। তুমি ওই ওখানে গিয়ে বস।'

কেষ্ট অপ্রতিভ হইয়া বলিল — 'বেশ তো, আপনিই ফেব কোশচেন করুন।'

আমি। আব দবকার নেই। তোমাদের মোটেই মতে মিলবে না, বফা কবাও চলবে না। আমি এই হুকুম লিখলুম— napoo, nothing doing। কেস এখন মুলতবী বইল। এক বৎসব নিজেব নিজেব মতামত বেশ ক'বে বিভাইজ কব, তাব পব আবাব অত্র আদালতে হাজির হইবা।

কেষ্ট এবাব চটিযা উঠিল। বলিল — আপনি আমার সিস্টেম কিচ্ছু বুঝতে পারেন নি। আপনি যা করলেন সে কি একটা টেস্ট হ'ল? — শুধু ইয়ারকি। আপনাকে মধ্যস্থ মানাই ঝকমাবি হয়েছে।'

আমিও খাপ্পা হইযা বলিলাম — 'দেখ কেষ্ট, বেশী চালাকি ক'রো না। আমি একজন উকিল, বার বৎসব প্র্যাকটিস কবেছি, পনব বৎসব হ'ল বিবাহ করেছি, ঝাড়া একটি মাস সাইকোলজি পড়েছি। কাব সঙ্গে কাব মনে মেলে তা আমাব বিলক্ষণ জানা আছে। আর — তুমি তো নির্বিকাব, তোমাব অত বাগ কেন? দেখ দিকি, পদ্ম কেমন লক্ষ্মীমেয়ে, চুপটি ক'বে বসে আছে।'

কেষ্ট গজগজ করিতে লাগিল। এই সময় হঠাৎ ঘবের পর্দা ঠেলিয়া টুনিদিদিব ছোট খুকী প্রবেশ করিল।

আমি গম্ভীর স্ববে বলিলাম — 'নারী, তুমি কি চাও?'

খুকীব নাবীত্বের দাবি অতি মহৎ এবং সমস্ত নাবীসমাজের অনুধাবনযোগ্য। বলিল — 'খাবেন চলুন, লুচি জুড়িয়ে যাচ্ছে।'

কেষ্ট কাহারও সহিত আব বাক্যালাপ করিল না, ভাল কবিযা খাইলও না। আহারান্তে আমি একাই নিজের বাসায ফিবিলাম। গৃহিণী আজ এখানেই রাত্রি যাপন করিবেন।

পরদিন বেলা দশটায সময় গৃহিণী ফিরিযা আসিয়া আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলেন। সভযে দেখিলাম তিনি কম্বলের ভিতরে ক্ষণে ক্ষণে নড়িযা উঠিতেছেন এবং অস্ফুট শব্দ করিতেছেন।

বলিলাম — 'ফিক ব্যথাটা আবার ধরেছে বুঝি? ডাক্তার দাসকে ডাকব?'

গৃহিণী অতি কষ্টে বলিলেন —'না, কিছু দবকার নেই, ও আপনিই সেরে যাবে। হুঃ, হুঃ হিঃ।'

হিস্টিরিয়া নাকি? ও উৎপাত তো ছিল না, নিশ্চয় বেচারা কন্যকার ব্যাপারে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে। আমার মতলব তো জানে না। মেয়েবা চায় রাতারাতি বিবাহটা স্থির হইয়া যাক। আরে অত ব্যস্ত হইলে কি চলে। কেষ্ট সবে বঁড়শি গিলিয়াছে, এখন তাকে আরও দিনকতক খেলাইতে হইবে।

বৈকালে মুন-শাইন ভিলায় যাইলাম — উদ্দেশ্য কেষ্টকে একটু ঠাণ্ডা করা। কিন্তু কেষ্টব দেখা পাইলাম না, মামাও নাই। কচি-সংসদেব সভাগণ নিজ নিজ খাটে শুইয়া আছে, ডাকিলে সাড়া দিল না। তাহাদের দৃষ্টি উদাস, — নিশ্চয় একটু বড়বকম ব্যথা পাইয়াছে।

বোদাকে জিজ্ঞাসা করিলাম — 'বাবু কাঁহা?'

বোদার বদনচক্রে দর্শন, নিঃশ্বাস ও বাক্যনিঃসরণেব জন্য যে কযটি ছোট ছোট ছিদ্র আছে তাহা বিস্ফারিত হইল। বলিল —'বাবু বাগা।'

আঁ? কেষ্টবাবু ভাগা। কাঁহা ভাগা? নিশ্চয় ভুবনবাবুর বাড়িতে গিযা হোগা।

'বুবনবাবু বাগ গিয়া! উনকি বিবি বাগ গিয়া। উনকি কোকী বাগ গিয়া। কোকীকা গোড়া বাগ গিয়া। গোবে-সি মিসিবাবা যো থি সো বি বাগ গিয়া।' কেষ্ট পালাইযাছে। ভুবনবাবু, তাঁহার বিবি, তাঁহার খুকী, খুকীর ঘোড়া এবং ফবসা-মতন মিসবিবা — অর্থাৎ পদ্ম — সকলেই পালাইযাছে। নকুড়-মামা বোধ হয় খোঁজে বাহিব হইযাছেন কচি-সংসদ কিছুই জানে না, জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

গৃহিণীর কাণ্ড মনে পড়িল। ফিক ব্যথাও নয, হিস্টিবিযাও নয — শুধু হাসি চাপিবাব চেষ্টা। তৎক্ষণাৎ বাসায় ফিরিলাম।

বলিলাম — 'তুমিই যত নষ্টেব গোড়া।'

গৃহিণী। আহা, কি আমার ক্যজের লোক! নিজে কিছুই করতে পাবলেন না, এখন আমার দোষ।

আমি। তার পর ব্যাপাবটা কি বল দিকি?

গৃহিণী প্রথমে একচোট হাসিয়া গড়াইয়া লইলেন। শেষে বলিলেন — 'তুমি তো বাত সাড়ে দশটায ফিরে গেলে। টুনি-দিদি আব আমি গল্প কবতে লাগলুম — সে কত সুখ-দুঃখের কথা। রাত বারটার সময় দেখি — কেষ্ট টিপিটিপি আসছে। তার মুখ কাঁদো-কাঁদো, চাউনি পাগলের মতন। টুনি-দি বললেন — কেষ্ট, কি হয়েছে? কেষ্ট বললে, পদ্মর সঙ্গে বে না হ'লে সে আব এ প্রাণ রাখবে না, তার আর তর সইছে না, হয় পদ্ম — নয় কি একটা অ্যাসিড। আমি বললুম — তার আর চিন্তা কি, অ্যাসিড ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, আর পদ্ম তো মজুতই আছে। আগে সকাল হ'ক তারপর যা-হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। কেষ্ট বললে — সে এক্ষুনি তার সঙের সাজ ফেলে দিয়ে ভদ্দর লোক সাজবে, কিন্তু অত লাফালাফির পর পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাবে কেমন করে? টুনি-দি বললেন — কুছ পরোয়া নেই, কালকের মেলেই কলকাতায় পালিয়ে চল, গিয়েই বে দেব। পদ্ম বিগড়ে

বসল। টুনি-দি বললে নে, নেঃ — নেকী। টুনি-দিকে জান তো, তার অসাধ্য কাজ নেই। সেই রাত্রেই মশাই মোট বাঁধা হ'যে গেল — এক-শ তেষট্টিটা লাগেজ। তাবপর সকালে তাদেব ট্রেনে তুলে দিয়ে চ'লে এলুম।'

বিবাহের পর দেড় মাস কেষ্ট আমার সঙ্গে লজ্জায় দেখা করে নাই, — সবে কাল আসিযা ক্ষমা চাহিয়া গিয়াছে। আমি তাহাকে সর্বান্তকরণে মার্জনা কবিযাছি এবং মনস্তত্ত্ব হইতে নজিব দেখাইয়া বুঝাইয়া দিযাছি যে তাহাব লজ্জিত হইবাব কোনও কাবণ নাই। কেষ্টব মনেব আড়ালে যে আব-একটা উপমন এতদিন ছাইচাপা ছিল তাহাবই ভূমিকম্পেব ফলে সে বাঁদর নাচিয়াছে।

রুচি-সংসদ্ ছত্রভঙ্গ হইযা গিযাছে। কেষ্ট আবাব একটা নূতন ক্লাব স্থাপন কবিযাছে — হৈহয সংঘ। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হৈহয় ক্ষত্রিযগণেব সঙ্গে ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই। ইহাব মেম্বাব —সস্ত্রীক আমি ও কেষ্ট। এই বড়দিনেব বন্ধে আমবা হাওড়া হইতে পেশাওআর পর্যন্ত হইহই করিতে যাইব।

লেখক-পরিচিতি

(বয়সানুক্রমিক)

প্রথম খণ্ড

উইলিযম কেরী ঃ জন্ম ১৭৬১, নবদামটনশায়ারে। পেশা শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : কথোপকথন, ইতিহাসমালা ইত্যাদি। মৃত্যু ১৮৩৪।

মৃত্যুঞ্জয বিদ্যালঙ্কাব ঃ জন্ম ১৭৬২, পেশা শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি, প্রবোধচন্দ্রিকা ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৮১৯।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায ঃ জন্ম · ১৭৮৭, পেশা সাংবাদিকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কলিকাতা কমলালয, হিতোপদেশ, নববাবুবিলাস, দূতীবিলাস, নববিবিবিলাস ইত্যাদি। মৃত্যু ১৮৪৮।

ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ জন্ম ১৮২০, মেদিনীপুবেব বীবসিংহ গ্রামে। পেশা শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বর্ণপবিচয, বোধোদয, কথামালা, আখ্যানমঞ্জবী ইত্যাদি। মৃত্যু ১৮৯১।

ভূদেব মুখোপাধ্যায ঃ জন্ম ১৮২৭, পেশা সাহিত্য-চর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস, পুষ্পাঞ্জলি, পাবিবাবিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচাব-প্রবন্ধ ইত্যাদি। মৃত্যু ১৮৯৪।

পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ঃ জন্ম ১৮৩২, সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব অগ্রজ।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ঃ জন্ম ১৮৩৪, পেশা সাহিত্য-চর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বামেশ্বরেব অদৃষ্ট, কণ্ঠমালা, জালপ্রতাপচাঁদ, দামিনী, পালামৌ ইত্যাদি। মৃত্যু ১৮৮৯।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায ঃ জন্ম ১৮৩৮, ২৪ পবগণাব কাঁঠালপাড়া গ্রামে। পেশা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, কমলাকান্তেব দপ্তব, কৃষ্ণকান্তেব উইল, আনন্দমঠ ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৮৯৪।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায ঃ জন্ম ১৮৪৭, পেশা শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ · কঙ্কাবতী, ভূত ও মানুষ, মজাব গল্প, ডমরুচবিত ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯১৯।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ জন্ম ১৮৫৩, পেশা সাহিত্য-চর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাল্মীকিব জয, সচিত্র রামায়ণ, কাঞ্চনমালা, বেনেব মেযে ইত্যাদি। মৃত্যু . ১৯৩১।

অমৃতলাল বসু ঃ জন্ম ১৮৫৩, পেশা বিশিষ্ট নাট্যকার। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গল্প-সংকলন, নিমাইচাঁদ ও উপন্যাস 'অবলা বল ও চঞ্চলা' ছাড়াও অসংখ্য নাটক। মৃত্যু ১৯২৯।

স্বর্ণকুমারী দেবী ঃ জন্ম . ১৮৫৫ , পেশা সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ . বসন্ত-উৎসব, হুগলীর ইমামবাড়ী, নবকাহিনী, স্নেহলতা ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৩২।

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ জন্ম : ১৮৫৮, শ্রীহট্টে. বিশিষ্ট দেশনেতা ও সুবক্তা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শোভনা, মহারানী ভিক্টোরিয়াব জীবনী, জেলের খাতা, চরিত্রচিত্র, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি। মৃত্যু . ১৯৩২।

জলধর সেন ঃ জন্ম . ১৮৬০ , পেশা শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ · প্রবাস-চিত্র, হিমালয়, কাঙ্গাল হবিনাথ, দানপত্র, তিনপুরুষ ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৯৩৯।

ববীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্ম ১৮৬১ , জোড়াসাঁকোয়। পেশা সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ . সাহিত্যেব সর্ব শাখায় অসংখ্য গ্রন্থ। মৃত্যু ১৯৪১।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঃ জন্ম ১৮৬১ , পেশা সম্পাদনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ স্বপনসঙ্গীত, পর্বতবাসিনী, অমবসিংহ, জয়ন্তী ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৪০।

শরৎকুমারী চৌধুরানী ঃ জন্ম ১৮৬১ , চোরবাগানে। পেশা সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শুভবিবাহ. শরৎকুমাবী চৌধুবাণীব বচনাবলী ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৯২০।

কেদাবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায ঃ জন্ম ১৮৬৩ , চব্বিশ পবগণার দক্ষিণেশ্বরে। পেশা সাংবাদিকতা ও সাহিত্য-চর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বত্নাকব, কাশী- সঙ্গীতাঞ্জলি, চীনযাত্রী, শেষ খেযা, স্মৃতিকথা ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৪৯।

উপেন্দ্রকিশোব বাযচৌধুবী ঃ জন্ম ১৮৬৩ , মৈমনসিংহে। পেশা সম্পাদনা ও সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ টুনটুনিব বই, সেকালেব কথা, অথৈ জলের বাজপুবী, গুপী গাইন বাঘা বাইন ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯১৫।

মানকুমাবী বসু ঃ জন্ম ১৮৬৩ , যশোহব জেলাব শ্রীধবপুব গ্রামে। পেশা সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রিয প্রসঙ্গ, হাবানো প্রণয ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৪৩।

শ্রীনি দেবী ঃ প্রকৃত নাম নিবোদমোহিনী বসু। জন্ম ১২৭০ ; পেশা সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পাবিজাত। মৃত্যু ১৩৩৯।

প্রমথ চৌধুবী ঃ জন্ম ১৮৬৮ , পেশা সম্পাদনা, ওকালতি, সাহিত্য-চর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সনেট-পঞ্চাশৎ , চাব ইযাবি কথা, বীববলেব হালখাতা, নানাকথা ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৪৬।

জগদানন্দ বায ঃ জন্ম ১৮৬৯ , কৃষ্ণনগব। পেশা লেখালিখি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ গ্রহনক্ষত্র, বৈজ্ঞানিক, পোকামাকড, বাংলাব পাখি ইত্যাদি।

দীনেন্দ্রকুমাব বায ঃ জন্ম ১৮৬৯ , পেশা · সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ পল্লীচিত্র, বাসন্তী, চীনেব ড্রাগন, পট, অজযসিংহেব কুঠী ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৯৪৩।

সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্ম . ১৮৬৯ , পেশা সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ দোলা, মঞ্জুষা, দাসী, চিত্ররেখা ও বৈতানিক ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯২৯।

হিবণ্ময়ী দেবী ঃ জন্ম ১৮৭০ , স্বর্ণকুমাবী দেবীব মাতা। পেশা সম্পাদনা, সাহিত্যচর্চা ও জনহিতকব কাজ। 'সখা', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকায নিযমিত লিখতেন। মৃত্যু ১৯২৫।

চিত্তরঞ্জন দাশ ঃ জন্ম · ১৮৭০ , বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। পেশা : ব্যারিস্টারি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ · মালঞ্চ, সাগরসঙ্গীত, অন্তর্যামী, কিশোর-কিশোরী ইত্যাদি। মৃত্যু . ১৯২৫।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্ম ১৮৭০ ; পেশা . সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ চিত্র ও কাব্য, মাধবিকা, শ্রাবণী ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৮৯৯।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্ম : ১৮৭১ ; পেশা চিত্রাঙ্কন, সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী, ভূতপত্রীর দেশ, নালক, বুড়ো-আংলা, আলোর ফুলকি ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৫১।

সরলা দেবী ঃ জন্ম : ১৮৭২ , পেশা . সমাজসেবা ও সাহিত্য সাধনা, শিক্ষকতা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : নববর্ষের স্বপ্ন, জীবনের ঝরাপাতা ইত্যাদি। মৃত্যু : ১৯৪৫।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী ঃ জন্ম · ১৮৭৩ , পেশা · সাহিত্যচর্চা ও সঙ্গীতচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ নারীর উক্তি, বাংলার স্ত্রী আচার, পুরাতনী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৯৬০।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ জন্ম . ১৮৭৩ , বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে। পেশা ব্যারিস্টারি ও সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ · নবকথা, ষোড়শী, দেশী ও বিলাতী, সন্ন্যাসী, রত্নদ্বীপ ইত্যাদি । মৃত্যু · ১৯৩২।

স্নেহলতা সেন ঃ জন্ম ১৮৭৪ , পেশা অধ্যাপনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ . 'Nehal the Musician'

সরলাবালা সরকার ঃ জন্ম ১৮৭৫ , নদীয়ার কাঁঠালপোতা গ্রামে। পেশা অধ্যাপনা ও সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আর্ঘ্য, নিবেদিতা, স্বামী বিবেকানন্দ, পিক্ষুর ডায়েরী, হারানো অতীত ইত্যাদি । মৃত্যু ১৯৬১।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্ম · ১৮৭৬, হুগলির দেবানন্দপুরে। পেশা সাহিত্য-সাধনা। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ বিষয়ে অসংখ্য গ্রন্থ লিখেছেন। মৃত্যু ১৯৩৮।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জন্ম · ১৮৭৭ , মালদহ জেলার চাঁচল গ্রামে। পেশা অধ্যাপনা, সম্পাদনা, সাহিত্যচর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ভিখারিণী, সর্বনাশের নেশা, পরগাছা, পঞ্চদশী, চোরকাঁটা ইত্যাদি। মৃত্যু ১৯৩৮।

ইন্দিরা দেবী ঃ জন্ম . ১৮৭৯ , কলকাতায়। পেশা : সাহিত্য-চর্চা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ফুলের তোড়া, স্পর্শমণি, নির্মাল্য, কেতকী, শেষদান ইত্যাদি। মৃত্যু · ১৯২২।

কিরণবালা দেবী সরস্বতী ঃ জন্ম . ১৮৮০ , পেশা : সাহিত্যচর্চা। 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'গল্পলহরী' ইত্যাদি পত্রিকায় নিয়মিত লেখালিখি করতেন।

পরশুরাম ঃ প্রকৃত নাম রাজশেখর বসু। জন্ম : ১৮৮০ ; পেশা . বিজ্ঞান-চর্চা ও সাহিত্য-সাধনা। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ . শ্রীশ্রী সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড, গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন, চলন্তিকা।
